বালক

মাসিক পত্রিকা।

জে, এম, বি, ডন্‌ক্যান
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

২৩ নং চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা।

১৯১৪

সূচী।

(বর্গানুক্রমিক।)

বালক

৩য় বর্ষ।] জানুয়ারী, ১৯১৪। [১ম সংখ্যা।

কুড়ানী

বৃষ্টির ফোঁটায় বজ্রের গতি ফিরাইতে পারে, অথবা একগাছি চুলহইতে এমন ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে করিয়া একটী রাজ্য লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইতে পারে, সামান্য জিনিসহইতে যে অতি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সে নিয়মের উদাহরণ মাকড়সার জাল ও মাকড়সার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দেখিয়া রবার্ট ব্রুসের ভগ্নপ্রাণে উৎসাহ-লাভ ও পুনরায় উদ্যোগ এবং স্কটলণ্ড-দেশের স্বাধীনতা-রক্ষণ। ফলে একটুক্‌রা ছোট পাথর যদি পথে পড়িয়া না থাকিত, আমাদের এই "কুড়ানী"র গল্পের সূত্রপাত হইত না।

আসামদেশের কোন পাহাড়তলীর পথে একটুক্‌রা তীক্ষ্ণ পাথর (কলিকাতার খোয়া) পড়িয়াছিল। এক গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে একটী "কাছাড়ী" বালক ঘোড়ায় চড়িয়া এই পথ ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহার ঘোড়ার পায়ে এই পাথরখানা বিঁধিয়া গেল। এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, সেকালে আসামদেশে ঘোড়ার পায়ে "নাল" পরান হইত না—এখন চা-কর ইংরেজদের দেখাদেখি অনেকে পরাইয়া থাকে। এই কাছাড়ী রাখাল-যুবকের নাম "মণিরাম"; ঘোড়ার পায়ে কিছু ফুটিয়াছে টের পাইয়া, মণিরাম নামিয়া পড়িল। কিন্তু লাগাম ঘোড়ার পীঠে রাখিয়া, ঘোড়াকে হাঁটাইয়া দেখিতে চাহিল, কোন্ পায়ে কি হইয়াছে। লাগাম পীঠে পাইয়া, ঘোড়া বেগে ছুটিল, একপলকে অন্ধকাররাত্রিতে অদৃশ্য হইল। মণিরাম অবাক্! এদিক্-ওদিক্ তাকাইল, কিছুই দেখিতে পাইল না। অগত্যা নিকটস্থ পাহাড়ের একটা গর্ত্তের ভিতরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বালক অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, তাই শুইতে-না-শুইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরের বেলা পাখীর কলরবে মণিরামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া দেখে, বদরপুর-পাহাড়ের নাগেশ্বর-গাছের পাতায় পাতায় প্রাতঃকালের সূর্য্যকিরণ নাচিতেছে, আর হাসিতেছে। এমন সময়ে দেখিতে পাইল, একটা শিয়াল একটা খরগোশ মুখে করিয়া ছড়ার পার দিয়া যাইতেছে,—বেচারী আপন বাচ্ছাদের জন্য খরগোশটী শিকার করিয়াছিল।

এই প্রদেশে প্রথমে যখন চায়ের বাগান হয়, তখন শিয়ালের বড় উপদ্রব ছিল। শিয়ালে গৃহস্থের ও চা-বাগানের কুলিদের ছাগল, মেষ, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি দিনের বেলাই লইয়া যাইত। এইজন্য চা-কর সাহেবেরা হাটে বাজারে ঢোল পিটাইয়া দেন যে, শিয়াল মারিয়া মাথা আনিয়া যে দেখাইবে, সে এক-এক-মাথার জন্য চারি-চারি আনা "বক্‌শিশ্" পাইবে। এইজন্য লোকে ফাঁদ পাতিয়া, বিষ খাওয়াইয়া, ও গুলী করিয়া শিয়াল মারিত, গৃহস্থেরা দুই-তিন-বৎসরের মধ্যে বিস্তর শিয়াল মারিয়া ফেলিয়াছে। তবু শিয়াল-বংশ নির্ব্বংশ হয় নাই—তবে বড় বেশী নাই। যেগুলি আছে, সেগুলি বড় হুঁশিয়ার—বড় সাবধানে চলে।

বহুকাল এই পাহাড়তলীতে বাস করাতে এই শৃগালীর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মানুষে যাহা কিছু করে, কেবল শৃগালজাতির সর্ব্বনাশের জন্য করিয়া থাকে। তাই বনের যেদিকে মানুষের গতিবিধি, আজ সে দিক্ দিয়া না গিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, পাহাড়ের নানা

খানা-খন্দক পার হইয়া, একটা টীকড়ের দিকে চলিল—এই টীকড়ের পূর্ব্ব গায়ে একটা গর্ত্তের মধ্যে বেচারী বাচ্ছাগুলি লইয়া বাস করে। আজ গর্ত্তের কাছে আসিয়া, সাবধানে এদিক্-ওদিক্ দেখিল, উপরে ও নীচের দিকে নজর করিল, কিন্তু সন্দেহ করিবার কোন কারণ না পাওয়াতে গর্ত্তের মুখের কাছে বেতের ঝোপের নিকটে গিয়া, "উক্-উক্"-শব্দ করিল। শব্দ শুনিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে, ঠেলাঠেলি করিতে করিতে গোটাকতক বাচ্ছা বাহির হইল। বাহির হইয়া, মা যে খরগোশটা আনিয়াছিল, কেঁউমেউ, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-শব্দ করিতে করিতে সেইটা উদরসাৎ করিতে আরম্ভ করিল, শাবকেরা খাইতে লাগিল, মা একপাশে দাঁড়াইয়া দেখিতে ও আনন্দ-অনুভব করিতে লাগিল।

আগেই ত বলিয়াছি, পূর্ব্বদিকে ঝোড়-জঙ্গলের ফাঁক দিয়া সূর্য্য উঁকি মারিতে আরম্ভ করিলেই, মণিরামের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। শৃগালী যখন খরগোশ মুখে করিয়া, টীকড়ের গা বহিয়া উঠিতেছিল, মণিরাম দেখিতে পাইয়াছিল। শৃগালী ঘুরিয়া টীকড়ের অপর দিকে যেই গেল, মণিরাম অমনি উঠিয়া, সেইদিকে গিয়া দূরহইতে বাচ্ছাদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে অনেকটা অগ্রসর হইল; কিন্তু নিতান্ত কাছে আসিয়া পড়িলেও, শৃগালী বা বাচ্ছারা তাহাকে দেখিতে পাইল না।

শিয়ালের মাথা লইয়া গিয়া দেখাইলেই, প্রতি মাথায় চারিআনা করিয়া "বক্‌শিশ" পাওয়া যায়, তাই সে শৃগালী ও বাচ্ছাগুলিকে মারিয়া ফেলিবার মৎলব করিল। সঙ্গের বন্দুকটা সে নিঃশব্দে পূরিল, এবং শৃগালী যেই একটা বাচ্ছার গা চাটিতে আরম্ভ করিল, অমনি গুলী করিয়া বেচারীকে মারিয়া ফেলিল।

বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভয়ে বাচ্ছাগুলি গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়িল। মণিরাম আর একটীকেও মারিতে পারিল না, কিন্তু গর্ত্তের মুখে বড় বড় পাথর চাপা দিয়া, নিকটস্থ বস্তী বা পুঞ্জির দিকে ধাবিত হইল। এদিকে সাতটী বাচ্ছা অন্ধকারময় গর্ত্তে আটক রহিল। যাইতে যাইতে মণিরাম পলাতক ঘোড়াকে কত গালি দিতে লাগিল।

বেলা পড়িল। বাচ্ছাগুলি ভাবিতে লাগিল, মা অমন করিয়া পড়িয়া গেল কেন? কেনই বা মা আমাদের সারাদিন দুধ দিল না? কেনই বা গর্ত্ত এত অন্ধকার হইল? এইপ্রকারে দিন যাইতে লাগিল। বৈকাল-বেলা মণিরাম কোদাল ও শাবল লইয়া আসিল। আসিয়াই কোদাল দিয়া গর্ত্তের মুখের পাথর সরাইতে লাগিল। বাচ্ছাগুলি কোদালের শব্দ শুনিতে পাইল। একটু পরে গর্ত্তে আলো চমকিল। কোন কোন বাচ্ছা মনে করিল, মা বুঝি কিছু লইয়া আসিতেছে। অবশেষে দেখিতে পাইল, মা নয়, দুইজন অদ্ভুত প্রাণী তাহাদের ঘরে সিঁধ কাটিতেছে।

ঘণ্টাখানিক মাটী খুঁড়িলে পর, লোক-দুইটী গর্ত্তের তলায় আসিল; এইখানে বাচ্ছাগুলি—গা-ভরা পশম—কটা কটা চক্ষু—ভয়ে একবারে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল। বাচ্ছাগুলির এই ভাব দেখিয়া শত্রুদের প্রাণে একরত্তিও দয়া-মায়া হইল না। এক-একটা করিয়া তাহারা বাচ্ছাগুলিকে ধরিল। ধরিয়া এক-এক-আছাড়ে মারিয়া থলিয়ায় পূরিল। থানায় গেলেই ইহারা বক্‌শিশ পাইবে।

এই শৈশব-কালেও বাচ্ছাগুলি সকলে একভাবের নয়; এক-একটার এক-এক-ভাব। উহারা যখন ধরিল, তখন কোন কোনটা ভয়ানক চেঁচাইতে লাগিল। আবার কোন কোনটা গর্জ্জিয়া উঠিল। কোন কোনটা কামড়াইতে চেষ্টা করিল। একটা বাচ্ছা প্রথমে টের পায় নাই যে, বিপদ্ উপস্থিত; সেটা সকলের শেষে পলাইতে গিয়া সকলের পীঠের উপর ছিল। মণিরাম সকলের আগে সেইটাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিল। যে বাচ্ছাটা সকলের আগে বিপদ্ টের পাইয়া পলাইয়াছিল, সেটা সকলের নীচে পড়িয়াছিল। মণিরাম ও তাহার সঙ্গী এক-একটা করিয়া ধরিল ও মারিয়া থলিয়ায় পূরিল, সকলের শেষে এই বুদ্ধিমান্ বাচ্ছাটা তাহাদের চোকে পড়িল। বাচ্ছাটা নড়েও না, চড়েও না, চক্ষু-দুইটী অর্দ্ধেক বুজিয়া মরার মত নিশ্চল রহিল, যেন ইহার প্রাণ নাই। মণিরাম সেটাকে হাতে করিয়া তুলিল। বাচ্ছাটা ক্যাঁ ক্যাঁ করিয়া উঠিল না, বা কামড়াইতে চেষ্টাও করিল না। মণিরাম সঙ্গীকে বলিল, "ভাই রে, এ বাচ্ছাটাকে মেরে কাজ নাই—বাড়ী লইয়া গেলে, ছেলেরা একে পাইয়া খুব খুশি হইবে।" এই বলিয়া সেটাকে জীয়ন্তই থলিয়ায় রাখিল। বেচারা মৃত ভাই-ভগিনীদের সঙ্গে থলিয়ার ভিতর রহিল, ভয়ে আধ-মরা। মণিরাম ও তাহার সঙ্গী থলিয়া পীঠে ফেলিয়া পাহাড়ের গা বহিয়া নামিতে লাগিল। অবশেষে গ্রামে বা পুঞ্জিতে পঁহুছিয়া তাহারা থলিয়া নামাইয়া, গলা টিপিয়া ধরিয়া বাচ্ছাটাকে থলিয়াহইতে বাহির করিল। বাচ্ছাটা দেখিতে পাইল, যাহারা তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, সেইপ্রকার বিস্তর প্রাণী তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছেলেরা শিয়ালের বাচ্ছা পাইয়া বড় খুশি! উহারা শিয়াল ঢের দেখিয়াছে, কিন্তু বাচ্ছা কখনও দেখে নাই—তাই জিজ্ঞাসা করিল,—"এটা কি? কোথায় পাইলে?"—সমস্ত শুনিয়া উহারা বাচ্ছাটার নাম রাখিল—"কুড়ানী"।

২

শিয়ালের বাচ্ছা, "কুড়ানী," দেখিতে বেশ, গা-ভরা পশমের মত লোম, জঙ্গলী কুকুরের মত চেহারা, দুই কাণের মধ্যস্থলে কপালটা বেজায় চৌড়া।

কিন্তু কুড়ানী—মাদী বাচ্ছা—ছেলেদের বড় একটা প্রিয় হইল না। সে ছেলেদের কাছে ঘেঁসিতে ভাল বাসে না, বরং তফাৎ তফাৎ থাকে। কুড়ানী খাইয়া-দাইয়া বেশ মোটা হইয়া উঠিল, কিন্তু, আদর করিলে, খুশী হয় না। বলিতে কি, যে বাক্সে থাকে, ডাকিলে তাহাহইতে বাহিরেও আসে না। হয় ত বড় বড় বালকেরা যখন ইচ্ছা তখনই শিকল ধরিয়া বেচারীকে টানিয়া বাক্সহইতে বাহির করে বলিয়া, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আদর সে গায়ে মাখিত না। বড় বালকেরা টানা-টানি করিয়া জালাতন করিলে, কুড়ানী নীরবে কষ্ট সহিত। মরার মত পড়িয়া থাকিত। সে যেন জানিত যে, ঐরূপ করিলেই নিষ্কণ্টকে থাকা যায়; কিন্তু ছাড়িয়া দিলে, অমনি বাক্সের এক কোণে গিয়া আড়-নয়নে বালকদিগের প্রতি তাকাইয়া দেখিত, আবার টানিয়া তাহাকে বাহির করে কি না।

এই গ্রামের বালকদিগের মধ্যে তেরবৎসরের একটী বালক ছিল। যদিও শেষে সে তাহার পিতার মত দয়ালু, বলবান্ ও চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি বাল্যকালে সে নিতান্ত নিষ্ঠুর ছিল।

আর সকল পাহাড়িয়া ছেলের মত এই বালক—তোতারাম ইহার নাম—বাঁশের চটার ফাঁস ছুড়িতে শিখিতেছিল। তোতারামের ছোট ভাই-ভগিনীরা বাড়ীতে গুরুজনের তত্ত্বাবধানে থাকে, ভাইয়ের মত বনে জঙ্গলে বেড়াইতে পায় না। তোতারামকে দড়ি হাতে করিয়া আসিতে দেখিলে পাড়ার কুকুরগুলি পলাইতে পথ পাইত না। কাজেই সে ফাঁস ফেলিয়া, এই কুড়ানীকে ধরিয়া ফাঁস ফেলা-অভ্যাস করিতে লাগিল। বেচারীকে আল্‌গা পাইলেই তোতারাম বাঁশের ফাঁস ফেলিয়া ধরে। দিনকতকের মধ্যে সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, খানাখন্দকে লুকাইয়া বা সটান মাটীতে পড়িয়া থাকিলে, হাজার জোরে ফাঁস ফেলিয়া মারিলেও, কোন ভয় নাই। ফলে এক করিতে গিয়া আর হইল। তোতারামের ফাঁস ফেলা ও তাহাহইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে করিতে কুড়ানী বেশ বুঝিতে ও চিনিতে পারিল বাঁশের ফাঁস কি, এবং কি করিলে, ফাঁস এড়াইতে পারা যায়। কেমন করিয়া ফাঁসহইতে নিজেকে বাঁচাইতে হয়, কুড়ানী যখন তাহা শিখিয়া ফেলিল, তখন তোতারাম এক নূতন ফিকিরে আমোদ-আরম্ভ করিল। মণিরাম যেমন করিয়া নেকড়ে-বাঘ ধরিবার জন্য নালার ধারে বাঁশের যাঁতি-কল পাতে, সে তেমনি করিয়া, কল পাতিয়া, তাহার উপরে খানিকটা মাংস রাখিল, এবং আশে পাশে মাংসের টুক্‌রা ছড়াইয়া দিল। একটু পরে মাংসের গন্ধ পাইয়া কুড়ানী সেইখানে আসিল, এবং যেই কাছে গেল, অমনি বেচারার একটী পা কলে আটকিয়া যাইতে যাইতে রহিয়া গেল। তোতারাম একটু দূরে গাছের আড়ালে থাকিয়া তামাসা দেখিতেছিল। কুড়ানী ভয়ে পলাইয়া বাক্সের ভিতর গিয়া লুকাইয়াছিল, মণিরাম আনন্দে চীৎকার-ধ্বনি করিতে করিতে কুড়ানীকে বাক্সহইতে টানিয়া বাহির করিল, করিয়া, বেচারীকে ফাঁসে জড়াইয়া ভাই-ভগিনীদের লইয়া খানিকক্ষণ খেলা করিল। মুরব্বিদের টের পাইবার আগেই সে কুড়ানীকে ফাঁসহইতে মুক্ত করিয়া দিল। বার-দুই-তিন এইরূপ করাতে, কুড়ানীর এমন হইল যে, ফাঁস বা যাঁতিকল দেখিলেই ভয়ে সে সাত-হাত তফাতে থাকিত। সে শীঘ্রই কাঁচা বাঁশের গন্ধ চিনিয়া ফেলিল, কারণ তোতারাম কাঁচা বাঁশ-দিয়া যাঁতিকল বানাইয়া পাতিত। ছোট ভাই কুড়ানীর বাক্স আড়াল করিয়া দাঁড়াইত আর তোতারাম কল পাতিত—হাজার পাতা চাপা দিলেও, কুড়ানী গন্ধ পাইয়া বুঝিত যে, এ যাঁতিকল।
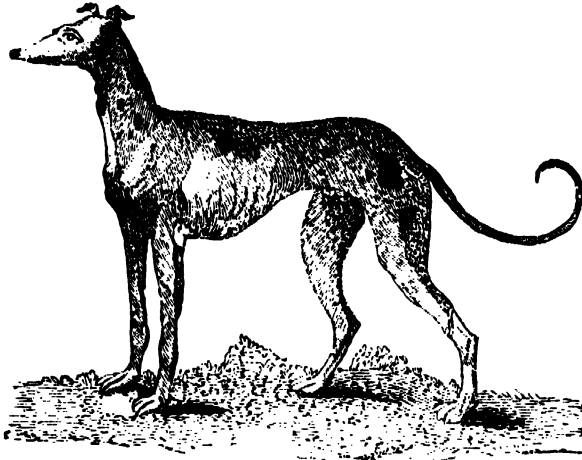
একদিন কুড়ানীর শিকল খুলিয়া গেল। সে শিকল গলায় করিয়া একটু দূরে এক জায়গায় গেল। এক চা-কর সাহেবের সর্দ্দার দেখিতে পাইয়া গুলী করিল। কুড়ানীকে লাগিল না, কিন্তু আগুন দেখিয়া ও বন্দুকের শব্দ শুনিয়া সে বরাবর আপন বাক্সের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। কেহ আসিয়া শিকল বাঁধিয়া দিল বটে, কিন্তু আজহইতে কুড়ানী বন্দুকের আওয়াজ ও বারুদের গন্ধকে ভয় করিতে শিখিল। আরও শিখিল যে, মাটীতে সটান পড়িয়া থাকিলেই রক্ষা, আর কোন উপায় নাই।

বেচারী কুড়ানীকে বন্দী অবস্থায় থাকিয়া আরও অনেক দেখিতে ও ভুগিতে হইল।

নেকড়ে-বাঘ, বনবিড়াল ইত্যাদি মারিবার জন্য পাহাড়িয়া লোকেরা একপ্রকার বিষ-ব্যবহার করিত। এ বিষ একপ্রকার গাছের কাঁচা পাতা। এই পাতা বাঁটিয়া মাংসের টুক্‌রার ভিতরে পুরিয়া বা মাংসে মাখিয়া জঙ্গলে রাখিয়া দিত, খাইয়া নেকড়ে-বাঘ ইত্যাদি মরিয়া যাইত। লোকেরা অতি সাবধানে এই বিষ রাখিয়া দিলেও, তোতারাম কেমন করিয়া খানিকটা জোগাড়

করিল, এবং একদিন এক টুক্‌রা মাংসে মাখিয়া কুড়ানীর বাক্সের ভিতর ফেলিয়া দিল, আর দূরে বসিয়া দেখিতে লাগিল, কুড়ানী কি করে।

কুড়ানী শুঁকিতে লাগিল। সে না শুঁকিয়া কোন জিনিস মুখে দেয় না। ঘ্রাণ লইয়া মনে সন্দেহ জন্মিল। মাংসের গন্ধটুকু ভাল ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাতের গন্ধ, আর এক নূতনরকমের গন্ধ ছিল; কিন্তু যাঁতি-কলের কাঁচা বাঁশের গন্ধ নহে। অবশেষে সে না চিবাইয়া মাংসটুকু গিলিয়া ফেলিল। একটু পরেই পেটে দারুণ বেদনা হইল এবং হাত পায়ে খেঁচুনী ধরিল। কিছু খাইয়া অসুখ-বোধ হইলেই, বিড়ালজাতীয় সকল প্রাণীই বমি করিয়া সে জিনিসটা তুলিয়া ফেলে। কুড়ানীও তাই করিল। সে একগোছা ঘাসের ডগা চিবাইয়া খাইল। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে বমি হইয়া কুড়ানীর সকল অসুখ সারিয়া গেল।

তোতারাম মাংসে এত বিষ দিয়াছিল যে, খাইলে দশ-বারটা শিয়াল মরিত। যদি অল্প বিষ দিত, এত শীঘ্র কুড়ানীর পেটে বেদনা উপস্থিত হইত না, কাজেই বিষ সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িত। আর যখন পেটে বেদনা উপস্থিত হইত, তখন বমি করিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারিত না, কাজেই বেচারী মরিয়া যাইত। কুড়ানী ইহজন্মে ঐ বিদ্‌ঘুটে গন্ধ ও বেদনার কথা ভুলিবে না। আর এ অবস্থায় ঘাস খাইলে, যে কত উপকার হয়, তাহাও তাহার বেশ মনে রহিল—এই ঘাস বিড়ালজাতির স্বভাবদত্ত মহৌষধ। এই স্বাভাবিক জ্ঞান অনুশীলন করিলে বাড়িতেই থাকে। প্রথমবার বিষযুক্ত মাংস খাইয়া অসুখ-বোধ যেই হইল, অমনি বমি করিয়া ফেলিয়াছিল। এইবারহইতে কিছু মুখে দিয়া দেখিত, অসুখ-বোধ হয় কি না। হইলে, ঔষধ ত আছেই। দুষ্ট তোতারাম কুড়ানীকে আবার বিষ খাওয়াইল, কিন্তু এবার বেশি কষ্ট পাইতে হইল না। ঘাস খাইয়া বমি করিয়া রক্ষা পাইল। এই সময়ে এক চা-কর সাহেব তোতার মামাকে একটা বিলাতী কুকুর দিলেন। বালক সেইটাকে লইয়া, কুড়ানীকে নূতনরকমে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল। এইসকল বিপদে পড়িয়া কুড়ানী ঠেকিয়া শিখিল যে, চুপ্‌চাপ্ থাকা ও বিপদ্ দেখিলে তাড়াহুড়া না করিয়া লুকাইয়া থাকা ভাল। বাড়ীর মুরব্বিরা অবশেষে কুড়ানীকে জ্বালাতন করিতে তোতাকে বারণ করিয়া দিল, আর বিলাতী কুকুরটাকে কুড়ানীর বাক্সের কাছে যাইতেই দিত না।

এই সকল কথা শুনিয়া, পাঠক, মনে করিও না যে, কুড়ানী নির্দ্দোষ ও নিরীহ প্রাণী ছিল। সে কামড়াইতে শিখিয়াছে। সে উঠানে মুরগীর বাচ্ছা চরিতে দেখিলে এমনভাবে মাটীতে পড়িয়া থাকে, যেন মরিয়া রহিয়াছে। বাচ্ছা নিকটে গেলেই, ধরিয়া মারিয়া ফেলে। আবার সে ভোরের বেলা ও সন্ধ্যাবেলা ঘেউ ঘেউ করিয়া গান ধরিত। সে গান শুনিয়া ঘুমন্ত ছেলে কাঁদিয়া উঠিত, কাজেই গৃহিণী মধ্যে মধ্যে তাহাকে "শতমুখা" বক্‌শিশ্ দিতেন। কিন্তু কুড়ানী বড় চালাক; সকালে বা সন্ধ্যাকালে ডাকিয়া উঠিলেই, যদি ঘরের ঝাঁপ-খোলার শব্দ শুনিত, অমনি চুপ করিত। তবু মধ্যে মধ্যে লাঠির খোঁচা খাইতে হইত। তাহাতে তাহার বড় বেশী কষ্ট হইত না। আবার কখনও কখনও ভয় দেখাইবার জন্য তোতার মামা কেনারাম-সর্দ্দার বন্দুক ছুড়িত। ইহাতে এই হইল যে, কুড়ানী বন্দুক ও শিকারীকে ভয় করিতে শিখিল। কেন যে কুড়ানী বিকট সুরে গান ধরিত, জানি না। ভোরের বেলা ও সন্ধ্যাকালে ডাকিয়া ত উঠিতই, আবার কোন দিন দুই-প্রহরের সময়ে চেঁচাইত। সে গান ধরিলে, পাড়ার কুকুরগুলি তার সুরে সুর মিলাইয়া গান ধরিত। আবার দূরবর্ত্তী জঙ্গলের শিয়ালেরাও তাহার ডাক শুনিয়া ডাকিয়া উঠিত।

কুড়ানীর এক চমৎকার অভ্যাস হইয়া উঠিল—এটা তাহার জাতিগত অভ্যাস। বাক্সের এককোণে সে কতকগুলি নীরস হাড় রাখিয়া দিত। আর তাহার এলাকার মধ্যে, ভবিষ্যতের জন্য মাটী খুঁড়িয়া মাংসের টুক্‌রা পুঁতিয়া রাখিত। যদি বুঝিতে পারিত যে, কোন কুকুর বা বিড়ালে টের পাইয়াছে, অতি সংগোপনে সে মাংস তুলিয়া অন্য একস্থানে পুঁতিয়া রাখিত।

এইরূপে একবৎসর গেল। কুড়ানী আর বাচ্ছা নহে, বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই একবৎসরে কুড়ানী অনেক বিষয় শিখিয়াছে,—যাহা শিখিতে গেলে, তাহার জঙ্গলী সজাতীয়দের প্রাণ যাইত। পাহাড়িয়া লোকেরা যে নানাপ্রকার ফাঁদ ও কল পাতিয়া শিয়াল, জঙ্গলী কুকুর, হরিণ ও নেকড়ে-বাঘ মারে ও ধরে, কুড়ানী সেসকল চিনিয়া ফেলিল, আর এত ভয় করিত যে, সেসকলের কাছে ঘনাইত না। পাহাড়ীরা যে বিষ-পোরা মাংসের টুক্‌রা ফেলিয়া রাখে, কুড়ানী দেখিলেই বা গন্ধের দ্বারা তাহা চিনিয়া ফেলিত, এবং দৈবাৎ একটু খাইলে, কিরূপে তাহা বমি করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, তাহা জানিত। বন্দুক যে কি মারাত্মক অস্ত্র, সে তাহা বেশ জানিত। এখন আর সকাল-সন্ধ্যায় কবিওয়ালাদের চিতান-সুরে যে গান ধরে না—গান যে না ধরে, এমন নয়; তবে কি না, খুব নরম সুরে, এবং সংক্ষেপে। পোষা কুকুর যে কি পদার্থ, তাহা তাহার জানিতে বাকি নাই;—কুকুর দেখিলে, সে দূরে দূরে থাকে। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া তাহার এই এক বিশেষ ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিপদ্ দেখিলে, মরার মত মাটীতে পড়িয়া থাকা, চুঁ-চাঁ কিছু না করা ভাল। কুড়ানীর কটা কটা চোকের চাহনী দেখিয়া বোধ হইত, মানুষের বিষয়ে সে অনেক শিখিয়াছে ও জানিয়াছে; কিন্তু তাহা যে কি, বুঝিতে পারা যাইত না।

আর মাসকতক পরে কুড়ানী আরও বড় হইয়া উঠিল। এমন সময়ে মণিছড়া-বাগানের বড়সাহেব কলিকাতাহইতে গোটাকতক বড় বড় বিলাতী কুকুর আনাইলেন। এগুলিকে ইংরেজিতে

গ্রে হাউণ্ড বলে, আসামের পাহাড়ীয়া বলে—"বাঘা-কুকুর।" এই কুকুর হরিণের মত দৌড়িতে পারে, তাই ডেবিডসন্-(পাহাড়ীরা বলে—"দেবিসিং-সাহেব") সাহেব মনে করিলেন, এই কুকুরদ্বারা পাহাড়ীরা শিয়াল-বংশ নির্ব্বংশ করিতে পারিবে। কারণ বিস্তর শিয়াল মারা হইয়াছে বটে, তবু মধ্যে মধ্যে শিয়াল আসিয়া কচি-বাছুর, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি মারিয়া ফেলে। তোতার মামা সাহেবের প্রিয় সর্দ্দার, তাই কুকুরগুলি তাহারই জিম্মায় রহিল। তোতার মামা কেনারাম উঠানের কোণে বাঁধা কুড়ানীকে দুই-চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারিত না, তাই ভাবিল, এইটাকে ছাড়িয়া দিয়া, বাঘা-কুকুরগুলিকে শিয়াল-শিকার করিতে শিখাইতে হইবে। তাই সে একদিন কুড়ানীকে থলিয়ায় পুরিয়া অনেক দূরে লইয়া গিয়া, ছাড়িয়া দিল, এবং বাঘা-কুকুরগুলিকেও লেলাইয়া দিল। কুড়ানী বিদ্যুৎবেগে দৌড়িল, কুকুরগুলিও তাহার পিছনে পিছনে তাহারই ছায়ার মত দৌড়িল। কেনারাম ও তাহার সঙ্গীরা চেঁচাইতে ও হাততালি দিতে লাগিল। কুড়ানী ভয় খাইয়া আরও বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। এইরূপে অনেক দূর গেল। বেচারী আর পারে না। কুকুরেরা তাহাকে ধরে আর কি! আর রক্ষা নাই, এমন সময়ে সে থামিল—ফিরিল, এবং কাণখাড়া করিয়া, লম্বা লাঙ্গুল দোলাইতে দোলাইতে আদরমাখা বন্ধুভাবে কুকুরদিগের সম্মুখে গেল। বাঘা-কুকুরেরা এক আশ্চর্য্য-রকমের। তাহাদিগকে দেখিয়া কোন প্রাণী ভয়ে দৌড়িলে, তাহারা পিছনে পিছনে দৌড়িয়া সে প্রাণীকে মারিয়া ফেলে। আর যদি কোন প্রাণী পলাইতে চেষ্টা না করিয়া, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, কিছু বলে না। এক্ষণে কুড়ানী ফিরিয়া যেই দাঁড়াইল, কুকুরগুলি লাফ খাইয়া ফিরিয়া যেন হতবুদ্ধি হইল। কুড়ানীর লেজ-নাড়া দেখিয়া কুকুরেরা বুঝিল যে, এই সেই শিয়াল, যেটা উঠানের কোণে বাঁধা থাকে। কেনারাম ও তাহার সঙ্গীরাও হত-বুদ্ধি হইল। তাহারা ভাবিল, এ কি হইল—এক করিতে আর হইল। ফলে তাহাদের চেষ্টা বিফল হইল—আর কুড়ানী জিতিল।

কোন প্রাণী যদি লেজ দোলায় ও না দৌড়ায়, বাঘা-কুকুরেরা সে প্রাণীকে তাড়া বা আক্রমণ করে না। কেনারাম ও তাহার সঙ্গীরা দেখিল যে, কুড়ানী দৌড়িলে, তাহাকে ধরা দুঃসাধ্য, তাই দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহাকে আবার আটকাইল।

পরদিন মাঠে গিয়া আবার কুড়ানীকে ছাড়িয়া দিয়া বাঘা-কুকুরগুলিকে লেলাইয়া দিল। কিন্তু কুড়ানী পূর্ব্বদিনের মত লেজ দোলাইতে আর আদর দেখাইতে লাগিল। কুকুরেরা তাহার সঙ্গে খেলা-আরম্ভ করিয়া দিল। তাই দেখিয়া, পাহাড়ীরা "বুল্‌ তেড়িয়া"-(Bull-terrier) নামে একটা মোটাসোটা কুকুর ছাড়িয়া দিল। সেটা তেড়ে গিয়া কুড়ানীর লোমভরা গলা কামড়াইয়া ধরিয়া তুলিল, এবং একটু নাড়াচাড়া করিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিল। কুড়ানী মরার মত সটান মাটীতে পড়িয়া রহিল—আর নড়ে চড়ে না। দেখিয়া কেনারাম ও আর সকলে বড় খুশি। এদিকে বাঘা-কুকুরেরা দুঃখিতভাবে কুড়ানীর আশে পাশে ঘুরিতে লাগিল।

এমন সময় চা-কর ডেবিড্‌সন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। তিনি মরা শিয়ালের ঝাঁকরাল লেজের ডগাটা চাহিলেন। মণিরাম বলিল, কাটিয়া নিতে পার ত নেও। তিনি লেজের ডগার দিক্‌টা মুঠা করিয়া ধরিয়া, ছুরী-দিয়া মাঝামাঝি কাটিলেন। কুড়ানী যন্ত্রণায় কোঁ কোঁ করিয়া ঢং পড়িয়া গেল। সেত মরে নাই, করিয়া মরার মত এতক্ষণ পড়িয়া-ছিল মাত্র। এক্ষণে একলাফে উঠিয়া ছুট দিল। একদৌড়ে নিকটস্থ নলবনে গিয়া অদৃশ্য হইল। কুড়ানীকে দৌড়িতে দেখিয়া, বাঘা-কুকুরেরা তাহাকে তাড়া করিয়া দৌড়িল, এমন সময়ে তাহাদের সম্মুখ দিয়া একটা বড় খরগোশ দৌড়িয়া গেল কুকুরেরা কুড়ানীকে দেখিতে না পাইয়া খর-গোশের পিছনে ছুটিল। নিকটে শিয়ালের এক গর্ত্ত ছিল। খর-গোশ সেই গর্ত্তে গিয়া অদৃশ্য হইল। কুড়ানী নিরাপদে নিরুদ্দেশ হইল।

কুকুরের কামড়ে কুড়ানীর অনেকটা কষ্ট হইয়াছিল—এক্ষণে লেজ কাটাতে বিশেষ যন্ত্রণা হইল। আর কিছু হয় নাই। নলবনের ভিতরে খানা-খন্দকের ধার দিয়া দৌড়িয়া সে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করিল। এই কুড়ানী বদরপুর-পাহাড়তলীর শৃগাল-সমাজে নূতন রীতি-নীতি প্রচলিত করিবে।

(ক্রমশঃ)

সেকেলে ডাক্তার।

[স্কটলণ্ডদেশীয় একজন চিকিৎসকের সহৃদয়তার সকরুণ-কাহিনী।]

১

স্কট্‌লণ্ডদেশস্থিত ড্রামটথ্‌টি-গ্রামের লোকদিগের কেবল পুষ্টিকর খাদ্য-ভক্ষণ ও নির্ম্মল বায়ু-সেবনব্যতীত আর সমস্তই স্বাস্থ্য-বিধি-লঙ্ঘন করার অভ্যাস ছিল, তথাপি ইব্রীয় রাজর্ষি-গায়ক মানবায়ুর যে সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ঐ গ্রামের লোকেরা সচরাচর তত বৎসর-পর্য্যন্তই জীবিত থাকিত। ইহারা শীত-গ্রীষ্মে একই প্রকার বেশ-পরিধান করিত, কেবল ড্রামস্থক-প্রমুখ কয়েকজন মাথালো-গোছের কৃষাণ তাপ-তারতম্য অগ্রাহ্য করিয়া মানের দায়ে "বিশ্রামবারে" একটী করিয়া "টপকোট"-পরিধান করিত। কাহারও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় ইহারা মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মানবশতঃ কৃষ্ণবাস-ছাড়া আর কিছুই পরিতে চাহিত না এবং উত্তরিয়া হাওয়া পঞ্চাশ-ক্রোশব্যাপী তুষার-অতিক্রমপূর্ব্বক বহিয়া আসিয়া ইহাদের গায়ে লাগিতে থাকিলেও, ইহারা সেই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকক্ষণ গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাকিত। জংশনে যদি মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকিত, তাহা হইলে ড্রামটথ্‌টির লোকেরা সুধু সেই পল্লীসুলভ নির্ব্বন্ধ-প্রযুক্তই, যতক্ষণ না তাহাদের কোটের পুচ্ছদেশহইতে ঝরণা বহিতে সুরু করিত, ততক্ষণ মুহূর্ত্ত-দুই দাঁড়াইয়া ভিজিত এবং কিলড্রামির অভিমুখে অর্দ্ধপথপর্য্যন্ত পঁহুছিয়া হয়ত এই মন্তব্যপ্রকাশ করিত যে, আজ একটু 'বাদ্‌লা'। বাদ্‌লা ঠিক "ঝুপঝাপ বৃষ্টি" নয়, আগার ঝুপঝাপ বৃষ্টি হইলে, "ভিজে ঢোল" হইবার কথা নহে।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে অনবরত গোঁয়ারতমী করার ফলে কাহারও কাহারও একটু-আধটু কাশি হইত, গৃহিণীরা তখন কর্ত্তাদের স্বাস্থ্য-বিধি-পালন করিতে অনুরোধ করিতেন; কিন্তু কর্ত্তারা তদুত্তরে বলিতেন যে, সহুরে লোকেরাই 'ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছো' যায়, ড্রামটথ্‌টির মরদবাচ্ছারা এত কচিখোকা নয়। স্যাণ্ডি ষ্টুয়ার্ট পথে পাথর বসাইত, রৌদ্র-বর্ষা, শীতগ্রীষ্মে পুরাদমে কাজ চালাইত। পঁচাশীবৎসর-বয়সে তাহাকে কর্ম্মহইতে অবসর-গ্রহণ করিতে "দাওয়ান" হয়। সে আরও দশবৎসর জীবিত থাকিয়া তত শীঘ্র কর্ম্ম-পরিত্যাগের জন্য পশ্চাত্তাপ ও তাহার কার্য্যগ্রহণকারীর কার্য্যের সমালোচনা করিয়া এই পৃথিবীহইতে বিদায়-গ্রহণ করিয়াছিল। ড্রামটথ্‌টির লোকেরা সচরাচর সত্তরবৎসরপর্য্যন্ত পূর্ণপরিমাণে কাজ করিত, সত্তর পার হইলে, আশীবৎসরপর্য্যন্ত ঠিকাঠাকা-কাজ করিয়া বেড়াইত; তাহার পর নব্বইএর কাছাকাছি পঁহুছিলে, ইহলোকহইতে সরিয়া পড়িত। যেসমস্ত লোকের বয়স নব্বইএর বেশী হইত, লোকে তাহাদের বড় খাতির করিত। তাহারাও বেশ মুরুব্বী-আনা করিত। সত্তরবছরের লোকেরও মতামত তাহারা অকালপক্কের মতামত-বিবেচনা করিয়া অগ্রাহ্য করিত এবং তাহাদের মত-সমর্থনার্থে বিগত শতাব্দীর ঘটনাহইতে উদাহরণ দিত হিলক্সের ভাই যখন ষাটবছরে সরিয়া পড়িয়া বে-অকুফি করিয়া ফেলিল, তখন সে বেচারার দুর্নামের আর ইয়ত্তা রহিল না; তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ঘোর-প্যাচ করিয়া কৈফিয়ৎ কাটিতে হইল।
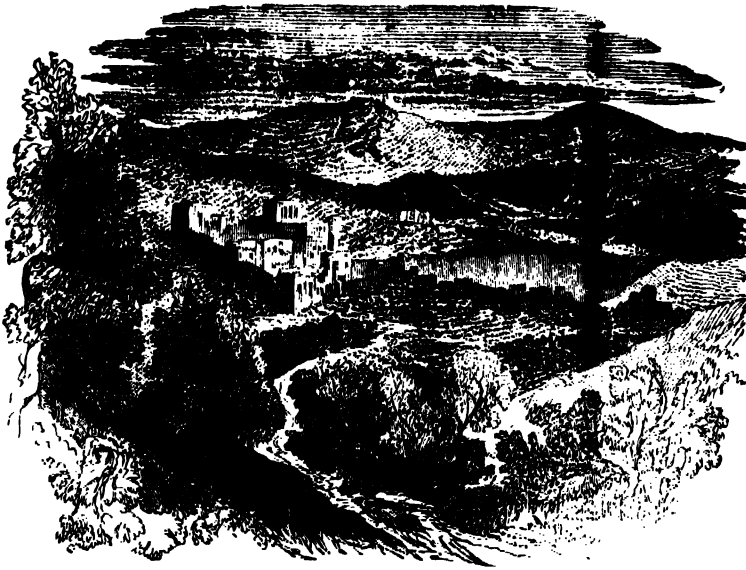
হিলক্স বলিল,—"যেদিক্ দিয়াই দেখ না কেন, ব্যাপারটা বড় বেতর-রকমের হ'য়ে প'ড়েছে; আমাদেরই এখন মহামুস্কিল আর কি! আমাদের গুষ্ঠীতে এরকমটি আর কখনও শুনি নি, কাজেই কৈফিয়ৎ দেওয়া নেহাৎ সোজা নয়।

ওর গিন্নি ব'লছিল যে, এক বৃষ্টি-বাদলের রাতে ও একটা জলায় পথহারিয়ে ফেলে, কাজেই একটা ঝোঁপের তলায় ঘুমিয়ে রাত কাটায়; কিন্তু সে কোন কাজের কথা নয়। আমার মনে হচ্ছে, দু'বছর যে ও ইংলণ্ডে গিয়ে কাটায়, তাইতেই ওর শরীরটায় ঘুণ ধ'রে গিয়েছিল। সে তিরিশবছরের কথা; কিন্তু সেই বিদিশি জল-হাওয়া লাগা-অবধি ও আর সুধ্‌র্'তে পারে নি।"

ড্রামটথ্‌টীর মরদেরা কৈফিয়ৎটা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিল বটে, কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না।

"জলায় রাতকাটান এমন কি বড় কথা; আমরা অনেকদিন বাইরে রাত কাটিয়েছি, কখনও তো একগাছা চুলেরও ক্ষতি হয় নি।

হ্যাঁ, তবে ইংলণ্ডে যাওয়াতে শরীরটা খারাপ হ'তে পারে বটে।

না খাওয়া, না দাওয়া পথে পথে টো টো ক'রে বেড়ালে, শরীরটা একটু বেজুত হবারই কথা; কিন্তু দখিণে গিয়ে যে তা'র শরীরটা বিগ্‌ড়ে গেছে, হিলক্‌সের ভাই তো আমাদের তা কখন বলে নি।"

ফলকথা যে সময় সে বেচারা একটা আলু খুঁড়িবার যন্ত্র লইয়া বিলাতে গিয়া বিফল হইয়া ফিরিয়া আসে, সে সময়-অবধি লোকের আর তাহার উপর তেমন বিশ্বাস ছিল না, এখন অকালে কাল কবলিত হওয়াতে, তাহার উপর তাহাদের অশ্রদ্ধার মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল।

করিতেছে। সে তখন শালগমের কথা লইয়া ব্যস্ত; কথা-প্রসঙ্গে সে বলিল যে, সে ডাক্তারের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

"গিন্নি সকালথেকে সন্ধ্যেপর্য্যন্ত আমার মুখটার কথা নিয়ে কেবলই বক্‌বক্‌ কচ্ছে—তা'র চীৎকারের চোটে আমার কাণে তালা লা'গ্‌বার জো হয়েছে, তাই আমি ম্যাক্‌গিওরের অপেক্ষায় আছি; এলে, এক বোতল অষুধ নিতে হ'বে। ঐ যে সে আস্‌ছে।"

ডাক্তার ঘোড়ার উপর বসিয়া কেবল চোখে দেখিয়াই রোগীর

রোগ-নির্ণয় করিলেন। তাহার পর প্রশংসনীয় স্পষ্টতার সহিত রোগের কথা রোগীকে বুঝাইয়া দিলেন। এই কারণেই ড্রাম-টথ্‌টির লোকেরা তাঁহাকে এত ভাল বাসে।

"আরে মোলো, হিলক্‌স, সেদ্ধ বিটের মত গাল নিয়ে এখেনে ব'সে তুই কচ্ছিস কি? তোর যে 'ইরিসিপেলাস' হ'য়েছে, তা বুঝি মালুম হচ্ছে না, এখন তোর বাইরে বাইরে ঘুরে না বেড়িয়ে বাড়ী চ'লে যাওয়া উচিত। অষুধের জন্যে একটা লোক পাঠিয়ে দিস্‌।

সকলে সব কথা বলার পর ড্রামসুক বলিল,—"এখন সে ম'রে গেছে, তা'ছাড়া তাহার চেয়েও মন্দ লোক আছে, তবে সে যে একটু খাম্‌-খেয়ালী লোক ছিল, তা'তে সন্দ নেই।"

ড্রামটথ্‌টির কোন মরদকে কোন রোগ আক্রমণ করিবার দুঃসাহস করিলে, লোকে রোগটাকে গ্রাহ্যই করিত না। একদিন বৈকালে আমি ডাকঘরে চিঠি আনিতে গিয়াছি, হিলক্‌স তখন ডাকঘরে বসিয়া আছে; তাহার মুখের দক্ষিণভাগটা লাল টক্‌টক্‌

হিন্দুপেট্রিয়টের স্বত্বাধিকারীর সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে এই বন্যাচিত্র-তিনখানি মুদ্রিত হইল। "বালক"-সম্পাদক.

শক্তিগড়ের বন্যাদৃশ্য।
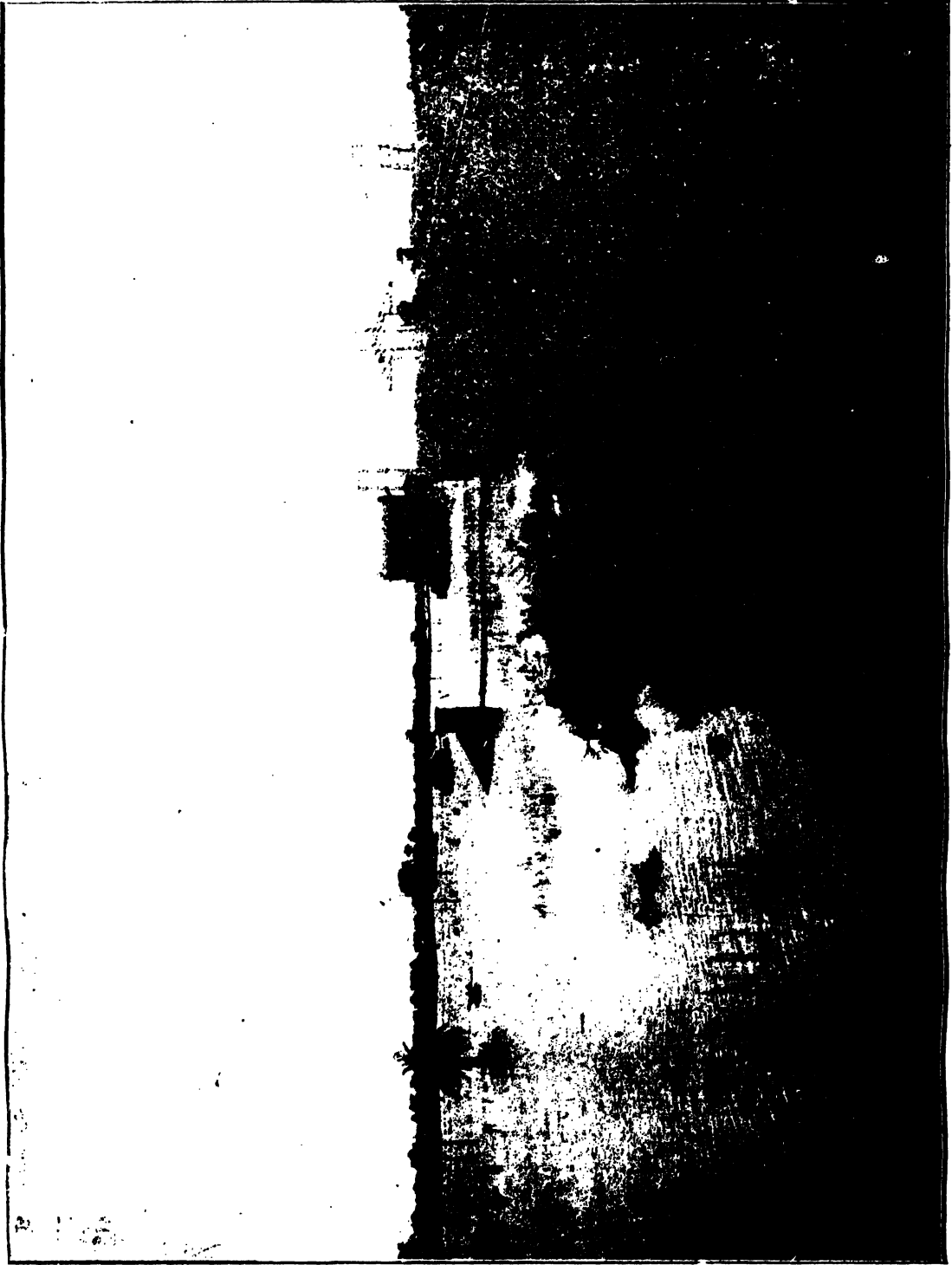
বেগুয়া-খালের নিকট ধাপধাড়ায় দামোদরের বাঁধভঙ্গ।

বন্যায় কইনার দুর্দ্দশা।

আচ্ছা হাঁদা যা' হো'ক, তোরও ভাইএর মত জোয়ান বয়সে অক্কা পা'বার ইচ্ছে হয়েছে না কি ?"

যতক্ষণ না হিলক্‌স বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল, ততক্ষণ ড্রাম-টথ্‌টির ডাক্তারসাহেব বকিতে থাকিলেন। যখন হিলক্‌স চলিয়া যাইতে লাগিল, তখনও তাহাকে চিকিৎসকসুলভ কয়েকটি কাজের কথা বলিতে থাকিলেন।

"আমি দেখ্‌ছি, সময় নষ্ট করিস্‌ নি। সকালবেলাটা শুয়ে থাক্‌গে যা। যতক্ষণ না আমি গিয়ে দেখি, ততক্ষণ ক্ষেতে যাস্‌ নি। সোমবার-দিন আমি গিয়ে তোকে ডাক দেব। বুড়ো বেয়াকুব! এ গাঁয়ের একটাও লোক কারুর কথা শু'নবে না।"

হিলক্‌সের গৃহিণী একজন প্রতিবেশিনীর কাছে গিয়া খবর দিল যে,"ডাক্তার মিন্সেকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে, তাই মিন্সে এখন ঘরে রয়েছে।" তার মানে, সে সকালবেলা চা খাইয়াছে, আর এখন মাথায় সুধু একটা শাল জড়াইয়া আদুড় গায়ে বাড়ীর গোলায় গোলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

যে দেশের লোকেরা পাথরে আছড়াইলেও মরে না, সে দেশের লোকদের কাছহইতে ডাক্তারের পারিশ্রমিক-প্রাপ্তির আশা বড় অল্প। সেইজন্য ম্যাক্‌লিওরকে আরও দুইখানি গ্রামেও রোগী দেখিতে হইত। তাঁহার বাড়ীখানি সদর রাস্তার উপরে, কিন্তু বড় ক্ষুদ্র। শীতকালে সেই রাস্তায় খুব পুরু তুষার পড়িত। পথ-ঘাট দুর্গম হইয়া উঠিত, কিন্তু ডাক্তার কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি আঁধারে, কি আলোকে ধনী-নির্ধন ও যুবা-বুড়ানির্ব্বিশেষে সকলেরই চিকিৎসা করিতে ছুটিতেন। চল্লিশবৎসর-যাবৎ তিনি অবিরাম চিকিৎসা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

একটী ঘোড়ায় তাঁহার কাজ চলিত না, কিন্তু আমরা তাঁহাকে তাঁহার শাদা ঘোটকীটির উপর দেখিলেই আহ্লাদিত হইতাম। প্রভুর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে ঘোটকীরও মৃত্যু হয়—মরণান্তে উভয়েরই যেন হাড় জুড়াইয়াছিল। তিনি যে খুব ভাল সোয়ার ছিলেন, তাহা নয়। অশ্বচালনের সকল কায়দা-কানুনই তিনি অবহেলা করিতেন। কখন কখন এমন ঝুঁকিতেন যে, যেন জেসের (ঘোটকীর) সহিত কাণে কাণে কথা কহিতেছেন। প্রায়ই জিনের উপরহইতে অনাবশ্যকভাবে উৎক্ষেপ করিতেন, কিন্তু তিনি খুব দ্রুতভাবে অশ্বচালন করিতে পারিতেন। তাহা-ছাড়া তিনি যেমন দুই হাঁটুদিয়া অশ্বটিকে বাগাইতে পারিতেন, এমন কেহ পারিত না। তাঁহার অশ্বারোহণ লোকের নিকট এমন পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, অন্ধকার-রাত্রিতেও তিনি অশ্বা-রোহণে যাইলে, লোকে বুঝিতে পারিত, ডাক্তার যাইতেছেন।

তাঁহার যন্ত্রাদি জিনের পিছনে চর্ম্মবদ্ধ থাকিত। তাঁহাকে সকলপ্রকার চিকিৎসাই করিতে হইত। তিনি সার্জ্জন, ডেন্টিষ্ট, অকিউলিষ্ট, কেমিষ্ট, ড্রগিষ্ট একাধারে সবই ছিলেন। অথচ বেচারা যদি কোথাও একটু দেরী করিয়া গিয়াছেন, অমনি লোকেরা তাঁহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিত।

ডাক্তারমাত্রেরই পোষাক বড় ফিট্‌ফাট্‌ দেখা যায়, কিন্তু ম্যাক্‌লিওরের পরিচ্ছদ ও চিকিৎসক-সুলভ ফিট্‌ফাট্‌ ছিল না। সহরের ডাক্তারেরা তাঁহার পোষাক দেখিয়া হাসিত। তবুও রোগী তাঁহার উপস্থিতিমাত্রেই মনে করিত, আমার অর্দ্ধেক ব্যারাম ভাল হইয়া গেল।

তাঁহার শরীর হাড়ে মাসে জড়িত ছিল। তিনি খুব ঢেঙ্গা ছিলেন। মুখের রঙ রোদবৃষ্টিতে জ্বলিয়া গিয়াছিল। গলার আওয়াজ খুব জোর ছিল, একবার হাঁক দিলে, দু'টা মাঠ পারের লোক শুনিতে পাইত। মাথার চুল লাল এবং দাড়ির চুল কাঁচাপাকা ছিল। তাঁহার বাহু "আজানুলম্বিত" ছিল; কিন্তু চিকিৎসায় তাঁহার খুব হাতযশঃ ছিল। সকলেরই এই ধারণা ছিল যে, ম্যাক্‌-লিওর যখন আসিয়াছে, তখন আর রোগীর মৃত্যু নাই। লোককে সান্ত্বনা দিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তখন তাঁহার সেই অমন প্রবল কণ্ঠস্বর কি কোমল হইত! তাঁহার একটী ভ্রূ কাটা ছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইত, তিনি বুঝি বড় বদ্‌লোক, কিন্তু বেচারা এক রোগী দেখিতে গিয়া বরফে পিছলাইয়া ঘোড়াসুদ্ধ পড়িয়া যাওয়াতে, ঐ ভ্রূটি কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি একটু খোঁড়াইতেনও, উহাও তুষারবৃষ্টির সময় রোগী দেখিতে গিয়া পতনের ফল। তাঁহার পঞ্জরাস্থিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এইজন্য তিনি কখন একবারে জেসের উপরে চড়িতে পারিতেন না। তদ্ভিন্ন তিনি একটু বাতাক্রান্তও হইয়া পড়িয়াছিলেন—কত ঝড়বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, হইবারই তো কথা; কিন্তু তাঁহার এই শারীরিক ত্রুটিগুলি তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তিই আকর্ষিত করিত। তিনি ইহার জন্য "ভিক্টোরিয়া ক্রুশ" পান নাই সত্য; কিন্তু দেশবাসীর প্রত্যেকেরই হৃদয়-মন্দিরে শ্রদ্ধার আসন-লাভ করিয়াছিলেন।

অর্থের প্রতি তাঁহার দৃক্‌পাত ছিল না। বলিতে কষ্ট হয়, তাঁহার আমাদের মত দুর্ম্মূল্য দেশে মাসিক ২০০৲ টাকার অধিক আয় হইত না। কেহ ষাট টাকা দিতে আসিলে, তিনি খাদ্য-সামগ্রীর মহার্ঘতার কথা তুলিয়া বলিতেন, আমাকে ত্রিশ টাকা দিলেই চলিবে!

এ রকম লোকের ভাল, এ জগতে হয় না।

(ক্রমশঃ)

———•———

নির্দ্দয় দেবেন্দ্র।

দেবেনের একটুও দয়ামায়া নাই,—
মারে ছোট বোনটিকে,
মারে বুড়ী 'বামা'-ঝীকে;
লাঠি-সোঁটা কিছু তা'র হাতে থাকা চাই!

২

যখন তখন দুষ্টু মারে যা'কে তা'কে,—
মারে 'বুধী'-বেচারাকে,
মারে লাথি 'মেনী'টাকে
কখন কখন মারে স্নেহময়ী মাকে!

৩

দুষ্টুমীটা কিছুতেই ঘুচে না দুষ্টুর।
ধ'রে এনে প্রজাপতি
করে তা'র কি দুর্গতি!
একদিন জব্দ কিন্তু হ'ল সে নিষ্ঠুর!

৪

গরু-ঘোড়া জল খায় পথেতে যেথায়,
সেথা গেঁকী 'কুত্তা' এক
জল খায় ম্যাক্ ম্যাক্;
দেবেন্ চাবুক-হাতে বেড়ায় সেথায়।

৫

কুকুরে চাবুক দিয়ে মারে বার বার।
কাঁদে 'কুত্তা' কেঁউকেঁউ,
করে রেগে ঘেউঘেউ,
কা'ম্ড়ে ধ'র্‌লে শেষে পা'র 'গুলো' তা'র!

৬

এইবার দেবেনের কাঁ'দবার পালা—
কেঁদে সে কোকিয়ে ওঠে,
যন্ত্রণায় ভুঁয়ে লোটে,
কুকুরের কামড়ের ধ'রেছে রে জ্বালা!

৭

খোঁড়াতে, খোঁড়াতে 'দেবু' ঘরে ফিরে যায়;
কুকুর চাবুক নিয়ে
পালায় কোথায় দিয়ে,
কেহ তা'র আর কোন ঠিকানা না পায়।

৮

হ'য়েছে বড়ই কাবু দুষ্টু "দেবু"-বাবু;
প'ড়ে আছে বিছানায়,
জ্বরে অঙ্গ জ্বলে যায়;
ওষুধ—'হাকুচ্' তেঁতো; পথ্যি—'জলসাবু'!

ষ্টেসন-মাষ্টারের কর্ত্তব্য।

যাত্রিগণ ষ্টেশনমাষ্টারকে রেল-কোম্পানীর প্রতিনিধি বিবেচনা করিবেন। ষ্টেশনমাষ্টার, যে ষ্টেশনের তিনি ভারপ্রাপ্ত, সেই ষ্টেশনে যাত্রীরা যাহাতে নিরাপদে থাকেন, এবং ষ্টেশনসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য যাহাতে যথাবিধি নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য দায়ী। সেই ষ্টেশনের অন্যান্য কর্ম্মচারীর ষ্টেশনমাষ্টারই অব্যবহিত উৰ্দ্ধতন অধ্যক্ষ; তাহারা তাঁহার আদেশ-পালন করিতে বাধ্য। নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে যথাবিধি কার্য্য করাইবার নিমিত্ত ষ্টেশনমাষ্টার দায়ী। তথাপি ষ্টেশনমাষ্টার তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের সহিত সর্ব্বদা সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করিবেন, কর্ম্মানুরোধে প্রয়োজন না হইলে, শিষ্টতার সীমা-অতিক্রম করিবেন না।

ষ্টেশনমাষ্টারের সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে, যাত্রীদিগকে নিরাপদ্ রাখা। এই বিষয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার নিম্নতন কর্ম্মচারীরা যাহাতে কাজ বুঝে ও সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে, তাহা তাঁহার দেখা উচিত। তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীরা তাঁহার আদেশ-পালনে সমর্থ কি না, তাহাও তাঁহার দেখা কর্ত্তব্য।

ষ্টেশনে কোম্পানীর যে সমস্ত আসবাব থাকে, তৎসমুদয়ের ভার ষ্টেশনমাষ্টারেরই হস্তে থাকে। ষ্টেশনের ইমারত ও কার্য্যালয়গুলি পরিস্কৃত রাখাও তাঁহারই কার্য্য; এ বিষয়ে যাহাতে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার দিনে অন্ততঃ একবার সমুদয় কার্য্যালয়, প্রকোষ্ঠ প্রভৃতি স্থান-পরিদর্শন করিয়া আসা উচিত। তাঁহার মাঝে মাঝে ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া আসা এবং সিগ্‌ন্যাল ও পয়েন্টগুলি পরিস্কৃত ও কার্য্যোপযোগী আছে কি না, তাহাও দেখিয়া আসা কর্ত্তব্য।

ষ্টেশনের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থে বিজ্ঞাপিত সময়ে টিকিট-ঘর ও লাগেজ করিবার স্থান খুলিয়া রাখা অত্যাবশ্যক-কার্য্য, এইরূপ করিলে, যাত্রীদিগের কোনই অসুবিধা হয় না। যাত্রীদিগের টিকিট কেনা কিম্বা মাল লাগেজ করা হইলে, তাঁহারা যাহাতে ষ্টেশনের যে প্ল্যাটফর্ম্মহইতে গাড়ী ছাড়িবে, সেই প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিতে এবং গাড়ীতে বসিবার জায়গা পান, তাহা দেখা তাঁহার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। যে সমস্ত স্ত্রীলোক একাকিনী রেলে যাত্রা করিতেছেন,* তাঁহাদিগের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা তাঁহার

একটি বিশিষ্ট কর্ত্তব্য। ইহার নিমিত্ত তিনি তাঁহার সর্ব্বশ্রেণীর নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে শ্রেণীনির্ব্বিচারে সমুদয় রমণীরই প্রতি (তা তখন তাঁহারা গাড়ীতেই চড়িয়া থাকুন বা ষ্টেশনে থাকুন) সম্ভ্রমসূচক ব্যবহার ও তাঁহাদের সেবা-যত্ন করিতে বিশেষ-ভাবে উপদেশ দিবেন। যে স্ত্রীলোকদিগের সহিত পুরুষ আত্মীয় যাইতেছেন না, তাঁহাদিগকে স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠেই সর্ব্বদা বসাইয়া দিবেন।

ষ্টেশনমাষ্টার স্বয়ং "উর্দ্দি" পরিয়া উর্দ্দিপরিধান-সম্বন্ধে ষ্টেশনের অন্যান্য কর্ম্মচারীর আদর্শ-স্বরূপ হইবেন। যাহাদের উর্দ্দি পরিতে হয়, তাহারা সর্ব্বদা যাহাতে উর্দ্দি পরে, তদ্বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে বাধ্য করিবেন।

যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদিগকে আরামপ্রদানহেতু যাহা যাহা করা সম্ভব, সর্ব্বপ্রযত্নে করিবেন। তাহার পর রেলবর্ত্ম যাহাতে শীঘ্র বিঘ্ন-শূন্য হয়, সে দিকে মনোযোগ করিবেন।

যে সমস্ত ষ্টেশনে হোটেল ইত্যাদি আছে, সে সমস্ত ষ্টেশনে যাত্রীদিগের আহার-সমাধা না হইবার পূর্ব্বে "প্যাসেঞ্জার ট্রেণ" ছাড়া হইবে না। এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার নিমিত্ত ষ্টেশনমাষ্টারের হোটেলের নিকটে একটি লোককে নিযুক্ত রাখা উচিত, সে ট্রেণ ছাড়িবার দুই তিন-মিনিট পূর্ব্বে যাত্রীদিগকে সতর্ক করিয়া দিবে।

ছোট ছোট ষ্টেশনগুলিতে ষ্টেশনমাষ্টার যাত্রীদিগকে, মাল বা

দুর্ঘটনা।

ষ্টেশনের সমুদয় কর্ম্মচারীর তিনি একখানি হাজিরা-বই রাখিবেন। তাহাতে কাহার কোন্ সময়ে কি কাজ, তাহাও লিখিত থাকিবে। আর দিনে অন্ততঃ একবার তাহাদের সকলের হাজিরা লইবেন।

ষ্টেশনে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে ষ্টেশনমাষ্টার তৎক্ষণাৎ সেই ঘটনা তাঁহার অব্যবহিত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর গোচর করিবেন। যদি সেই দুর্ঘটনায় কেহ আহত বা হত হয়, তাহা হইলে তিনি, যত শীঘ্র সম্ভব, চিকিৎসকের সাহায্য-গ্রহণ করিবেন।

কোন জীব-জন্তু বহনহেতু রেলকোম্পানীর প্রাপ্য ভাড়ার টাকারও ভারপ্রাপ্ত থাকেন। এই টাকা নির্ভুলভাবে আদায় করা ও এই টাকার নির্ভুল হিসাব দেওয়াও ষ্টেশনমাষ্টারের কার্য্য। এই কার্য্যসাধনার্থে তিনি দুইখানি হিসাব-বই রাখেন, একখানি যাত্রীদিগের ভাড়ার হিসাব আর একখানি মালের ভাড়ার হিসাব, তাহাছাড়া তাঁহাকে সদর কার্য্যালয়ে কয়েকখানি হিসাবপত্র পাঠাইতে হয়, তাহাতে কত টাকা আদায় হইয়াছে, কতই বা বাকী আছে, তাহা দেখাইতে হয়।

কুড়ের মুলুক।

সকাল হইয়াছে, রোদও উঠিয়াছে, যতীন যে ঘরে শুইয়া আছে, সে ঘরের জানালার ভিতর দিয়া তাহার মুখে রোদ লাগিতেছে। জগৎসুদ্ধ লোক জাগিয়াছে। ফুলগুলিহইতে শিশিরের ফোঁটাগুলি ঝরিয়া গিয়াছে, তাহারা ভোরের আলোয় চোক মেলিয়া চাহিতেছে। পাখীরা বাসা ছাড়িয়া খাবার খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, মৌমাছিরা মধুর আশায় ভন্ ভন্ করিতে করিতে এফুলহইতে ওফুলে উড়িয়া বসিতেছে, তবুও যতীনের ঘুম আর ভাঙিতেছে না।

মা আসিয়া ডাকিলেন,—"যতীন, ওরে যতে! আচ্ছা কুড়ে যা' হো'ক!" যতীন একবার চোক-দুটি আধখোলাগোছ করিয়া লেপমুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া আবার ঘুমাইল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা একপ্রহর। খুব দেরী হইয়া পড়িয়াছে। ধুতি অসামাল হইয়া পড়িয়াছিল, সে বার বার হাই তুলিতে তুলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা আবার গুছাইয়া পরিল। রান্নাঘরে গিয়া, মা কি করিতেছে, দেখিল। ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া চারিটি মুড়ী ও খানকতক গুড়ের বাতাসা কোঁচড়ে বাঁধিয়া লইল। তাহার পর খিড়কীর আমবাগানে গিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া, মুখ না ধুইয়া, দাঁত না মাজিয়া সেগুলির সদ্গতি করিতে লাগিল। এমন সময়ে সে শুনিল, পাঠশালার পড়ুয়ারা সকালের পড়া পড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সে মনে মনে হাসিল, আজ খুব ফাঁকি দেওয়া গেছে।

এমন সময়ে কোথাহইতে হঠাৎ একটা বিশ্রী চেহারার লোক তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল লম্বা লম্বা, কটা হইয়া জটা পাকাইয়া গিয়াছে। তাহার মুখে, হাতে, সকল গায়ে তিনপুরু ময়লা; তাহার দাঁতে বিশ্রী ছেদ্লা; তাহার কাপড়, জামা যেমন ছেঁড়া, তেমনি ময়লা,—তাহার লজ্জা-নিবারণ করিবে কি, আরও যেন বাড়াইয়া তুলিতেছে। তাহার গায়ে এমনই দুর্গন্ধ যে, তাহার কাছে কেহ নাকে কাপড় না দিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

যতীন উঠিয়া তাহার কাছহইতে তিনহাত তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি?"

সে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল,—"আমি কুড়ের মুলুকের কুড়ের সর্দ্দার, নাম গোঁফ-খেজুর।"

যতীন বলিল,—"ও!"

গোঁফ-খেজুর বলিল,—"কি হে ছোক্‌রা, তুমি আমাদের দেশে যা'বে? সেখেনে ছেলেদের পাঠশালে যেতে হয় না, দাঁত মা'জতে হয় না, চান কত্তে হয় না।"

যতীন ভাবিল, বেশত, বলিল,—"যা'ব।"

গোঁ-খে। তবে এস।

এই বলিয়া সে যতীনের হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। লোকটা এত আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল যে, যতীন জিজ্ঞাসা করিল,—"আর একটু জোরে চ'ল্‌লে হয় না?"

গোঁফ-খেজুর চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"আরে বাস্‌রে, আরও জোরে, এতো উড়েই চ'লেচি! এর চেয়ে জোরে চ'ললে, হয়ত প'ড়ে যা'ব, জামার বোতাম ছিঁড়ে যা'বে; তখন মহাকষ্টে প'ড়ব। কুড়ের মুলুকের ক'বরেজ, আমি ডাক্‌তে ডাক্‌তে গলা চিরে ফে'ল্‌লেও, আস্তে আস্তে বছর-কাবার ক'র্‌বে, দর্জ্জিও দেড়বছরের কম বোতাম-কটা টেঁকে দেবে না, তাই একটু সাবধান হ'য়ে কাজ করা ভাল, বুঝেচ, ছোকরা?"

যতীন কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিল,—"বুঝেচি।"

শেষে তাহারা একটা ঝুপড়ীগোছের কুঁড়েঘরের কাছে আসিয়া পঁহুছিল। তাহার দরজার উপরে লেখা আছে,—"কুড়ের দেশের নাচ-দরোজা।" আর একটু দূরে দেখিল, একজায়গায় লেখা আছে,—"এখানে কেহ কাজ করিলে, তাহার ফাঁসি হইবে!" যতীন ভাবিল,—"আমি কাজও ক'র্‌ব না, ফাঁসিও যা'ব না।" একটু মুচ্‌কিয়া হাসিল।

ঘণ্টাখানিক ধরিয়া গোঁফ-খেজুর দরজা খুলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল। যতীন ভাবিতে সুরু করিল,—"এতক্ষণ দরজা খু'ল্‌তে লাগ্'ছে—বাড়ীর লোকগুলো মড়া না কি?"

ঘণ্টাদেড়েকের পর দরজা খুলা হইল। গোঁফ-খেজুর হাসিয়া বলিল,—"আজ দরজাটা ঠিক সময়ে খুলেছে, তোমার বরাত ভাল।"

একটা তালগাছের মত লম্বা আর পাটকাঠীর মত রোগা লোক-খেড়্‌খেড়ে আওয়াজে বলিল,—"আসুন।" তাহার পর সে একটা অন্ধকার ঘুট্‌ঘুটে সরু গলির ভিতর দিয়া তাহাদের বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইতে লাগিল। যতীন দেখিল, একটা ঘরের চৌকাঠের উপর লেখা রহিয়াছে—"রান্নাঘর।" তাহার কপাট-দুইটি উইএ কাটিয়া জেরবার করিয়া ফেলিয়াছে। কব্জায় মর্চ্চ্যা ধরিয়াছে, কপাট-দুইটি তাই পড় পড় অবস্থায় ঝুলিতেছে। ঘরের মধ্যে ঝাড়ের মত ঝুল ঝুলিতেছে। হাঁড়ি, কড়া, চাটু, হাতা, খুন্তী সব ঘরটাময় ছিটান ও ছড়ান রহিয়াছে—সব সকড়ী। রাঁধুনী এক নোঙ্‌রা বুড়ী, সে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। পচা ও বাসি ডা'ল-তরকারীর দুর্গন্ধে যতীনের উকি উঠিয়া আসিবার জো হইতে লাগিল।

সেই তালপাতার সিপাহীর মত লোকটা শেষে তাহাকে একটা ঘরের সাম্‌নে আনিয়া বলিল,—"এই তোমার ঘর।"

ঘরটি একেবারে খালি, একটিও আসবাব নাই; ধুলায় ভরা। চারিদিকে মাকড়সার জাল। ভয়ানক নোঙ্‌রা, ঘোর অন্ধকার।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল,—"এই নরকের মত ময়লা অন্ধকূপে আমি কি ক'রে থা'ক্‌ব?" লোকটা বলিল,—"কেন, আর সব লোক কি ক'রে আছে, আমরা কি মানুষ নই?" এই বলিয়া সে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যতীন দেখিল,—দেওয়ালে লেখা রহিয়াছে,—"এখানে কথা কহিতে, ভাবিতে, গান গাইতে বারণ।"

যতীন কি করে? সেই ধুলাতেই আড় হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেবল ঐ কাজটি করাই বুঝি এখানে বারণ নয়! যখন সে জাগিল, তখন একটা ঘড়ীতে বারোটা বাজিতেছে। তাহার মনে পড়িল, সে এখানে তিনঘণ্টামাত্র আছে, এখন তাহার নিজের বাড়ীতে হয় ত খাওয়া-দাওয়া হইতেছে। কোঁচার কাপড়টা সে গায়ে দিবার চেষ্টা করিল, শীত লাগিতেছিল।

কে বলিল,—"ও কি কচ্ছ, ছোক্‌রা? থাম।"

যতীন শিহরিয়া উঠিল। তাহার পাশে কে একটা ভূতের মত লোক ভারি আঁটাসাটা পায়জামা-কুর্ত্তা পরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমনি আঁটা সে পোষাক যে, একটু চাড় পড়িলে, বোধ হয়, ছিঁড়িয়া যাইবে!

ভূত আসিয়া কেবল সাইনবোর্ডের দিকে আঙুল দেখাইয়া চলিয়া গেল। যতীন তাহার পিছু পিছু ঘরের বাহির হইল, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। একটা ঘরের দরজা আধ-খোলা ছিল, সে সেই ঘরের মধ্যে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে ছেঁড়া নেকড়া পরিয়া একটা দর্জ্জি বসিয়া আছে। তাহার মুখের উপর একখানা রুমাল ঢাকা রহিয়াছে—সে নাক ডাকাইতেছে। রুমালখানা বিশ্রী ময়লা! ঘরের মধ্যে নানা-রকম কাপড়-চোপড় ছড়ান রহিয়াছে—সূচে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে; কোন কাজেই সে এপর্য্যন্ত হাত দেয় নাই।

ভূতটা কেন অত আঁটাসাঁটা পোষাক পরিয়াছিল, যতীন তাহা এখন বুঝিতে পারিল, দর্জ্জি এপর্য্যন্ত তাহাকে আর একপ্রস্থ পোষাক তৈয়ার করিয়া দেয় নাই—ছেলেবেলাকার পোষাকই সে পরিয়া আছে!

যতীন ভাবিল,—"অমনতর ময়লা রুমাল তো আমি কখন মুখের ওপর চাপা দিতে পা'রব না।"

আবার ভূতটা দেখা দিয়া তাহাকে গলির একটা সাইনবোর্ড দেখাইল—ভাবিতে বারণ; বলিল,—"ভেবো না, ভা'ব্‌লে, পাগল হ'য়ে যা'বে।"

যতীন একটু আগাইয়া গিয়া আর একটা ঘরে উঁকি মারিল। সেখানে একটা ঝী একরাশি ময়লা কাপড় লইয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে—এখনও একটিও কাপড় কাচা হয় নাই। যতীন তখন বুঝিল, দর্জ্জির রুমালটা তত ময়লা কেন।

এইবার তাহার ক্ষুধা পাইতে লাগিল। তাই সে রান্নাবান্নার কতদূর কি হইল দেখিতে আবার রান্না-ঘরে ঢুকিল। রাঁধুনী তখনও ঢুলিতেছে! সে এত বিরক্ত হইল যে, নিজেই রাঁধিবার যোগাড় দেখিবার জন্য হাঁড়িকুড়ি গুছাইতে আরম্ভ করিল। তখনই যেন ভূমিকম্পে বাড়ীটা কাঁপিয়া উঠিল। যতীন গলির দিকে ছুটিল। গিয়া দেখে, ঝি তখন তাড়াতাড়ি ময়লা কাপড়গুলি কাচিতেছে। দর্জ্জী গান গাইতে গাইতে সিলাই সুরু করিয়াছে। তখন আর একটা ঘরের মধ্যহইতে চারিটা ভূত সেই কুড়ের সর্দ্দারকে বাহির করিয়া আনিল। বলিল,—"বেটা অক্কা পেয়েছে! এতদিন আমাদের জবুথবু ক'রে রেখেছিল।"

যতীন চোকের পলক ফেলিল। পরে চাহিয়া দেখে, সে তাহা-দের আমবাগানের মধ্যে বসিয়া; পাঠশালার ছেলেরা আবার পড়িতে চলিয়াছে। যতীনের বড় লজ্জা হইল, তাহাদের দেখিয়া লুকাইল। ভাবিল,—"ছি, ছি, আর কখন কুড়েমী ক'রব না। সবাই যদি আমার মত কুড়ে হয়, তা' হ'লে খেতে, ফর্সা কাপড় প'র্‌তে পারা যা'বে না। চারিদিক্ কেবল ধুলোয় আর ঝুলে ভ'রে যা'বে।"

অদল-বদল।

১

"বালকের" সম্পাদক—"জে এম বি ডন্‌ক্যান"
চিত্র-প্রতিযোগিতায় ছবি আঁকিবারে দেন;—
আঁকিবারে হ'বে এক ক্রীকেট-খেলার ছবি,
শুনিয়া মলিন মুখ যত ছোট-খাট 'রবি'!

২

আমার এ'বার কিন্তু বড় মজা—ভারি 'ফুৎ',—
ছবি আঁকিবারে আমি বরাবর মজবুৎ;
পেন্সিল লইয়া করে আঁকিলাম ঝট্‌পট্,—
কেমনে বৈকুব 'বেল্দা' হঠাৎ হইয়ে 'কট'!

৩

এ'দিকে 'মালতী' বসি', দেখিলাম, আঁকে ছবি;
"কি রে 'মালি', তোর সাধ তুই চিত্রকর হ'বি?
ক্রীকেট-খেলার তুই কি জানিস মেয়েছেলে?
কি লাভ হ'বে বা তোর 'ব্যাট্'-পুরস্কার পেলে?"

৪

বা'র হ'ল পরমাসে প্রতিযোগিতার ফল,—
'মালতীই' লভিয়াছে, হায় রে, প্রথম স্থল!
কি করি, দিলাম তা'রে পড়িতে 'বালক' মোর,
আমি তা'র 'ব্যাট্' ল'য়ে করিতে গেলাম 'স্কোর'

উইকেট্‌-কিপার

উত্তম উইকেট-কিপার বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা উইকেট্‌-কিপারের কাজ কখনও করে নাই, তাহারা হয় ত মনে করিতে পারে যে, এ কাজটী অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এ কাজটী ভালরূপে করিতে চাহিলে, তোমার কেবল যে সাহস ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি থাকা দরকার, তাহা নয়; অন্যান্য গুণও আবশ্যক হইবে। যাহারা উত্তম উইকেট্‌-কিপার হইতে চায়, তাহাদিগকে আমরা প্রথম উপদেশ এই দিব যে, যত্ন ও উদ্যোগের সহিত ঐ কার্য্যটি অভ্যাস কর, কারণ উহা অত্যাবশ্যক। সর্ব্বপ্রথমে ব্যাট্‌সম্যানের অনুপস্থিতিতে, অভ্যাস করা ভাল। তুমি উইকেটের পিছনে দাঁড়াইবে এবং অন্য একজন ছেলে বল দিবে। কিছু দিন এরূপ করিলে পর, তুমি সম্ভবতঃ দেখিবে যে, তোমার বলটী ধরিবার অভ্যাস হইতেছে, বলটী আর তত সহজে তোমার হাত এড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না।

ঐপ্রকার অভ্যাস করা হইলে পর, তুমি ব্যাট্‌সম্যানের উপস্থিতিতে অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিবে। বলা বাহুল্য, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, উইকেট্‌-কিপারের কার্য্য কোনমতে সহজ নয়। তোমার কাজে নানারকম বাধা-বিঘ্ন জন্মিবে; সেগুলির মধ্যে একটী প্রধান বাধা হইতেছে—ব্যাট্‌সম্যানের গা। ব্যাট্‌স-ম্যান তোমার সামনে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া, তুমি বলটী অনেক সময়ে অতি কষ্টে দেখিতে পাইবে। তাহাছাড়া, ব্যাট্‌সম্যান যে পরিমাণে ব্যাট্‌টী ভাঁজিবে, সেই পরিমাণে তোমার পক্ষে বলটীর প্রতি নজর রাখা কঠিন হইয়া উঠিবে; মনে রাখিও যে, বলটীর উপর নজর রাখা উইকেট্‌-কিপারের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তুমি যে একবারেই উত্তম উইকেট্‌-কিপার হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা বৃথা; মন দিয়া অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে, নহিলে তুমি কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যেপর্য্যন্ত না তুমি অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিশ্চিতভাবে বলটী ধরিতে পারিবে, সেইপর্য্যন্ত উইকেট্‌-কিপারের কাজের অন্যান্য দিকে মনোযোগ করিবে না, কারণ বলটী সহজ ও নিশ্চিতভাবে ধরিতে না পারিলে, উইকেট্‌-কিপারের কাজের অন্য কোন দিক্‌ ভালরূপে দেখা অসম্ভব। যে ছেলে ঐরূপে বল ধরিতে শিখে নাই, সে ক্যাচ্‌ বা ষ্টাম্প করিবার সুবিধা করিতে পারিবে না।

উইকেট্‌-কিপার যেন ষ্টাম্প করিবার সুবিধা পায়, তজ্জন্য তাহার উইকেটের খুব কাছে দাঁড়ান দরকার। অফ্‌-সাইডে একটু সরিয়া দাঁড়াইলে, তাহার সুবিধা হইবে, কারণ ব্যাট্‌সম্যানের গা তাহার দৃষ্টির তদ্রূপ বাধা জন্মাইবে না। ব্যাট্‌সম্যানকে ষ্টাম্প করিতে হইলে, ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না; বলটী ধরিয়াই, উইকেট্‌-কিপার তদ্দ্বারা বেলগুলিতে আঘাত করিবে। ফলতঃ উত্তম উইকেট্‌-কিপারের পক্ষে বলটী ধরা ও বেলগুলিতে আঘাত করা যুগপৎসাধ্য ব্যাপার; তাহা একটিমাত্র ক্রিয়াদ্বারা সম্পন্ন হয়।

উইকেট্‌-কিপার উইকেটের যত নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, ততই ভাল, কারণ বলটী উইকেট্‌ ছাড়াইলেই, তাহা ধরা দরকার। সে নিজ সুবিধামত এমনভাবে ঝুঁকিয়া থাকিবে, যেন বলটী সহজে ধরিতে পারে। উইকেট্‌-কিপার, যাহাতে শীঘ্রই দরকারমত এদিক্‌ বা ওদিকে ছুটিতে পারে, এমনভাবে না দাঁড়াইলে নয়। সে সচরাচর কিন্তু পা সরাইবে না; বলটী যদি উইকেটের নিকটহইতে কিছু দূরে, লেগ-সাইডে ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে উইকেট্‌-কিপার পা সরাইতে পারে। বলা বাহুল্য, বলটী ধরিবার জন্য উইকেট্‌-কিপারের হাত-দুইটী সর্ব্বদা উদ্যত রাখা চাই।

উইকেট্‌-কিপারের সতত সতর্ক থাকা দরকার। বল ধরিলেই, যদি সে মনে করে যে, ব্যাট্‌সম্যান নিজ জায়গার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তবে বেলগুলিতে বল দিয়া আঘাত করিয়া আম্পায়ারের কাছে আপিল করিবে; কিন্তু বেলগুলি ফেলিয়া দিবার পর উইকেট্‌-কিপার যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার ভুল হইয়াছে, তাহা হইলে আপিল না করিয়া বেলগুলি আবার উইকেটের উপর বসাইয়া দিবে। মিথ্যা বা অনর্থক আপিল করা উচিত নয়।

ষ্টাম্প যেমন, ক্যাচ্‌ করা তেমনই উইকেট-কিপারের পক্ষে কিছুতেই সহজ নহে; এরূপস্থলে সতর্ক হওয়া ও বলের উপর নজর রাখা অত্যাবশ্যক। ফিল্ডার যখন উইকেটের কাছে বলটী ছুড়িতেছে, তখন উইকেট্‌-কিপার উইকেটের পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিবে, নহিলে তাহার ব্যাট্‌সম্যানকে 'রাণ-আউট' করিবার সুবিধা হইবে না। উইকেট-কিপার সাধারণ ফিল্ডার নয় বটে, কিন্তু, যেস্থানে ফিল্ডার নাই, বলটী উইকেটের নিকটহইতে খানিক দূর ছুটিয়া গিয়া তেমন স্থানে আসিয়া পড়িলে, সে ধরিতে যাইবে।

উইকেট্‌-কিপারের কাজসম্বন্ধে আমাদের শেষ-কথা এই, তোমার হাতদুইটী পরস্পরের কাছেই রাখা দরকার। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কার্য্য করিও না, তোমার হস্তের সঞ্চালন সহজ হওয়া চাই। তোমার কোনরকম কু-অভ্যাস যেন না জন্মে, সে বিষয়ে সাবধান হইবে। দর্শকদের প্রশংসার দিকে একবারও দৃষ্টি করিও না; ক্রিকেট্‌ নাটক-অভিনয় নয়—খেলাই।

———•———

আরব্য-উপকথা

একজন গরীব স্ত্রীলোকের একথলিয়া ছাতু চুরী গিয়াছিল। সে এক শেখের কাছে গিয়া নালিশ করে। কাছে একটা তাঁবু গাড়া ছিল, শেখ সে তাঁবুর লোকদের ডাকিয়া প্রত্যেকের হাতে এক-একটী ছড়ি দিয়া বলিল,—"কাল সকালপর্য্যন্ত ছড়িগুলি তোমাদের কাছে রাখিবে, সকালে আমি মাপিয়া দেখিব, যাহার ছড়ি বড় হইবে, সেই চোর। এখন ছড়িগুলি সব একমাপেরই আছে।"

পরদিন দেখা গেল, একটী ছড়ি অন্য ছড়িগুলির চেয়ে ঢের ছোট হইয়া গিয়াছে! তখন শেখ সেই ছড়ি যাহার, তাহাকে বলিল,—"তুমিই চোর!" সে দোষ-স্বীকার করিল, ফলে দোষীই দণ্ড পাইল। সে-ই চোর কি না, তাই সত্যসত্যই ছড়ি বাড়িবে এই ভয় করিয়া তাহার ছড়ির খানিকটা ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল!

২

মা বলিলেন,—"বাবা এই থালাটা নিয়ে যাও, বাজারথেকে মধু আর নুন নিয়ে এস।" ছেলে মার হুকুম তামিল করিতে চলিল। প্রথমে সে মধুর দোকানে গেল, সেখানে থালা ভরিয়া মধু লইল। তাহার পর সে লবণের দোকানে গেল। লবণ কিনিবার সময় সে ভাবিল,—"থালার উল্টো পীঠে যদি নুন নিই, তা' হলে আর দু'টো বোঝা বইতে হয় না।" থালা উল্টাইয়া লবণ লইল, সব মধু রাস্তায় পড়িয়া গেল। সেদিকে তাহার খেয়াল নাই, সে বাড়ী ফিরিয়া চলিল। বাড়ী পঁহুছিয়া বলিল,— "মা, এই নাও, মধু আর নুন।"

মা বলিলেন,—"নুন তো দে'খ্'ছি, মধু কই?"

ছেলে। কেন, এই যে এ পীঠে!

মধু নাই!

ছেলে। ওহো, তবে প'ড়ে গেছে, তা' এই নুন নাও।

আবার থালা উল্টাইল, লবণও নাই!

৩

এক দুষ্ট লোক তাহার বাড়ীখানি বেচিয়া ফেলিতে চাহিল, কিন্তু সেই বাড়ীর একটী ঘর সে তাহার দখলে রাখিবার ইচ্ছা করিল। খরিদদার সেই সর্ত্তেই বাড়ীখানি কিনিল। খরিদ-বিক্রীর একটা লেখা-পড়া হইল। যাই লেখা-পড়া হইয়া গেল, অমনি বিক্রেতা তাহার ঘরের বাহিরে একটা মরা কুকুর টাঙাইয়া দিল।

আরবেরা মরা কুকুর ছোঁয় না। ক্রেতা বিক্রেতাকে মরা কুকুরটাকে স্থানান্তর করিতে অনুরোধ করিল; বিক্রেতা তাহার কথা কাণে তুলিল না। ক্রেতা তখন বাধ্য হইয়া বিক্রেতাকেই খুব কম দামে বাড়ীখানি বেচিয়া ফেলিল। জুয়াচোর বিক্রেতার উহাই অভিসন্ধি ছিল!

৪

একজন লোক সদর রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময়ে একটা বাড়ীর উপরহইতে একচাপ পাথর আসিয়া তাহার উপরে পড়িল, ফলে তাহার পা ভাঙিয়া গেল। লোকটি গিয়া, যে বাড়ীহইতে পাথরের চাপটা পড়িয়াছিল, সেই বাড়ীর মালিকের নামে আদালতে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিল। বাড়ীর মালিক আপত্তি করিল, নালিশ তাহার নামে না করিয়া যে বাড়ী তৈয়ার করিয়াছে, তাহার নামে করা উচিত। রাজমিস্ত্রি আসিয়া বলিল যে, এ দুর্ঘটনার জন্য তাহাকে দায়ী করা উচিত নয়, কারণ সে যখন পাথরখানা বসাইতেছিল, তখন পথদিয়া একটী মেয়ে বড় রঙচঙে একটী পোষাক পরিয়া যাইতেছিল, তাহাতে তাহার চোক ঠিক্‌রিয়া যায়, সেইজন্য পাথরখানা ঠিক জায়গায় বসাইতে পারে নাই।

তখন মেয়েটির তলব হইল। সে আসিয়া যে দোকানদার তাহাকে অত চটুকে রঙের কাপড় বিক্রয় করিয়াছে, তাহার দোষ দিল। দোকানদার আসিয়া জানাইল যে, ঐ রঙের কাপড় বিদেশহইতে আসিয়াছে, সুতরাং বিদেশী সওদাগরই দোষী!

বিচারক রাগিয়া গিয়া বলিল,—"কি, তুমি বিদেশী জিনিষের কারবার কর? তবে তোমারই দরোজায় তোমাকে লট্‌কাইয়া ফাঁসী দেওয়া হইবে।"

দরোজাটা নীচু, আর লোকটা ঢেঙা ছিল, সুতরাং দোকান-দারকে লট্‌কান গেল না, ফলে সে সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেল!

৫

এক মসজিদ-রক্ষক এক ধোপানীর উপর ভারী চটিয়া গিয়াছিল। সে তাহাকে খুন করিবার অভিপ্রায়ে ভুলাইয়া মসজিদের মধ্যে আনিয়া বলিল;—"চল, তোমাকে এক পীরের কবর দেখাই।" কবরের দরোজা খুলিয়া সে ধোপানীকে কবরের মধ্যে ঢুকাইয়া বাহিরহইতে দরোজা বন্ধ করিয়া দিল; তাহার পর কাজির কাছে গিয়া নালিশ করিল,—একটা ধোপানী একটী কবরের মধ্যে ঢুকিয়াছে। মুসলমান-ধর্ম্মমতে এরকম কাজ বড় অন্যায়। কাজি ধোপানীকে দেখিতে আসিল। ধোপানী ইতোমধ্যে কি করিয়া কবরের মধ্যহইতে পলাইয়াছে, কাজি আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না। মসজিদ-রক্ষক বলিল,—"আমি তা'কে কবরে বন্ধ ক'রে রেখে গিয়েছিলুম।" একজন লোক বলিল,—"ধোপানীকে এই তো দেখে এলুম, কাপড় কা'চছে।"

কাজি ধোপানীকে সত্যই কাপড় কাচিতে দেখিয়া মসজিদ-রক্ষককে মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য দণ্ড দিল।

বালক

৩য় বর্ষ।]　　　ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪।　　　[২য় সংখ্যা

কুড়ানী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৩

কুড়ানী ত মানুষের হাতহইতে মুক্ত হইয়া বনে আসিল, কিন্তু এখন উদরের চিন্তায় আকুল। আজিহইতে তাহাকে নিজেই নিজের অন্নের সংস্থান করিতে হইবে।

বন্য পশুদের তিনপ্রকারে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। প্রথম, পূর্ব্বপুরুষেরা যা ঠেকিয়া শিখিয়াছে। বন্য পশুরা সম্পদ্‌ ও বিপদ্‌-হইতে যে জ্ঞানলাভ করে, পরবংশীয়েরা স্বভাবতঃ সেই জ্ঞানের ভাগী হয়, শৈশবে এই জ্ঞানদ্বারা তাহাদের বিস্তর উপকার হয়—জন্মাবধি তাহারা এই উত্তরাধিকারলব্ধ জ্ঞান-বলে আপনাদিগকে বাঁচাইয়া চলিতে পারে।

দ্বিতীয়, মাতাপিতা ও সঙ্গীরা ঠেকিয়া, ঠকিয়া যা শিখে, সেই শিক্ষা সন্তানেরা দৃষ্টান্ত দেখিয়া লাভ করে। দৌড়িতে শিখিলেই, সেই শিক্ষাদ্বারা তাহাদের অনেক উপকার হয়

তৃতীয়, নিজেরা যা' ঠেকিয়া শিখে। যত বড় হয়, এই শিক্ষা তত দরকারি ও উপকারী হইয়া উঠে।

প্রথম জ্ঞান বা শিক্ষা সদাই একভাবের; দেশের, কালের অবস্থা বদলিয়া গেলে, সঙ্গে সঙ্গে এই উত্তরাধিকারলব্ধ জ্ঞানের সময়োচিত বদল হয় না। দ্বিতীয়প্রকার শিক্ষার দোষ এই যে, কথা বলিতে না পারাতে পশুরা একজনের মনের ভাব অন্যজনকে জানাইতে পারে না। তৃতীয়প্রকার শিক্ষার দোষ এই যে, এ শিক্ষা-লাভ করিতে গেলে, বড় বিপদে পড়িবে—প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়। কিন্তু এই তিনপ্রকার শিক্ষা একাধারে অধিষ্ঠান করিলে, বড় ভাল হয়, প্রায় নিরাপদে থাকা যায়।

কুড়ানী কিন্তু এক নূতনরকমের শিয়াল। তৃতীয়প্রকার, অর্থাৎ ঠেকিয়া শেখা জ্ঞান লইয়া হয় ত কখনও কোন শিয়ালকে সংসারে পা দিতে হয় নাই, দ্বিতীয়প্রকার, অর্থাৎ মাতাপিতার ও সঙ্গীদের নিকটহইতে অর্জ্জিত জ্ঞান ত কুড়ানীর মোটেই ছিল না। প্রথমপ্রকার জ্ঞান যা' ছিল, খাটাইবার সুযোগ না পাওয়াতে সে জ্ঞান ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল।

পাহাড়িয়া লোকদের এবং চা-বাগানের কুলিদের এলাকা ছাড়াইয়া সে অনেক দূরে আসিয়া পড়িল, কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। একবার কেবল গাছতলায় বসিয়া লেজের ঘা চাটিল। অবশেষে সে যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেখানে খরগোশের আড্ডা। ধাড়ীগুলি আহারের অন্বেষণে কোথায় গিয়াছে, কেবল কতকগুলি বাচ্ছা গর্ত্তে রহিয়াছে। নিকটে আসিলেই, বাচ্ছাগুলি একপ্রকার ঘোৎ-ঘোৎ-শব্দ করিয়া উঠিল।

কুড়ানী একটা বাচ্ছাকে ধরিতে গেল, কিন্তু সেটা বেগে দৌড়িয়া গর্ত্তের ভিতর ঢুকিল। পরে সেখানহইতে সরিয়া পড়িল। ঝর্ণার ধারে যদি কয়েকটা বড় ইন্দুর না পাইত, কুড়ানীকে সে রাত্রিতে উপবাস করিয়া কাটাইতে হইত। সে মায়ের কাছে শিকার করিতে শিখে নাই বটে, কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া ঠেকিয়া শেখা জ্ঞানের সাহায্যে কয়েকটা ইন্দুর ধরিয়া উদরসাৎ করিল।

পরে দিনকতকের মধ্যেই কুড়ানী আহারের যোগাড় করিতে শিখিল। এই জঙ্গলে ইন্দুর, গো-সাপ, খরগোশ, নেউল ইত্যাদি বিস্তর দৌড়াইয়া ধরিতে পারা যাইত। দূরে শিকার দেখিতে পাইলে, সে নিঃশব্দে, যতটা পারে, কাছে যায়, যদি একলাফে

গিয়া ধরিতে না পারে, পলাতক প্রাণীকে তাড়া করিয়া অবশেষে ধরে। এইরূপে দিন-পনের যাইতে না যাইতে, কুড়ানী উদরান্নের বিলক্ষণ যোগাড় করিতে শিখিয়া ফেলিল।

কুড়ানী যেখানে ছিল, দুই-একবার সেইখান দিয়া শিকারী-দিগের বিলাতী কুকুর যাওয়া-আসা করিতে দেখিল। কুকুর দেখিলে, শিয়ালেরা প্রায়ই চেঁচাইয়া উঠে, বা টিলার মাথায় উঠিয়া কুকুরগুলি কি করে, ও কোন্‌দিকে যায়, না যায়, তাই দেখিতে থাকে। কিন্তু কুড়ানী এ সব বোকামী করিল না। দৌড়িলে, কুকুরেরা তাহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইলে, কাহার সাধ্য সে কুকুরের হাত এড়ায়। সে যেখানে ছিল, সেইখানে মাটীতে সটান শুইয়া পড়িল, পড়িয়া মরার মত নিশ্চলভাবে ও নিঃশব্দে রহিল। কুকুরেরা তাহাকে দেখিতে পাইল না। মাটী শুঁকিতে শুঁকিতে, ঘুরিয়া ফিরিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে অন্যদিকে চলিয়া গেল। কুড়ানী শিশুকালহইতে মানুষের কাছে ছিল, এবং শিখিয়াছিল যে, নীরবে পড়িয়া থাকিলে, সহজে বিপদ্ এড়াইতে পারা যায়, এক্ষণে সেই শিক্ষা কাজে লাগিল। ফলে তাহার শৈশবের দুর্ব্বলতা এক্ষণে বলে পরিণত হইল। আসামের পাহাড়িয়া শিয়ালেরা হরিণের অপেক্ষাও দ্রুত দৌড়িতে পারে বলিয়া বিখ্যাত; ফলে দৌড়ই তাহাদের একমাত্র ভরসা; আর বিশ্বাস ছিল যে, এ বনে এমন কোন প্রাণী নাই যে, দৌড়ে তাহাদের সঙ্গে পারে। কোন পশু তাড়া করিলে, এই শিয়ালেরা তাহাদের সঙ্গে খেলা করে। ধরা দেয় দেয় করিয়া একছুটে কোথায় পলাইয়া যায়। প্রথম প্রথম বিলাতী "বাঘা-কুকুরের" সঙ্গে ঐপ্রকার খেলা করিতে গিয়া অনেকে মারা পড়িল। কিন্তু কুড়ানী মানুষের কাছে "মানুষ" হইয়াছে, সদাই শিকলে বাঁধা থাকিত, কাজেই বড় একটা দৌড়িতে পারে না। সে পদ-বলের উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধি-বলের উপর নির্ভর করিয়া নিরাপদে বনে দিন কাটাইতে লাগিল।

গ্রীষ্মকালটা কুড়ানী বদরপুর-পাহাড়ের আশে পাশেই রহিল। এইখানে থাকিয়া সে গো-সাপ ইত্যাদি ছোট ছোট প্রাণী ধরিয়া খাইতে শিখিল। আহা, সে যদি শৈশবে মানুষের হাতে না পড়িত, দুধে দাঁত ভাঙ্গিবার আগে সে এইপ্রকার জানোয়ার ধরিতে আর দৌড়িতে শিখিত, এবং শরীরেও বল হইত। কুড়ানী চা-বাগান ও গ্রামের ত্রিসীমানায় যায় না, এবং মানুষ, ঘোড়া, গোরু ইত্যাদি দেখিতে পাইলে, ঝোড়ের ভিতরে নিঃশব্দে লুকাইয়া থাকে; কাজেই কাহারও চখে পড়ে না। এইভাবে সে গ্রীষ্মকালটা একাই রহিল। দিনের বেলা সে এদিক্-ওদিক্ যায়, এটা-ওটা দেখে, বেশ থাকে; কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলেই, তাহার গান গাহিতে, অর্থাৎ ডাকিতে ইচ্ছা হয়। এদেশের শিয়ালের মত আসামের পাহাড়িয়া শিয়ালেরাও গান ধরিতে বড় ভালবাসে।

একটা শিয়াল যে গান শিখিয়া আর সকলকে গাহিতে শিখাই-য়াছে, তাহা নহে; বহুকালহইতে—বোধ হয়, সৃষ্টিকালহইতে—শিয়ালেরা এইরূপে সপ্তমে গান ধরিয়া মনের ভাব-প্রকাশ করিয়া থাকে। এই গানে শৃগালজাতির প্রকৃতি এবং যে বনে থাকাতে উহাদের এই স্বভাব হইয়াছে, সেই বনের প্রকৃতি প্রকাশ পায়। একটা শিয়াল গান ধরিলে, বনের সকল শিয়াল গানে যোগ দেয়। ঠিক যেন প্রতিধ্বনি। রাত্রিকালে বনের একপ্রান্তে শিয়াল ডাকিয়া উঠিলে, অন্য প্রান্তের শিয়ালেরাও ডাকিয়া উঠে, কারণ সে আপন প্রকৃতির বশে এরূপ না করিয়া পারে না।

সূর্য্য অস্ত গেলেই, শিয়ালেরা গান ধরিয়া যেন দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে খবর দেয়, আমরা ভাল আছি, তোমরা কেমন আছ? তাহারাও গান ধরিয়া যেন উত্তর দেয়, বেশ বেশ, আমরাও ভাল আছি। পাহাড়িয়া লোকেরাও একপ্রকার শব্দ করিয়া রাত্রিকালে একগ্রামের লোকে অন্যগ্রামের লোকদিগকে সংবাদ দেয়। এই শব্দকে আসামদেশে "কুই দেওয়া" বলে। আকাশে চাঁদ উঠিতে দেখিলে, শিয়ালেরা আর এক সুরে গান ধরে, কারণ চাঁদ দেখা দিলেই, শিকারে যাইবার সুবিধা হয়। শীতকালে রাত্রিবেলা চাষাদিগকে ধান-খেতের "নাড়া পোড়াইতে" দেখিলে, শিয়ালেরা এক বিদ্‌ঘুটে সুরে ডাকিতে থাকে। আবার উদরচিন্তা-মূলক কার্য্যশেষ করিয়া ভোরের বেলা (যেন "বিভাস"-রাগিণীতে) গান ধরিয়া আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যায়। যে রাত্রিতে যথেষ্ট শিকার হয়, সে রাত্রিতে, মাইনের দিনের আপিসের বাবুদের মত, আনন্দ করিতে করিতে যায়। কালভেদে, সময়ভেদে, অবস্থা-ভেদে উহারা নিশ্চয়ই নানা সুরে গান ধরে, কিন্তু তাহা মানুষে বুঝিতে পারে না।

জন্মসুলভ স্বভাবের বশে কুড়ানী ঠিক সময়ে ঠিক গান ধরে। সে যখন মানুষের কাছে থাকিয়া—

"কাকের বাসায় কোকিলের ছা,
জা'ত্-বুলি তার করে রা।"

এই কথা-প্রমাণ-করণার্থ জাতীয় গান ধরিত, তখন গৃহস্থেরা চটিয়া মার-ধর করিত। তাই তাহাকে "ধুয়া" ধরিয়াই থামিতে হইত, এই বনেও সে প্রায় তাই করে, আর খুব আস্তে আস্তে গায়। এত নরমে গান ধরিলেও, অদূরে তাহার স্বজাতীয় কেহ কেহ এই গানে যোগ দেয়। কুড়ানী অমনি থামিয়া সে স্থানহইতে চম্পট্ দেয়। বড় ভয়!

একদিন মণিছড়া-নামক নালার পাড় দিয়া যাইতে যাইতে কুড়ানী পোড়া মাংসের গন্ধ পাইল। গন্ধ পাইয়া মাংসের লোভে সে খর পায়ে চলিল। একটু গিয়া দেখে, একটুক্‌রা মাংস পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল; আজ কয় দিন ধরিয়া বেচারীকে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে হইতেছে। এই মাংসের গন্ধ এক নূতন-রকমের; লোভ সাম্‌লাইতে না পারিয়া, কুড়ানী মাংস-টুক্‌রা খাইয়া ফেলিল। মাংস পেটে পড়িতে না পড়িতে দারুণ বেদনা উপস্থিত হইল। বালক তোতারাম তাহাকে যে বিষমাখা মাংস দিয়াছিল, তাহার কথা কুড়ানীর বেশ মনে আছে।

বেচারীর ঠোঁট কাঁপিতে ও মুখ দিয়া ফেনা উঠিতে লাগিল এই অবস্থায় সে তাড়াতাড়ি গাছকতক দূর্ব্বাঘাসের পাতা গিলিল; গিলিতে না গিলিতে বমি হইয়া মাংস উঠিয়া পড়িল, কিন্তু সে অচেতন অবস্থায় নালার ধারে পড়িয়া রহিল।

মণিরাম পূর্ব্বদিন বিষমাখা মাংস ফেলিয়া গিয়াছিল। সকাল-বেলা সে ঘোড়ায় চড়িয়া নালার ধার দিয়া যাইতে যাইতে দূর-হইতে শিয়ালটার দুর্দ্দশা দেখিতে পাইল। সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, বিষমাখা মাংস খাইয়া শিয়ালের এ দশা ঘটিয়াছে, তাই একটু বেগে ঘোড়া চালাইল, কিন্তু মণিরাম নিতান্ত কাছে আসিয়া না পড়িতেই, কুড়ানীর বিষের নেশা ছুটিয়া গেল। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিবামাত্র, প্রাণপণ যত্ন করিয়া, সম্মুখের পায়ে ভর দিয়া কুড়ানী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া মণিরাম গুলী করিল, কিন্তু বন্দুকের শব্দ শুনিয়া, ভয় পাইয়া, কুড়ানী আরও বেশী চেষ্টা করিল। সে দৌড়িতে গিয়া দেখে, পিছনকার দুই পা অবশ। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সম্মুখের দুই পায়ে ভর দিয়া, পিছনের পা-দুইখান টানিয়া লইয়া কোনপ্রকারে চলিল। এখন পেটে বিষ নাই, বিষের নেশাও ছুটিয়াছে, কাজেই যেমন ইচ্ছা হইল, তেমনি করিতে পারিল। যদি পড়িয়াই থাকিত, কোন্ কালে মরিয়া যাইত। কিন্তু বন্দুকের শব্দ শুনিয়া, এবং মানুষটাকে আসিতে দেখিয়া, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বেচারীর যার-পর-নাই চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা হইল। পিছনের পা দিয়া হাঁটিবার জন্য বার বার বিস্তর চেষ্টা পাইল। পিছনের পা-দুইখানা টানিয়া টানিয়া বেচারী উচ্চ স্থানহইতে নীচের দিকে যাইতে লাগিল, আর শিরাদিয়া যেন অবশ পায়ে রক্ত চালাইতে লাগিল। স্নায়ু বা দৈহিক শক্তি আর কিছুই নয়, কেবল মনের ইচ্ছা। পা-দুইখান অবশ হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে মনের ইচ্ছাসম্ভূত-শক্তি একটু পাইয়া ক্রমে সবল হইয়া উঠিল। মৃত অঙ্গে যেন জীবন সঞ্চারিত হইল। মণিরাম যতবার বন্দুক ছুড়িল, সেই শব্দে কুড়ানীর ইচ্ছা-শক্তি, মনের বেগের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বল তত বাড়িয়া উঠিল। আর একবার চেষ্টা করাতে পিছনের একখানি পা একটু খেলিল। আর দুই-এক-লাফ দিতেই, অপর পাখানিও খেলিল। দেখিতে দেখিতে কুড়ানী বেত-বনে ঢুকিল। উদরের বেদনার কথা এতক্ষণ যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল। মণিরাম যদি এত দূর আসিয়াই থামিত, হয় ত শুইয়া পড়িয়া থাকিয়া কুড়ানী পঞ্চত্ব পাইত। কিন্তু সে আসিয়া বেত-বনে বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। কাজেই কুড়ানী প্রাণ-ভয়ে বহু কষ্টে আর আধক্রোশ পথ গেল—যত গেল, পিছনের দুইখানি পা তত সবল হইল। উদরের জ্বালাও সারিয়া গেল। দেখ, শত্রুই কুড়ানীকে মারিতে গিয়া বাঁচাইয়া দিল। সে তাড়া করাতে প্রাণপণে দৌড়িতে হইল, আর দৌড়িতে দৌড়িতে অবশ অঙ্গ সবশ হওয়াতে বেচারী রক্ষা পাইল।

এই সকল ঘটনায় তাহার এই জ্ঞান হইল যে, বিদ্‌ঘুটে গন্ধযুক্ত মাংস খাইলে, উদরে বিষম বেদনা হয়। অতএব ওরূপ মাংস স্পর্শ করিতে নাই। এ কথা তাহার বেশ মনে রহিল। কুড়ানী আজহইতে সেঁকো বিষ যে কি বস্তু, তা' চিনিল।

সুখের বিষয় এই যে, পাহাড়িয়া গাঁতিকল পাতিলে, বিষমাখা মাংস ছড়াইলে, বা ফাঁদ পাতিলে কুকুর বাঁধিয়া রাখে! কারণ কুকুরেরাও কলে বা ফাঁদে পড়িতে ও বিষ খাইয়া ফেলিতে পারে। আজ মণিরামের সঙ্গে কুকুর থাকিলে, কুড়ানীর আর রক্ষা ছিল না।

শরৎকালের শেষে উত্তুরিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। মানুষের কাছে থাকিয়া "মানুষ" হওয়াতে, শিয়ালের বাচ্ছারা শিশু-কালে মায়ের কাছে যে সকল বিষয় শিখে, কুড়ানী সে সকল বিষয় শিখিতে পায় নাই—কিন্তু এই কয় মাসে অনেকটা শিখিয়া ফেলিয়াছে। বনের আর পাঁচটা শিয়াল যেমন, কুড়ানী অনেক বিষয়ে প্রায় সেই সকলের মত হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্য অস্ত গেলেই, গান ধরিতে তাহার ভাল লাগে।

একদিন সন্ধ্যার পরে তাহার ডাক শুনিয়া অদূরে আর একটা শিয়াল ডাকিয়া উঠিল; কুড়ানী সেটার ডাকের উত্তররূপে আবার ডাকিল। অমনি একটা খুব বড় শিয়াল আসিয়া উপস্থিত। এই সময়ে বাগানের কুলি আর গৃহস্থ লোকেরা শিয়াল-বংশ নির্ব্বংশ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল, এ অবস্থায় এখানে শিয়াল আসা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; তবে যে এ শিয়ালটা আসিয়াছে? এ খুব চালাক ও সাহসী। এ শিয়ালটা ধীরে ধীরে কুড়ানীর কাছে আসিল। স্বজাতীয় পুংপ্রাণীকে দেখিয়া, আনন্দে কুড়ানীর গায়ে কাঁটা দিল। সে বড় শিয়ালটাকে কাছে আসিতে

দেখিয়া মাটীতে হামাগুড়ি দিয়া রহিল। আগন্তুক গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে ক্রমে খুব কাছে আসিয়া পড়িল। কুড়ানীকে আপনার গন্ধ জানাইবার জন্য সে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে এবং লেজ খাড়া করিয়া দোলাইতে লাগিল। প্রদক্ষিণ করিয়া জানাইল, লড়াই করিতে আসি নাই; লাঙ্গুল দোলাইয়া জানাইল, ভাব করিতে আসিয়াছি। আগন্তুক আরও নিকটে আসিলে, কুড়ানী অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল, আর নিজের গন্ধ শোঁকাইবার জন্য মাথা খাড়া করিয়া রহিল। অনন্তর সে নিজের লেজ, যতটা পারিল, দোলাইল। এইরূপে দুই জনের আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল।

আগন্তুক শিয়ালটা খুব বড়; লম্বায় ও খাড়াইতে কুড়ানীর দেড়া। তাহার ঘাড়ের ও পাঠের অনেকটা স্থান খুব কৃষ্ণবর্ণ লোমে ঢাকা। দেখিলে বোধ হইত, যেন কাল গালিচার আসন পাতা। তাই রাখাল-বালকেরা সেটাকে দেখিলে "কৃষ্ণসার" বলিত। আমরাও কৃষ্ণসার বলিব। এই অবধি কৃষ্ণসার আর কুড়ানী কখনও কখনও একসঙ্গে থাকিতে লাগিল। সর্ব্বদা একস্থানে থাকিত না, প্রায়ই দিনের বেলা একটাহইতে অপরটা ক্রোশ খানিক দূরে থাকিত, কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসিলে, এ বা সে এক টীলার উপরে উঠিয়া গান ধরিত—কা হুয়া, কা হুয়া। পরে একটা অপরটার কাছে যাইত। আকারে ও শারীরিক বলে কৃষ্ণসার বড়, কিন্তু বুদ্ধিবলে কুড়ানী বড়। কাজেই অল্পদিনের মধ্যে কৃষ্ণসারকে কুড়ানীর আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে হইল। মাস-খানিকের মধ্যে আর একটা শিয়াল আসিয়া জুটিল, এবং কৃষ্ণসার ও কুড়ানীর সঙ্গী হইল। দিনকতক পরে আরও দুইটা আসিয়া এই পালভাঙ্গা দলে মিশিল। লেজ-কাটা কুড়ানী আকারে ছোট হইলেও, তাহাকে ঠেকিয়া যে সকল শিক্ষা পাইতে হইয়াছে, আর আর শিয়ালগুলির সেপ্রকার শিক্ষা-লাভ হয় নাই। শিয়াল মারিবার জন্য মানুষে যে সকল ফিকির করে, সে সকল তাহার বেশ জানা ছিল—তা'-ছাড়া সে মানুষের ভাবগতিও অনেকটা জানিত ও বুঝিত। এ সকল বিষয় সে কথা কহিয়া আর সকলকে বুঝাইয়া দিতে পারিত না বটে, কিন্তু সঙ্কেত ও দৃষ্টান্তদ্বারা অনেকটা বুঝাইয়া দিতে লাগিল। আর সকলে বেশ বুঝিতে পারিল। কুড়ানী শিকারে বাহির হইয়া যে সকল ফিকির করে, তাহাতে খালি হাতে ফিরিতে হয় না। কিন্তু সে সঙ্গে না থাকিলে, অনেক কষ্টেও যথেষ্ট শিকার পাওয়া যায় না। মণিছড়া-বাগানের কাছে একজন সর্দ্দার-কুলির কুড়িটা পাটনাই ভেড়া ছিল। একটা প্রকাণ্ড দেশী কুকুর এই মেষদিগকে চৌকি দিত। একদিন ঝর্ণার ধারে চরিতে দেখিয়া কুড়ানীদের দলের দুইটা শিয়াল গিয়া মেষগুলিকে তাড়া করিল। একটাকেও ধরিতে পারিল না, লাভের মধ্যে কুকুরের হাতে পড়িয়া নাস্তানাবুদ হইয়া পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইল। আর একদিন গোধূলির সময়ে মেষদিগকে চরিতে দেখিয়া কুড়ানীর দলস্থ সকলে মিলিয়া তাড়া করিতে গেল। দলস্থ কাহাকে কি করিতে হইবে, কুড়ানী আগেই তাহা সকলকে শিখাইয়া রাখিয়া-ছিল, কিন্তু কেমন করিয়া—তা জানি না। কাছে গিয়া শিয়ালেরা বেত-বনের ভিতরে লুকাইয়া রহিল। প্রকাণ্ডকায় দুঃসাহসী কৃষ্ণসার অগ্রসর হইয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। কুকুরটা অমনি লাফাইয়া উঠিল, এবং কৃষ্ণসারকে দেখিতে পাইয়া, তাড়া করিয়া আসিল। কৃষ্ণসার স্থিরচিত্ত, লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি কিছু করিল না, কেবল ধরা দেয় দেয় করিয়া কুকুরটাকে বেশী জঙ্গলে আনিয়া ফেলিল। এদিকে কুড়ানী আর শিয়ালগুলিকে লইয়া তাড়া করিয়া মেষদিগকে নানা দিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল, এবং গোটা-কতককে মারিয়া ঝর্ণার ধারে ফেলিয়া চম্পট্ দিল।

গোটাকতক মেষ ভারী জখম হইয়াছিল। অন্ধকার-রাত্রিতে সর্দ্দার কুলি কুকুর লইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া কতকগুলিকে পাইল, চারিটাকে অনেক খুজিয়াও পাওয়া গেল না। সেগুলি সে রাত্রিতে শিয়ালদের ভোগে লাগিয়াছিল। মরাগুলির ঘাড়ে বিষ দিয়া মেষপালক চলিয়া গেল।

পরদিন রাত্রিতে শিয়ালেরা সেইখানে আবার আসিল। কুড়ানী মরা মেষের গন্ধ শুঁকিয়া বিষ পাইল। ইসারা করিয়া সঙ্গীদিগকে মরা মেষের মাংস খাইতে বারণ করিল; আর পাছে অন্য শিয়ালে আসিয়া খায়, তাই মরা মেষগুলিকে সকলে মিলিয়া জঙ্গল চাপা দিয়া রাখিল। একটা শিয়াল কিন্তু কথা না শুনিয়া বিষাক্ত মাংস খাইল। বেচারা অবাধ্যতার ফলে প্রাণ হারাইল।

(ক্রমশঃ।)

সেকেলে ডাক্তার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ডাক্তার ম্যাক্‌লিওরের রোগীর ঘরহইতে খাইবার ঘরে আসিয়া পাপোষের উপরে দাঁড়াইয়া অতিপ্রাকৃতিক ভাবে রোগীর সম্বন্ধে কোন মতামত-প্রকাশের মত আমিরী কায়দা ছিল না; কারণ ড্রামটথুটির লোকেরা সে কায়দা সহ্য করিতে পারিত না; ম্যাক্‌-লিওরেরও অতটা কায়দা দুরস্ত ছিল না। তিনি উঠানে দাঁড়াইয়া ঘোড়ার রেকাবে একটী পা লাগাইয়া যাহা বলিবার বলিয়া ফেলি-তেন; কিন্তু যেদিন তিনি অ্যানী মিচেলকে দেখিয়া ঘরের বাহির হইলেন, সেদিন তাঁহার মুখদিয়া একটীও কথা বাহির হইল না।

তবু তাঁহার মুখ দেখিয়াই অ্যানী মিচেলের স্বামীর হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল।

টামাস বোকাগোছের লোক, সে ইঙ্গিত-আভাষ বড় বুঝে না, তাহা-ছাড়া তাহার বাক্‌শক্তির চিরকালই একটু ত্রুটি ছিল; কিন্তু ভালবাসা সেদিন তাহাকে চক্ষু ও বাক্‌পটুতা উভয়ই দিয়াছিল।

সে বলিল,—"ডাক্তার, তোমাকে দেখে ওর অবস্থা যতটা খারাব বোধ হচ্ছে, আশা করি, ততটা খারাব নয়। সত্য কথা বল, অ্যানি কি টিক্‌বে?"

এই বলিয়া টামাস ম্যাক্‌লিওরের মুখের দিকে স্পষ্ট করিয়া চাহিয়া দেখিল। ম্যাক্‌লিওর কোন দিনই কর্ত্তব্যবিমুখ হইতেন না, বা কাহাকেও মিষ্টকথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন না, তিনি বলিলেন,—"অ্যানীর জীবনের কিছু আশা আছে, এ কথা ব'ল্‌তে পেলে, আমি কি না কর্ত্তে প্রস্তুত আছি? কিন্তু আমার তা ব'ল্‌তে সাহস হচ্ছে না; আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমরা তা'কে হা'রাবে, টামাস্!"

ম্যাক্‌লিওর ঐ কথা বলিবার সময়ে ঘোড়ার উপরে বসিয়াছিলেন, কথাটা বলিয়া তিনি টামাসের কাঁধের উপর সস্নেহে হাত দিলেন। সেপ্রকার আদরের বিনিময় পুরুষে পুরুষেই হয়।

পরে বলিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয়, কিন্তু তুমি পুরুষবাচ্ছা, আশা করি, অ্যানীকে ত্যক্ত ক'র্‌বে না। আমি ব'ল্‌ছি, এ বিষয়ে অ্যানীর কোন ত্রুটি হ'বে না।"

"আমিও, যতদূর সাধ্য, মানুষের মত আচরণ ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রব।" এই বলিয়া টামাস ম্যাক্‌লিওরের হাতটা এমন জোরে মুঠাইয়া ধরিল যে, কোন রোগা-পট্‌কা লোক হইলে, তাহার হাড় ভাঙিয়া যাইত। ড্রামটখ্‌টির লোকেরা এরকম সময়ে এই পরুষাকৃতি লোকটির ভ্রাতৃভাব-অনুভব করিত, তাই তাঁহাকে ভালও বাসিত।

টামাস জেসের কেশরে তাহার মুখ লুকাইল; জেস তাহার সুন্দর দুঃখপূর্ণ নেত্রে ঘাড় বেঁকাইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল; সে অনেক বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা-পাত হইতে দেখিয়াছে; অশ্বিনীর এই নীরব সহানুভূতি পাইয়া দুঃখার্ত্ত লোকটি ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তাহার গরল-পাত্রটি নিঃশেষিত করিল। বলিল,—

"এ রকম যে হ'বে, তা আমি কখন ভাবি নি; আমার ধারণা ছিল, আমিই আগে মারা যা'ব, কারণ সে আমার চেয়ে দশবছরের ছোট, তা'-ছাড়া তা'র কখনও অসুখ-বিসুখ হয় নি। আমাদের বারোবছর হ'ল বিয়ে হ'য়েছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, যেন আমাদের কাল বিয়ে হয়েছে। আমি কোন দিনই তা'র যোগ্য স্বামী হ'তে পারি নি। তা'র চেয়ে সুন্দরী, ঝর্‌ঝরে, দয়াময়ী এই উপত্যকায় আর কে আছে? সে যে আমায় কেমন ক'রে দেখতে পা'র্‌ত, তা' আমি কখন ভেবে ঠিক ক'র্‌তে পারি নি; এতদিন আমি তা'র বিষয়ে কোন কথা বলি নি, এখন কোন কথা বল্‌বার সুযোগই নেই। আমি যে তা'র যোগ্য নই, একথা তা'র মুখ দিয়ে কখন বা'র হয় নি, কক্‌খোনো না। সে সর্ব্বদাই ব'ল্‌ত, 'তুমি আমারই, তোমার চেয়ে কেউ আমার ওপর বেশী সদয় হ'তেই পারে না।' আমার তা'র ওপর সদয় ব্যবহার ক'র্‌বার ইচ্ছে ছিল, এখন আমি তা' ক'র্‌বার অনেক উপায় দে'খ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু এখন আর সময় কই? সে যে আমার কত অত্যাচার সহ্য ক'র্‌ত, তা' কেউ দেখে নি, সর্ব্বদাই মুখ বুজে আমাকে নিয়ে সংসার ক'র্‌ত, বাইরের লোকের সাম্‌নে কখনও আমাকে অপদস্থ ক'রে নি। আমাদের দু'জনের কখনও ঝগড়া হয় নি, বারোবছরের মধ্যে একদিনও না। আমরা দু'জনে কেবল যে স্বামী-স্ত্রী ছিলুম, তা নয়—বরাবরই যেন দুই প্রণয়ী-প্রণয়িনী ছিলুম। অ্যানি, তোমাবিহনে ছেলেরা, আমি, আমরা সব কি ক'রে থা'কব?"

শীতের রাত শীঘ্রই ঘনাইয়া আসিল। পথ পুরু তুষারে উঁচু হইয়া উঠিল, আর অকরুণ উত্তরিয়া হাওয়া বিলাপ করিয়া ফিরিতে লাগিল। টামাস নিরশ্রুনয়নে শোক করিতে লাগিল, ড্রামটখ্‌টির পুরুষেরা অশ্রুপাত করিতে জানে না। ডাক্তার বা জেস হাত-পা কিছুই নাড়িল না, কিন্তু তাহাদের হৃদয় যাতনাগ্রস্ত ব্যক্তির যাতনা তাহারই ন্যায় অনুভব করিতে লাগিল। অবশেষে ডাক্তার মার্গেট হোকে ইসারা করিয়া ডাকিল; সে টামাসের খোঁজে বাহিরে আসিয়াছিল, এক্ষণে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে বলিল,—"তুমি এমন ক'রে শোক কচ্ছ, যেন তোমাতে অ্যানীতে কখনও ভালবাসা ছিল না। যা'দের ভেতরে ভালবাসা আছে, মরণ তা'দের আ'লাদা ক'র্‌তে পারে না। ভালবাসার চেয়ে শক্তি আর কিসের আছে? যদি অ্যানী সত্যসত্যই তোমার মায়া কাটিয়ে তোমার চোকের আড়ালে চলে যায়, তোমার হৃদয়ের আরও কাছে আ'স্‌বে। সে এখন তোমাকে দে'খ্‌তে চায়। সে এখন তোমার মুখে শু'ন্‌তে চায় যে, যত দিন না, যেখেনে বিচ্ছেদ নেই সেখেনে আবার তোমাদের দেখা হয়, তত দিন তুমি দিনে রেতে একবারও তা'কে ভু'ল্‌বে না। আমি কি ব'ল্‌ছি, তা' আমি খুব ভাল বুঝি। পাঁচবছর হ'ল জর্জ্জ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে। সে থা'ক্‌ত তখন এডিনবরায়, আমি থা'ক্‌তুম এই ড্রামটখ্‌টিতে; এখন সে আমার আরও কাছে রয়েছে।"

"ধন্যবাদ, মার্গেট; তুমি যে কথাগুলি ব'ল্‌লে, সব ভাল কথা—সত্য কথা; তোমার তা' আমাকে ব'ল্‌বার অধিকারও আছে; কিন্তু আমি যদি গোধূলির সময় কাজথেকে ফিরে এসে তা'কে ঘরবা'র ক'র্‌তে দেখ্‌তে, যদি তা'র গলার আওয়াজ শু'ন্‌তে, তা'কে আমার ভালবাসা জানা'তে না পাই, তা' হলে কেমন ক'রে বাঁচ্‌ব?

ডাক্তার, আর কিছুই কি ক'র্‌তে পারো না? তুমি যখন ফ্লোরা ক্যাম্বিলকে, বার্ণব্রেকে, ডান্‌লিণ্‌ ভেড়াওয়ালার পরিবারকে বাঁচিয়ে ছিলে, তখন আমরা তোমার কত সুখ্যাতি করেছিলুম!

অ্যানীরও জন্য তুমি কি কিছুই ক'র্‌তে পার না? তা'কে, আমাকে—ছেলেদেরকে ফিরিয়ে দিতে পার না কি?"—এই বলিয়া টামাস শীতের ক্ষীণ আলোকে ডাক্তারের মুখের দিকে সতৃষ্ণলোচনে তাকাইয়া রহিল।

ঐ কথা শুনিয়া ডাক্তার ঘোড়ার উপরে কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি সকলেরই দুঃখে দুঃখিত হইতেন—সুতরাং তাঁহার দুঃখ সে "উপত্যকার" মধ্যে সকলের অপেক্ষা বেশী ছিল। টামাস তাঁহার মুখপ্রতি যখন কাতরভাবে তাকাইয়া রহিল, তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিলে, সকলেরই তাঁহার প্রতি করুণার সঞ্চার হইত। তিনি কি করিবেন? তাঁহার হাতে তো জীবন-মরণের চাবি নাই! এদিকে তিনি সাধু লোক, মিথ্যাকথা বলিয়া দায়-এড়ান তাঁহার অভ্যাস ছিল না, তাই তিনি বলিলেন,—

"টামাস, আমার কাছে তোমার অনুনয় ক'রবার দরকার নাই, আমি যা' জানি, তোমার স্ত্রীকে বাঁচা'বার জন্যে তা' ক'র্‌ছি। তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'বার আগে-থেকে তা'কে আমি জানি। তা'র যখন একটী ভাল লোকের সঙ্গে বিয়ে হ'ল, তখন আমার চেয়ে আর কেউ বেশী খুশি হয় নি। এই উপত্যকার সমস্ত লোককে আমি আমার আপনার লোক মনে ক'রে থাকি। মিউরটাউনে আর এমন একটী লোক নেই, যে তা'র জন্যে আমার চেয়ে বেশী কিছু ক'র্‌তে পারে, থা'ক্‌লে, আমি এই রাতেই গিয়ে তা'কে নিয়ে আস্‌তুম, কিন্তু পার্থশায়ারের কোন ডাক্তারই এই ব্যারামে কিছু ক'র্‌তে পা'রবে না।

টামাস, আহা বেচারা! আমার এই বুড়ো হাড় চূর্ণ ক'রেও যদি আমি দে'খ্‌তে পেতুম যে, তোমরা দু'জনে পাশাপাশি ব'সে আগুন পোয়াচ্ছ আর ছেলেরা কাছে ব'সে আছে, আমি তা ক'র্‌তুম; কিন্তু তা' হ'বার নয়, টামাস, তা' হ'বার নয়!"

ডাক্তার যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন যদি কেহ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, তাঁহার মুখের ভাব যেন রূপান্তরিত হইয়াছে—তাহাহইতে যেন করুণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি সে রাত্রিতে রূপান্তরিতই হইয়াছিলেন, কারণ প্রেমের মত রূপান্তরকারী আর কিছুই নাই।

টামাস বলিল,—"ঈশ্বরের তবে এই ইচ্ছে, আমাকে কাজেই এ শোক সহ্য ক'র্‌তে হ'বে। ডাক্তার, আমি তোমার কাছে অকৃতজ্ঞ হ'ব না, তুমি যা' ক'রেছ, আজ রাত্রিতে যা' বলেছ, আমার মনে থা'ক্‌বে।" এই বলিয়া টামাস অ্যানীর কাছে জন্মের শোধ বসিতে গেল।

জেস গভীর তুষার-ভেদ করিয়া সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল, এ সকল পথে সে অনেকবার চলিয়াছে, সুতরাং এ সকল পথে চলিতে যে নিপুণতার প্রয়োজন হয়, তাহা তাহার আয়ত্ত ছিল। তখন ডাক্তার তাঁহার অভ্যাসমত তাহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে চলিলেন—

"জেস, বড় কঠিন কাজ—সব চেয়ে কঠিন কাজ, উরটাখ্-উপত্যকার ঝড়ে আমি আর একবার পথ চ'ল্‌তে রাজি আছি, কিন্তু টামাস মিচেলকে তা'র স্ত্রী যে মারা যাচ্ছে, তা আর একবার ব'ল্‌তে রাজি নই।

আমি বলেছি, তা'র ব্যারাম ভাল হ'বে না; কথাটা সত্যি। এই দেশে একটী লোক ওকে ভাল ক'র্‌তে পারে, কিন্তু তা'কে আনান ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্যে আমি টামাসকে তা'র কথা বলি নি, তা'তে ওর শোকের ওপর দুঃখ চা'প্‌ত বইত নয়।

কিন্তু, জেস, বড় দুঃখের কথা, অত টাকা থা'ক্‌লে, একটা প্রাণ বাঁচান যেত। অ্যানী যদি কোন ওমরাহের স্ত্রী হ'ত, তা' হ'লে মারা প'ড়্‌ত না। গরীব গেরস্থের স্ত্রী, তাই এই হপ্তাটা শেষ হ'তে না হ'তে বেচারা মারা যা'বে।

সকালে যদি সেই ডাক্তারকে আ'ন্‌তে পারা যায়, তা' হ'লে ও বেঁচে যা'বে, কারণ ওর রোগটা এখন পনেরআনা ভাল আছে।

কিন্তু সে ডাক্তারকে আনি কি ক'রে? কোন উপায় নেই, মিছে চেষ্টা করা, জেস, পা চালিয়ে চল। কিন্তু এটা যদি যেনতেন-প্রকারেণ ঘটাতে পারা যায়, তা' হ'লে এই উপত্যকায় আমাদের সময়ের মধ্যে একটা মস্ত কাজ করা হ'বে।

জেস, চল একবার ড্রামসুকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। জর্জ্জ হোর মৃত্যুর পর তা'র স্বভাব ব'দ্‌লে গেছে! লোকেরা তা'কে বু'ঝ্‌তে পারে না, কিন্তু তা'র শরীরে দয়া-মায়া আছে।"

এই বলিয়া ডাক্তার গ্রামের মধ্যদিয়া জেসকে ছুটাইয়া লইয়া চলিলেন।

"এস, আস্‌তে আজ্ঞে হ'ক, ডাক্তার, তুমি পথে আ'স্‌ছিলে, আমি শু'ন্‌তে পেয়েছি। তুমি টামাস মিচেলের বাড়ী ছিলে, তা'র গিন্নি কেমন আছে? আশা করি, সে ভালই আছে?"

"ড্রামসুক, অ্যানী মর মর, টামাস শোকে পাগলের মত হ'য়েছে।"

"ডাক্তার, ব্যাপারটা বড় সোজা নয়,—সোজা নয়। টামাস তা'র স্ত্রীকে যেমন ভাল বাসে, এমন তো ড্রামটথ্‌টিতে আর কাউকে ভাল বা'স্‌তে দেখি নি।

অ্যানীর মত অমন সুন্দরী, কাজের মেয়ে আমাদের এ মহল্লায় আর কেউ নেই। তা'কে একটু চেষ্টা-চরিত্তর ক'রে তোমায় ভাল ক'র্‌তেই হবে, ডাক্তার। সত্যই কি তা'র রোগটা তোমার চেষ্টার অসাধ্য হ'য়ে পড়েছে?"

"সুধু আমার চেষ্টায় অসাধ্য নয়, কেবল একজন-ছাড়া এ অঞ্চলের আর সব ডাক্তারেরই চেষ্টার অসাধ্য হ'য়ে পড়েছে। যে একজন ডাক্তারের কথা ব'ল্‌ছি, তা'কে আ'ন্‌তে হ'লে ১০০গিনি ফি দিতে হ'বে।"

"একশো গিনি লাগুক, আর যাই লাগুক, তা'কে আন্‌তেই হচ্ছে। এখনও অ্যানীর আদ্ধেক বয়স হয় নি, এর মধ্যে সে মারা প'ড়্‌লে, চ'ল্‌বে কেন?"

ম্যাক্‌লিওর। সত্য ব'ল্‌ছ, ড্রাম্‌মুক?

ড্রাম্‌মুক। উইলিয়ম ম্যাক্‌লিওর, আমার কেউ নেই—একা লোক, এমন কি, মরে গেলে, কবর দেবার লোকপর্য্যন্ত নেই। একটী স্ত্রীলোককে ভাল বা'স্‌তুম, তা' সে আমার হয় নি। সে দুঃখের কাহিনী তোমাকে একদিন ব'ল্‌ব, উইলিয়ম, কারণ তোমাতে আমাতে পুরাণো বন্ধুতা, আর না ব'লে, এ বন্ধুতার শেষ হ'বে না। কোন মেয়েমানুষ আমার প্রতীক্ষা ক'রে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। আমি বাড়ী এলে, কেউ আমার সঙ্গে তামাসা করে না। কেউ আমার পকেটে কি আছে, খুঁজে দেখে না। একটা বাড়ীতে এরকম হ'তে দেখেছি—তা'রা আমাকে দেখে লুকোয়; মনে করে, আমি হা'স্‌ব। আমি হা'স্‌ব? আমার ঘর ফাঁকা, হাহা কচ্ছে।

আমাদের ঘরে ত আনন্দ নেই, উইলিয়াম! অন্যের ঘরের এ আনন্দের আলোটুকু নিবে যায়, এ আমরা চাই না। একটা টেলিগ্রাম লিখে ফেল, সাণ্ডি এই রাতেই কিল্‌ড্রামিথেকে তা' পাঠিয়ে দেবে, সকালেই তোমার লোক এসে হাজির হ'বে।"

"ড্রামমুক, তোমারই ওপর আমি নির্ভর করেছিলুম। কিন্তু তুমি আমার ওপর একটা অনুগ্রহ কর। আমি ঐ ১০০গিনির আদ্ধেক আস্তে আস্তে শোধ ক'র্‌তে চাই, তুমি তা' আমাকে ক'র্‌তে দিও। আমি দে'খ্‌ছি, তুমিই সমস্ত টাকাটা দিতে চাও, কিন্তু আমিও অ্যানীর প্রাণরক্ষায় সাহায্য ক'র্‌তে চাই।"

পরদিন প্রভাতে কিল্‌ড্রামি-ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে এক মূর্ত্তি আসিয়া সার জর্জ্জকে অভ্যর্থনা করিল। সেই সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সেই মূর্ত্তিকে মৃগয়ার অনুচর মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপনাকে "ড্রামটথ্‌টির ম্যাক্‌লিওর" বলিয়া আত্মপরিচয়-প্রদান করিলেন। যখন এই দুইব্যক্তি পাশাপাশি দাঁড়াইলেন, তখন মনে হইল, প্রাচী যেন প্রতীচীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। একজন ভ্রমণকালীন রোম-পরিশোভিত, সুপুরুষ ও গণ্যমান্য; তাঁহার মুখ দেখিলে, বোধ হয় তিনি শিক্ষিত, তাঁহার চা'ল-চলন কর্ত্তৃত্বব্যঞ্জক। অন্যজন আজ আরও অদ্ভুত রকমের পোষাক পরিয়াছেন, কারণ ড্রামমুক তাঁহাকে আজ তাহার টপ্‌কোটটি জোর করিয়া পরাইয়া দিয়াছে—কেননা তিনি আজ নবাগত ডাক্তারকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখ ও হাত দারুণ শীতে লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার চেহারা উস্কোখুস্কো ও বিরাগজনক, তবু তাঁহার চক্ষু ও কণ্ঠস্বর তাঁহার শক্তির কিছু কিছু পরিচয় দিতেছে। নবাগত ডাক্তারকে ম্যাক্‌লিওর ড্রামমুকের টম্‌টমের উপর বসাইয়া দিলেন, আজ তাহাতে হিলক্‌সের দুইখানি প্রমাণ কম্বল বিছান হইয়াছে। ম্যাক্‌লিওর আর একখানি কম্বল দিয়া নবাগত ডাক্তারের ব্যাগটি মুড়িয়া বসিবার আসনের নীচে এমন সম্ভ্রমের সহিত রাখিলেন, যেন তাহা রাজ-পরিচ্ছদাদি। টম্‌টম্ বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, ম্যাক্‌লিওর স্যার জর্জ্জকে জানাইলেন,—"এখেনে বেশ চলেছি, কারণ এখেনে হাওয়ায় তুষারের কিছু ক'র্‌তে পা'র্‌ছে না, কিন্তু উপত্যকায় ঝড় বইছে, সেখেনে একটু কারিকুরি না ক'র্‌লে, ঠিকানায় পৌছনই যা'বে না।"

চারিবার তাঁহারা পথ ছাড়িয়া মাঠদিয়া চলিতে বাধ্য হইলেন। দুইবার একটা বেড়ের ফাঁকের ভিতর দিয়া জোর করিয়া পথ করিয়া গেলেন। তিনবার, ম্যাক্‌লিওর ষ্টেশনে আসিবার সময়ে বেড়ায় যে ফাঁক করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যদিয়া অতিক্রম করিলেন।

তাহার পর কথায় কথায় ম্যাক্‌লিওর জানাইলেন যে, তাঁহাদিগকে টথ্‌টি-নদী পার হইতে হইবে।

"শীতের বানে সাঁকোটা নড়্‌বড়্ ক'র্‌ছে, তাই তা'র ওপর দিয়ে যেতে ভরসা করি না। কাজেই আমাদের নদীটা হেঁটে পার হ'তে হ'বে। উরটাখের দিক্‌থেকে বরফ গ'ল্‌তে সুরু হ'য়েছে। এখন জল যে খুব বেড়েছে, তা'তে সন্দেহ নেই, জল আরও ফাঁ'প্‌বে। কিন্তু আমরা পার হ'য়ে যেতে পা'র্‌ব, বোধ হয়।

যন্ত্রগুলোতে যা'তে জল না লাগে, তা'র জন্যে ওগুলো আপনার হাঁটুর ওপর তুলে নিলে ভাল হয়। তা'-ছাড়া আপনি একটু শক্ত হ'য়ে বসুন, নদীর তলায় পাথর আছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা নদীর কিনারায় আসিয়া পড়িলেন। নদীতীরের দৃশ্য একটুও স্ফূর্ত্তিজনক নয়। টথ্‌টির জল ক্ষেতপর্য্যন্ত গড়াইয়া গিয়াছে, তাঁহারা জল কমিবার ভরসায় যতক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, ততক্ষণে দেখিলেন, উহা দুই-বুরুল বাড়িয়া একটী গাছের গুঁড়ির আরও দুইবুরুল ডুবাইয়া দিল। গ্রীষ্মকালের বান একরকম, শীতকালের বান আর একরকম; এই সময়ে নদীর মধ্যস্থলে স্রোতোবেগ বিপর্য্যয় বলশালী হইয়া উঠে। নদীর অপরপারে দাঁড়াইয়া হিলক্‌স কোথায় কি আছে, তাহা বলিয়া দিতেছে, কারণ এই পারাণী স্থানটা তাহার জমীর অন্তর্গত, এখানকার টথ্‌টি-নদীর অবস্থা সে যত ভাল জানে, তত আর কেহ জানে না।

যেখানটায় জল অল্প, সেখানটা তাঁহারা বেশ নির্ব্বিঘ্নে পার হইলেন; কেবল গাড়ীর চাকা একবার একটা চোরা-পাথরে আটকাইয়াছিল। তাহার পর, যখন তাঁহারা খাস নদীতে গিয়া পড়িলেন, তখন ম্যাক্‌লিওর জেস্‌কে একটু হাঁফ ছাড়িতে দিবার জন্য একটু থামিলেন। ঘোটকীর উদ্দেশে বলিলেন,—

"নদীটা পার হ'তে তোমার অনেকটা মেহনৎ লা'গ্‌বে, মা! এ সময়ে আমি তোমার পিঠে সোয়ার হ'য়ে থা'ক্‌তে পারলেই, হ'ত ভাল; এই নদী-পার হওয়াটার ওপরেই একটা অবলার জীবন-নির্ভর ক'র্‌ছে; কিন্তু তুমি তো কখন পিছ্‌পাও হও নাই।"

তাহার পর নদীর মধ্যে যেই আগাইয়াছেন, অমনি গাড়ীর চাকার অক্ষদণ্ডপর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল; তাহার পর জল কম্পাসপর্য্যন্ত উঠিল; সার জর্জ্জের পদতলে ছলাৎছল-শব্দ করিতে লাগিল! টম্‌টম্‌খানা কাঁপিতে লাগিল, বোধ হইতে লাগিল, উহা বুঝি টানের চোটে ভাসিয়া যাইবে! সার জর্জ্জ ভীরু নহেন, কিন্তু বানের সময় তিনি কখন কোন পার্ব্বত্য-নদী হাঁটিয়া পার হন নাই। চারিদিকে কালো জল কলকল করিতেছে, দেখিয়া তাঁহার স্নায়ুসকল শিথিল হইয়া পড়িল—ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি তাঁহার আসনে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ম্যাক্‌লিওরকে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন, কহিলেন:—"কাহারও জন্য যদি আমি এমন করিয়া বিঘোরে প্রাণ নষ্ট করি, তাহা হইলে আমার আর মুক্তির কোন উপায় থাকিবে না।"

ম্যাক্‌লিওর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"ব'স, ব'স ব'ল্‌চি। যদি এমন ক'রে তুমি তোমার কর্ত্তব্য এড়া'বার চেষ্টা কর, তা' হ'লেই বরং একদিন-না-একদিন তুমি নরকে যা'বে।"

দুইজনেই খুব চোট্‌পাট্‌ জবাব করিতে লাগিলেন। শেষে ম্যাক্‌লিওরের জিদ্‌ই বহাল রহিল।

জেস ঘস্‌টাইয়া ঘস্‌টাইয়া আগাইতে লাগিল; সে তাহার গলা তুলিয়া রাখিল। ম্যাক্‌লিওর সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া হিলক্‌সের দিকে লক্ষ্য রাখিতে থাকিলেন। হিলক্‌স কোমর জলে দাঁড়াইয়া অশ্বিনীকে "দিলাশা দিতে" লাগিল।

"ডাক্তার, ডা'ন-দিকে, ওদিকে একটা গর্ত্ত আছে,—ওদিক্‌ মাড়িও না। হ্যাঁ, ঠিক হ'য়েছে, বেশ আ'স্‌ছ! মাথা ঠিক ক'রে, মাথা ঠিক ক'রে! এবার গভীর জলে এসে প'ড়েছ, বেঁতে বোস। এদিক্‌ দিয়ে এস, তা'হ'লে ঘূর্ণীটা এড়া'তে পা'র্‌বে। সাবাস্‌, জেস্‌, সাবাস্‌ বুড়িয়া! সোজা আমার দিকে চ'লে এস, ডাক্তার, তা' হ'লে আমি তোমাদের টেনে তু'ল্‌ব।"

যাহা হউক হিলক্‌সের সাহায্যে তাঁহারা বাকী পথটুকুও পার হইলেন।

সার জর্জ্জ অ্যানীকে ঠিক করিয়া অস্ত্র করিলেন। পরদিন সকালে ম্যাক্‌লিওর তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার সময়ে, তাঁহার ব্যাগের পার্শ্বে ড্রামন্ডের সহি-করা একটী ১০০গিনির চেক রাখিয়া দিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। সার জর্জ্জ বলিয়া উঠিলেন,—"ডাক্তার, তুমি আমাকে ভীরু ব'ল্‌তে পার; কিন্তু ইতর কিম্বা কঞ্জুস ভেবো না।" এই বলিয়া তিনি চেকখানি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন! তাহার পর ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ম্যাকলিওর, এস, আর একবার তোমার সঙ্গে করমর্দ্দন করি। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি ব'লে, আমি গর্ব্ব-অনুভব কচ্ছি। আমাদের ব্যবসায়ের তুমি গৌরবস্বরূপ!"

(আগামী বারে সমাপ্য।)

সন্তোষ

যাহারা পাড়াগাঁয়ে থাকে, তাহারা সহুরে লোকের একটী কষ্টের কথা বুঝিতে পারিবে কি না, সন্দেহ। তাহারা সকালে চোক খুলিয়া চাহিলেই, সবুজ ফলফলে গাছ-পালাগুলি দেখিতে পায়, কাণ পাতিয়া শুনিলেই, পাখীর গান শুনিতে পায়; আর আমরা, সহুরে লোক, সকালে উঠিয়া চোক মেলিয়া চাহিলেই, দেখি—ধূঁয়া আর ধূলো; কাণ পাতিয়া শুনিলেই, শুনি—ময়লাগাড়ীর ঘড়ঘড়ানী!

আমি তখন ১২।১৩ বছরের ছেলে। বাবা ডাক্তার, কাজেই যেখানে পশারের সুবিধা হইবে, সেইখানেই তাঁহাকে বাড়ীভাড়া করিতে হইয়াছে; আমরা চীৎপুর রোডে একখানি বাড়ীতে থাকি। সমস্ত দিনই সে পথে লোকের চলাচল, ফেরীওয়ালাদের চীৎকার, আর বাড়ীর গাড়ী, ছেক্‌ড়া-গাড়ী, ট্রামগাড়ী, গরুর গাড়ী ও ময়লা-গাড়ীর প্রাণান্তক হট্টগোল। কাজেই বাবা বৎসরে একবার করিয়া আমাদের—মাকে, আমাকে আর আমার বহিন অমলাকে আমাদের এক আত্মীয়ের কাছে, মধুপুরে, পাঠাইয়া দেন। লোকে দার্জ্জিলিংএ যায়, ওয়ালটেয়ারে যায়, পুরীতে যায়, শিমুলতলাতে যায়, দেরাদূনে যায়, আমরা বছরে একবার শুধু মধুপুরটুকু যাইতে পাই। এবার বাবা তা'ও যাইতে দিবেন না। এখন পূজার ছুটী হইয়াছে—সমস্ত দিনই প্রায় বাড়ীতেই থাকি। ঐ কথাটা শুনিয়া-অবধি মনটা বড় দমিয়া গিয়াছে, বাবার উপরে বড় রাগ হইতেছে। কি করি? অমলাকে উস্কাইবার চেষ্টায় তাহার খেলাঘরে গেলাম, তাহাকে বাবা যেন একটু বেশী ভালবাসেন। গিয়া দেখি, সে নিশ্চিন্ত মনে 'বেণে-পুতুলগুলিকে' কাপড় পরাইতে ব্যস্ত —মনে কোনই দুঃখ নাই। দেখিয়া আমার গা জ্বলিয়া গেল! 'বেণে-পুতুল' লইয়া খেলা বা আমার মারবেল-খেলা, ঘুড়ী-

ওড়ান, লাটু-ঘোরান এতো যখন-তখনই চলিতে পারে। পাহাড়ে চড়া, রঙবেরঙের পাথর-কুড়ান, পাখীর বাসা খোঁজা, প্রজাপতি ধরা, সিঁদুরে লাল পথগুলি দিয়ে বেড়াইতে যাওয়া, এসব তো, এখানে পচিতে থাকিলে, ভাগ্যে যুটিবে না, আর তা'ও বছরে একবার বৈত নয়? মেয়েটা কি হাঁদা! আমি তাহাকে উস্কাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলাম, সে কথা কাণেই তুলিল না, পুতুল-গুলিকে কাপড় পরাইয়া ইঁটের চড়চড়ী, বালির ভাত, আর সুরকীর অম্বল রাঁধিতে লাগিল! তখন আমি রাগিয়া গিয়া বাবা যে আমাদের আর ভাল বাসে না এইরকম কি একটা কথা বলিয়া ফেলিলাম! এমন সময়ে বাবা আসিয়া ডাকিলেন,—"মন্মথবাবু, আমার সঙ্গে গাড়ী চ'ড়ে রুগী দে'খ্‌তে যা'বে?" আমারই নাম মন্মথ; আমি তখন ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, —"হ্যাঁ, বাবা, যা'ব।"

"তবে শীগ্‌গির কাপড় প'রে নীচে এস।"

এই বলিয়া বাবা নীচে নামিয়া গেলেন; আমি তাড়াতাড়ি জুতা-জামা পরিয়া নীচে নামিলাম। পরে গাড়ীতে চড়িয়া বাবার সঙ্গে আহিরীটোলায় এক রোগীর বাড়ীতে চলিলাম।

গাড়ী ক্রমে এক অজ গলির মধ্যে ঢুকিল। সে গলিটা যেমন অন্ধকার, তেমনি অপরিষ্কার, দুর্গন্ধে আমার অন্নপ্রাশনের অন্নপর্য্যন্ত উঠিয়া আসিবার জো হইতে লাগিল। কোঁচার প্রান্তটুকু নাকে চাপিয়া ধরিয়া অতি কষ্টে সেই পথ-অতিক্রম করিয়া চলিলাম—প্রাণ যেন আইঢাই করিতে লাগিল।

শেষে আমাদের গাড়ী বহুকালের পুরাতন, ভাঙা একখানি একতলা, এঁদো বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। এ কি বাড়ী? এর কাছে আমাদের বাড়ীখানি ত অট্টালিকা! বাবা বলিলেন,—"নাম, মন্মথ, এখানে একজন রুগী আছে, তা'কে দেখে বাড়ী যা'ব।

বাবা বলিলেন, কি করি, গাড়ীহইতে নামিলাম, কিন্তু সে জায়গাটা এমনি নোংরা যে, আমার মাটীতে পা দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না।

দুই-তিনটা ভাঙা ঘর-পার হইয়া আমরা একটি ছোট কুঠরীতে ঢুকিলাম। সেখানে রাতে ত আলো ঢুকে না, দিনমানেও কখন সূর্য্য উঁকি মারে কি না, সন্দেহ। দেখিলাম, সেই ঘরে এক অস্থি-চর্ম্মসার রোগী শুইয়া আছে। পরে বাবার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তাহার রাজযক্ষ্মা হইয়াছিল।

রোগী বাবাকে দেখিয়া দুই হাত যুড়িয়া শুইয়া শুইয়াই তাঁহাকে নমস্কার করিল; তাহার মুখখানি একটু যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

বাবা অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীর কাছে বসিয়া নানা কথা কহিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রোগী বলিল, সে জন্মাবধি এই বাড়ীতে আছে। কখন কলিকাতার বাহিরে যায় নাই—কখন রেল বা ট্রাম-গাড়ীতে চড়ে নাই—কখন পাহাড় বা জঙ্গল দেখে নাই। এই বাড়ীতে আছে? এ কি বাড়ী? এ যে অন্ধকূপ! তবে তো আমাদের অদৃষ্ট ভাল, আমরা তো প্রায়ই মধুপুরে গিয়া থাকি। এ বছরটা যাইতে পাই নাই, তাই আজই কত বক্ বক্ করিতেছিলাম।

সে যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের বাহিরে ছোট একটু উঠান আছে, তাহাতে একটি যূঁই-ফুলের গাছ আছে, সে সেই গাছটি ও উহার ফুলের কত সুখ্যাতি করিল। লোকটির কষ্টের অবধি নাই, তবু সে একটুও অসন্তুষ্ট নয়, ঈশ্বরের দয়ার কত প্রশংসা করিল। সব দেখিয়া-শুনিয়া আমি তো অবাক্! এত কষ্টের মধ্যেও এই লোকটির মুখে হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে, একটু যে যূঁই-ফুলের সুবাস পায়, তাহার জন্য ইহার মনে কত সন্তোষ! আমাকে যূঁই-ফুলের গাছটির দিকে বারবার চাহিতে দেখিয়া সে বলিল,—"আমার আর বেশী দিন নাই, শিগ্‌গিরই ঈশ্বর, বোধ হয়, আমাকে তাঁর কাছে তুলে নেবেন, তখন, দাদাবাবু, গাছটি আপ্‌নাকে দিয়ে যা'ব।"

ও কথা শুনিয়া আমি হাসিব কি কাঁদিব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। কি ছার একটি যূঁই-ফুলের গাছ, তাই সে আমাকে উপহার দেবে, আমি কত ভাল ভাল ডবল-যূঁই, গোলাপ, মল্লিকা, কনকচাঁপা, গন্ধরাজ-ফুলের গাছ দেখিয়াছি, ঐ সব ফুলের আঘ্রাণ লইয়াছি। মধুপুরে বড় বড় গোলাপফুল ফুটে। কিন্তু এ বেচারী জীবনে যূঁই-ফুল-ছাড়া আর বুঝি কোন ফুল দেখে নাই, যূঁই-ফুলের মৃদু সুবাস-ছাড়া বুঝি আর কোন ফুলের সুবাস-আঘ্রাণ করিয়া নাসিকার তর্পণ করে নাই!

আমি আর কি বলিব? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িলাম। একটু আগে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম বলিয়া বড় লজ্জাবোধ হইতে লাগিল; বাবার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না; ঘাড় নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরে বাবার সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল, যেন স্বর্গে আসিলাম!

কয়েক দিন পরে দেখি, বাবা একটি যূঁই-ফুলের-গাছ আনিয়াছেন। এ সেই রোগীর যূঁই-গাছ—বুঝিলাম রোগী আর ইহজগতে নাই। সে আমাকে একটি সৎশিক্ষা দিয়া গিয়াছে—তাহার রোগ-শয্যায়ও তাহার মুখে যে একটি সন্তোষের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার আমরণ মনে থাকিবে—তাহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আমি কাঁদিয়াছিলাম। অত দুঃখেও যে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখে, তাঁহাকে ভক্তিভাবে স্মরণ করে, সে, মানুষের দৃষ্টিতে সামান্য লোক হইলেও, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নহে। এ কথা, যখন তাহাকে ছেলে-বেলায় দেখিয়াছিলাম, তখন বুঝি নাই, এখন বুঝি।

এই চিত্র তিনটি আমরা "হিন্দু-পেট্রিয়টের" সত্বাধিকারীর সানুগ্রহ-অনুমতিক্রমে মুদ্রিত করিলাম।

কালেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১১০গজ সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

সাঁতার।

১

"বালকে"র পাঠকদের মধ্যে যাহারা সাঁতার কাটিতে জানে না, সুযোগ পাইলেই, তাহাদের উহা শিক্ষা করা উচিত ; কেননা এমন হইতে পারে যে, ভবিষ্যতে কোন সময়ে কেবল তাহাদের জীবন নয়, অপর লোকদের জীবনও তাহাদের ঐ কৌশলের উপর নির্ভর করিবে, এজন্য তাহাদের প্রস্তুত থাকা চাই। বুদ্ধিমান লোকে আজকাল এ-বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ করিতে-ছেন, কিন্তু সাধারণ লোকে

ডুবের প্রতিযোগিতা।

এখনও ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছে কি না, সন্দেহ। জাহাজ-ডুবি হইয়া অনেক লোক মারা পড়িলে, লোকে বুঝিতে পারে যে, জলমগ্ন ব্যক্তিরা যদি সাঁতার দিতে জানিত, তবে মারা পড়িত না।

সাঁতার দিতে শিখিলে, কেবল যে তোমরা বিপদের সময়ে তোমাদের বা অপরের প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে, তাহা নয়; সেই অভ্যাসের দ্বারা তোমাদের শরীরও বেশ সবল হইয়া উঠিবে। এজন্য আমরা 'বালকে'র পাঠকমাত্রকেই এই পরামর্শ দিতেছি—সাঁতার দিতে শেখ।

সাঁতার দিতে শিখিতে হইলে, কয়েকটী কথা মনে রাখা দরকার। প্রথম কথা এই যে, একাকী গভীর জলে যাওয়া ভাল নহে। যেস্থানে পুকুর বা নদী গভীর বলিয়া তোমার ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, সেই স্থানে একাকী যাওয়া উচিত নয়। ঐপ্রকার জায়গাতে গেলে, যে সাঁতার দিতে জানে, এমন একজন লোক তোমার সঙ্গে থাকা চাই। তাহা-ছাড়া, আহারান্তে বা ক্লান্ত-অবস্থায় সাঁতার শিখিতে যাইবে না।

নানালোক নানারকমে সাঁতার দিতে শিখিয়াছে। কেহ কেহ জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া একপায়ে ভর দিয়া অন্য পা এমনভাবে চালাইয়াছে, যেন তাহারা সত্যই সাঁতার দিতেছে, এইরূপে সাঁতার শিখিয়াছে। তাহারা এরকম করিয়া পা-দুইটী ভালরূপে চালাইতে অভ্যাস করে। কেহ কেহ আবার জলের উপরিভাগে কলাগাছ ভাসাইয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকে; সেই অবস্থায় তাহারা পা-দুইটী উচিতমত চালাইতে শিখে। বিলাতী স্কুলে আজকাল সাঁতার শিখিবার একটী নূতন পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাকে একরকম ড্রিল বলা চলে। সন্তরণকালে হাত-পা কিরূপে চালাইতে হইবে, ছেলেরা উক্তপ্রকার ড্রিল-অভ্যাস করিয়া তাহা বেশ শিখিতে পারে।

পদ-সঞ্চালন এইরূপে শিখিতে পারা যায়:—ছাত্রেরা খাড়া হইয়া দাঁড়াইবে। শিক্ষক 'এক' বলিলে, ছাত্রেরা বাঁ-হাঁটু উঠাইয়া বাঁদিকে এমনভাবে ঘুরাইয়া বাড়াইবে, যেন শেষে তাহাদের বাঁ গুল্‌ফ ডাইন-হাঁটুর ভিতরভাগে আসিয়া লাগে। এ অবস্থায় ছাত্রদের বাঁ পায়ের অঙ্গুলিসকল নীচে থাকিবে। তাহার পর শিক্ষক 'দুই' হাঁকিলে, ছেলেরা বাঁ-পা পিছনে ঘুরাইয়া এমনভাবে

সন্তরণ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার-দ্রব্য

বুড়ো আঙ্গুল মাটির উপর নামাইবে, যাহাতে তাহাদের বাঁ ও ডাইন পায়ের মধ্যে আড়াই-ফুট ফাঁক থাকে। শিক্ষক আবার যখন 'তিন' হাঁকিবে, তখন ছেলেরা ইতস্ততঃ না করিয়া বাঁ-পা ডাইন-পায়ের কাছে পৌছাইয়া দিবে। এ কাজটী করা হইলে, ছাত্রেরা ঠিক ঐ প্রকারে ডাইন-পাও চালাইবে। উভয় পদের সঞ্চালন-অভ্যাস করিলে পর, ছাত্রেরা পা-দুইটী পরপর চালাইবে; এবার কেহ তাহাদের কাছে 'এক, দুই, তিন' হাঁকিবেন না।

পদ-সঞ্চালন শিখিলে পর, ছাত্রেরা আবার বাহু-সঞ্চালন-অভ্যাস করিবে। তাহারা আগের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার পর শিক্ষক যখন 'প্রস্তুত হও' বলিবেন, তখন তাহারা কনুই-দুইটী

স্থির করিয়া রাখিয়া হাত-দুইটী স্কন্ধপর্য্যন্ত উঠাইবে। তাহার পর হাত-দুইটী উপুড় করিয়া এমনভাবে সাম্‌নে বাড়াইবে, যেন তাহাদের হাত-দুইটী একটু উঁচু হইয়া যায় এবং বুড়ো-আঙ্গুল কাছাকাছি হয়। এমন সময়ে তাহারা মাথা একটু পিছনে বাঁকাইয়া দিবে। শিক্ষক আবার যখন 'এক' হাঁকিবেন, তখন তাহারা সত্বর হাত-দুইটী পৃথক্ করিয়া ডাইন ও বাঁ-দিকে ঘুরাইয়া বাড়াইবে। এ কাজটী এমনভাবে করিতে হইবে, যাহাতে হাত-দুইটীর মধ্যে যথাসাধ্য ফাঁক থাকে এবং হাতের উপরিভাগ একটু অগ্রবর্ত্তী হয়। তাহার পর শিক্ষক 'দুই' হাঁকিলে, ছাত্রেরা কনুই ঈষৎ পিছাইয়া পাঁজরার কাছে ঘুরাইয়া আনিবে। হাত-দুইটী বুকের পার্শ্বের একটু সাম্‌নে থাকিবে; মুঠা বন্ধ, আঙ্গুলগুলি সাম্‌নে এবং হাতের তালু নীচুমুখ থাকিবে; দুইহাতের বুড়া-আঙুলের মধ্যে প্রায় ছয়-বুরুল ব্যবধান থাকিবে। শিক্ষক যখন 'তিন' হাঁকিবেন, তখন ছেলেরা আবার আগের মত হাত সাম্‌নে বাড়াইবে। ঐ সমস্ত সঞ্চালন-ক্রিয়া বার বার অভ্যাস করিতে হইবে।

পদ ও হস্ত-সঞ্চালন উক্তপ্রকারে বেশ অভ্যস্ত হইলে পর, ছেলেরা ঐ দুইপ্রকার সঞ্চালন একসঙ্গে অভ্যাস করিবে, অর্থাৎ শিক্ষক 'এক' হাঁকিলে, তাহারা প্রথম পদ ও প্রথম হস্ত-সঞ্চালন করিবে; তিনি যখন 'দুই' বলিবেন, তখন তাহারা দ্বিতীয় হস্ত-পদ-সঞ্চালন করিবে, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ছেলেদিগকে অভ্যাস করিবার সময়ে একপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, কাজেই এইবার হস্ত-সঞ্চালনের সময়ে প্রথমে বাঁ ও তা'র পরে ডাইন-পা তুলিয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

উক্তপ্রকার ড্রিল-অভ্যাস করার পর, বুকে ভর দিয়া সাঁতার দেওয়া যে কিরকম জিনিস, তাহা তুমি অনেকটা বুঝিতে পারিবে, এবং সাঁতার দিবার জন্য জলের মধ্যে গেলে, তোমার অনেক সুবিধা হইবে।

যাহারা ভাল করিয়া সাঁতার দিতে চায়, তাহাদের অন্য একটী বিষয়ে মনোযোগ করা দরকার। ঠিকভাবে নিশ্বাস লইতে ও প্রশ্বাস ফেলিতে শিক্ষা করিতে হইবে, নহিলে সাঁতার দিবার সময়ে অসুবিধা হইতে পারে। ইহাও স্থলে থাকিয়া অভ্যাস করা যাইতে পারে। ছেলেরা খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার পর, মাথা ও স্কন্ধ আগাইয়া ধীরে ধীরে ফুস্‌ফুস্‌হইতে মুখদিয়া যতদূর সম্ভব প্রশ্বাস ফেলিবে। তাহার পর তাহারা নাসিকার মধ্যদিয়া যতদূর সম্ভব ধীরে ধীরে নিশ্বাস লইবে, এমন সময়ে তাহারা আবার মাথা ও স্কন্ধ পিছাইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইবে। রোজ কএকবার এরকম অভ্যাস করিলে, তাহারা নিশ্বাসে ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ করিতে শিখিবে; সন্তরণ-কালে, এই শিক্ষা তাহাদের অনেক উপকারে আসিবে।

ফুট্‌বল-মাহাত্ম্য

(গান)

মুলতান—একতালা।

যতরকম খেলা আছে এ সংসারে
"ফুট্‌বলের" কাছে সব মিঞাই হারে,
"কিক্" মেরে "বলে" কি সুখ আহা রে!
যে না জানে, তা'রে ধিক্ ধিক্ ধিক্!

কিন্তু যদি, দাদা, ঢোকে এসে "গোল",
তবেই বেজায় বেধে যায় গোল—
"গোল-কিপারের" মুখ হয় "ওল,"
"ফরোয়ার্ড"-কাঁধে ধ'রে যায় "ফিক্"!

"পাস" ক'রে ক'রে করিয়ে "সেণ্টার,"
বল্‌টা "গোলে" কর্‌লে "এণ্টার,"
"ক্ল্যাপ" প'ড়ে যায় দু'ধারে এস্তার,
হাসি ফোটে ঠোঁটে ফিক্ ফিক্ ফিক্।

তবু এ খেলাটি তোফা—"ফাষ্ট গ্রেড্"!
খেতে পাই বেড়ে সোডা-লেমনেড্!
যদিচ কখন হই "নকড্ হেড্,"
করে যদি "কিক্" কোন অরসিক!

বিশ্বস্ত ভৃত্য।

এক প্রভুর একজন ভৃত্য ছিল। অনেক দিন সে প্রভুর কাজ করিয়াছিল। বাড়ীতে সে সকলের আগে উঠিত ও কাজ-কর্ম্ম করিয়া রাত্রিতে আবার সকলের পরে শুইতে যাইত। প্রভু যে কাজ করিতে বলিতেন, হাজার কঠিন হইলেও, তাহা যথাসম্ভব সত্বর হাসিমুখে সম্পন্ন করিয়া ফেলিত। কোনও দিন সে কোনও কাজে আপত্তি করে নাই।

একবৎসর চাকরী হইয়া গেল, প্রভু মাহিনা দিলেন না, কারণ মাহিনা হাতে পাইয়া সে যদি চলিয়া যায়, তবে এত কর্ম্মঠ, দক্ষ চাকর তো আর তিনি সহজে পাইবেন না। চাকরটীর পয়সা-

কড়ির দরকার না থাকায়, সেও কিছু চাহিল না। সে আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। দুইবৎসর গেলেও, যখন মাহিনা পাওয়া গেল না, তখন মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিল না, কাজ সে পূর্ব্বের মতই করিয়া যাইতে লাগিল। তৃতীয় বৎসর-শেষ হইলে, সে একদিন বেতন চাহিয়া বসিল, বলিল, "প্রভু! আমায় বিদায় দিন, আমি এবার আমার অদৃষ্ট-পরীক্ষায় বাহির হইব; বেতন যাহা পাওনা হইয়াছে, হিসাব করিয়া মিটাইয়া দিন। প্রভু বলিলেন, "হাঁ, তুই যখন যা'বিই, তখন তোকে ন্যায্য যা পাওনা হয়েছে, তাই দিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি পকেটহইতে তিনটী পয়সা বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া বলিলেন, "নে, এই তোর তিনবছরের মাহিনা পাওনা হইয়াছে। খুব কম লোকই এই তিনবছরের জন্য তোকে এত বেশী মাহিনা দিত—তুই খুব কর্ম্মঠ কি না, তাই আমি তোর উপর সন্তুষ্ট হ'য়ে এত দিলাম।" চাকরটা ছিল খুব বোকা, পয়সা-কড়ির খবর সে কিছু বুঝিত না, সে মনে করিল, প্রভু কি ঠকাইতে পারেন? ন্যায্য পাওনাই উনি দিয়াছেন। এখন তো বেশ অর্থ-সমাগম হইয়াছে, স্ফূর্ত্তি করিয়া দিনকতক কাটান যাউক। এই মনে করিয়া সে প্রভুর গৃহ ছাড়িয়া রওনা হইল।

২

একটা নির্জ্জন পথ দিয়া যাইতে যাইতে একটা বামনের সঙ্গে তাহার দেখা। বামনটী একটা ঝোপের আড়ালথেকে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ হে তুমি? তোমার ভাবগতিক দেখে মনে হয় না তো, চিন্তা ক'র্‌বার তোমার কিছু আছে। বেশ আমুদে লোক তো তুমি!"

"কেন হে, আমি কেবল ব'সে ব'সে ভেবে ভেবে ম'র্‌ব? আমার দেখ না কত টাকা; আমার তিনবছরের মাহিনা এই।" এই বলিয়া সে পয়সা-তিনটী বাহির করিয়া দেখাইল। বামন বলিল, "শুন হে শুন, আমার অবস্থা খুব খারাপ, আমায় পয়সা-তিনটী দাও না, আমি বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, কাজ ক'র্‌তে পারি না; তোমার অল্প বয়স, কাজ ক'র্‌বার যথেষ্ট শক্তি আছে; তুমি তো আবার উপায় ক'র্‌তে পা'র্‌বে। কেমন, আমায় পয়সা-তিনটী দিয়ে দাও।" চাকরটীর খুব দয়া হইল, সে তাহাকে পয়সা-কয়টী দিয়া বলিল, "তোমার যখন বিশেষ দরকার, তখন তুমিই নাও, আমার এমন বিশেষ কিছু দরকার নাই।"

বামন তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "আমি তোমাকে তিনটী বর দিব, দেখো, ঠিক ফ'ল্‌বে।"

চাকরটী বলিল, "দে'খ্‌ছি তুমি বাজীকর যে! আচ্ছা বেশ—আমায় এমন একটা বাঁশী দাও, যা'র সাহায্যে আমি যা' ইচ্ছা করি তা'ই পা'ব, এমন একটা বেহালা দাও, যে তা'র বাজনা শু'ন্‌বে তা'কেই না'চ্‌তে হ'বে এবং তৃতীয়তঃ যা'র কাছে যা' চাইব, তা'কেই তা' দিতে হ'বে।"

বামন "তথাস্তু" বলিয়া ঝোপ-থেকে একটা বাঁশী ও বেহালা আনিয়া তাহাকে দিল। চাকরটীর আর আনন্দ ধরে না, সে মনের সুখে আবার পথ চলিতে লাগিল।

খানিক দূর যাইয়া সে দেখিতে পাইল, পথের ধারে দাঁড়াইয়া, উপরের দিকে তাকাইয়া একজন ইহুদী পাখীর গান শুনিতেছে! পাখীটী একটা গাছের 'মগ'-ডালে বসিয়া গান করিতেছে। ইহুদী বলিল,—"যদি এই পাখীটী ধ'রে দিতে পার, তবে তোমায় একথলি স্বর্ণমুদ্রা দেব।"

চাকরটী শুনিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিবামাত্রই পাখীটী নীচে পড়িয়া গেল, কিন্তু একটুও আঘাত পাইল না। সে সেই ইহুদীকে বলিল, "যাও, এখন নিয়ে এস।" ইহুদী যেই পাখী আনিতে কাঁটাবনে ঢুকিয়াছে, আর যাইবে কোথায়, সে অমনি বেহালায় সুর চড়াইয়াছে! ইহুদী তো পাগলের মত নাচিতে সুরু করিয়া দিল—কাঁটা লাগিয়া গা, কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া কুটিকুটী হইয়া যাইতে লাগিল। সে আকুল হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল,—"থাম, থাম, আর সহ্য হয় না!" সে যতই চেঁচায়, চাকরটী ততই বাজায়। শেষে যখন ইহুদী একথলি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া দিল, তখন চাকরটী বাজান বন্ধ করিয়া টাকার থলি পকেটে করিয়া হাসিতে হাসিতে রওনা হইল।

ইহুদী তো চটিয়া লাল, ভয়ে সাম্‌নে কিছু বলিতে পারিতেছিল না, কিন্তু ভৃত্যটি দৃষ্টির আড়াল হইবামাত্র বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও, একদিন সুবিধা পাইলেই, তোমার কি দশা করি, দেখে নিও," এই বলিয়া নালিশ করিতে সে কাছারিতে চলিল। বিচারককে বলিল, "মশায়, দেখুন, আমার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! পথে একবেটা পাজী, আমায় কি করেছে দেখুন! আমার যথাসর্ব্বস্ব-লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। আমার প্রতি দয়া করুন। তা'কে ধরে এনে শাস্তি দিন, তা' না হ'লে আর বাঁচি না, দেশ উচ্ছন্ন যায়। সর্ব্বনাশ ক'ল্লে।"

বিচারক বলিলেন, "সে কি সৈন্য, যে তোমায় তলোয়ার দিয়ে আঘাত ক'রে সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়েছে?" "না, ম'শায়, তা' নয়, তা'র কাছে তলোয়ার-টলোয়ার কিছু নেই। কেবল একটা বাঁশী আর বেহালা তা'র সঙ্গী। তা'-দিয়েই সে লোককে এইরকম জ্বালাতন করে। তা'কে দেখলেই, লোকে চি'ন্‌তে পা'র্‌বে।"

বিচারকের হুকুমে পুলীশরা তাহাকে পথথেকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল। ইহুদীর সেই টাকার থলিটা তাহার পকেটে পাওয়া গেল।

তখন সে বিচারককে বলিল, "কি আমার অপরাধ যে; আমায় ধরে নিয়ে আসা হ'ল? আমি ইহুদীর শরীরও স্পর্শ করি নি। বেহালা বাজিয়েছিলাম, ও দাঁ'ড়াতে পা'র্‌ছিল না, তাই চুপ্ ক'র্‌তে

টাকার থলি আমায় দিয়েছে। আমার দোষটা হ'ল কোথায়?" কিন্তু ইহুদী সব কথা-অস্বীকার করিল। বিচারকও জানিতেন, ইহুদীরা কেমন কৃপণ। তিনি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, স্ব-ইচ্ছায় ইহুদী এত টাকা দিয়াছে। সেকালে সামান্য অপরাধেই ফাঁসী হইত। ডাকাতির অপরাধে তাহার ফাঁসীর হুকুম হইয়া গেল।

ফাঁসীর দিন তাহাকে ফাঁসী দিবার জন্য ফাঁসীমঞ্চের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। সে বলিল, "বিচারক-মহাশয়! আমায় একবার বেহালাটা বাজা'তে দিন। ম'র্‌বার আগের এই প্রার্থনাটা, হুজুর, অনুগ্রহ করে মঞ্জুর করুন।" ইহুদী শুনিয়াই লাফাইয়া বলিল, "না মশায়! কখনও না, তা' হ'বে না, দেবেন না, দেবেন না, তা' হ'লে সর্ব্বনাশ হ'বে, নয় আমায় খুব শক্ত ক'রে বেঁধে রাখুন, তা'র পর বাজা'তে দেবেন।" বিচারক ভৃত্যের অন্তিম ইচ্ছা মঞ্জুর করিলেন, সে বাজাইতে সুরু করিল।

যেই বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, বিচারক, উকীল, ইহুদী, লোকজন সব নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বিচারক আর ইহুদীই নাচে সব চেয়ে বেশী! মহাকাণ্ড বাধিয়া গেল, কত লোক মজা দেখিতে আসিল, কিন্তু মজা দেখিতে আসিয়া নিজেরাও মজার সামিল হইয়া পড়িল। কুকুর, বিড়াল, যে কাছে ছিল, সকলেই নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে এ ওর গায়ে পড়ে, বমি করে। কত লোকের মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। কাহারও পা ভাঙ্গিল, কেহ পায়ের তলায় পড়িয়া মরিবার উপক্রম হইল। তখন বিচারক চেঁচাইতে লাগিলেন, "আচ্ছা, থাম, থাম, তোমাকে আর ফাঁসী দেওয়া হইবে না।" তখন সে থামিল। ইহুদীর কাছে যাইয়া বলিল, "হতভাগা, লক্ষীছাড়া, বল্ কোথায় তুই নিজেই টাকার থলি পেয়েছিস্? তা' না হ'লে কিন্তু আবার বাজা'ব।"

ইহুদী ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমি চুরী ক'রেছিলাম গো! তোমায় আমি স্ব-ইচ্ছায় দিয়েছিনু।" বিচারকের আদেশে চোর ইহুদীর ফাঁসী হইয়া গেল, আর চাকরটী নূতন শিকারের আশায় বাঁশী, বেহালা লইয়া চলিল।

শ্রীনলিনীমোহন রায়-চৌধুরী।

যাত্রী-ট্রেণের ভারপ্রাপ্ত

গার্ডের কর্ত্তব্য।

যাহারা গার্ডের পদ পায়, তাহারা প্রথমে টিকিট-কলেক্টার বা অন্য কোন নিম্নতন কর্ম্মচারীরূপে রেলওয়ের কার্য্যে প্রবেশ করে। পরে তাহারা পরিণত-বয়স্ক হইয়া উঠিলে এবং একনাগাড়ে সদ্ভাবে কাজ করিতে থাকিলে, গার্ডের পদে উন্নীত হয়। গার্ড হইয়া অনেকদিন-অবধি তাহাকে কয়লার ট্রেণে বা মালের ট্রেণে গার্ডের কাজ করিতে হয়। তাহার পর, প্রথমে তাহাকে যাত্রী-ট্রেণের, পরে এক্সপ্রেস-ট্রেণের এবং শেষে ডাক-ট্রেণের গার্ড করা হয়।

মালট্রেণের গার্ডের কাজ প্রায় অন্য সমস্ত ট্রেণের গার্ডের কাজেরই মত। তবে মাল-ট্রেণের গার্ডকে, প্রয়োজন হইলে, গাড়ী ট্রেণহইতে অন্য লাইনে লইয়া যাওয়া তদারক করিতে হয়, এবং অন্যলাইনহইতে গাড়ী আনিয়া ট্রেণে যুড়াইতে হয়, তাহা-ছাড়া তাহাকে অন্য ট্রেণের গার্ডদের অপেক্ষা বেশীক্ষণ কাজ করিতে হয় এবং তাহার দায়িত্বও অপেক্ষাকৃত কম।

কোন গার্ডকে যখন যাত্রীট্রেণে গার্ডের কাজ করিতে হয়, তখন তাহাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে মনোযোগ করিতে হয়। সে প্রথমতঃ যে ষ্টেশনহইতে ট্রেণ ছাড়িবে, সেই ষ্টেশনে, তাহার পদানুরূপ উর্দ্দি পরিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারকে তাহার উপস্থিতি-জ্ঞাপন করিবে। তাহার পর সে গার্ডের জন্য অভিপ্রেত "নোটিস-বোর্ডে" যদি কোন আদেশপত্র বা বিজ্ঞাপন থাকে, তাহাতে তাহার নাম-সহি করিবে, পরে টেলিগ্রাফ আফিসের ঘড়ীর সহিত তাহার ঘড়ী মিলাইয়া লইবে। অনন্তর সে তাহার ট্রেণ-তদারক করিতে যাইবে; এই তদারক-কার্য্যে ট্রেণে কতগুলি গাড়ী আছে,—কতগুলি প্রথম শ্রেণীর, কতগুলি দ্বিতীয়-শ্রেণীর, কতগুলি তৃতীয় শ্রেণীর, কতগুলি বা রিসার্ভ তাহা এবং গাড়ীগুলির নম্বর লিখিয়া লইতে হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে "ভ্যাকুয়াম হোস পাইপ" এবং একটী গাড়ীর সহিত অন্য গাড়ী যে সংযোজক স্ক্রুগুলির দ্বারা যোড়া হয়, সেগুলি ঠিক যোড়া আছে কি না, ব্রেকভ্যানে বাতী আছে কি না, এবং গাড়ীর বাতিগুলিতে তেল আছে কি না ও সেগুলির পলিতা ঠিক কাটা আছে কি না, এসকলও দেখিতে হয়। ট্রেণ-তদারক করা হইয়া গেলে, সে ইঞ্জিনের কাছে গিয়া চালকের সহিত তাহার ঘড়ী মিলাইবে।

প্রত্যেক গার্ডের ব্রেক্‌ভ্যানে তিনটি করিয়া বাতি থাকে। তন্মধ্যে দুইটি বাতির নাম—"সাইড ল্যাম্প" (পার্শ্ববর্ত্তিকা) আর একটির নাম—"টেল ল্যাম্প" (পুচ্ছবর্ত্তিকা)। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বাতি-দুইটি ব্রেকভ্যানের দুই পার্শ্বের ব্র্যাকেটে আট্‌কাইয়া দেওয়া হয়, ঐ বাতি-দুইটিতে ডবল্ বৃষ-চক্ষুঃ-(bull's eye) কাচ বসান আছে। সন্ধ্যাহইতে সকালপর্য্যন্ত ঐ বাতি-দুইটি জ্বলে; ঐ বাতি জ্বালা হইলে, উহাহইতে এঞ্জিনের দিকে সাদা আলো এবং পিছনদিকে লাল আলো পড়ে; পুচ্ছবর্ত্তিকায় একটিমাত্র বৃষ-চক্ষুঃ-কাচ বসান আছে। উহা গাড়ীর পিছনে একটী ব্র্যাকেটে আট্‌কান থাকে;

এবং উহা পশ্চাদ্দিকে লোহিত রশ্মি-বিকীরণ করিতে থাকে। যদি গার্ড গাড়ী থামাইবার উদ্দেশ্যে চালকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতে চাহে, তাহা হইলে সে পার্শ্ববর্ত্তিকা-দুইটির মুখ ফিরাইয়া দিলেই, লাল আলো দেখিয়া চালক এঞ্জিন থামাইয়া ফেলিবে। শেষের গাড়ীতে ব্রেকভ্যান-বর্ত্তিকা থাকার উদ্দেশ্য ট্রেণটিকে নিরাপদ্ রাখা। পিছনের আলো দেখিয়া অন্য ট্রেণ সাম্‌নের ট্রেণের ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে পায় না। তাহাছাড়া ঐ আলোক দেখিয়া চালক বুঝিতে পারে যে, সব গাড়ীগুলি ট্রেণে আছে, গতিকালে একটিও ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখি, লাল আলো বা রাঙা নিশান বিপদ্‌ব্যঞ্জক, শ্বেত আলোক সচরাচর নির্ব্বিঘ্নতা-জ্ঞাপক।

মালগুলি নামাইয়া দিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের হাতে সেই সেই মালের "ওয়ে বিল"গুলিও গার্ডকে দিয়া যাইতে হয়, এবং তজ্জন্য তাহার "গাইড্যান্স"-নামক রসিদ-বইএ ষ্টেশন-মাষ্টারের সহি লইতে হয়। গাইড্যান্সে প্রত্যেক "ওয়ে বিল" চুম্বক করা থাকে, মাল-গ্রাহী ষ্টেশনকে প্রাপ্ত মাল ও "ওয়ে বিলে"র জন্য উহাতে রসিদ দিতে হয়। গাড়ীতে মাল তুলা শেষ হইলে, গার্ড সচরাচর দেখিবে যে, ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইয়াছে। তখন সে সমস্ত গাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়াছে কি না দেখিয়া লইবে।

তাহার পর ষ্টেশন-মাষ্টারের আদেশ পাইলে, গার্ড একবার তাহার "হুইশিল্" বাজাইবে এবং সেই সঙ্গে দিনের বেলায় সবুজ নিশান এবং রাত্রিতে সবুজবাতি মাথার উপর হাত তুলিয়া দেখাইবে,

তন্ময় পাঠক
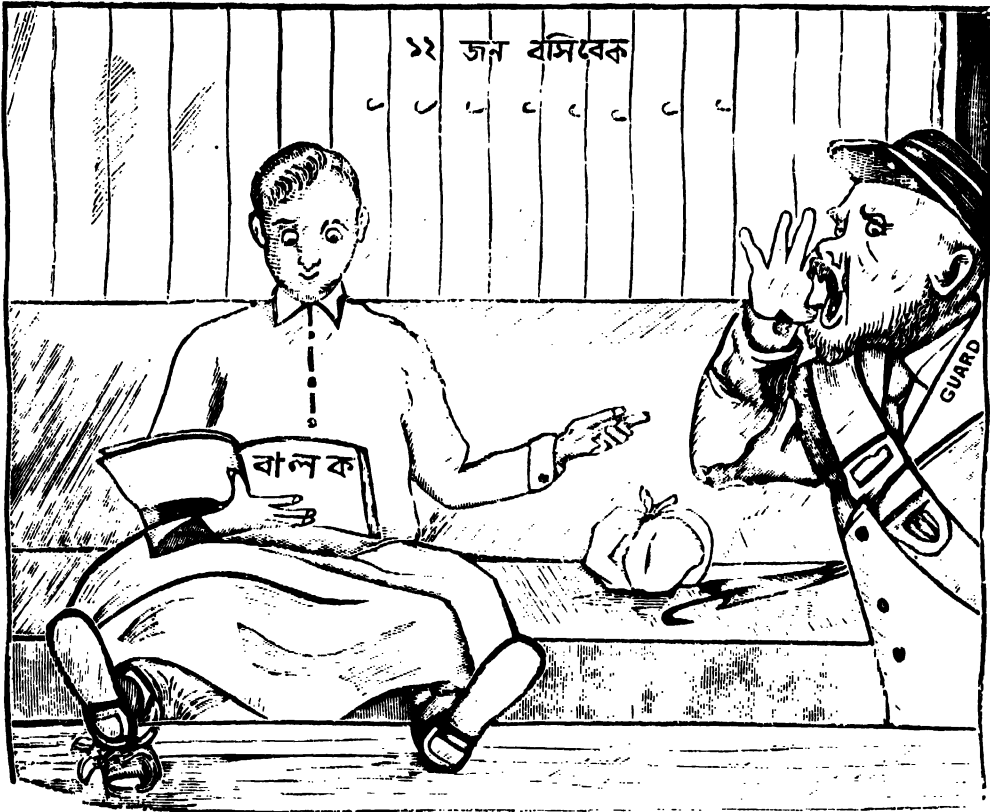
ঘড়ী মিলান হইলে পর, গার্ড লাগেজের কেরাণীর নিকটহইতে যাত্রীদিগের যে সমস্ত মাল ব্রেকভ্যানে যাইবে, সেগুলি বুঝিয়া লইয়া, তাহার সম্মুখে সেগুলি সযত্নে ব্রেকভ্যানে তুলাইবে। কেরাণীর নিকটহইতে মালগুলি বুঝিয়া লইবার সময়ে গার্ড প্রত্যেক মালের নিমিত্ত তাহার নিকটহইতে একখানি করিয়া "ওয়ে বিল" পাইবে। ঐ "ওয়ে বিলে" যাত্রীর নাম, কতগুলি মাল আছে, কোন্ ষ্টেশনে থামিবে, ইত্যাদি তথ্য লেখা থাকে। চলিতে চলিতে ট্রেণ যখন যখন যে যে ষ্টেশনে থামে, তখন তখন সেই সেই ষ্টেশনের

তাহা দেখিয়া চালক তাহার এঞ্জিনের হুইশিল্ বাজাইয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিবে। ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিয়া শেষের গাড়িখানি প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্ত ছাড়াইবার পূর্ব্বে, গার্ড চালকের সহিত "সব ঠিক"-(all right) নামক নিশানার বিনিময় করিবে। এই নিশানা-বিনিময় করিবার সময়ে গার্ডকে দিনের বেলায় হাত বাহির করিয়া ও রাত্রিবেলা শাদা বাতি দেখাইতে হয়। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য চালককে জানান যে, গার্ড ব্রেকভ্যানে ঠিক উঠিতে পারিয়াছে এবং সব ঠিক আছে।

যখন ট্রেণ দুই ষ্টেশনের মাঝামাঝি চলিয়াছে, তখন কোন গাড়ীর দরোজা খুলা আছে কি না, তাহা দেখা গার্ডের কর্ত্তব্য। যখন ট্রেণ কোন ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তখন অদূরবর্ত্তী ষ্টেশনের সিগন্যালগুলি ট্রেণের অগ্রগমনের পক্ষে অনুকূল কি না, তাহাও তাহার দেখা উচিত, অর্থাৎ যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে চালক তিনবার সংক্ষিপ্ত ও তীব্র হুইশিল দিয়া গার্ডকে ষ্টেশনের সিগন্যাল "কশন্" (সাবধানতাসূচক) বা "ডেঞ্জার" (বিপদ্জ্ঞাপক) তাহা দেখিতে ইঙ্গিত করিবে, সেও ব্রেকভ্যানের ধারে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

যে যে ষ্টেশনে গাড়ী থামিবে, সেই সেই ষ্টেশনে যাত্রীরা গাড়ীহইতে নামিবার নিমিত্ত প্রচুর সময় পাইল কি না, তাহা দেখাও গার্ডের কার্য্য; তাহার পর গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে সমস্ত গাড়ীর দরোজা বন্ধ হইল কি না, তাহাও তাহার দেখা উচিত। যাত্রীদিগকে নিরাপদ্ রাখা, কেবল গার্ডের নয়, সমুদয় রেলওয়ে-কর্ম্মচারীর মুখ্য ও অত্যাবশ্যক কার্য্য।

যে রেল-বিভাগে গার্ড কার্য্য করিতেছে, তাহার প্রত্যেক বড় বড় ট্রেণের ছাড়িবার সময় কখন, তাহা তাহার জানা আবশ্যক। তাহা-ছাড়া যে যে রেলওয়ের সঙ্গে গার্ডের রেলওয়ের যোগ আছে, সে সকলেরও ট্রেণগুলির ছাড়িবার সময় তাহার জানিয়া রাখা চাই, তাহা হইলে কোন যাত্রী কোন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর দিতে পারিবে।

সাধারণের সহিত শিষ্ট ও ভদ্র ব্যবহার করা গার্ডের জীবনের একটি অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য। লোকে যতক্ষণের নিমিত্তই ট্রেণে থাকুন না কেন, তাঁহাদের সহিত অসম্ভ্রমসূচক বা অভদ্র ব্যবহার করিলে, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কিছুতেই তাহা সহিতে পারেন না। সাধারণের সহিত ভদ্র-ব্যবহার করা-ছাড়া ষ্টেশনমাষ্টারের ও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের আজ্ঞাধীন থাকা গার্ডের পদ-রক্ষার্থ সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

যে ষ্টেশনে পঁহুছিলে গার্ডের ছুটি হইবে, সেই ষ্টেশনে পঁহুছিয়া গার্ডকে তাহার বদলীকে তাহার কাজ বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহার পর সে ষ্টেশনমাষ্টারের অনুমতি লইয়া ষ্টেশন-ত্যাগ করিবে।

বিপজ্জনক কোন কিছু ঘটিলে, কোন যাত্রী গাড়ীর মধ্যে যে শিকল থাকে, তাহা টানিয়া গার্ড ও চালককে তাহা জানাইতে পারে। ঐ শিকল টানিলে, ভ্যাকুয়াম ব্রেকের নলের মধ্যে হাওয়া ঢুকে, তাহাছাড়া যে গাড়ীতে বিপদ্ ঘটিয়াছে, সেই গাড়ীহইতে একটি রক্তবর্ণ চাকৃতি বহিঃনিঃসৃত হয়। কেহ ঐ নিশানার অযথা ব্যবহার করিলে, তাহার ৫০৲ পঞ্চাশটাকা জরিমানা হয়। ঐ নিশানা দেখিলেই, গার্ড ও চালক গাড়ী থামাইয়া ফেলিবে এবং যে গাড়ীহইতে চাকৃতি দেখা দিয়াছে, সেই গাড়ীর দিকে ছুটিয়া যাইবে।

কোনপ্রকার দুর্ঘটনাহেতু দুই ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যদি ট্রেণ থামাইতে হয়, তাহা হইলে প্রথম ট্রেণের পর যদি দ্বিতীয় ট্রেণ ছাড়া হইয়া থাকে, তবে সেই ট্রেণ যাহাতে এই ট্রেণের ঘাড়ে না আসিয়া পড়ে, তজ্জন্য গার্ডকে ট্রেণের পিছনে গিয়া সতর্কতা-অবলম্বন করিতে হইবে। এই বিষয়ে সতর্কতা-অবলম্বনের নিমিত্ত গার্ডকে ব্রেকভ্যানের সিকি-মাইল পিছনে একটি ভুঁই-পট্কা এবং ব্রেকভ্যানহইতে অর্দ্ধমাইল পিছনে দশগজ অন্তর তিনটি ভুঁই-পট্কা এবং তাহা-ছাড়া একটি রাঙা নিশান বা বাতি দেখাইতে হয়। অন্য ট্রেণের গাড়ীর চাকা ঐ ভুঁই-পট্কার উপর দিয়া চলিয়া গেলে, উহা ফাটিয়া গিয়া আওয়াজ হয়; ঐ ভুঁই-পট্কার নাম "ফগ্ সিগন্যাল" (কুয়াশা-নিশানা)। তবে সচরাচর ছোট লাইনেই একটি ট্রেণের পিছনে আর একটি ট্রেণ ছাড়া হয়, বড় লাইনে উহা আইন-বিরুদ্ধ।

অযুগ্ম বর্ত্মে (single line) বিপরীত দিক্হইতে কোন ট্রেণ আসিয়া যাহাতে অপর একটি ট্রেণের ঘাড়ে না পড়ে, তজ্জন্য সাবধান হইতে হয়। ঐপ্রকার সতর্কতা-অবলম্বন চালকের কাজ, কারণ তখন গার্ড পশ্চাদ্দেশ-রক্ষণে ব্যস্ত থাকে। দুর্ঘটনাবশতঃ দুই-দিক্কার লাইনই যদি আবদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে যুগ্মবর্ত্মে চালকই পুরোবর্ত্তী ট্রেণের সহিত সংঘর্ষণ-নিবারণার্থে উহাকে থামাইবে।

উল্লিখিত কর্ত্তব্যগুলি-ছাড়া গার্ডের আরও নানা কার্য্য আছে; বাহুল্যভয়ে সেগুলির কথা এ ক্ষুদ্র নিবন্ধের অন্তর্গত করা হইল না, কেবল মুখ্য কর্ত্তব্যগুলির কথাই লিখিত হইল।

নূতন প্রতিযোগিতা।

ফুট্‌বল, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাড্‌মিন্টন ও হকী খেলা বাদে অন্য কোন কৌতুকাবহ খেলা-সম্বন্ধে একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধরচনা করিতে হইবে। যাহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে একখানি ইংরাজী পুস্তক-উপহার দেওয়া হইবে।

১। প্রবন্ধটি "বালকে"র এক পৃষ্ঠা-পরিমিত হওয়া চাই।

২। উহার হস্তলিপি বেশ সুস্পষ্ট হওয়া চাই।

৩। কাগজের উভয়-পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইবে না।

৪। প্রবন্ধটি "বালক"-পরিচালকগণের সম্পত্তিস্বরূপে পরিগণিত হইবে।

৫। উহা এই মাসের শেষ-তারিখের মধ্যে বালক-কার্য্যালয়ে পঁহুছান চাই।

৬। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি বালকে মুদ্রিত হইবে।

৭। পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হইলে, একাধিক প্রবন্ধ পুরস্কৃত ও "বালকে" প্রকাশিত হইতে পারে।

"বালক"-সম্পাদক,

২৩নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

৮র্থ বর্ষ। জানুয়ারী, ১৯১৫ ১ম সংখ্যা।

ফিল্ড মার্শাল আর্ল রবার্টস্, ভি, সি

পৃথ্বী-প্রবেশ—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩২ খ্রীঃ-অঃ।

পৃথ্বী-পরিহার—১৪ই নভেম্বর, ১৯১৪ খ্রীঃ-অঃ।

ফ্রেডারিক স্লি রবার্টস—কান্দাহার, প্রিটোরিয়া ও ওয়াটার-ফোর্ডের আর্ল রবার্টস্ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর-তারিখে কাণপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল—জেনেরল সার অব্রাহাম রবার্টস্ এবং তাঁহার মাতা দ্বিষষ্টিতম পদাতিক সৈন্যদলের সৈনিক-কর্ম্মচারী মেজর বান্‌বারীর দুহিতা ছিলেন; সুতরাং পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুলহইতেই রবার্টস্ সৈনিক-শোণিত-লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ঈটনে সাধারণ শিক্ষালাভ করেন, তাহার পর স্যাণ্ডহার্ষ্ট ও আডিসকুম্বের সামরিক বিদ্যালয়-দুইটিতে সমর-বিদ্যা-শিক্ষা করেন। অনন্তর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর-মাসে বঙ্গীয় গোলন্দাজ-সৈন্য-বিভাগে দ্বিতীয় লেফ্‌টেন্যাণ্টের পদ লইয়া তিনি সমর-বিভাগে প্রবিষ্ট হন এবং তিনমাস পরে ভারতে পদার্পণ করেন।

প্রথম পাঁচবৎসর তিনি পঞ্জাবে ছিলেন; যখন সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়, তখন তিনি পেশাওয়ারে ছিলেন। ঐ বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় তিনি ব্রিগেডিয়ার নেভিল্ চেম্বারলেনের অধীনে তাঁহারই একজন পরিচালক-কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন এবং ওয়াজিরাবাদে যে একদল সৈন্য সমবেত হয়, তিনি সেই সৈন্যদলে থাকেন। এই সৈন্যদল মৈনমীরের সিপাহীদিগের নিকটহইতে অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লয় এবং শেষে দিল্লী-অবরোধকালে জন নিকল্‌সনের সৈন্যদলের সহিত মিশিয়া যায়। লেফ্‌টেন্যাণ্ট রবার্টস্ এই সময়ে নিকল্‌সনের একজন পরিচালক-কর্ম্মচারী হন এবং যুদ্ধরত থাকেন; ১৪ই সেপ্টেম্বর-তারিখে যখন দিল্লী নগরী আক্রান্তা হয় এবং নিকল্‌সন মারাত্মকরূপে আহত হন, তখন রবার্টস্ সেই রণরঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। নিকল্‌সন যে সময়ে আহত হন, সেই সময়ে রবার্টস্ তাঁহার কাছে ছিলেন না, নিকল্‌সন আহত হইবার কিছু সময় পরে তিনি তাঁহার সাক্ষাৎ পান। মহাত্মা নিকল্‌সন তখন একটী ডুলীর মধ্যে পড়িয়া ছিলেন, তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে ফেলিয়া রাখিয়া লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল, তিনি তখন ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, রবার্টস্ বাহক-সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সেই ডুলীতে করিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন, সেই তাঁহার নিকল্‌সনের সঙ্গে শেষ-সাক্ষাৎ। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে তিনি লাহোর-ফটক-আক্রমণ-ব্যাপারে সম্মানের সহিত যুদ্ধ করেন। দিল্লীর অধঃপতনের পর সার কলিন ক্যাম্বেল যে সৈন্যদল লইয়া লক্ষ্ণৌএর ইংরাজ সৈন্যদিগকে দ্বিতীয়বার উদ্ধার করিতে যাইতেছিলেন, রবার্টস্ সেই সৈন্যদলে যোগ দেন। এই সময়ে তিনি এইরূপ বীরত্ব-প্রদর্শন করেন যে, ভিক্টোরিয়া ক্রুশ-লাভ করেন। বিদ্রোহাগ্নি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, রবার্টস্ ছুটী লইয়া দেশে যান এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩তম পদাতিক সৈন্যদলের একজন কর্ম্মচারী কাপ্তেন বিউসের কন্যা নোরা বিউসকে বিবাহ করেন। ঐ বৎসরের জুলাই-মাসে নব-পরিণীত দম্পতি ভারতে আগমন করেন। অতঃপর কাপ্তেন রবার্টস্ সার হিউ রোজের পরিচালক-কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিতে থাকেন এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আম্বালা-অভিযানের সহিত যান। পরে তিনি সার ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্টের অধীনে বঙ্গীয় ব্রিগেডের আসিষ্ট্যাণ্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনেরলের পদ লইয়া আবিসিনিয়ায় যান। আবিসিনিয়ায় যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর-তারিখে কলিকাতায় যে, ভয়ানক ঝড় হয়, তাহা দেখেন। তাহার পর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লুশাই-যুদ্ধে যান। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রবার্টস্ জেনেরল এবং

পঞ্জাব সীমান্ত-প্রদেশের সৈন্যদলের অধিনায়ক হন। ঐ বৎসরের শেষাশেষি কাবুলের আমীর শের আলি গোলযোগ বাধান, রবার্টস্ তাই একদল সৈন্য লইয়া গিয়া কুরম-উপত্যকা-আক্রমণ করেন। অতঃপর ২রা ডিসেম্বর-তারিখে পিওয়ার্ কোটালের ভয়ানক যুদ্ধটি সংঘটিত হয়, তাহাতে ইংরাজের অল্প-সংখ্যক সৈন্য আফগানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে। এই পরাভব-সংবাদ পাইয়া শের আলি তুর্কিস্থানে পলায়ন করেন এবং তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র ইয়াকুব সন্ধি-প্রস্তাব লইয়া ইংরাজ-সরকারের শরণাগত হন। রবার্টসের মতে এই সন্ধিটি বড় তাড়াতাড়ি, সবিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া, করা হইয়াছিল। ফলে, কাবুলের তৎকালিক ইংরাজ দূত মেজর কাভাগনারি, সিবিলিয়ান মিঃ জেন্‌কিন্‌স্, সার্জ্জন-মেজর কেলী এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট হ্যামিণ্টন্ ভি, সি, ঐ সন্ধি-স্থাপন করার অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই কাবুলের রাজধানীতে নিহত হন। তৎক্ষণাৎ কুরম-উপত্যকার সৈন্যদলকে কাবুলে অগ্রসর হইতে আদেশ করা হয়, রবার্টস্ ঐ সৈন্যদলের নেতা হইয়া যান। তিনি সত্বর বল-পূর্ব্বক কাবুলে প্রবেশ করেন। কাবুলের আমীর ইয়াকুব খাঁ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও তাঁহার অগ্রগমনে বাধা দিতে পারেন নাই। কাবুল অধিকৃত করার অল্পকাল পরেই ইয়াকুব সিংহাসনচ্যুত হন এবং যাবৎ বিলাতহইতে কোন আদেশ না আসে, তাবৎ জেনেরল রবার্টস্ আফগানিস্থানের শাসন-কর্ত্তার কার্য্য করিতে থাকেন। অতঃপর কয়েক মাস ধরিয়া কাবুলীরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে ও তাঁহাকে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে ব্যাপৃত রাখে; সেই সময়ে আবার কয়েক মাস আফগানীরা ইংরাজদিগকে শেরপুরে অবরোধ করিয়া রাখে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আবদর্ রহমান আমীর-বিঘোষিত হন। কিন্তু উহার অত্যল্পকাল পরেই, ইয়াকুবের ভাই, এবং কাবুলের সিংহাসনের অন্যতম প্রত্যাশী আয়ুব খাঁ মাইওয়াণ্ড-নামে স্থানে জেনেরল বারোসকে পরাভূত করেন। এই পরাজয়ের ফলে, জেনেরল প্রিমরোজ কান্দাহারে বন্দী হন, তখন জেনেরল রবার্টস্, তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অভিযানটির আরম্ভ করেন।

এই যুদ্ধযাত্রা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্টে আরব্ধ এবং ৩১শে আগষ্টে সমাপ্ত হয়। রবার্টসের সৈন্য-সংখ্যা প্রায় দশসহস্র ছিল, তিনি এই সৈন্য-দল লইয়া ৩১৩ মাইল মরুমার্গ-অতিক্রম করেন, অথচ তাঁহার একজন সৈন্যেরও প্রাণহানি হয় নাই। তাঁহার আত্মজীবনচরিতে তিনি বলিয়াছেন যে, যখন তাঁহার এই সৈন্যদল কান্দাহারে পঁহুছে, তখন তাহাদের দুর্দ্দশার প্রায় চরম হইয়াছিল, কিন্তু আয়ুব খাঁর সৈন্যদলকে দেখিয়াই, তাহারা আবার নবোদ্যমে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, পরদিনই যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে আয়ুব খাঁর সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। কান্দাহার শত্রুহস্ত-মুক্ত ও আয়ুব খাঁর পরাভব হওয়ার পরই কাবুল-যুদ্ধের 'ইতি' হয়। তখন আবদর্ রহমন নীরবে কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই জয়লাভ করার পর রবার্টস্ বিশ্রামলাভাশয়ে স্বদেশে ফিরিয়া যান এবং তখন তিনি সবিশেষ সম্মানিত ও নানা উপাধি-ভূষিত হন।

অতঃপর ভারতে প্রত্যাগত হইলে, রবার্টস্ মান্দ্রাজের সৈন্যদলের কমাণ্ডার-ইন-চীফের পদলাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতের জঙ্গী-লাটের পদ পান, সাতবৎসরেরও অধিককাল তিনি ঐ পদে কার্য্য করেন। অনন্তর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম্মহইতে অবসর-গ্রহণ করেন। অবসর-লাভান্তে তিনি ব্যারণ রবার্টস্ অব কান্দাহার—এই উপাধি-লাভ করেন।

একষট্টি-বৎসর-বয়সে যখন তিনি পেন্সন লন, তখন লোকে স্বভাবতঃ মনে করিয়াছিল যে, রবার্টসের কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে, কিন্তু তখনও তাঁহার জীবনের অনেক গৌরবময় কর্ত্তব্য-সাধন করিতে বাকী ছিল। যৎকালে বুয়ার-সমর উপস্থিত হয়, তৎকালে রবার্টস্ আয়র্লণ্ডের কমাণ্ডার-ইন-চীফের কার্য্য করিতে-ছিলেন, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা বুয়ারদের কাছে পরাভূত হইলে, গবর্ণমেণ্ট লর্ড রবার্টস্‌কেই সেই আপৎনিবারণে সমর্থ ব্যক্তি মনে করিয়া আফ্রিকায় প্রেরণ করিলেন। লর্ড কিচেনারকে তাঁহার সহযোগী-স্বরূপে লইয়া এই প্রবীণ যোদ্ধা আফ্রিকায় গমন করিলেন। আফ্রিকায় পঁহুছিয়া তিনি সত্বরই বুয়ারদিগের সহিত রণ দিলেন। অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের মধ্য দিয়া গিয়া বুয়ারদিগকে পরাভূত করিলেন, এবং জেনেরল ক্রঞ্জীকে পারর্ডেবার্গে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। এই পরাজয়-লাভের পরহইতেই বুয়ার-সমরের স্রোতোগতির মুখ যেন ফিরিয়া গেল। অতঃপর বুয়ারেরা যদিও আরও দুই বৎসর যুঝিয়াছিল, তথাপি তখন কোন্ পক্ষের জয় হইবে, সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ ছিল না। লর্ড রবার্টস্ বিজয়গর্ব্বে প্রিটোরিয়ায় প্রবেশ করার পর ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া লর্ড উল্‌সিলির পরিবর্ত্তে কমাণ্ডার-ইন-চীফ হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রবার্টস্ কমাণ্ডার-ইন-চীফ হন এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ঐ পদটি বিলুপ্ত হয়, তখনপর্য্যন্ত ঐ পদে কর্ম্ম করেন।

অতঃপর প্রত্যেক সমর্থ ইংরাজকেই যাহাতে সৈনিক হইতে বাধ্য করা হয়, এই ব্যাপারে তিনি উদ্যোগ দেখাইতেছিলেন, ইহার জন্য তাঁহাকে অনেকের কাছে বিদ্রূপ-ভাজন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সমর ইংরাজ-জাতির চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, অভিজ্ঞ আর্ল রবার্টসের মতেই কার্য্য করা জাতির কর্ত্তব্য ছিল।

আর্ল রবার্টস্ ক্ষুদ্রকায় ছিলেন। তিনি সচরাচর খাকী পোষাক পরিতেন, একে তো খাকী পোষাকে জাঁক-জমকের লেশমাত্র নাই, তাহাতে আবার এই যোদ্ধৃপ্রবর তাঁহার প্রচুর-সম্মানচিহ্নগুলি পরিচ্ছদে শোভিত করিতেন না। এই দীর্ঘজীবী সামরিক কর্ম্মচারী কখন ধূমপান করিতেন না, সুরারও ব্যবহার তাঁহার অত্যল্পই ছিল, তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে মিতাচারী হইতে

আর্ল রবার্টস্

আর্ল রবার্টস্।

(বর্ত্তমান মহাসমরের যে সময়ে সূত্রপাত হয়, সেই সময়ে এই ছবিখানি তোলা হয়।)

উপদেশ দিতেন এবং তাঁহার সৈন্যদিগের মধ্যে কেহ অমিতাচারী হইলে, তাহার আর রক্ষা থাকিত না।

তাঁহাকে কেহ কখন শপথ করিতে শুনে নাই তিনি কখন ধর্ম্ম গায়ে মাখিয়া বেড়াইতেন না, কাহাকেও জোর করিয়া আপনার মতে মত দিতে বলিতেন না। কিন্তু সামরিক বিভাগে প্রবেশাবধি তিনি স্বয়ং প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় উপাসনা করিতে যাইতেন; তাহা দেখিয়া তাঁহার অধীন সেনানী ও সৈনিকেরা কি করিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা খুব ভাল ছিল, তাঁহার বিচার-নৈপুণ্য প্রায় অতিপ্রাকৃতিক ছিল। ভাল লোকেরা, তিনি স্বয়ং ভাললোক ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিত। দয়ার্দ্র লোকদিগের হৃদয়-বীণার সুর তাঁহার হৃদয়-বীণার সুরের সঙ্গে মিলিত। আবার কঠোর যাহারা, তাহারা সময়ে সময়ে তাঁহার ন্যায্য কঠোরতাও প্রত্যক্ষ করিত। একজন সৈনিককে তিনি এমন করিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন যে, লোকটী তাঁহার চিরানুগত হইয়া পড়েন এবং শেষে তাঁহারই জন্য প্রাণ দেন।

তাঁহার অধীন সৈন্যেরা তাঁহার জন্য সকলই করিতে সম্মত থাকিত—অধিকতর পথপর্য্যটন করিত, অধিকক্ষণ অনশনে থাকিত, তাম্বু, কম্বল, ইত্যাদি বিহীন হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতে সম্মত হইত, এবং অধিকতর সংখ্যায় প্রাণ দিত! ইতঃপূর্ব্বে মহাব্রিটনের সামরিক বিভাগে ওয়েলিংটন হয় তো আরও ছিলেন, কিন্তু রবার্টস্ আর একটিও ছিলেন না। তিনি ক্ষুদ্র সৈনিককে পর্য্যন্ত প্রত্যভিবাদন করিতে উপেক্ষা করিতেন না। অনেক সৈনিকের নাম জানিতেন, অনেকের বীরত্বের ইতিহাস তাঁহার চিত্ত-ফলকে ক্ষোদিত ছিল। তাঁহার সৈনিকদের এই ধারণা ছিল যে, "ববস্" (রবার্টসের সংক্ষিপ্ত "ডাক"-নাম) কখন ভুল করিতে পারেন না। তাঁহার যোগ্যতা-সম্বন্ধে তাঁহার অধীন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ভিন্নমত ছিল না। তিনি স্বয়ং এমন কি সামান্য সৈনিকের সঙ্গে আলাপ করিতে অপমান-বোধ করিতেন না। এদিকে আবার তিনি দুষ্টের যম ছিলেন। দুষ্টামী করিয়া কেহ তাঁহার চোক এড়াইতে পারিত না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এমনই বিস্ময়করী ছিল যে, চুম্বকে যেমন লৌহাকর্ষণ করে, তেমনই তিনি মনুষ্যহৃদয়গুলিকে চিরাকৃষ্ট করিয়া রাখিতেন।

"ববস্" চিরকর্ম্মিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন, একনাগাড়ে দশঘণ্টা বসিয়া পত্রাদি লিখিয়া, পরে আবশ্যক হইলে, ২৫।৩০ ক্রোশ ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিয়া আসিতে পারিতেন, তখন যে সমস্ত লেফ্‌টেন্যাণ্টের ঘোড়ায় চড়াই কর্ম্মহেতু অভ্যস্ত, তাহারাও তাঁহার কাছে হারি মানিত।

আর্ল রবার্টস্ বুধবার ১১ই নভেম্বর-তারিখে তাঁহার স্ত্রী ও জামাতা মেজর লিউইনকে লইয়া ফ্রান্সে যান। বৃহস্পতি ও শুক্রবারে তিনি বড় বড় ইংরাজ সেনানীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বর্ত্তমান সমরসম্বন্ধে আলোচনা করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রিয় ভারতীয় সৈন্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ অভিপ্রায়েই অত বৃদ্ধাবস্থায় বিদেশে যান। শুক্রবার একজন সামরিক কর্ম্মচারী যুদ্ধস্থলহইতে আসিয়া এই সংবাদ দিয়াছেন যে, বৃহস্পতিবারে ভারতীয় সৈন্যদিগকে পরিদর্শন করিবার সময় তিনি "ওভারকোট" পরিতে স্বীকৃত হন নাই। শুক্রবারেও তিনি যুদ্ধ দেখিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন, এবং, ভয়ানক বৃষ্টিপাত হইতে ও প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলেও, তিনি এক খোলা পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া যুদ্ধ দেখিতে থাকেন। সেখানহইতে ফিরিয়াই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন।

তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া বহু ভারতীয় সৈন্য অশ্রু-মোচন করিয়াছে। তাঁহাকে অনেকে ফ্রান্সে যাইতে মানা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে এই উত্তর দেন,—"আমার পুরাতন বন্ধুরা যে সময়ে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে, সে সময়ে আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।" ভারতই এই উদার-হৃদয় মহাবীরের জন্মভূমি, ভারতীয়দিগের প্রতি তাঁহার প্রীতিও অনুপম ছিল। অতএব তাঁহার লোকান্তর-গমনের সংবাদ পাইয়া অনেক ভারতবাসীর হৃদয়ে যে, বিষম ব্যথা লাগিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি?

শুক্রবার রাত্রিতে আহার করিবার সময়ে তিনি বলেন যে, তাঁহার একটু সর্দ্দিভাব হইয়াছে, এবং তাঁহার নাড়ীও গরম হয়। অনন্তর একজন চিকিৎসককে ডাকিয়া তাঁহার পরীক্ষা করান হয়, অন্য দুইজন চিকিৎসককেও পরামর্শ-দানের জন্য ডাকা হয়। আর্ল রবার্টস্ কোনপ্রকার অস্বস্তিবোধ না করিয়া ঘুমাইয়া পড়েন, সেই নিদ্রাই তাঁহার মহানিদ্রায় পরিণত হইয়াছে।

পাচিকার পুত্র

আখ্যায়িকা।

এক হাড়-পাঁজরা-সার রোগী বিছানার সহিত মিলাইয়া পড়িয়া আছে। বড় কষ্টে প্রশ্বাস ফেলিতেছে, প্রত্যেক প্রশ্বাসটি যেন তাহার বুক খালি করিয়া বাহির হইতেছে; কিন্তু রোগী বড় শান্ত, একটুও ছট্‌ফট্ করিতেছে না, চুপ করিয়া শুইয়া আছে। তাহার মুখখানিতে কেমন একটু আভা ফুটিয়া রহিয়াছে,

ঠোঁটে একটু হাসিও দেখা যাইতেছে। সে মাঝে মাঝে বড় আস্তে আস্তে জল চাহিতেছে, তাহার পাশে তাহার স্ত্রী বসিয়া আছে, সে তাহাকে ঝিনুকে করিয়া একটু একটু জল খাইতে দিতেছে, আর অন্য সময়ে তাহার চুলের মধ্যে আঙুল দিয়া চুল কুলাইয়া দিতেছে।

তখন ভোর হইতে আর অল্পই সময় বাকী আছে। আকাশের পূর্বদিকে একটু আলো ফুটিয়াছে, শুকতারার আলো ক্রমশঃ মিট্‌মিটে হইয়া পড়িতেছে, দুই-একটি পাখী বাসায় বসিয়া ডানা ঝট্‌পট্ করিতেছে, শিউলী-ফুলগুলি টুপ্‌টুপ্ করিয়া গাছের তলায় ঝরিয়া পড়িতেছে, আস্তে আস্তে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে ফুল ও পাতাগুলি নাড়া পাইয়া যেন, শিশির নয়, মুক্তা ছড়াইতেছে।

ক্রমে আরও একটু ফর্সা হইল। দুই-একটি করিয়া পাখী ডাকিতে আরম্ভ করিল। শুকতারা আকাশে মিলাইয়া গেল। পাড়ার বোসজা-মহাশয় গান গাইতে গাইতে নাহিতে চলিলেন। কতকগুলি মেয়ে সাজী হাতে করিয়া আসিয়া শিউলীতলা-হইতে শিউলী-ফুল কুড়াইতে লাগিল; তাহাদের কপালের চুলে নীহারের হার দুলিতে লাগিল।

রোগী চোক বুজিয়া ভক্তিভরে ঈশ্বরের নাম করিতেছিল; ক্রমশঃ কথা এড়াইয়া আসিতে লাগিল; তাই বুঝি চোক মেলিয়া চাহিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল,—'সুরো!'

তাহার স্ত্রীর নাম সুরবালা।

সু। এই যে, কেন, কি কষ্ট হচ্চে?

রো। চোকে আর ভাল দে'খ্‌তে পাচ্চি না, খোকা কোথায়? তা'কে একবার দে'খ্‌ব।

সুরবালা কষ্টে চোকের জল সাম্‌লাইয়া পাশের ঘরহইতে খোকাকে তুলিয়া আনিল। খোকা দেড়বছরের শিশু; একটু আগে ঘুমহইতে উঠিয়াছিল, মা আবার তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া মুখে মধু দিয়া চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছিল; এখন তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তুলিয়া আনিয়া বাপের চোকের সমুখে ধরিল। বাবা তাহার মুখে হাত বুলাইল, কপালে একটি চুমা দিল, তার পর বলিল, "যাও, নিয়ে যাও, শুইয়ে দাও।"

সুরবালা তাহাই করিল। তাহাকে শোওয়াইয়া আসিয়া আবার স্বামীর কাছে বসিল। স্বামী তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিল, কিছু যেন বলিতে চাহিতে-ছিল, কিন্তু পারিল না, তাহার তখন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে চোকের তারাদুইটি উল্‌টিয়া গেল। সুরবালা তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। গায়ে হাত দিল,—ঠাণ্ডা যেন হিম! বুকে হাত দিল,—বুকের ধুক্‌ধুকানী একটু পরেই একেবারে থামিয়া গেল। সুরবালা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে জানে না। স্বামীর বুকের উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

খোকা পাশের ঘরে শুইয়া আছে—সে "দেওলা" দেখিয়া হাসিতেছে—সে তাহার মায়ের ও তাহার কি সর্ব্বনাশ হইল, তাহার কিছুই বুঝিল না।

সে যে ঘরে শুইয়া আছে, সেই ঘরের জানালার পাশে একটী "কয়েদবেলের" গাছ, সেই গাছের পাতার ফাঁক দিয়া সূর্য্যের আলো আসিয়া তাহার মুখখানি আরও হাসিভরা করিয়া তুলিল।

এই যে লোকটি স্ত্রী-ছেলেকে 'পথে বসাইয়া' এই দুঃখের সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেল, ইহার নাম যোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগেশ্বর দরিদ্রের সন্তান। অতি কষ্টে কিছু লেখাপড়া শিখিয়া-ছিল। প্রথম-বার্ষিক-শ্রেণী-পর্য্যন্ত পড়িয়া টাকার অভাবে লেখা-পড়া ছাড়িয়া দেয়; শেষে স্বগ্রামে, দুর্গাহাটায়, মাইনর-স্কুলের প্রধান-শিক্ষক হয়। তখন তাহার পিতার কাল হইয়াছিল, কেবল বিধবা মা বর্ত্তমান ছিলেন। ছেলের আঠারো-টাকা মাহিয়ানার চাকুরী হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার আহ্লাদ আর ধরে না, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। ছেলে নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া বিবাহ করিতে বড়ই নারাজ ছিল; এবং, বোধ হয়, বেশী টাকা মাহিয়ানা না হইলে, বিবাহ করিতও না; কিন্তু একে মায়ের কান্নাকাটি, তাহার উপর আবার একদিন একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক আসিয়া তাহার হাতে পৈতা জড়াইয়া বড়ই অনুনয়-বিনয় করিতে, বড়ই কাঁদিতে লাগিল।

বেচারা আর "না" বলিতে পারিল না, অগত্যা বিবাহ করিতে বাধ্য হইল।

সুরবালার গায়ের রং তেমন ধবধবে ফর্সা নয়, তবে মুখ-চোক, গড়ন-পিটন চমৎকার! কিন্তু শরীরের সৌন্দর্য্যের চেয়ে তাহার মনের সৌন্দর্য্য আরও ভাল। সে আস্তে আস্তে কথা কয়, আস্তে আস্তে হাঁটে, রাগ তাহার শরীরে নাই, বলিলেই হয়, কথা খুব কম কয়; যখন তাহার বিবাহ হয়, তখনই তাহার বয়স প্রায় চৌদ্দ, তখনই সে বড় গম্ভীরা ছিল। ঘরের এমন কোন কাজ নাই, যাহা সে জানে না; খাটিতে সে একটুও পিছ্‌পাও নয়, তবে সে একটু কাহিল, তাই, ইচ্ছা করিলেও, সকল কাজ তাড়া-তাড়ি সারিতে পারে না। তাহার স্বামীর তাহার উপর এমন শ্রদ্ধা ছিল যে, সে কখনও তাহাকে একটিও উঁচু কথা বলে নাই। তাহার বুদ্ধিশুদ্ধিও বেশ ভাল ছিল, তাই তাহার স্বামী সর্ব্বদাই তাহার পরামর্শ লইয়া সকল কাজ করিত; কিন্তু সে এমনই ছিল যে, তাহার স্বামী পরামর্শ না চাহিলে, সে নিজে উপরপড়া হইয়া কখন তাহাকে পরামর্শ দিতে যাইত না।

ছেলে হইবে না, ছেলে হইবে না, বাঁঝা বউ এই বলিতে বলিতে সুরবালার বয়স যখন তেইশবৎসর, তখন তাহার একটী খোকা হইল।

খোকার বয়স এখন, আগেই বলিয়াছি, দেড়বৎসর; সে বাপের মত ফর্সা আর দোহারা, আর মায়ের মত সুশ্রী। বিধাতা যেন

তাহার বাপমায়ের ভাল উপাদানগুলি লইয়া তাহাকে গড়িয়াছেন। খোকার নাম প্রবোধকুমার। প্রবোধ বড় শান্ত, বড় গম্ভীর শিশু। আপন মনে খেলা করে, কাঁদিতে যেন জানেই না। তাহার মায়ের গুণেও বোধ হয়, সে অত শান্ত হইয়াছে, সুরবালার আগে আর কোন সন্তান না হইলেও, সে বড় যত্ন, বড় বুদ্ধি করিয়া ছেলেটিকে মানুষ করিতেছে।

যে বৎসর খোকা হয়, সেই বৎসরই তাহার ঠাকুর-মা মারা পড়েন। ছিল সংসারে খোকা, খোকার মা আর খোকার বাপ। আজ খোকার বাপও খোকার মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল। সুরবালা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়ে খোকার ঘুম ভাঙিল। সে দুই-তিনবার মা, মা করিয়া ডাকিল, উত্তর পাইল না। তখন আস্তে আস্তে বিছানাহইতে নামিয়া মার কাছে আসিল। কি হইয়াছে, সে তাহার কি বুঝে? আসিয়া আরও দুই-একবার মা, বাবা বলিয়া ডাকিল, উত্তর পাইল না। তখন সেও পিতা ও মাতার মধ্যে গিয়া শুইয়া আপন মনে কত কি বকিতে লাগিল!

২

একে ত বিধবার দুঃখ বুঝাইয়া বলিবার মত স্পষ্ট ভাষা জগতে নাই, তায় তোমরা তরুণমতি বালক-বালিকা, তোমাদের প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে আমি সে দুঃখের ছায়াপাত করিতে চাই না। মোটের উপর এইটুকু জানিয়া রাখিও যে, বিধবার মত দুঃখিনী জগতে আর নাই, সুতরাং জীবনে কোন বিধবাকে কখন মনোকষ্ট দিও না।

তবে বিধবাও জীবনে একটু সান্ত্বনা পান, যদি তাঁহার একটী ছেলে কি মেয়ে থাকে। সুরবালার জীবনে সে সান্ত্বনা ছিল, কেননা খোকা তাঁহার মলিন মুখে হাসি ফুটাইত, বাপ-মরা ছেলের মাকে ছেলের মা ও বাপ দুই-ই হইতে হয়, সুতরাং খোকার ভাবনা সুরবালাকে এত ভাবিতে হইত যে, তিনি যে স্বামীহীনা, একথা অনেক সময়ে তাঁহার ভাবিবার অবসর থাকিত না। খোকাকে খাওয়ান, খোকাকে নাওহান, খোকাকে ঘুম-পাড়ান, খোকাকে খেলা-দেওয়া, খোকার উপর সকল সময়েই নজর রাখা চাই-ই চাই, তাই সুরবালার শোকপ্রকাশের অবকাশ ছিল না।

সুখীর দিন যায়, দুঃখীরও দিন যায়; "দিন যায়, রয় না"। সুরবালারও দিন যাইতে লাগিল। খোকা দিন দিন বড় হইতে লাগিল, ছটফটিয়া হইতে লাগিল, দুরন্ত হইতে লাগিল। তবে তাহার এক গুণ ছিল, বয়োধর্ম্মে সে ছটফট্ করিত, কিন্তু স্বভাবতঃ সে অন্য শিশুর চেয়ে শান্ত ছিল, আর সে মায়ের বড় বাধ্য ছিল। মা যদি বলিলেন, "খোকা, ওটা করে না, ছি ছি অমন ক'র্‌তে নাই," অমনি খোকাও বলিত, "তি তি ত'র্‌তে নাই;" এবং ভুলিয়া না গেলে, আর সে কখন সে কাজ করিত না। তাহার মাও তাহাকে বড় মৃদুভাবে শাসন করিতেন, কখনও গায়ে হাত তুলিতেন না, নিজে মৃদু ব্যবহার করিয়া তাহাকে মৃদু হইতে শিখাইতেন।

এইরূপে খোকা পাঁচবছরের হইল। তখন তাহার হাতে-খড়ি হইল—সুরবালাই হাতে-খড়ি দিলেন, তিনিই তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন। খোকা বড় মেধাবী, মা বড় সহিষ্ণু, একাগ্রচিত্তা। খোকা শীঘ্র শীঘ্র "বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ" সায় করিয়া "কথামালা" পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাছাড়া সুরবালা তাহাকে কত ছড়া, দুই-চারিটি সহজ সহজ ঈশ্বর-বিষয়ক গানও শিখাইল। সন্ধ্যাবেলা মায়ে বেটায় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ছড়া আওড়াইত, আস্তে আস্তে গান গাহিত। সুরবালা যখন বলিতেন—

"আয়, আয়, চাঁদ আয়, আয়, আয়, আ রে।
মণির কপালে মোর চিক্ দিয়ে যা রে॥"

তখন প্রবোধ স্থির দৃষ্টিতে চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি এক সুখের আবেশে চোক বুজিয়া ফেলিত! সুরবালা আবার প্রবোধকে কত তারা দেখাইতেন। মায়ে বেটাতে অগুন্তি তারা গুণিতে লাগিয়া যাইত। তারা দেখাইতে দেখাইতে সুরবালা বালকের কোমল মনে দুই-একটি ঐশ্বরিক ভাব ফুটাইবার চেষ্টা পাইত। যাহার মা তাহাকে ছেলেবেলায় ঈশ্বরের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, সে ছেলে বড় সহজে ঈশ্বরকে ভুলে না—উত্তরকালে সে ছেলে কখনও পাষণ্ড হয় না।

যাহা হউক, প্রবোধ ক্রমে দশবছরের ছেলে হইল—সে মাইনর-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইল। তাহাদের স্বগ্রামে এণ্ট্রান্স স্কুল তখন ছিল না; যদি সে আরও পড়িতে চায়, তবে তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে; কিন্তু কলিকাতায় যাইবার পয়সা কোথায়? সেথায় সে কাহার কাছেই বা থাকিবে? মায়ের সুখ ও সম্পদ্—প্রবোধ। সুরবালা বড় ভাবিতে লাগিলেন—কি করিবেন?

কচি ছেলেকে কলিকাতায় একা পাঠান যায় না, ছেলেই এখন সুরবালার সর্ব্বস্ব—নয়নের মণি, অন্ধের যষ্টি। ছেলেকে চোকের আড়াল করিয়া তিনিই বা কি করিয়া জীবন-ধারণ করিবেন? কিন্তু ছেলের উন্নতির পথে বাধা দেওয়া মায়ের কর্ত্তব্য নহে। সুরবালা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন—কোনই উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

এই গ্রামের একটী স্ত্রীলোক কলিকাতায় ঝীএর কাজ করিত; সে সম্প্রতি বাড়ী আসিয়াছে। সুরবালা যখন ভাবনা-সাগরে ভাসমানা, তখন সে একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল। সুরবালা সেই অবকাশে তাহাকে তাঁহাদের উপস্থিত সমস্যার কথা বলিয়া পরামর্শ চাহিলেন। আহ্লাদী (ঝী) অনেকক্ষণ ভাবিল, শেষে বলিল,—"বামুন-দিদি, এক কাজ যদি ক'র্‌তে পার, তা' হ'লে আমি তোমাদের ক'ল্‌কেতায় নিয়ে যাই। কিছু মনে ক'র না, তোমায় সে কথা ব'ল্‌তে আমার প্রাণ চাইচে না, কিন্তু আর তো কোন রাহা দেকি নে। দেখ, আমি যখন ছুটী নিয়ে বাড়ী আসি, তখন মা-ঠাক্‌রোণ ব'লে দি'ছিলেন, 'আহ্লাদী বাড়ী যাচ্ছিস্, একজন রাঁধবার লোক যদি দে'খে শু'নে আ'ন্‌তে পারিস্, তো দেখিস্।'

তা' তুমি যদি যাও তো নিয়ে যাই। আমার মুনিবেরা লোক ভাল; খিচ্ খিচ্, ঝিক্ ঝিক্ করে না। চাকর ব'লে কাউকে অগ্‌গেরাহ্যিও ক'রে না। হাত দরাজ। দিতে থুতে রাকাড়ে না। খাৱা মাইনে দেয়। তা'দের যা'কে বলে, ধনে পুতে নক্ষীলাভ, তাই। বিয়েটা-আসটাতে উপরি পাওনা-থোওনাও বেশ হয়। তুমি যদি যাও, তিনটাকা মাইনে আর বছরে চারখানা কাপড় আর দু'খানা গামছা পা'বে। ফি দোয়াদশীতে একআনা ক'রে পয়সা পা'বে। যা'বে?" সুরবালা যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। বলিলেন, "হাঁ' যা'ব।" ছেলের জন্য তিনি সকলই সহিতে—সকলই বহিতে পারেন। ছেলেকে যদি তিনি উচিতমতে পালন করিতে পারেন, তাহা হইলে ছেলেই তাঁহার দুঃখ ঘুচাইবে।

তাহার পর আহ্লাদীর সহিত সুরবালার বিস্তর পরামর্শ হইল। শেষে আহ্লাদী, সুরবালা ও প্রবোধ একদিন লুকাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ।)

স্ফটিক-স্বপ্ন।

স্ফটিক-স্বপ্ন! সে আবার কি? নামটা তোমরা জান না বটে, কিন্তু জিনিসটা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। মফঃস্বলে কোন মেলায় গেলে, জিনিসটি মনোহারীর কাছে দেখিতে পাওয়া যায়, কলিকাতায় পূজার দিনে মুসলমান-রমণীদিগকে উহা পথের ধারে
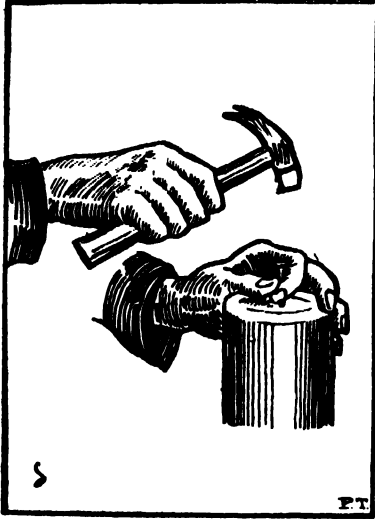
বসিয়া বিক্রয় করিতে দেখা যায়। সেই যে গো, একটা মার্বেল-কাগজ-মোড়া চোঙ্, যাহার দুই মুখে কাচ লাগান আছে, এবং যাহার একমুখে চোখ লাগাইয়া চোঙটা ঘুরাইতে থাকিলে, তাহার মধ্যে কত কি বিচিত্র ও উজ্জ্বল লতা-পাতা-ফুল দেখা যায়—সেই চোঙেরই আমি নাম দিয়াছি,—স্ফটিক-স্বপ্ন; মন্দ নাম দিয়াছি কি? এই খেলানাটি সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়—বোধ হয়, সব দেশেরই বালক-বালিকারা কোন-না-কোন সময়ে এই খেলানাটি চোকে লাগাইয়া স্ফটিক-স্বপ্ন দেখিয়াছে, দেখিয়া তোমাদেরই মত বিস্ময় ও বিমল আনন্দ-অনুভব করিয়াছে। ইহার ইংরাজী নাম "ক্যালাইডোস্কোপ"। উহা একটা বড় কথা, তোমরা, বোধ হয়, সহজে উচ্চারণ করিতে পারিবে না। ঐ শব্দটি গ্রীকভাষাহইতে ইংরাজী ভাষায় আসিয়াছে, ঐ শব্দটির অর্থ, সুন্দর আকৃতি-প্রদর্শন যন্ত্র। সময়ে সময়ে লোকে খুব বড় স্ফটিক-স্বপ্ন-নির্ম্মাণ করে। তোমাদের ঘরে যদি তিনখানি খুব বড় আয়না থাকে, তাহা হইলে তোমরাও খুব বড় স্ফটিক-স্বপ্ন-নির্ম্মাণ করিতে পারিবে। যদি তোমরা ঐ তিনখানি আয়না-দিয়া একটি ত্রিভুজ প্রস্তুত কর, আর সেই ত্রিভুজ-আয়নায় তোমাদের প্রতিবিম্ব-পাত কর, তাহা হইলে, দেখিবে, একটি বালক সেই আয়নায় "অগুন্তি" হইয়া উঠিয়াছে! তখন সেই বালক কেবল যে, তাহারই প্রতিবিম্ব সেই আয়নায় দেখিবে, তাহা নহে, সে দেখিবে, তাহার সেই প্রতিবিম্বগুলির আবার কত প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তখন সেই বালক যদি তাহার হাতে একখানি রুমাল লইয়া নাড়ায়, তাহা হইলে দেখিবে, শত শত রুমাল নড়িতেছে। বালকটির মাথার উপরে যদি সেই সময়ে একটি বাতি জ্বলিতে থাকে, এবং আয়না-তিনখানি যদি উপরের দিকে একটু টলান থাকে, তাহা হইলে আরও চমৎকার ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইবে।
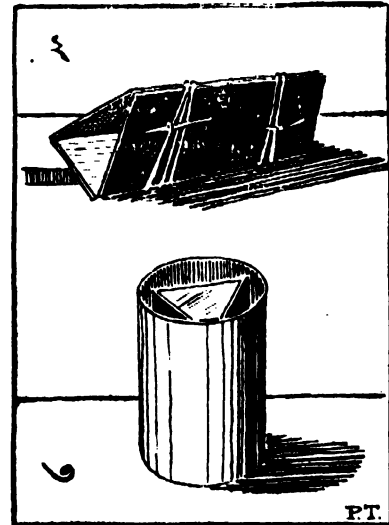
কিন্তু তোমাদের সকলেরই বাড়ীতে হয় তো বড় আয়না নাই, যদিও বা থাকে, তবু আয়না-তিনখানি ত্রিভুজের আকার করা

হয় তো তোমাদের সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না; সুতরাং, এস, আমরা এমন একটি স্ফটিক-স্বপ্ন-নির্ম্মাণ করি, যাহা আমরা, ইচ্ছা করিলে, জামার পকেটে রাখিতে পারিব।

প্রথমে আমাদের একটি না খুব ফাঁদালো না খুব সরু এক-বিঘতটাক লম্বা টিনের কৌটার যোগাড় করিতে হইবে। কৌটাটির
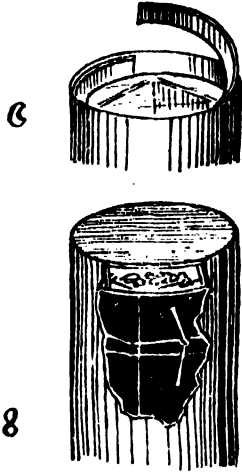
যোগাড় হইলে, তাহার তলার ঠিক মাঝখানে একটা তীক্ষ্মমুখ প্রেকদিয়া একটি ছেঁদা করিতে হইবে। ঐ প্রেকদিয়া যে ছেঁদাটি হইবে, তাহা তত বড় হইবে না, সুতরাং আর একটা তীক্ষ্মমুখ কিছু-দিয়া ছেঁদাটিকে বড় করিতে হইবে, একটু সূচালো "ছেনি" হইলেই, ভাল হয়, কিন্তু তাহা যদি না পাওয়া যায়, তবু ছেঁদাটীকে বড় করা তোমাদের পক্ষে হয় তো কষ্টকর হইবে না। এইবার তোমাদের তিনটুক্‌রা-কাচের যোগাড় করিতে হইবে, ঐ কাচ-তিনখানি যেন লম্বায় কৌটাটীর চেয়ে আধ-ইঞ্চি করিয়া ছোট হয়। আবার ঐ কাচ-তিনখানি এমন চৌড়া হওয়া চাই, যেন উহাদের ত্রিভুজের আকার করিয়া বাঁধিলে, ত্রিভুজের তিন কোণ কৌটার টিনে গিয়া ঠেকে, আর কৌটার ভিতরে অধিক স্থান খালি না থাকে। যদি তোমরা তিনটুক্‌রা আর্সি-ভাঙার যোগাড় করিতে পার, তাহা হইলেই সবচেয়ে ভাল হইবে। যদি তাহার যোগাড় না করিতে পার, তবে সাদা কাচের ত্রিভুজ তৈয়ার করিয়া তাহার পিছনে কালো কাগজ সাঁটিয়া দিও। যদি মোটেই কাচ-যোগাড় না করিতে পার, তাহা হইলে তিনটুক্‌রা টিন হইলেও কাজ চলিবে; কিন্তু আমি ধরিয়া লইতেছি, তোমরা তিনটুক্‌রা কাচেরই যোগাড় করিতে পারিবে, এবং সেই কাচত্রয়-দ্বারা নির্ম্মিত ত্রিভুজে কালো কাগজ সাঁটিয়া লইবে।

ঠিক মাপসই তিনটুক্‌রা কাচের কি করিয়া যোগাড় করা যায়? প্রথমে তিনটুক্‌রা "পিচ্‌বোর্ড" কাটিয়া ত্রিভুজ তৈয়ার করিয়া তাহা টিনের কৌটার মধ্যে ঠিক ঢুকে কি না, তাহা দেখিয়া লইবে, যতক্ষণ না ঢুকে, ততক্ষণ পিচ্‌বোর্ড-তিনখানি মাপসহি করিয়া কাটিবার চেষ্টা করিবে। বলা বাহুল্য, প্রথমে পিচ্‌বোর্ড-তিনখানিকে ঠিক এক মাপেরই করিয়া কাটিয়া লইবে। তাহার পর, ঐ পিচ্‌বোর্ড-তিনখানির মাপে তিনখানি কাচ কিনিয়া বা যোগাড় করিয়া লইবে। কাচ-তিনখানিকে কৌটার মধ্যে ঢুকাইবার আগে তাহাদের ত্রিভুজের আকারে স্থাপিত করিয়া সুতা-দিয়া বাঁধিয়া লইবে কিম্বা দুইটুক্‌রা কাগজ ফিতার আকারে কাঁচি-দিয়া কাটিয়া আটা-দিয়া আড়বাগে কাচ-ত্রিভুজ বেড়িয়া সাঁটিয়া দিবে। তাহার পর সেই কাচ-ত্রিভুজটি কৌটার মধ্যে স্থাপিত করিবে। কাচ-তিনখানি যদি দৈর্ঘ্যে কৌটার অপেক্ষা আধ-ইঞ্চি করিয়া কম হয়, তাহা হইলে কাচ-ত্রিভুজ কৌটার মধ্যে প্রবেশিত হইলে, কৌটার উপরের দিকে আধ-ইঞ্চি জায়গা ফাঁক থাকিবে। এখন তোমাদের একটি কাচের চাকৃতির যোগাড় করিতে হইবে, চাকৃতিখানির পরিধি এমন হওয়া চাই, যেন তাহা কৌটার মধ্যে ঢুকিয়া ত্রিভুজের মাথায় "ফিট্" হইয়া আট্‌কাইয়া যায়। এই কাচের চাকৃতিখানি পরিষ্কার সাধারণ কাচের হওয়া চাই, এবং ইহার পিছনে কালো কাগজ সাঁটিবার প্রয়োজন নাই। এইবার একটুক্‌রা পিচ্‌বোর্ড ফিতার মত সরু করিয়া কাটিয়া চক্রাকারে চাকৃতির উপরে আঁটিয়া বসাইয়া দাও, যেন চাকৃতিখানি কৌটার বাহির হইয়া পড়িবার যো না থাকে। পিচ্‌বোর্ডখানি এমন পুরু হওয়া চাই, যেন চাকৃতিখানি উহার বৃত্তের ভিতর দিয়া গলিয়া না পড়িয়া যায়, আবার উহার ফিতার ওসার এমন করিতে হইবে যে, আর একখানি কাচের চাকৃতিও কৌটার ভিতরে উহার উপরে
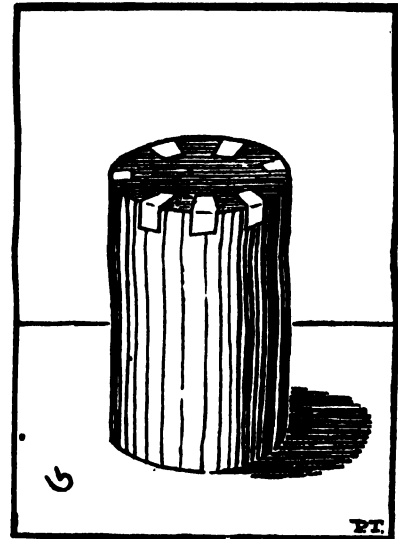
বসাইলে, কৌটার অভ্যন্তরস্থ তাবৎ বস্তুর সমষ্টি ঠিক কৌটার কানায় আসিয়া ঠেকে। দ্বিতীয় কাচের চাকৃতিখানি ঘসা কাচের হওয়া চাই। কাচ-বিক্রেতাদের কাছে এই কাচ পাওয়া যাইবে; অনেক বাড়ীর সার্সিতেও এইরকম কাচ লাগান আছে, খুঁজিলে তাহা সার্সির টুক্‌রা মিলিতে পারে।

দ্বিতীয় কাচখানি কৌটার মধ্যে বসাইবার পূর্ব্বে ছোট ছোট

কয়েক টুক্‌রা রঙ্গীন কাচ বা পুঁথি প্রথম কাচের চাকৃতির উপরে রাখিয়া দ্বিতীয় কাচের চাকৃতিখানি বসাইয়া দিতে হইবে। এখন, দ্বিতীয় কাচের চাকৃতিখানিকে টিনের কৌটার মধ্যে এমন করিয়া আট্‌কাইয়া দিতে হইবে যে, কৌটা উল্‌টাইলে, তাহা না খুলিয়া পড়িয়া যায়। দ্বিতীয় কাচখানি বসাইয়া যদি কৌটার উপরে তবুও একটু টিন বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা মুড়িয়া দিলে, দ্বিতীয় কাচটার পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না; অন্যথা, এইরূপ করিলেও চলিবে—কয়েক টুক্‌রা কাগজের সরু সরু ফিতা কাঁচি-দিয়া কাট, সেই ফিতায় আঠা লাগাইয়া প্রত্যেক ফিতার একমুখ কাচের দ্বিতীয় চাকৃতিতে আর একমুখ বাহিরে কৌটার টিনের গায়ে সাঁটিয়া দাও, কিন্তু ঐ কাগজের ফিতাগুলির যে মুখগুলি কাচের চাকৃতিতে সাঁটিবে, সেগুলির দ্বারা যেন অভ্যন্তরস্থ ত্রিভুজ আচ্ছন্ন না হয়।

অতঃপর টিনের কৌটার বহির্ভাগে মার্বেল-কাগজ সাঁটিয়া দিবে, তাহা হইলেই স্ফটিক-স্বপ্ন-নির্ম্মাণ-কার্য্য-শেষ হইবে।

কালোয়াৎ।

আখ্যায়িকা।

গ্রীষ্মকাল। প্রায় বেলা দুই-প্রহরের সময়ে কতকগুলি ছোট ছোট পাখী ভবানীপুর লণ্ডন মিশন কলেজ-বাটীর গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে কিচিরমিচির, চ্যাচোঁ-শব্দ করিতেছে। খোট্টা ধোবাদের পঞ্চায়েৎ বসিলে, যেমন গোলমাল হয়, তেমনি গোলমাল হইতেছে, পরস্পর ঠেলাঠেলি, ঠোক্‌রাঠুক্‌রিও চলিতেছে। এই পাখীকে আমরা বলি চড়ুই-পাখী, কিন্তু লিখি, চটক-পক্ষী। স্কুলের বড় ঘড়িতে যেই টুং টাং করিয়া ১২টা বাজিল, গোলমাল একটু থামিল, পাখীগুলিও একটু হটিয়া, সরিয়া দাঁড়াইল। তখন এই গণ্ডগোলের কারণ টের পাওয়া গেল; আজ একটী চটকী স্বয়ম্বরা হইবে। বিস্তর যুবক চটক আসিয়া এই যুবতীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এক এক যুবক আর সকলকে ঠেলিয়া কাছে গিয়া বলিতেছে, আমাকে বরমাল্য-দান কর, কিন্তু যুবতী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, ডানা নাড়িয়া ও সুগোল গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া বলিতেছে, দূর হও; আমি তোমায় চাই না। এই পক্ষী যুবকদের প্রণয়-সম্ভাষণের প্রণালী "ভদ্রোচিত" নহে; কেহ গিয়া যুবতীকে ঠোক্‌রাইতেছে, কেহ বা তাহার সম্মুখে গিয়া মুখ-ব্যাদান করিয়া চীৎকার করিতেছে; কিন্তু দেখিলাম, কেহই গুরুতর আঘাত করিতেছে না। পক্ষীযুবতী সগৌরবে কেবল "না" বলিতেছে, তাহার মুখে বাজে কথা নাই; পাখীগুলি কিন্তু জ্বালাতনের একশেষ করিয়া তুলিয়াছে, তাই পক্ষীযুবতীর বড়ই রাগ হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্ট জানা গেল যে, চটক-যুবকেরা চটকীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, আরও জানা গেল যে, সে ইহাদের কাহাকেও বরমাল্য দিতে রাজি নহে। যেটা ভাব করিতে কাছে আইসে, সে সেইটাকে ঠোক্‌রাইয়া তাড়াইয়া দেয়। প্রণয়ার্থী যুবকেরা ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া যেই একটু সরিয়া গেল, চটকী অমনি উড়িয়া জলটুঙি-বাগানে গিয়া, গোল ঘরের কার্ণিষের উপর বসিল।

২

একটা চটক সবে যৌবনের এলাকায় পা দিয়াছে—তাহার গ্রীবায় কৃষ্ণবর্ণ পালকগুলি বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে—গোঁফ দেখা দিলে, অনেক যুবক যেমন ধরাকে সরাখানার মতন জ্ঞান করে, ইহারও সেই ভাব। এই চটক জল-টুঙির এক ফোঁকরের ভিতর পাখীর বাসা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অনেক বিষয়ে এই চটকের ভাব-গতিক, ধরণ-ধারণ একরকমের। বাসা-নির্ম্মাণের জন্য সে যে সকল মাল-মস্‌লা-সংগ্রহ করিল, সে সকলই ছোট ছোট কঞ্চি, নানাগাছের শুষ্ক ছোট ছোট ডালপালা, ইত্যাদি। নিকটস্থ বাঁশ-বন ও আমবাগানহইতে সে বহু যত্নে এ সকলের সংগ্রহ করিয়াছে। সে বাসা-নির্ম্মাণ-কার্য্যে সদাই ব্যস্ত; কিন্তু সকালবেলা কাজ বন্ধ রাখিয়া, জল-টুঙির কার্ণিষের এক ধারে বসিয়া মধুর গান ধরে। সুর ঠিক শ্যামা-পাখীর সুর, কিন্তু গলা চড়ুই-পাখীর।

পুং-চড়ুই-পাখীকে তো একা বাসা-নির্ম্মাণ করিতে—বিশেষ শালিকের বাসার মত অত বড় বাসা-নির্ম্মাণ করিতে আমি কখনও দেখি নাই। তবে কি না, এ চড়ুইটা, আগেই ত বলিয়াছি, অনেক বিষয়ে একরকমের পাখী। ছয়-সাত-দিনে বাসাটা এক-রকম তৈয়ার হইয়া আসিল। ফোঁকরটা কুটা-কাটায় প্রায় ভরিয়া গেল। হাতে কাজ না থাকাতে সে ছাদে কার্ণিষের এক ধারে বসিয়া সদাই শ্যামা-পাখীর ডাক ডাকে। আবার কখনও কখনও সেতারের গৎ ভাঁজে। কালীঘাটের ফেরত যাত্রীরা পুষ্করিণীর মাছের তামাসা দেখিতে আইসে, তাহারা পাখীর গান শুনিয়া প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া যায়; আর ভাবে, চড়ুই-পাখী শ্যামা-পাখীর বুলি বলিতে ও সেতারের গৎ ভাঁজিতে শিখিল কেমন করিয়া? তাহারা ভাবিল, কলিকাতা আজব-সহর, এখানে সকলই সম্ভব। একদিন দৈবাৎ মঙ্গলু-ওস্তাগর-নামক দরজির সঙ্গে দেখা এবং কথা না হইলে, আমরাও হয় তো এই চটক-পক্ষীকে চটক-পক্ষীর দেহধারী অভিশপ্ত শ্যামা-পাখী বলিয়া মনে করিতাম।

জলটুঙি-বাগানের দক্ষিণদিকের কোণে রাস্তার ধারে একটা গোল ঘর আছে। এই ঘরে মঙ্গলু-খলিফার দরজির দোকান। মঙ্গলু এইখানে বসিয়া বাবুদের জামা, চাপ্‌কান ইত্যাদি সেলাই করে। সন্ধ্যার পরে চোখে ভাল দেখিতে পায় না বলিয়া বসিয়া বসিয়া সেতার বাজায়। দরজার একপাশে কাপড়-ঢাকা একটী

ডবল পিঁজারা আছে। তাহাতে দুইটী শ্যামা-পাখী। একদিন হঠাৎ খাঁচাটা নীচে পড়িয়া যাওয়াতে একটা পাখীকে বড় লাগিল। দুই-তিন-দিন পরে পাখীটা মরিয়া গেল। মঙ্গলুর মনে বড় দুঃখ হইল।

একদিন সকালবেলা দোকান খুলিতে খুলিতে খলিফা দেখিল, চৌধুরীদের দালানের ফোঁকরহইতে চড়ুই-পাখীর একটা বাসা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে একটা ছোট বাচ্ছা, সবে চক্ষু ফুটিয়াছে। মঙ্গলু যত্ন করিয়া বাচ্ছাটী আনিল, খাঁচার খালি কুঠরীতে রাখিয়া দিল।

এই খাঁচায় ছোটটীহইতে চড়ুই-পক্ষীর ছানা বড়টী হইল। শ্যামার কাছে থাকিয়া শ্যামার মত ডাকিতে ও শিশ্ দিতে শিখিল। আবার শ্যামাকে সেতারের গৎ আওড়াইতে শুনিয়া নিজেও গৎ আওড়াইতে লাগিল। অনেক বাঙ্গালী বালক ইংরেজি স্কুলে ইংরেজি ও লাটিন শিখে, কিন্তু বাঙ্গলা ভাল বলিতে পারে না—"আমি যাবে, তুমি খাব"-রকমের বাঙ্গলা বলে। এই চড়ুই-পাখীরও তাই হইল। সে মাতৃভাষা একটু আধটু বলে বটে, কিন্তু ঐ "আমি যাবে, তুমি খাব"-রকমের। কিন্তু কোন শ্যামা-পাখীই উহার মত শিশ্ দিতে পারে না। গলা বড়ই দরাজ, পরিস্কার; কিন্তু ঠিক শ্যামার গলা নহে; একটু চটকী ভাবের। তানসেন (বলিতে ভুলিয়াছি, মঙ্গলু-ওস্তাগর ইহার নাম রাখিয়াছে—তানসেন) শিশ্ ধরিলে, মঙ্গলুর দোকানের সম্মুখে লোক দাঁড়াইয়া যায়; আর খাঁচায় অন্য খোপে যে শ্যামা আছে, সে লজ্জায় নীরব থাকে। এই শ্যামার কাছেই তানসেন শিশ্ দিতে, ও সেতারের গৎ ভাঁজিতে শিখিয়াছে—ফলে তানসেনের বিদ্যা "গুরুমারা"।

সন্ধ্যার পরে মঙ্গলু চোখে ভাল দেখিতে পায় না, তাই সেলাই বন্ধ করিয়া বসিয়া বসিয়া সেতার বাজায়। তখন পাশের পাঁচকড়ি-টিনওয়ালা দোকান বন্ধ করিয়া আইসে এবং মঙ্গলুর কাছে বসিয়া বাঁয়ায় তাল দিতে থাকে। এই সময়ে তানসেনের বড়ই স্ফূর্ত্তি। সেও যথাসাধ্য টুং টাং টিং টিং করিয়া গৎ ভাঁজিতে লাগিয়া যায়। দোকানের সম্মুখে বিস্তর লোক দাঁড়াইয়া শুনে।

কুড়ানী শ্যামা-পাখীটাকে বড়ই জ্বালাতন করে। শ্যামা গান ধরিলে, তানসেন এত চেঁচাইয়া শ্যামাকে নকল করিতে থাকে যে, শ্যামা অবশেষে চুপ করিয়া থাকে। ফলে তানসেনের জ্বালায় শ্যামার মুখ খুলিবার জো নাই। অথচ এই শ্যামার কাছেই তানসেনের এ সকল শিক্ষালাভ হইয়াছে—তাই বলি, তানসেনের বিদ্যা গুরুমারা।

একদিন দম্‌কা বাতাসে খাঁচাটা রাস্তায় পড়িয়া গেল, একটা গরু খাঁচাটাকে শিংএ করিয়া তুলিয়া মাথা নাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল। মঙ্গলু তাড়াতাড়ি গিয়া দেখে, তাহার সাধের শ্যামা মরিয়া গিয়াছে, আর তানসেন পলাইয়াছে। সে চৌধুরীদের বাড়ীর কার্ণিসে বসিয়া কিচির-মিচির করিয়া মঙ্গলুকে যেন বলিল, এই যে আমি এখানে, মরি নাই।

এই-অবধি তানসেন স্বাধীন। জলটুঙির বাগানে, বলরাম বসুর পাড়ায়, এবং লাট-পাদ্রির গির্জ্জার হাতায় বেড়াইয়া বেড়ায়, আর স্বজাতীয় পক্ষীদের সঙ্গে আলাপ, কখনও বা ঝগড়া করে। আর প্রায়ই মিশন-স্কুলের ও চৌধুরীদের বাড়ীর কার্ণিষে বসিয়া শ্যামার ডাক ডাকে, এত জোরে ডাকে যে, রাস্তায় লোক জমিয়া যায়। মঙ্গলু চড়ুইটাকে ধরিবার জন্য ঢের চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনমতে পারিল না। (ক্রমশঃ)

জিউ-জিৎসু।

জাপানদেশের* ব্যায়াম-বিদ্যা।

অতি অল্প কালের মধ্যে জাপান "ছোটটীহইতে বড়টী হইয়াছে"—সকল বিষয়ে এমন উন্নত হইয়া উঠিয়াছে যে, পৃথিবীতে আর কোন দেশ এত অল্প সময়ে এরূপ উন্নত হইয়া উঠে নাই। সেকালে জাপান-দেশকে লোকে একটা দেশ বলিয়াই গণ্য করিত না, এক্ষণে এই দেশের লোকেরা পৃথিবীর উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদের তুল্য বলিয়া গণিত। ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় লোকদিগের নিকটহইতে জাপানীরা নানা উপকারী ও আবশ্যক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আজকাল সুসভ্য জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে—কিন্তু এক্ষণে অনেক বিষয়ে সম্পর্ক বদলিয়া গিয়াছে—এক্ষণে ইউরোপীয় লোকে জাপান-দেশীয় লোকের নিকটহইতে অনেক মঙ্গলকর বিষয়-শিক্ষা করিতেছে।

* আমাদের দেশের "রাজপুত"দিগের মত জাপানে "সমুরাই"-নামে একজাতীয় বা একশ্রেণীস্থ লোক আছে। জিউ-জিৎসু-নামক ব্যায়াম-বিদ্যা এই জাতীয় লোকদিগের একচেটিয়া ছিল; আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্মণ-ভিন্ন আর কোন জাতীয় লোকের বেদপাঠ নিষিদ্ধ, জাপানে সমুরাই-ভিন্ন আর কোন শ্রেণীস্থ লোকের জিউ-জিৎসু-বিদ্যা-অভ্যাস করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সভ্য হইয়া উঠিতে সাবেক আইন বদলিয়া গিয়াছে, এক্ষণে জাপানে সকল শ্রেণীর লোকেই এই ব্যায়াম শিখিতেছে—বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে এই বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইতেছে—ইউরোপের লোকেরাও জিউ-জিৎসু-প্রণালী-অনুযায়ী ব্যায়াম শিখিতেছে। বলিয়া রাখি, জাপানে স্ত্রীলোকে পর্য্যন্ত জিউ-জিৎসু-ব্যায়াম-শিক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরেজেরা এইপ্রকার ব্যায়াম-ক্রিয়ায় বড়ই অনুরাগী; ফলতঃ সেনাদলে, নৌ-সেনাদলে

এবং লণ্ডনের পুলিস-সেনাদলে জিউ-জিৎসু-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

এই বিদ্যা শারীরিক বলবর্দ্ধন ও আত্মসমর্থন-বিষয়ে যোলকলা-পূর্ণা অদ্বিতীয় বিদ্যা। পৃথিবীর আর কোন দেশে ব্যায়াম-শিক্ষা-বিষয়ে এমন বিদ্যা প্রচলিত ছিল না, এবং নাই। আমাদের দেশেও সেনাদলে এবং কলিকাতা-পুলিশের অনেক কর্ম্মচারীকে ঐ বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

"জিউ-জিৎসু" কথার অর্থ "কোমল কলা"। অঙ্গপুষ্টি এবং আত্মরক্ষণবিষয়ে এমন যোলকলাপূর্ণা বিদ্যা পৃথিবীর আর কোন দেশে প্রচলিত ছিল না, বলিলে বাড়াইয়া বলা হয় না।

এই বিদ্যা যে জানে, আপনার অপেক্ষা বলবান্ ও দীর্ঘকায় কেহ আক্রমণ করিলেও সে তাহাকে তুলিয়া আছাড় মারিতে পারে। এ বিদ্যা জানা থাকিলে, অঙ্গের চালনা অতি সহজ হয় এবং সেই চালনায় "ভীমপরাক্রমের" প্রয়োজন নাই, এই কারণে এই বিদ্যাকে বৈরী-দমনের ভদ্র উপায় বলা যায়।

শরীরের কোন্ অঙ্গের কোন্ স্থানের কিরূপ গঠন, যে বিদ্যা-দ্বারা তাহা জানা যায়, সে বিদ্যাকে "শরীর-ব্যবস্থা-বিদ্যা" কহে। জিউ-জিৎসু-অভ্যাস করিলে, শরীরের নানা অঙ্গের গঠন ইত্যাদি জানিতে হয়, এই কারণে জিউ-জিৎসু জানিলে, শত্রুকে আক্রমণ করিতে অথবা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে, আপনাকে রক্ষা করিতে যার-পর-নাই সুবিধা হইয়া থাকে। শরীরের কোন্ স্থানের স্নায়ু বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়া টিপিয়া ধরিলে, শত্রু নিতান্ত "কাবু" হইয়া পড়ে, বিশেষ বিশেষ স্থানে আঘাত করিলে, বা টিপিয়া ধরিলে, আক্রমণ-কারী অবশাঙ্গ হয়, বা পঞ্চত্ব পায়; তাহা এই বিদ্যাপ্রভাবে জানা যায়। রুষের সহিত জাপানের যে যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে তো জাপান-সেনারা চমৎকার ক্লেশ-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেই, তাহাছাড়া চীনদেশে "বক্সার"-নামে কতকগুলি লোক বিদ্রোহী হইয়া (১৯০০ খ্রীঃ অব্দে) যখন পেকিন-নগরে ও অন্যান্য স্থানে শেষে ইউরোপীয়-দিগকে আক্রমণ করে এবং ইউরোপীয় ও জাপানী সেনারা মিলিয়া বক্সারদিগের দমনজন্য যুদ্ধ করেন, সেই যুদ্ধে সেনাদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ইউরোপীয় সেনারা যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন জাপানী সেনারা বিলক্ষণ অক্লান্ত এবং কার্য্যক্ষম ছিল।

জিউজিৎসু-অভ্যাস করিয়াছিল বলিয়া জাপানী সেনারা এরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াও রণক্ষেত্রে অক্লান্ত থাকিতে পারিয়াছিল। অতএব, কেমন করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিতে হয়, এবং কেমন করিয়া শত্রুকে আক্রমণ, ও শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে, বা আপনাকে বাঁচাইতে হয়, পরবর্ত্তী কয়েকটী প্রবন্ধে সেই বিষয়ে যথাসাধ্য কিছু বলিব। আমি যাহা বলিব, তাহা জাপানী জিউ-জিৎসু-ব্যায়াম-প্রণালীর একটি অংশমাত্র।

মল্লযুদ্ধ-কালে বিপক্ষকে কেমন করিয়া কোথায় ধরিতে, "আগ্‌লাইতে" বা "পট্‌কান" দিতে হয়, এ সকল জানা আবশ্যক; আর এ সকল জানিতে গেলে, শিক্ষার্থী যুবকেরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন যে, এ সকল কার্য্যে শারীরিক বল বড়ই আবশ্যক। অনেকে বলেন যে, পাশব-শক্তি অর্থাৎ শারীরিক বলের প্রয়োজন নাই; কিন্তু কতকটা শারীরিক বল যে আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, ব্যায়াম-অভ্যাস করিতে করিতে শিক্ষার্থীরা দেখিতে পাইবেন যে, যাহার শরীরে যত বল, জিউ-জিৎসু-ব্যায়ামে তাহার নৈপুণ্য তত বেশি হইবে।

আমাদের দেশে "ডনগিরেরা" "ডন" করিবার সময়ে, এবং আরও নানাপ্রকার ব্যায়াম-কার্য্যে লোহার বা কাঠের মুগুর-ব্যবহার করে, কিন্তু জিউ-জিৎসু-ব্যায়াম-কার্য্যে মুগুর বা গোলা ইত্যাদির প্রয়োজন নাই। এইপ্রকার শরীর-চালনা বা ব্যায়াম-ক্রিয়াকে বলে "প্রতিকূলতা"। দেহের এক এক অঙ্গের নানা-

প্রকার চালনা করিতে হয়, সেগুলি একে একে বলিয়া যাইব ও বুঝাইয়া দিব। বাহুসঞ্চালনের প্রণালী বা হাতের "কুস্তি" অনেক রকমের, কিন্তু যেগুলি খুব ভাল ও উপকারী, শিক্ষার্থী যুবকেরা সেগুলির প্রায় সকলই অন্যের সাহায্য-বিনাই অভ্যাস করিতে পারেন,—তবে কয়েকটীতে চেলার অন্যের সাহায্য আবশ্যক

হইয়া থাকে। পা সোজা করিয়া দাঁড়াও, এবং বাহু-দুইটী সোজা-ভাবে সম্মুখে রাখ, এখন বাম হাতের কব্জি-(মণিবন্ধ) দিয়া ডান-হাতের কব্জি চাপিয়া ধর। এইরূপে চাপিয়া ধরিয়া হাত-দুইখানি আস্তে আস্তে মাথার উপরে উঠাও। এখন হাত উল্টাও—ডান-হাতের কব্জি-দিয়া বাঁ-হাতের কব্জি চাপিয়া ধর, এইরূপে উল্টে পাল্টে ধরিয়া হাত মাথার উপর তুলিতে ও নামাইতে থাক। যখন এইরূপ অভ্যাস করিবে, তখন এক হাত-দিয়া অন্য হাত খুব জোরে চাপিবে, এবং সেই অন্য হাত-দিয়া সে হাত আস্তে আস্তে হটাইয়া দিবে। এইরূপ "কস্ত" বা অভ্যাস সমস্ত বাহুযুগলের—বিশেষতঃ মণিবন্ধের—পক্ষে বড় উপকারী। কব্জির একটু উপরে ও কনুয়ের নীচে হাতের যে অংশ, সেই অংশকে ইংরাজিতে forearm বলে, বাঙ্গলায় কি বলিব?—কব্জির উপরিভাগ বলিব। আচ্ছা, এইবার ডান-কব্জির উপরিভাগে বাম-কব্জির উপরিভাগ রাখ। এক হাতের উপর অন্য হাত বেশ জোরে চাপিয়া রাখিবে, রাখিয়া প্রথমবারের মত মাথায় তুলিয়া আবার নামাও—আবার তুল, আবার নামাও—এইরূপ বারকতক কর। এই দুই-প্রকার কস্ত ভালরূপে করিলে, বাহু-দুইটী বিলক্ষণ সবল হইয়া উঠে। (ক্রমশঃ)

সত্য

সম্পদে, বিপদে, ব্যসনে, উৎসবে সত্য নিরভয়ে ক'বে,
যা' হো'ক, তা' হো'ক, পাও মহাশোক, সত্যে আঁকড়িয়া র'বে।
প্রভাত-আকাশে প্রকাশে যে রবি, সত্যেরি প্রদীপ্ত ছবি।
সত্যে ফুটে সোম, তারকার স্তোম, তেজোময় হয় হবি।
সত্যে বহে বায়ু, দেয় জীবে আয়ু, তটিনী হিল্লোলি' ধায়;
সত্যে মেরুদেশে অপূর্ব্ব আলোক—'অরোরার' ভাতি তায়।
সত্যভ্রষ্ট যেই, কিছু তার নেই, দীনহ'তে সেই দীন;
হোক সে বিদ্বান্, মহাধনবান্, পশুহতে সেই হীন।
সত্যের পালনে প্রাণের প্রদীপ নিবে যায় যদি—যা'ক;
তবুও জীবনে সত্যের প্রতিভা প্রদীপ্ত হইয়া থাক্।
সত্য বিশ্বহেতু, অমরতা-সেতু, বিশ্বের ঈশ্বর সত্য।
সত্যই অমৃত, সর্ব্বসুখাকর, আত্মার প্রাণদ পথ্য।

গদা ও সদা

(উপকথা।)

গদাধর প্রামাণিক রাইপুর-গ্রামের মোড়ল, যেমন ভোঁদা, তেমনই হাঁদা, কিন্তু গরীব-বেচারা সদানন্দ সর্দ্দারের উপর অত্যাচার করিতে খুব মজবুত। সদার অপরাধ, সে গদার প্রতিবেশী; গদার তিনজোড়া বলদ, সদার "কুল্যে" একজোড়া, গদা তবু চাষের সময় সদার বলদ-জোড়া সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ ছয়দিন লইবেই। সদা তাই একদিন একটু নারাজ হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া গদা সদার বলদ্-জোড়ার একটাকে সরাইল, আর একটাকে বিষ খাওয়াইয়া দিল। সদা-বেচারা মড়া বলদের ছাল ছাড়াইয়া লইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে জাতিতে মুচী ছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সে এক চাষার বাড়ীর সাম্‌নে গরুর চাম্‌ড়াটা পাতিয়া বসিয়া আছে, এমন সময়ে দেখিল, চাষার বউ তাহার ভাইকে খুব আদর-যত্ন করিয়া ভাল ভাল জিনিস খাইতে দিতেছে। চাষার শ্যালাকে চাষা দেখিতে পারিত না। সে তাহার বাড়ীতে আসিলেই, চাষা "তেলেবেগুণে" জ্বলিয়া উঠিত।

চাষার বৌ তো ভাইকে এটা-সেটা খাওয়াইতে ব্যস্ত, এমন সময়ে চাষা হঠাৎ বাড়ী আসিয়া হাজির। তাহার বউ তাড়াতাড়ি ভাইকে এক বাক্সের ভিতর ঢুকাইল, পরে খাবারগুলা লইয়া গিয়া উনানের পিছনে লুকাইয়া রাখিল। সদা তাহা দূরহইতে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, চাষা তখন তাহার পাশদিয়া যাইতেছিল, তাই জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে বট তুমি?"

সদানন্দ উত্তর দিল,—"আমি সদানন্দ।"

চাষা ভাবিল, "এ সদানন্দ, একে বাড়ী নিয়ে যাই, নিশ্চয়ই আমোদ কিছু পাওয়া যা'বে।" প্রকাশ্যে বলিল, "তুমি সদানন্দ বট? আনন্দ দিতে পার কেমন?"

সদানন্দ বলিল,—"খুব!"

চাষা। এস তবে আমার সঙ্গে।

সদা চাষার সঙ্গে গেল।

বাড়ী গিয়া চাষা হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে বসিল। সদাকে অনুরোধ করিল,—"চাট্টি হোক না।"

সদা। তোমরা, আপনারা?

চাষা। রুহিদাস।

সদার আর আপত্তি রহিল না। হাত-মুখ ধুইয়া সেও খাইতে বসিয়া গেল।

চাষার বউ তাহাদের সুধু ডা'ল-ভাত খাইতে দিল। দেখিয়া সদা মনে মনে চটিল, চাম্‌ড়াটা পাশে রাখিয়া খাইতে বসিয়াছিল, তাহাতে একটা টোকা মারিল, চামড়াটা খড়্ খড়্ করিয়া উঠিল। চাষা জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি বটে?"

"গরুর চাম। চামখানা যাদু জানে; বল তো একে দিয়ে ভাল ভাল খাবারের যোগাড় করে ফেলি।"

চাষা। ঠিক কথা বলছ বটে? আচ্ছা, কর দেখিন কিছু তরকারীর জোগাড়, ডাল-ভাত আর যেন মুখে রোচে না।

সদা। চাম্ বল্‌ছে, ফুস্‌-মন্তরের চোটে সে ভাল তরকারী রাঁধা যোগাড় করে আ'নলে,—চুলোর পিছনবাগে আছে।

"কি বল হে তুমি, সত্য কথা বল্‌ছ বটে? আচ্ছা, দেখি কেমন তোমার চাম যাদু জানে।"

গিয়া চাষা সত্যই পাক্‌-করা ব্যঞ্জন পাইল; আনন্দে বলিয়া উঠিল,—"সদানন্দ, আনন্দ দিচ্ছ বটে, তোমার চামখানা যাদুই জানে বটে।"

দুইজনে সেই তরকারী দিয়া হাপুস্ হাপুস্ করিয়া সমস্ত ভাত খাইয়া ফেলিল। তখন সদা বলিল,—"দাদা, মিষ্টিমুখ ক'র্‌বার ইচ্ছে হচ্ছে কি?"

"হচ্ছে বটে, কিন্তন কোথাই বা কি পাই?"

"তা'র ভাবনা কি? চাম যাদু জানে; সে বল্‌ছে ফুস্‌-মন্তরের চোটে সে তোমার তক্তাপোষের নীচে এক ধামী নলেন-গুড়ের বাতাসা এনে হাজির করেছে।"

চাষা বিনা বাক্যব্যয়ে প্রদীপের আলোকের সাহায্যে তক্তাপোষের তলাহইতে বাতাসার ধামী বাহির করিল। দেখিয়া চাষার বৌএর মুখ হাঁড়ি হইল। চাষা আনন্দে একটা বাতাসা টপ করিয়া গালে ফেলিয়া দিয়া কড়র মড়র করিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল,—"সদানন্দ, আনন্দ দিচ্ছ বটে, খাও, খাও, তুমিও গোটাকয়েক খাও, জিবে একটু তার আসুক।"

সদানন্দ বাতাসা চিবাইতে চিবাইতে বলিল,—"দাদা, বাড়ীতে একটা ভূত পুষে রেখেছ কেন?"

চাষা। সে আবার কে বটে?

সদা। ভূত—ভূত, আবার কে? ঐ বাক্সটার মধ্যে আছে—চাম ব'ল্‌ছে।

চাষার বৌয়ের মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গেল! সদা বাক্সর ডালা তুলিয়া বলিল,—"এই দেখসে, দাদা, শুয়ে রয়েছে।"

চাষা গিয়া দেখে, কে একজন মানুষের মত বাক্সের মধ্যে রহিয়াছে, সেখানটা আঁধার, তাহাছাড়া চাষা ভয়ে ভূতের দিকে ভাল করিয়া তাকায় নাই, সুতরাং তাহাকে চিনিতে পারিল না।

বলিল, "তাই তো বটে, সদা, ভূ—ভূতই তো বটে! তোমার ও চামখানা কত হ'লে আমায় দেবে?"

"এ কি দেওয়া যায়?"

"যা'বে বৈ কি, যা'বে বৈ কি, দু'কুড়ি-টাকা দেব, আমায় ওখানা দেও—বুঝ্‌লে?"

"কুল্যে দু'কুড়ি?"

"আর তো এ সময়ে হাতে বেশী টাকা নেই, আচ্ছা পুরোপুরি পঞ্চাশই দেওয়া যা'বে। দাও, দিয়ে ফেল, আর বেশী গাই ক'র না, বুঝ্‌লে? কিন্তু বাক্সসুদ্ধ ভূতটা নিয়ে তোমায় একটু কষ্ট ক'রে গাঙের জলে ফেলে দিতে হ'বে, ভায়া!"

সদানন্দ তাহাতে রাজি হইল। পঞ্চাশটা টাকা লইল, আর বাক্সটা মাথায় করিয়া গাঙের দিকে চলিল। গাঙের কাছে পঁহুছিয়া চেঁচাইয়া বলিল,—"এইবার বাক্সটা দিই গাঙে ফেলে, আর ভূতের বোঝা বওয়া যায় না।"

তাহাতে চাষার শ্যালা বাক্সের ভিতরহইতে চেঁচাইয়া বলিল,—"দোহাই, আমাকে গাঙে ফেলো না, আমিও তোমাকে আমার বোনাই যত টাকা দিয়েছে, তত টাকাই দেব"

"সত্যি?"

"সত্যি দেব।"

"না দাও যদি, দেখ্‌বে মজা।"

এই বলিয়া সদানন্দ বাক্স নামাইল। বাক্সের ডালা খুলিলে, চাষার শ্যালা বাহির হইয়া বলিল,—"তুমি এইখানে থাক, আমি তোমাকে টাকা এনে দিচ্ছি।"

সদা। পালাবে মনে কচ্ছ? তা' পা'র্‌বে না। যাও, টাকা সত্যি এনে দাও, নইলে আমি যা ক'র্‌ব, তা' আমার মনেই আছে।

শ্যালা। না, না, তুমি আমাকে টোনা-মোনা ক'র না, আমি তোমাকে টাকা এনে দিচ্ছি।

সে সত্যই টাকা আনিয়া দিল। সদা আহ্লাদে আটখানা হইয়া বগল বাজাইতে বাজাইতে দেশে ফিরিয়া গেল।

২

দেশে ফিরিলে, গদা তাহার কাছে একরাশি টাকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, এত টাকা কোথাকে পেলি?"

"চাম বেচে।"

শুনিয়া গদা তাহার চারিটা বলদ মারিয়া চামড়া ছাড়াইয়া লইয়া হাটে বেচিতে গেল। যে দর-জিজ্ঞাসা করে, তাহাকেই সে বলে,—"এক-এক-খান চাম এক-একশো টাকা।" শুনিয়া সমস্ত খরিদ্দার সরিয়া পড়ে। অবশেষে একজন চর্ম্মক্রেতা তাহাকে বিদ্রূপ করিল, তাহাতে গদা চটিয়া উঠিয়া তাহাকে গালি দিল। সে গদাকে উত্তম-মধ্যম বেশ দু'ঘা দিল। মার খাইয়া গদা রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল। তাহার পর একদিন সদাকে বাগে পাইয়া এক থলিয়ায় পুরিয়া নদীর জলে ফেলিতে চলিল।

দ্বিপ্রহরে সে এক খাবারের দোকানের একটু তফাতে থলিয়া রাখিয়া জল-খাবার খাইতে বসিল। সদা ছালার মধ্যে বন্ধই আছে। এমন সময়ে শুনিল, এক বুড়া গাইয়ের পাল লইয়া কোথায় যাইতেছে আর বলিতেছে,—"আমার অদেষ্টে তো গঙ্গা নেই, এখেনেই মর্‌তে হ'বে।"

সদা থলিয়ার ভিতরহইতে বলিল,—"ও বুড়ো, গঙ্গায় যাবি তো আয় না, আমিও চলেছি।"

"কে তুমি ?"

"আমি যেই হই না, তুই গঙ্গায় যাবি ?"

"আর, বাবা, আমার অদেষ্টে কি তা' আছে ?"

"থা'ক্'বে না কেন ? তুই এই থ'লের ভেতর ঢোক, আমি তোকে নিয়ে যাচ্ছি।"

বুড়ার কি মতিভ্রম হইল, সে তাহাতে রাজি হইল। সদার থলিয়া খুলিয়া দিল, সে বাহির হইয়া আসিল, তখন বুড়া তাহার বদলে থলিয়ার মধ্যে ঢুকিল; সদা থলিয়ার মুখ বাঁধিয়া দিল; তাহার পর বুড়ার গাভীদল হাঁকাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

গদা বুড়াকে থলিয়া-সুদ্ধ এক গাঙে ফেলিয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া দেখে, সদা মরে নাই, বাঁচিয়া আছে, কোথাহইতে তাহার অনেক গাভী হইয়াছে, বলিল,—"তোকেই কি গাঙে ফেলে দেই নি ?"

"হ্যাঁ, দিয়েছিলে তো।"

"তবে তুই কি ক'রে বেঁচে আমার আগে গাঁয়ে ফিরে এলি ?"

"যক্ষির দয়ায়।"

"সে কিরকম ?"

"তুমি যে গাঙে আমায় ফেলে দিয়েছিল, তা'তে এক যক্ষি থাকেন, তিনি আমাকে আবার ডাঙায় তুলে দিলেন, আর এই গাইগুলো দান ক'রলেন।"

"বটে, তবে আমি যদি সেই গাঙে ডুব দিই, তবে আমিও অনেক গাই পাব ?"

"তা' যক্ষির অনুগ্রহ হ'লে পেতে পার।"

গদা গিয়া গাঙে ঝাঁপ দিল, কত গাভী পাইল, কে জানে ? আর কিন্তু ডাঙায় উঠিল না !

সমাপ্ত।

রকমারি

"কি হে, আজকাল তোমার বামুণ-ঠাকুর কিরকম ? সেদিন শু'নলুম সে নাকি তোমায় পদে পদে ঠকাচ্ছে !"

"হ্যাঁ, আর বল কেন, ভাই ? তা'র জ্বালায় জ্বালাতন ! সেদিন তা'কে জব্দ ক'রবার মতলবে আমি বাজারথেকে কতকগুলো আলু কিনে এনে গুণে দেখলুম যে, দশটা, তারপর তা'কে ডেকে একটু রাগতঃ স্বরে বল্লুম, 'আমাকে এই দশটা আলু সিদ্ধ করে এনে দাও।' তা'র পর খাবার সময় দেখি যে, সে সিদ্ধ আলুগুলো সব ভেঙে একসঙ্গে ক'রে এনেছে।

* * * *

"আচ্ছা, বাবা, রাতে দিনের চেয়েও বেশী বৃষ্টি হয় কেন ?"

"তুমি তো জান যে, দুটো মেঘে ঘসাঘসি হ'লেই, বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে।"

"ওহো, বুঝেছি, রাতে, বোধ হয়, তা'রা দেখ্'তে পায় না ব'লে এধার-ওধার যা'বার সময় বেশী ঘসাঘসি হয়।"

* * * *

"ওহে, কাল একটা লোক এক ছ'তালা বাড়ীর একটা জানালা সারাতে সারাতে ভারাথেকে প'ড়ে গেছে, কিন্তু লোকটার গায়ে দুই-একটা আঁচড়-ছাড়া আর কিছু লাগে নি, কি আশ্চর্য্য !"

"কিরকম, একি কখনও সম্ভব হ'তে পারে ?"

"হ্যাঁ হে, সত্যি ব'ল্'ছি। সে জানালা সারাবার সময় ভারাথেকে প'ড়ে গেছে।"

"দূর্ !"

"সত্যি, সে ঘরের ভেতর প'ড়েছিল।"

* * * *

"মা যতীনকে খুব প্রহার দেবার দরকার হ'য়েছে।"

"কেন, সে কি করেছে ?"

"সে বলে যে, তা'কে অর্দ্ধেকটা বিছানা দিতে হ'বে।"

"তা' তোমরা যখন দু'ভাই, তখন অবশ্যই অর্দ্ধেকটা বিছানায় তা'র অধিকার আছে।"

"তা' তো আছে, কিন্তু সে তা'র অংশটা চায় খাটের মাঝখানে আর ব'ল্'ছে যে, আমাকে তা'র দু'পাশে শুতে হ'বে !"

* * * *

শিক্ষক :—"তোমাকে এই ম্যাপটা আঁ'ক্'তে কি কেউ সাহায্য করেছিল ?"

ছাত্র :—"না ম'শায়, সমস্তটাই দাদার আঁকা।"

শ্রীঅজিত ঘোষ।

আত্মকথা

আজকাল দে'খ্‌ছি যে জীবনচরিত-লেখা একটা বাতিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য, বড়লোকের জীবনস্মৃতির প্রয়োজন কিছু থা'ক্‌তে পারে, এখন কিন্তু মহৎলোকের অভাব নাই; আত্ম-জীবনচরিতে দেশ ছেয়ে প'ড়্‌ছে। তাই আমার জীবনচরিত লেখাও আবশ্যক-বোধ হ'চ্ছে। আমি কাল্পনিক কোন মহৎ লোক নহি; বড়লোকও নহি। তবে আমি "কৃষ্ণবিষ্ণুর" মধ্যে একজন বটি!

আমার এখন বয়স কত, ঠিক জানা নেই। আমার পূর্ব্ব-পুরুষ কচিৎ কেহ বেঁচে থা'ক্‌তে পারেন, কিন্তু তাঁ'দের কাছ-হ'তেও আমি কোন সংবাদপ্রাপ্ত হ'তে পারি নি। আমাদের উৎপত্তি-কালসম্বন্ধেও আমার জ্ঞান খুব অল্প। তবে মনে হয়, যত দিন সৃষ্টি হ'য়েছে, আমরাও তত দিনথেকে আছি।

আমরা খুড়তুতো, জেঠতুতো, মামাতো, পিস্‌তুতো অনেক ভাই আছি। অনেকের জানা থা'ক্‌তে পারে, মর্ত্তমান, কাঁঠালি, চাঁপা, বীচি, কাঁচা প্রভৃতি। এঁ'রা সকলেই পৃথিবীর যাবতীয় লোকের মঙ্গলসাধনেই নিযুক্ত আছেন।

ক্ষুদ্র শিশুকে হয় ত তা'র মা'কে চিনিয়ে দিতে হয়, কিন্তু সে আমাকে আজন্ম চিনে। সে মাতৃস্তনা-ত্যাগ ক'রে আমায় পেতে চায়।

আমি দেখেছি, আমার প্রসার এত বেশী যে, পৃথিবীর কোন স্থানেই আমি সুদুর্ল্লভ নহি।

আমি জানি, "বালক"-পড়া বালকেরা আমাকে সবচেয়ে ভাল-বাসে। এই মুহূর্ত্তে হয় ত (হয় ত কেন—নিশ্চয়ই!) তাহাদের কোমল রসনা সিক্ত হ'য়ে উঠেছে। হ'বারই কথা, এমন একটী জিনিষে এত রস, অন্য কিছুতে আছে কি? না; কাঁচা খাও, ডাঁসা খাও, পাকা খাও—অমৃত! কাঁচা কলা, যাহাকে লোকে কাঁচকলা বলে—ঝোলে, শুক্তে খাও, যেমন উপকারী, তেমনি সুস্বাদু। পাকা যদি হয়, তো কথাই নাই। আমার ভয় হ'চ্ছে, আমায় ভেবে বালকেরা "বালকে"র পাতা-ক'খান না কামড়ে বসেন! আমাকে দুধদিয়ে, ভাতদিয়ে মেখে, থাবা থাবা অন্নের গ্রাস যে, কত-গুলি নিঃশেষিত হয়, তা' আর কি ব'ল্‌ব? সুধু মুখে? আহাহা!

কিন্তু আমার একটী কারণে মনে বড় দুঃখ—যে জিনিষ মানুষের এত প্রিয়, অনেক নিন্দুক ব্যাক্তি বিষাক্ত জিহ্বায় তাহার নিন্দা ক'র্‌তে বিমুখ হয় না। আমি যে বাড়ীর বাগানে জন্মেছিলুম, সে বাড়ীর কর্ত্তাটি সকালবেলা কি কোথায় যাবার সময় আমাদের দে'খ্‌তেন না বা নাম ক'র্‌তেন না; কিন্তু আমি একদিন বাগানহ'তে উঁকি মেরে দেখেছি, তিনি তাঁ'র ঠাকুরঘরে ঢুকেই আমার কোন আত্মীয়কে উদরসাৎ ক'রে ফেলেছেন, এমন সময় বা'রহ'তে কে ব'ল্লে—"ঠাকুরঘরে কে?" তিনি ত্বরিত উত্তর দিলেন—"আমি ত কলা খাই নি!" কিন্তু ভগবানের কি খেলা! বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি এই কথা ব'ল্‌তে গেলেন, আর মিথ্যা কথার শাস্তি-স্বরূপ (একটুখানি গলায় আটকে ছিল, বোধ হয়) একটা বিচী আটকে গেল। তিনি কেসে উ'ঠ্‌লেন। গৃহিণী তথায় উপস্থিত হ'লেন, তাঁ'র বু'ঝ্‌তে বাকী রইল না, কলাগুলি কোথায় গেল। তবে কেন এই নিন্দা, কেন এই ঘৃণা? আমাকে নইলে তো চ'ল্‌বে না! এই সম্প্রদায়কে নিমকহারাম ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয়।

ছেলেরা আমাদের যেমন ভালবাসে, আর একটী জাতি তদ্রূপ ভালবাসে। ডারুইনের মতে তা'রাও মানুষ, (যেহেতু তা'রা মানুষের পূর্ব্বপুরুষ!) আমার মতেও তাই; যেহেতু আমি দেখে-ছি, তা'রা ট্যাক্স দেবার ভয়ে সুধু কাপড় পরে না বা বাক্যালাপ করে না। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও চতুরতায় তা'রা অনেকের নাক-কাণ কা'ট্‌তে পারে। তা'দের কাছে আমরা যে, কি মহামূল্য বস্তু, তা' আর কি ব'লে বুঝান যায়? তোমাদের রাজার জাতিকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দে'খ, তাঁ'রা আমাদের কিরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করেন।

সুধু আমাদের প্রয়োজনীয়তা যে, ঐপর্য্যন্ত, তা' নয়। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে যদি আমাদের অঙ্গের সুবিশাল পত্র না দিয়ে, তোমার হাতে দু'খানা লুচি, দু'টো মেঠাই দিয়ে তোমায় বিদায় ক'রে দেয়, আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি, তুমি মনে মনে নিমন্ত্রণকর্ত্তার মস্তক-ভক্ষণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। ঠিক কি না! আচ্ছা —তোমরা মোচার ঘণ্ট, মোচার চপ্ নিশ্চয় খেয়েছ, কিন্তু জান কি যে, আমাদের দেহহ'তেই সেই মোচারূপ ফুলটি নির্গত হ'য়ে থাকে? আরো আছে—ধর, থোড় খেয়েছ কি! থোড়ের ডাল্‌না, থোড়-সড়সড়ী খায় নি, এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি। থোড় কোথাহ'তে জন্মায় জান? আমরাই তা'দের জন্মদাতা।

আমাদের ব্যবসা ক'রে যে, অনেকে বড়লোক (দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়—ধনী) হয়েছে, তা' সপ্রমাণ ক'র্‌বার জন্য ইতিহাস খুঁ'জ্‌তে হ'বে না। খনা-মহাশয়া ব'লেছিলেন—"পুঁতে কলা, না কেটো পাত—ওগো তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত!" আর তোমরা যদি সে কাজ কর, ভয় নাই, কেউ চাষাও ব'ল্‌বে না। একটি বাগান ক'রে তা'তে কয়েকটি গাছ পুঁ'তে দিলেই হ'ল, আমা-দের বংশ এত শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হ'বে যে, তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যা'বে। পরে প্রথমে সেই মোচা ফ'ল্‌বে। মোচাহ'তে সরু সরু কলা বা'র হ'লেই, মোচাটি কেটে, বাড়ী এনে—বুঝলে? সেই সরু কলা যখন মোটা হ'বে, একটু হলদে রঙ হ'বে, তখন,

তখন! না তোমাদের আর প্রলুব্ধ ক'র্‌ব না। তবে একটা কাজ নৃশংসের মত সকলে ক'রে থাকে। বাপু, আমার মোচা খেলে, কলা খেলে—তবু সাধ মি'ট্‌ল না; থোড়টি খা'বার জন্য, দিগ্‌দিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আমাকে কেটে ফে'ল্‌লে? ফেল, তা'তে কিছু আসে যায় না। মৃত্যু একদিন সকলেরই আছে, তুমিও ম'র্‌বে, আমিও ম'র্‌ব। তবু তোমাদের চেয়ে আমার সান্ত্বনা-শান্তি অনেক বেশী। আমি অনেকের কাজে, অনেকের উপকারে লেগেছি। হয়ত মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের করুণাকণ-লাভে বঞ্চিত হ'ব না।

না—আমার জীবনচরিত-লেখা হ'ল না। জীবনচরিত লি'খ্‌তে গেলেই আত্মগরিমার বড় আবশ্যকতা। সেটাকে আমি ঘৃণা করি।

তবে শেষে একটা কথা ব'ল্‌ছি শোন—

তোমরা ভা'ব্‌ছ, আমি তোমাদের পেটের মধ্যে না গিয়ে এত কথা শুনাচ্ছি, কি ক'রে! যদিও সেইটাই হ'ল আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য, কিন্তু তা'হ'তে এ হতভাগ্য বঞ্চিত হ'য়েছে। একটা বৃদ্ধ ফেরিওয়ালা বাজারে বিক্রয়ার্থ আমাদের অনেককে নিয়ে যাচ্ছিল। জান ত—কল্‌কাতার রাস্তার ফুটপাথ! তা'তেই ছিল, আমাদেরই কোন আত্মীয়ের ক্ষীণ চর্ম্ম প'ড়ে—বেচারীর একটা পা তা'রই 'পরে যেই পড়া, আর বৃদ্ধ কুপোকাৎ! আমরাও ছড়িয়ে প'ড়্‌লুম। সে উঠে অনেককে কুড়িয়ে নিলে, কিন্তু বোধ হয় সে ক্ষীণদৃষ্টি ছিল আর চশ্‌মা নেবার অবস্থাও তা'র ছিল না—আমায় দে'খ্‌তে পেলে না—ফেলে গেল। জীবনের চরম-লক্ষ্যচ্যুত হ'য়ে আমি এখন মনে বড় কষ্ট-বোধ ক'র্‌ছি। অনেকেই এমন লক্ষ্যচ্যুত হয়, পরে অনুতাপ করে।

যেমন অনেক ছেলে জীবনের লক্ষ্যচ্যুত হয়,—অল্পবয়সেই 'কলা-পোড়া' খায়—যদিও আমার জানা নাই, আমাদের দগ্ধবদন কেউ দেখেছে এবং আস্বাদ করেছে কি না—কিন্তু এমন লোক খুব কমই আছে, যে তা'র বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, গুরু-শিক্ষকের নিকট একবারও ঐ দ্রব্যটি আস্বাদ ক'র্‌তে উপদেশ-প্রাপ্ত হয় নি! কথাটা কথার কথা! কিন্তু অনেকেই অল্প বয়সে লেখা-পড়া না ক'রে কল্পনায় ঐ '—পোড়া' খেয়ে ফেলে। তা'দের জন্যে আমার দুঃখ হয়! তা'দের মতি পরিবর্ত্তিত হোক।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে 'কলা খাও' বলাটা যেমন অন্যায়, সুস্বাদু এত দ্রব্য থা'ক্‌তে '—পোড়া' খেতে বলাও ততোধিক অন্যায়। তবে কেউ যদি পূর্ব্বে তাহা খেয়ে দেখে থাকেন বা এখন খেয়ে দেখেন, আমার ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে জানা'লে তাঁ'রা সুখী হ'বেন।

হ্যাঁ, ব'ল্‌ছিলাম, ছেলেরা আমার মত লক্ষ্যচ্যুত হয়; তবে তা'রা প্রায় স্বেচ্ছায় হয় এবং তথাকথিত 'কলা-পোড়া' খায়। আমি তা' খাই নি। শেষে তা'রা সমস্ত জীবন দুঃখভোগ করে। আমার ইচ্ছা, তা'রা জানুক, ঐ '—পোড়া' বলিয়া কোন জিনিষ পৃথিবীতে নাই, সুতরাং তা'র লোভে তা'রা যেন অবনতির পথে না নামে।

শেষ-কথা, যিনি আমার জীবনচরিত লিপিবদ্ধ ক'র্‌ছেন, কেউ যেন তাঁ'কে '—পোড়া' খেতে ব'ল না। ঐ দ্রব্য নাই, একান্ত অমূলক। পাকা ' ' খাইতে বলিলে তিনি স্বীকৃত আছেন, বু'ঝ্‌ছি, কেননা, তিনি লি'খ্‌তে লি'খ্‌তে কেবল আমার পানে লুব্ধদৃষ্টির নিক্ষেপ কর্‌ছেন! কিমধিকম্‌?

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

দু'টি কিরণের ছটা

দু'টি কিরণের ছটা পড়িয়াছে বুকে বসুধার—
দেখি এক ধনী, তাঁ'র ধনহেতু নাহি অহঙ্কার;
ভয়ে ভয়ে পরশেন সোনারূপা, মণি-মুক্তা যত!
দেখি আর, দীন এক—পরিধান পরিম্লান চীর-
হাসিমুখে সাধিতেছে জীবনের ক্ষুদ্র ব্রত শত,—
মুছি'ছে অম্লান-মুখে ভালহ'তে তপ্ত স্বেদনীর।

তা'র পরে, এ কি দেখি? দীন এক শ্যামাভ সন্ধ্যায়
হাসিমুখে প্রণমিছে দীন-নাথ-চরণ-উদ্দেশে;
কৃতজ্ঞতাভরে তা'র চক্ষু-দু'টি যায় জলে ভেসে!
বলে,—'নাথ, দেছ দৈন্য, ধন্য তুমি, নমি তব পায়;
ধন দিলে, মন যেত ছু'টে, ছি ছি, ধনেরই পিছে;
দুর্লভ জনম মোর ব'য়ে যেত, হ'য়ে যেত মিছে!'

বালক

৪র্থ বর্ষ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। ২য় সংখ্যা

পাচিকার পুত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৩

প্রবোধের মা এখন আহ্লাদার মনিবের বাড়ী পাচিকার কাজ করে। প্রবোধও সেই বাড়ীতে থাকে, বাড়ীর কর্ত্তা তাহাকে "ফ্রি কলেজে" ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। সেই বিদ্যালয়ে সে এখন চতুর্থ-শ্রেণীতে পড়িতেছে। ছাত্রবৃত্তি-পাঠকালে সে ইংরাজী মোটেই পড়ে নাই, এখানে আসিয়া দেখিল, ইংরাজী না জানার দরুণ তাহাকে উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয়ের খুব নিম্নশ্রেণীতেই ভর্ত্তি হইতে হইবে। ফলে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে তাহার বয়স ১৬৷১৭ হইয়া যাইবে। ইহাতে সে নিরাশ হইবার ছেলে নয়, চারমাস ঘরে বসিয়া সে ইংরাজী একরকম শিখিয়া ফেলিল এবং "ফ্রি কলেজের" প্রধান শিক্ষকমহাশয় তাহাকে পরীক্ষা করিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন।

বিদ্যালয়ের বেতনের ব্যয়ের হাত সে এইপ্রকারে এড়াইল; কিন্তু বই কি করিয়া কেনা যায়? সে বইগুলি না কিনিলেই নয়, সেই বইগুলি, মা বেতন পাইলে, সে পুরাতন পুস্তকবিক্রেতাদের দোকানহইতে কিনিয়া আনিল। এখনকার ছেলেরা কত অর্থপুস্তক কিনে, তাহা তাহার কিনিবার সামর্থ্য ছিল না; একবার বাবু তাহাকে দুই আনা পয়সা পার্ব্বণি দিয়াছিলেন, তাহা সে খরচ ক'রে নাই; একদিন সে দেখিল, পথের ধারে এক বুড়া মুসলমান বসিয়া কতকগুলি পুরাণো বই বেচিতেছে, তাহার মধ্যে একখানি সামনের ও পিছনের দুই-এক পাতা ছেঁড়া একখানি ইংরাজীহইতে বাংলা অভিধান রহিয়াছে, তাহা সে কিনিবার জন্ম ব্যাকুলতা-প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু বুড়া অভিধানখানি অন্ততঃ চার আনায় বিক্রয় করিবে, এইরূপ সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিল, প্রবোধ মাত্র দুই আনা দিতে চাহে, সুতরাং সে প্রবোধকে অভিধানখানি আর ছুঁইতেই দিতেছিল না। তখন প্রবোধের চোক-দু'টি, কেন জানি না, ছল ছল করিতে লাগিল। দেখিয়া বুড়ার মায়া হইল। তখন বুড়া তাহাকে তাহার সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আরম্ভ করিল, প্রবোধও সকল প্রশ্নের সরলভাবে উত্তর দিতে লাগিল, সে যে ছলনা করিতে বা মিথ্যা কথা কহিতে জানে না। প্রবোধের সম্বন্ধে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বুড়ার হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল,—বুড়া প্রবোধকে দুই আনাতেই অভিধানখানি বিক্রয় করিল এবং বলিল,—"খোকাবাবু, তোমার যখন যে কেতাবের প্রিয়জন হ'বে, তুমি আমাকে জেনিও, আমি তোমাকে খুঁজেপেতে এনে দেব, দাম দিতে হ'বে না।"

ইহাতে প্রবোধের পুস্তকসম্বন্ধে অনেকটা ভাবনা দূর হইল; কিন্তু সকল বই সে বুড়ার কাছে পাইত না, বারবার বুড়াকে বিরক্ত করিতে যাইতেও তাহার ইচ্ছা হইত না, তাই অনেক সময়ে সে তাহার সমপাঠীদের বই চাহিয়া আনিয়া হাতে সমস্ত বইখানি নকল করিয়া লইত। কাগজ সে দফ্তরী-পাড়াহইতে সেরদরে কিনিয়া আনিত, সেই কাগজগুলির একপীঠে কিছু লেখা থাকিত; তাহা-ছাড়া সে, সময় পাইলেই, পথহইতে অনেক "হ্যাণ্ডবিল" কুড়াইয়া আনিত। আলোকের অভাবও তাহার ছিল, তাই সে কি শীতকালে কি গ্রীষ্মকালে রাত্রিবেলা বাড়ীর রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িত, পথের বায়বালোক তাহার পাঠ-বর্ত্তিকার কার্য্য করিত।

* * * * *

আজ "ফ্রি কলেজে" ষাণ্মাসিক পরীক্ষা বসিয়াছে। চতুর্থ-শ্রেণীতে আজ ইতিহাসের পরীক্ষা হইতেছে।

প্রবোধের পাশেই একজন বালক বসিয়া পরীক্ষা দিতেছে, তাহার নাম সনৎ। সনৎ বদমায়েসের সর্দ্দার, পড়াশুনা কিছুই

করে না, যেমন চুরী করিতে, তেমনই মুখ-খারাব করিতে, তেমনই সমপাঠীদিগের উপর অত্যাচার করিতে মজবুত। প্রশ্নপত্র পড়িয়া সনতের চোক কপালে উঠিয়াছে। সে একটী প্রশ্নেরও উত্তর করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিতে পারিতেছে না। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কলম কামড়াইতে লাগিল। তাহার পর, কি একগাদা মাথামুণ্ড লিখিয়া চলিল। শেষে ইতিহাস-শিক্ষকের চেহারা আঁকিতে লাগিল। অবশেষে প্রবোধকে বলিল,—"পেবা, এই পেবা, তোর লেখা কাগজগুলো আমাকে দে।"

প্রবোধ তাহাকে মরণাধিক ভয় করে! এমনই ভাণ করিতে লাগিল, যেন সে সনতের কথা শুনিতেই পাইতেছে না। শেষে সনৎ অধীর হইয়া প্রবোধকে পা-দিয়া ঠোক্কর মারিয়া বলিল,— "এই বেটা পেবা, তোর লেখা কাগজগুলো দে না!" তখন প্রবোধের আর ভাণ করা চলিল না। তাই বলিল,—"না, ধরা প'ড়্‌লে, তোমাকে আমাকে দু'জনকেই মাষ্টারম'শায় তুলে দেবেন, তখন কি হ'বে বল দেখি?"

এমন সময়ে যে শিক্ষক চৌকী দিতেছিলেন, তিনি বলিলেন,— "You two boys over there, don't whisper!"

প্রবোধের মুখ লাল হইয়া গেল; সে ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতে লাগিল, সনতের দিকে আর তাকাইলও না। সনৎ বে-পরওয়া, খানিকক্ষণ বাদে আবার বলিল,—"এই পেবা—পেবা, আচ্ছা, বেটা, দিলি নি, আজ তুমি ইস্কুলথেকে বা'র হও না, তোমাকে এমন গাঁট্টা লাগাব যে, বাপের নাম ভুলিয়ে দেব!"

প্রবোধের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। একবার তাহার মনে হইল, সনৎকে দুই-একখান কাগজদিয়া তাহার ক্রোধ-প্রশমন করিবে, তাহার পর তাহার মনে হইল, জুয়াচুরীর প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়, তাই সে মনে মনে সংকল্প করিল, মার খাই, খাইব, এরকম কুকাজ করিব না।

সনৎ তাহাকে মাঝে মাঝে শাসাইতেই থাকিল; কিন্তু প্রবোধ তাহার কোন কথা আর কাণেই তুলিল না, আপন মনে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে লাগিল।

সনৎ যখন দেখিল, প্রবোধ ভয় পাইতেছে না, তখন লেখা কাগজগুলি মুড়িয়া তাহার নাম লিখিয়া শিক্ষকমহাশয়ের হাতে দিয়া তাড়াতাড়ি পরীক্ষা-আয়তন-ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সনৎ চলিয়া গেলেও, প্রবোধের আতঙ্ক ঘুচিল না, সে মাঝে মাঝে লেখা ছাড়িয়া দুষ্ট সনৎ আজ তাহাকে কত উৎপীড়ন করিবে, তাহাই ভাবিয়া ভয়ে অস্থির হইতে লাগিল।

পরীক্ষা-শেষ হইয়া গেলে, প্রবোধ, সনৎ আজ তাহাকে কি বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে, তাহা একজন সমপাঠীর কাছে বলিল। এই ছেলেটাও ভাল নহে, ভারি দাঙ্গাবাজ; কিন্তু এ প্রবোধকে ভাল ছেলে বলিয়া একটু শ্রদ্ধা করিত; বলিল,—"আচ্ছা, তুমি আজ আমার সঙ্গে যেও, সন্‌তা-বেটা কেমন তোমাকে গাঁট্টা মারে, আমি দে'খ্‌ব।" এই বালক আজ রাস্তার একটা দাঙ্গা বাধাইবার সুবিধা পাইবে, এই আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিল!

এই ছেলেটা কেমন দাঙ্গাবাজ, সনৎ তাহা বিলক্ষণরূপে জানিত, সে আর প্রবোধের ত্রিসীমায় আসিল না, ফলে সে যাত্রায় প্রবোধ বাঁচিয়া গেল।

৪

কিন্তু সনৎ যেমন পরপীড়ক, তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ। সে নিরীহ বেচারা প্রবোধের উপর প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইল। প্রবোধ কিন্তু এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

বেলা তখন প্রায় দশটা। প্রবোধ অন্য দিন ঢের সকালে বিদ্যালয়ে চলিয়া যায়, সেদিন কিন্তু তাহার যেন বিদ্যালয়ে যাইবার কোনই গা নাই। প্রবোধ বড় সুবোধ ছেলে, সে তো কখন এমন করে না, আজ তবে বিদ্যালয়ে যাইতে 'গড়িমসি' করিতেছে কেন? প্রবোধের মা ইহা লক্ষ্য করিল, করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"পোবু, আজ ইস্কুল যা'বে না? বেলা যে ঢের হ'ল।"

প্রবোধ কিছু বলিল না, অপরাধীর মত মুখ করিয়া মায়ের মুখপানে তাকাইয়া রহিল।

"কি রে, পোবু, কি হ'য়েছে, অমন ক'রে আমার মুখপানে তাকিয়ে রইলি কেন?"

"মা, আজ আমার ইস্কুলে যাওয়া হ'বে না।"

"কেন?"

"কাপড় নেই।"

"কেন, যে ধুতিখানা প'রে আছ, ওখানা তো তত ময়লা নয়?"

"পিরেণটা বড্ড ময়লা হ'য়ে গেছে, মা!"

"তা' হোক, তুমি তো আগে এরকম কাপড় প'রে অনেক-বার ইস্কুলে গেছ।"

"আজ-কাল আর যা'বার যো নেই, মা! দু'তিনজন ছেলে বড্ড জ্বালাতন ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। জামা-কাপড় যদি এক রকমের ফর্সা না হয়, তবে, 'পেবা ধোবা, পেবা ধোবা' ব'লে আমায় বড় জ্বালাতন ক'র্‌তে থাকে।"

এই বলিয়া প্রবোধ কাঁদিয়া ফেলিল।

মা বলিল,—"আরে পাগল ছেলে! লোকে ধোবা ব'ল্‌লেই, কি তুই ধোবা হ'য়ে গেলি? যা'রা ওকথা বলে, তা'দের কথা গায়ে না মা'খ্‌লেই হ'ল। আর বেশী যদি জ্বালাতন করে, তবে তুমি মাষ্টারমশাইকে ব'লে দিলেই পার। যাও, বাবা, আর দেরী ক'র' না, ইস্কুলে যাও।"

প্রবোধ। মাষ্টারম'শায়কে ব'লে দিলে, কি রক্ষে আছে, তা' হ'লে তা'রা আমায় রাস্তায় ধ'রে মা'র্‌বে। তা'-ছাড়া কারুর নামে চুকলি কাটা ভাল নয়, মা!

মা। হ্যাঁ, ঠিক ব'লেছ, কারুর নামে চুক্‌লি কাটা ভাল নয়। তবে তুমি কারুর কথা গায়ে মেখ না, যে যা' বলে স'য়ে থেক, বাবা; আমরা গরীব মানুষ, আমাদের অনেক সইতে হয়।

প্রবোধ মায়ের কথায় প্রবোধ পাইল, আর কিছু না বলিয়া জামা গায়ে দিয়া, বইগুলি গুছাইয়া লইয়া স্কুলে চলিয়া গেল।

* * * *

কয় দিনযাবৎ চতুর্থশ্রেণীহইতে প্রায়ই ছেলেদের কিছু-না-কিছু চুরী যাইতেছে। আজ শ্যামাচরণ-নামে একজন ছেলের একখানি নূতন দু'-মুখো ছুরী-চুরী গিয়াছে। শ্রেণীতে তাই হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কে চোর, ধরা পড়িতেছে না। অঙ্কের মাষ্টার আসিয়া সকল ছাত্রের এক এক করিয়া গা-ঝাড়া লইতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি সকলকে নিজ নিজ পকেট দেখিতে বলিলেন। সকলে দেখিল, প্রবোধও দেখিল। কেহ তাহার পকেটে কথিত ছুরীখানি পাইল না। তখন তিনি প্রত্যেক ছেলেকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া স্বয়ং তাহাদের পকেটে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অন্যদিন প্রবোধ ভাল ছেলেদের কাছে বসে, আজ সে দেরী করিয়া স্কুলে আসিয়াছে, তাই বদ্‌মায়েস ছেলেদের কাছে বসিতে বাধ্য হইয়াছে।

সনতের পাশে, কালীচরণ, কালীচরণের পাশে শরৎ, শরতের পাশে ভূতনাথ এবং ভূতনাথের পাশে প্রবোধ বসিয়াছে। যখন অঙ্কের মাষ্টার ছেলেদের গা-ঝাড়া লইতেছেন, তখন কি একটা জিনিস সনৎ গোপনে কালীচরণের হাতে, কালীচরণ শরতের হাতে, শরৎ ভূতনাথের হাতে দিল, ভূতনাথ তাহা খুব সাবধানে বেচারা প্রবোধের পকেটে ফেলিয়া দিল, সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না! তাই যখন তাহার পালা আসিল, সে নির্ভয়ে মাষ্টার-মহাশয়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, তাহার পকেটেই সেই ছুরীখানি পাওয়া গেল। দেখিয়া প্রবোধের মুখখানি যুগপৎ লজ্জা, ভয় ও বিস্ময়ে কেমন একপ্রকার হইয়া গেল।

অঙ্কের মাষ্টার হুঙ্কারস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রবোধ, এ কি? আমি কখন মনে করি নি যে, তুমি চোর। আমি ভাব্‌তুম, তুমি ভাল ছেলে, তা' নয়, তুমি মিট্‌মিটে ডা'ন!"

প্রবোধ জড়িতস্বরে কি বলিল, কেহ বুঝিতে পারিল না; সে দাঁড়াইয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহাতে সংজ্ঞা কতটা রহিল, বলিতে পারি না। তবু তখনও তাহার মুখে যে সরলতাটুকু ফুটিয়া ছিল, তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না।

সকলেই বিশ্বাস করিল যে, প্রবোধ গরীব, অতএব সে-ই চোর। অঙ্কের মাষ্টার তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের কাছে লইয়া গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। প্রধান শিক্ষক প্রবোধকে সুবোধ বলিয়াই জানিতেন, শুনিয়া তিনি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সবিস্ময়ে প্রবোধের মুখপ্রতি তাকাইয়া রহিলেন। তাহার মুখপ্রতি তাকাইয়া তিনি আরও বিস্ময়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন—যাহার মুখের ভাব এমন সরলতামাখান, সে কি কখন চোর হইতে পারে? তবু তিনি প্রবোধকে কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এ ছুরী-চুরী ক'রেছিলে কেন, তোমার একখানা ছুরীর দরকার হ'য়েছিল ব'লে?"

"আমি ছুরী-চুরী করি নি, স্যার!"

"তবে এ ছুরী কি ক'রে তোমার পকেটে এল?"

"তা' আমি জানি না, স্যার!"

"হুঁ, উমাচরণবাবু (অঙ্কের মাষ্টার), এটি একটী বর্ণচোরা আম দে'খ্‌ছি—মুখ দে'খে ম'নে হ'বে, বড় ভালমানুষ, ভেতরবুঝে বদ্‌মাইস। সত্য কথা বল্, নইলে আগাপাস্তলা বিতিয়ে তোর নাম কেটে ইস্কুলথেকে তাড়িয়ে দেব।"

"স্যার, আমি সত্যি ব'ল্‌ছি, চুরী করি নি, কিন্তু ছুরীটা কি ক'রে যে, আমার পকেটে এল, তা' আমি নিজেই বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না। যখন মাষ্টারমশায় সকলের পকেট দে'খ্‌তে বলেন, তখনও ছুরীটা আমার পকেটে ছিল না।"

কেহই অভাগ্য প্রবোধের কথায় বিশ্বাস করিল না। প্রধান শিক্ষকমহাশয় তাহার নাম কাটিয়া তাহাকে বিদ্যালয়হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

প্রবোধ অশ্রুসিক্তমুখে বিদ্যালয়হইতে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ।)

জিউ-জিৎসু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বাহুর উপরিভাগ ও কব্‌জি বলশালী করিবার উপায়—বাহু-দুইটী সম্মুখের দিকে দিয়া খুব সোজা করিয়া রাখ। কব্‌জি-দুইটী মুঠা করিয়া ধর। এখন সোজাভাবে বাহু-দুইটী মাথার উপর উঠাও। পূর্ব্বের মত এই ভাবে দুই বাহু উঠাইতে ও নামাইতে থাক। একা না করিয়া কোন সঙ্গীর সঙ্গে ব্যায়াম-অভ্যাস করিতে হইলেও, ঠিক এইরূপ করিতে হয়। বিপরীত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ করিয়া একজন অন্যজনের পাশে দাঁড়াও। তোমার ডা'ন-হাতের কব্‌জি দিয়া সঙ্গীর ডান-হাতের কব্‌জি ঠেলিয়া দিতে থাক। এইরূপে কব্‌জি-দিয়া ঠেলিয়া একজন অন্যজনের বাহু (হাত) হটাইয়া দিতে চেষ্টা কর। একটু পরে বাম-হাতের কব্‌জি-দিয়া ঐরূপ ঠেলা-ঠেলি কর। এইরূপ কত খানিকক্ষণ করা হইয়া গেলে, তোমার কব্‌জির উপরি-ভাগ-দিয়া ঐপ্রকারে সঙ্গীর উপরিভাগ ঠেলিতে থাক।

বক্ষঃস্থল বলশালী করিবার জন্য জাপানীরা যে একপ্রকার

ব্যায়ামক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা অতি চমৎকার; আর এই ব্যায়াম-ক্রিয়ার দ্বারা বক্ষঃস্থলের সঙ্গে সঙ্গে বাহুযুগেরও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইপ্রকার ব্যায়াম-কার্য্যকে জাপানীয়া যাহা বলে, তাহার অর্থ "কোস্তাকুস্তী"। ইহাতেও দুইজন চাই। দুইজন সম্মুখা-সম্মুখী হইয়া দাঁড়াও। একজন অন্যজনের হাতে হাত দিয়া শক্ত করিয়া ধর; এইরূপে ধরিয়া হাত হাত-খানিক দূরে রাখ। এক্ষণে বুকে বুক দিয়া, একজন অন্যজনকে ঠেলিতে থাক; হাতের কস্তর বেলা যেমন, বুকের কুস্তীকালেও তেমনই একজন খুব জোরে ঠেলিবে, অন্যজন একটু কম জোরে ঠেলিয়া, একটু একটু করিয়া হটিতে থাকিবে। পরে যে হটিয়া গিয়াছিল, সে খুব জোরে ঠেলিবে, অন্যজন একটু কম জোরে ঠেলিয়া, একটু একটু করিয়া হটিতে থাকিবে, বক্ষঃস্থল বলশালী এবং পরিপুষ্ট করণের পক্ষে, বোধ হয়, এমন উপকারী ব্যায়ামক্রিয়া আর নাই। এই ব্যায়াম-ক্রিয়া-অভ্যাস করিতে থাকিলে, বক্ষঃস্থলের সঙ্গে সঙ্গে কব্‌জি এবং উরুদেশেরও বিলক্ষণ বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ-দেশের বলবৃদ্ধির উদ্দেশে যে ব্যায়াম-ক্রিয়া হইয়া থাকে, স্কুলের ছেলেরা প্রায় সকলেই তাহা জানে। তাহারা কিন্তু শারীরিক বলবৃদ্ধির জন্য বড় একটা নয়, আমোদের জন্যই ঐপ্রকার ব্যায়াম করিয়া থাকে। একজনের পীঠে অন্যজন পীঠ দিয়া, দুইজন দাঁড়াও, এবং পরস্পর হাতের (বাহুর) ভিতরে হাত গলাইয়া দিয়া, আঁকড়িয়া ধর। এখন একবার তুমি তাহাকে ধরিয়া তুল, আবার সে তোমাকে তুলুক—এইরূপে তোলা-তুলি করিতে থাক।

পঞ্জরের মাংসপেশী সবল করিবার উপায়—পা ঠিক সোজা করিয়া, অর্থাৎ খুব সোজা হইয়া দাঁড়াও। দুইদিকের পঞ্জরে দুইখানি হাত রাখ। হাত মুঠা করিও না—আঙ্গুলগুলি ঠিক সোজা রাখ। এখন যত পার, একবার সম্মুখদিকে আবার পিছনদিকে বাঁকিতে থাক—কিন্তু পাদমূলহইতে কোমরপর্য্যন্ত সমস্তটা পা যেন ঠিক সোজা থাকে। পরে পাশের দিকে—একবার ডাহিনে, আবার বামে বাঁকিবে।

পায়ের বলবৃদ্ধির জন্য যে ব্যায়াম-ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা বাহুর ব্যায়াম-ক্রিয়ার মতই, একজনে হয় না, দুইজন চাই। হাত-ধরা-ধরি করিয়া দুইজনে সম্মুখা-সম্মুখী হইয়া দাঁড়াও। এখন একজন ডা'ন-পায়ের পাদমূল-দিয়া অন্যজনের ডা'ন-পা পিছন-দিকে ঠেলিয়া দিতে থাক। যদি মাটীতে বসিয়া এই ধরণের ব্যায়াম করিতে চাও, তবে সম্মুখাসম্মুখী হইয়া দুইজন মাটীতে বসিয়া পড়। একজন অন্যজনের হাত ধরিও না—হাত-দিয়া পিছনদিকে মাটীতে ভর রাখ, এবং একজন ডা'ন-পায়ের তলা অন্যজনের বাম-পায়ের তলায়, এবং বাম-পায়ের তলা ডা'ন-পায়ের তলায় ঠেকাইয়া, হাঁটু একটু তুলিয়া পায়ে পায়ে ঠেলা-ঠেলি করিতে থাক।

মানুষের গলার উপরই মানুষের যত রাগ। চাকর কথার অবাধ্য হইলে, আমরা তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র বা গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দি। গলায় মারিতে পাইলে, লোকে তরোয়ালের কোপ শত্রুর গলায় মারে। যখন গলার উপর শত্রুর এত আক্রোশ, তখন গলা "মজবুত" করা আবশ্যক। কয়েকপ্রকার ব্যায়াম করিলে, গলা বেশ শক্ত হইয়া থাকে। এ কয়টী ব্যায়ামই অতি সহজ। প্রথম ঘাড় ও কাঁধ কোর্ট্‌কান। আর একপ্রকার ব্যায়াম, মাথাটা একবার ডান-দিকে, আবার বাম-দিকে যথাসাধ্য ফিরাও। বারকতক এইরূপ করিবার পর, মাথা নামাইবে ও তুলিবে; যখন তুলিবে, তখন যতটা পার, পিছনদিকে হেলাইবে। এইপ্রকার মাথা নাড়াচাড়া ও তোলানামা, সাবধান, তাড়াতাড়ি করিও না। ধীরে ধীরে, নাড়াচাড়া ও তোলানামা করিলে, ঘাড়-গর্দ্দান বিলক্ষণ মজবুত হইবে।

একটী কাজের কথা এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক। এই সকল ব্যায়াম-আরম্ভ করিলে, প্রতিদিন ঠিক সময়ে করিতে হইবে; বেশিক্ষণ না পার, অল্পক্ষণ করিও। আমাদের দেশের ডন্‌গিরেরা বলে, একদিন কুস্তি না করিলে, গায়ে বেদনা হয়। রোজ রোজ ঠিক সময়ে ব্যায়াম করিলে, উপকার হয়, কালেভদ্রে করিলে, কোন উপকার হয় না। ডন্‌গিরেরা সকাল-সন্ধ্যা দুইবেলা দুই-তিন-ঘণ্টা করিয়া কুস্তি করে, তোমাকে তা' করিতে বলি না। তুমি প্রতিদিন খানিকক্ষণ করিয়া ব্যায়াম করিবে, করিলে, শরীর সবল হইবে ও ভাল থাকিবে। এক্ষণে যে ব্যায়ামের বিষয় লিখিব, তাহাতে একজন আক্রমণ করিবে, অন্যজন আত্মরক্ষা করিতে—নিজেকে বাঁচাইতে—যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। এই ব্যায়াম প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে না করিলেই, নয়। একপ্রকার ব্যায়াম ভাল করিয়া না শিখিয়া, অন্যপ্রকার শিখিতে চেষ্টা করিও না। তাহা করিলে একটাও ভাল করিয়া শিখিতে পারিবে না, এবং কাজের সময়ে—কোন শত্রু আক্রমণ করিলে—হয় ত কোনটাই মনে পড়িবে না; কাজেই জিউ-জিৎসু শিখিলে, কোন উপকার দর্শিবে না।

তোমার ডা'ন-হাত-দিয়া, প্রতিপক্ষের বাম-হাত কনুইয়ের

উপরে দিয়া, ঘুরাইয়া কনুয়ের নীচে দিয়া আন, এবং তোমার বাম-হাতে শত্রুর বাম-হাতের কব্‌জি আর নিজের ডা'ন-হাত-দিয়া বাম-হাতের কব্‌জি খুব কসিয়া ধর। এখন ডা'ন-হাত-দিয়া বিপক্ষের হাত উপরের দিকে, এবং বাম-হাত-দিয়া নীচের দিকে চাপিতে থাক। চাপিলে, বিপক্ষের বাহুতে বড় যাতনা হইবে। কিছু লইবার জন্য হাত পাতিলে, হাতের তলা যে ভাবে থাকে, শত্রুর হাতের কব্‌জি এমন করিয়া ধরিবে, যেন তাহার করতল সেইভাবে থাকে। এইভাবে ধরিয়া চাপ দিলে, তাহার হাত চাপ পাইয়া উল্টাদিকে বাঁকিবে, সুতরাং যন্ত্রণা হইবে। এইরূপে তুমি যাহাকে ধরিবে, তাহার আপনাকে বাঁচাইবার উপায় কি তবে? যেই তুমি ধরিবে, সে যদি অমনি বাম-হাঁটু দিয়া তোমাকে পিছনদিক্‌হইতে ঠেলিতে ও ডা'ন-হাত দিয়া তোমার থুৎনিতে ঘুষি মারিতে থাকে, তবে তুমি তাহাকে "কায়দা করিতে" অর্থাৎ তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না; আর যদি বিলম্ব করে, হয় তো তাহার বাম-হাত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

হাত আঁকড়িয়া ধরার ঐরূপ আর একটি উপায় এই—বেশি বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। স্বাভাবিক-অবস্থায় বিপরীতভাবে প্রতিপক্ষের হাত টানিয়া ধরিতে হইবে। গাল পিছন-দিকে বামহাতে ঠেলিয়া দিতে পারিলে, প্রতিপক্ষের আরও যাতনা হইবে। একটি কথা মনে রাখিও, এইপ্রকার ও জিউ-জিৎসুর অন্য-অন্য প্রকার ব্যায়াম "কস্ত" বা অভ্যাস-কালে বেশি জোর যেন দিও না। তবে আপনার রক্ষার জন্য কাহাকেও আক্রমণ করিতে হইলে, যত পার, বল-প্রয়োগ করিতেই হয়।

৩

আর একপ্রকার খুব সহজ হাত-আঁকড়ান আছে। পিছন্‌দিক্‌-হইতে বিপক্ষের বাম-হাতের নীচে দিয়া তোমার বাম-হাত গলাইয়া দিয়া, তাহার ডা'ন-হাত তোমার ডা'ন-হাতে শক্ত করিয়া ধর। অনন্তর তাহার ডা'ন-হাত জোরে টানিয়া তাহার পিঠের মাঝখানে আন। এখন বাম-হাতে তাহার ডা'ন-হাত ধর, এইরূপ করিলে শত্রুর সহজে নড়িবার পথ আর রহিল না। তুমি যখন এইরূপ করিবে, তখন তোমার ডা'ন-হাতে কিছু রহিল না। এইপ্রকারে কেহ তোমাকে আক্রমণ করিলে, পিছন দিক্‌-দিয়া আক্রমণকারীর হাঁটুতে লাথি ও তলপেটে ঘুসি মারিবে। পিছনদিক্‌ দিয়া কেহ আক্রমণ করিলে, প্রায়ই এইপ্রকারে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হয়।

আর একপ্রকার বাহু আঁকড়াইয়া ধরার প্রণালী এই—তোমার বামবাহু এমনভাবে রাখ, যেন বিপক্ষের বামবাহু তোমার বামবাহুর "কায়দার" ভিতরে আইসে। এখন তোমার বাম-হাত-দিয়া বিপক্ষের মাথা ঘাড়ের একটু উপরে ধরিয়া তাহার সম্মুখদিকে ঠেলিতে থাক। এক্ষণে ডা'ন-হাত-দিয়া, বিপক্ষের ডা'ন-বাহু কনুইর কাছে ধরিয়া, তাহার পিছনদিকে টানিতে থাক। আক্রমণকারী বেশি জোর দিলে, আক্রান্ত ব্যক্তির বিলক্ষণ কষ্ট হয়। আপনার রক্ষার জন্য, এ অবস্থায়, সে কেবল আক্রমণকারীকে উল্টা লাথি মারিতে পারে, আর কিছুই করিতে পারে না। কিছু না করা-অপেক্ষা জোরে লাথি মারাই ভাল।
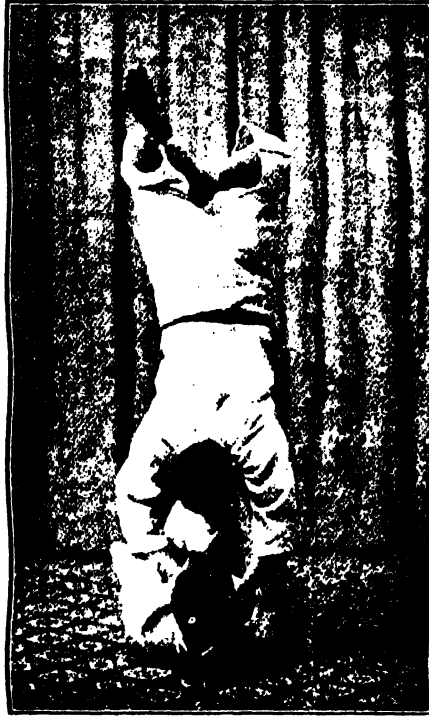
হাত আঁকড়াইয়া ধরার একটা ভাল উপায় আছে। বিপক্ষের সম্মুখে গিয়া, তোমার ডা'ন-হাতে তাহার বাম-হাত এমনভাবে ধরিবে, যেন তাহার হাতের পিঠ বাহিরদিকে থাকে। তাহাতে এই হইবে যে, তোমার হাতের আঙ্গুল-গুলি তাহার হাতের পাতার উপর থাকিবে, এদিকে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুল-দিয়া, হাতের পিঠের দিকে তাহার মধ্যমাঙ্গু-লির গোড়ার নরম স্থান জোরে ঘষিতে পারিবে। পরে তাহার হাত একবার সম্মুখের দিকে, আবার পিছনদিকে খুব জোরে ঠেলিবে। এইপ্রকার বারকতক করিতে পারিলে, বিপক্ষকে ধপাস্‌ করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিতে পারিবে।

এতক্ষণ কেবল হাত-আঁকড়ানর কথাই বলিলাম, এক্ষণে হাতের কোন্‌ স্থানে কিপ্রকার স্নায়ু আছে, এবং কেমন করিয়া স্নায়ু চাপিয়া ধরিলে, বিপক্ষের হাতে বিষম বেদনা জন্মে, এবং খানিকক্ষণের জন্য হাত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা বলিব।

বাহুর গোড়ায়, কাঁধের উপর আঙ্গুল-দুই লম্বা একটী স্নায়ু আছে, এটী খুব সহজেই টের পাওয়া যায়। তোমার নিজের বাহুর স্নায়ুটা আগে বাহির কর; তাহা সহজেই বাহির করিতে পারিবে। ইহা করিলে, বিপক্ষের কাঁধের কোথায় তাহার বাহুর স্নায়ু আছে, তাহা সহজেই জানিতে পারিবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি-দিয়া ঐ স্থান টিপিয়া ধর, আবশ্যক হইলে, আঙ্গুলটা ঘসিতে থাক। এরূপ করিলে, ভারি বেদনা জন্মে, নিজের কাঁধের ঐ স্নায়ু টিপিয়া ধরিলেই, আমার কথা যে ঠিক, তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে।

বাহুর উপরিভাগের ভিতরে আর একটী স্নায়ু আছে। তোমার ডা'ন-হাতে বিপক্ষের বাম-হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ডা'ন-হাতে

শত্রুর বামহাত বেশ সোজা করিয়া ধরিবে। ধরা হইলে, কনুইর যেখানে উচ্চ হাড় আছে, তাহারই একটু উপরে বুড়া-আঙ্গুল-দিয়া খুব টিপিয়া ধরিবে। ঐখানে স্নায়ু আছে। নিজের হাত টিপিয়া এ স্নায়ুটাও নিজেই ঠাওর করিতে পার। আবার বাহুর অগ্রভাগের বাহিরদিকে, কনুইর এক কি দুই-আঙ্গুল নীচে আর একটা স্নায়ু আছে। এই স্নায়ু কশিয়া টিপিয়া ধরিলেও, বিপক্ষের বাহুতে বড় যাতনা উপস্থিত হয়। এইরূপে স্নায়ু চাপিয়া ধরিবার সময়ে যে হাত খালি থাকে, সেই হাতে বিপক্ষের অপর হাত সোজাভাবে, কিন্তু হাতের তলা উপরদিকে রাখিয়া, খুব কশিয়া ধরিবে।

আর যে সকল স্নায়ু চাপিয়া ধরিলে বিপক্ষকে খুব "কাবু" করিতে পারা যায়, সেগুলি কোথায় কোথায় আছে, তাহা বলিতেছি। বাহুমূলের মাঝামাঝি এবং বাহুমূলের দুই-এক-আঙ্গুল নীচে একটী অতি অনুভূতিসম্পন্ন স্নায়ু আছে। এটী বড় কোমল, বৃদ্ধাঙ্গুল-দিয়া টিপিয়া রগড়াইতে থাকিলে, দারুণ যাতনা উপস্থিত হয়। এই স্নায়ু কোথায়, তাহা সহজেই টের পাওয়া যায়, পিছন-দিক্‌হইতে বিপক্ষকে আক্রমণ করিলে, এবং দুই হাতে দুইটী স্নায়ু চাপিয়া ধরিলে, আর নড়িবার সাধ্য থাকে না।

গ্রীবা বা গলায় বিস্তর স্নায়ু আছে—আপনার গ্রীবা-পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই, সহজে তাহা জানিতে পার। গলার পিছন-দিকে, ঠিক মাঝখানে, মেরুদণ্ডের সকলকার উপরের হাড়ের আঙ্গুল-দুই উপরে একটী স্নায়ু আছে। গলার দুই ধারে, কাণের শিরার সোজা-সুজি আরও কতকগুলি স্নায়ু আছে। সম্মুখ বা পিছন-দিক্‌হইতে হাতকে অর্দ্ধচন্দ্রের ভাবে মেলিয়া বিপক্ষের গলা টিপিয়া ধরিলে, বৃদ্ধাঙ্গুলি গলার একদিকের এবং আর সকল অঙ্গুলি অন্যদিকের স্নায়ুসকল চাপিয়া ধরে। যেই ধরা অমনি যদি স্নায়ু ঠিক করিয়া চাপিতে পার, তবেই বিপক্ষ জব্দ। একটু অভ্যাস করিলে, গলার কোথায় কোথায় স্নায়ু আছে, জানিয়া লইতে পার। এ সকল জানিয়া লইতে পারিলে, আক্রমণের সুবিধা ত হয়ই, তাহাছাড়া শত্রু তোমাকে আক্রমণ করিলে, যদি বাগমত তাহার গলার স্নায়ু চাপিয়া ধরিতে পার, সে তোমায় ছাড়িয়া পলাইতে পথ পাইবে না। ক্রমশঃ।

মাকড়সা ও মাছি

(গাথা।)
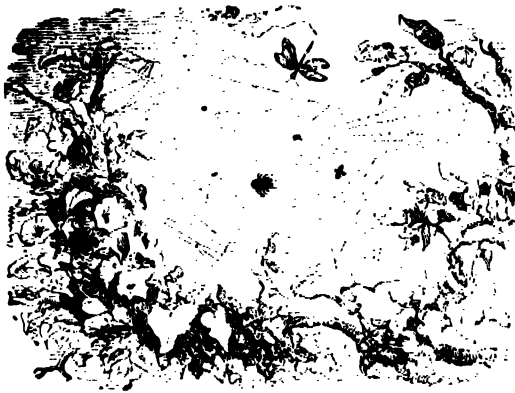
"বৈঠকখানায় মম এস, সখি, এস;
ক্ষুদ্র বটে ইহা, কিন্তু চমৎকার বেশ!"
—উর্ণনাভ সুচতুর কহে মক্ষিকায়—
"এক ঘোরা সিঁড়ি-দিয়া হেথা আসা যায়,
আইলে হেথায় আমি দেখা'ব তোমাকে
কি সুন্দর দ্রব্য সব রহে থাকে থাকে।"
কহে ক্ষুদ্র মক্ষী,—"না, না, বৃথা আমন্ত্রণ
করিতেছ মোরে তুমি, যে করে গমন
সর্পিত সোপান বাহি' তোমার ঐ বাসে,
সে আর জীবনে তা'র ফিরে নাহি আসে।"

"শ্রান্ত তুমি সুনিশ্চিত, প্রিয় সখি, ওই
আশ্রয়বিহীন উর্দ্ধ আকাশে ভ্রমই,
এস, এস, ব'স এসে শয্যা'পরে মোর,
সত্য কহি নাহি হেথা আরামের ওর!
চারিদিকে ফেলা আছে চারু যবনিকা,
আস্তরণ শুভ্র, সূক্ষ্ম,—যেন রে মল্লিকা
বিছায়ে কে রচিয়াছে এ শয্যা কোমল,
বিরাম নিবার এই তো উচিত স্থল।"
মক্ষিকা কহিল, "না, না; শুনিয়াছি আমি,
যে ওই শয্যায় শোয়, তা'র দুখ-যামী
হয় না রে এ জীবনে আর কভু ভোর,—
লোচনে তাহার চির র'য়ে যায় লোর!"

৩

ক্রূরমনা উর্ণনাভ কহে তা'রে তবে,—
"কি করিলে মোর বাক্যে তব আস্থা হ'বে?
কেমনে বিশ্বাস আমি করা'ব তোমায়,
প্রিয় সই, তব তরে আমার হিয়ায়
কি প্রেম জাগিয়া রয়, আহা, অহর্নিশ?
আছে মোর ভাণ্ডারেতে সুস্বাদু জিনিস

কতরকমের উপাদেয়, রুচিকর !
করি নিমন্ত্রণ, এস, স্বাদগ্রহ কর।"
কহিল মক্ষিকা তবে—"কৃপা আপনার
আছে জানা, মহাশয়, জানিবারে আর
চাহে না হৃদয় মোর, ভবদীয় খাদ্য
পরিপাক করিবার নাহি মোর সাধ্য !"

৪

বলে তবে মাকড়সা চতুরের চূড়ামণি,—
"সুন্দরি, রসিকা তুমি, ধীমতী রমণী,
কিবা চারু পক্ষযুগ, কোথা পা'বে পক্ষী !
উপমারহিত তব ওই দুই অক্ষি !
একবার দে'খে যাও মম দরপণে
তোমার অনুপ রূপ আপন নয়নে।"
মক্ষী কহে,—"ধন্যবাদ করি, মহাশয়,
আপনার স্তুতিবাদ তরে, আজ নয়,
আসিব অপর দিন, মহাশয়-সনে
সেই দিন কুণ্ঠিত না হ'ব আলাপনে।"
এত বলি' গেল মক্ষী পক্ষ বিথারিয়া
অকস্মাৎ মহাবেগে কোথায় উড়িয়া।

৫

উর্ণনাভ পশে তবে আলয়ে আপন
ভাবে, "কোথা যা'বে মক্ষী ? পুনঃ আগমন
করিবে নির্ব্বোধ।" দিল তাই সে তখন
সুজটিল জাল এক রচনায় মন।
তা'র পরে মক্ষীটারে করিতে ভোজন
পাতিয়া রাখিল তা'র আসন-বাসন।

৬

অতঃপর পুনরায় আসিয়া বাহিরে
গায়িতে লাগিল গান সুধীর সমীরে—
"এস, এস চারু মক্ষী, পক্ষে যার মতি,
কি শোভন বেশ তব, মুকুটে কি জ্যোতিঃ !
নয়ন-যুগল তব নক্ষত্র-উজ্জ্বল,
কি বিশ্রী আমার নেত্র নিষ্প্রভ, সমল !"

৭

হায়, হায় চতুরের শুনি, চাটুবাণী
ভাবিল না মক্ষী তা'র কি হইবে হানি।
আপনার রূপে মূঢ় আপনি মোহিত,
উর্ণনাভ-পাশে আসে ফিরিয়া ত্বরিত।
করি ভণ্‌ভণ্‌-ধ্বনি, বেড়ি উর্ণাজাল
ঘুরিতে লাগিল মাছি ধরি' কিছুকাল।
ক্রমে ক্রমে মতিভ্রমে যথা রহে জাল,
তথা অগ্রসর হয় ; জানে না যে কাল
ফাঁদ পাতি' তা'র আছে ওৎ পেতে,
ধরিলে, জীবনে আর দেবে না'ক যেতে।

৮

একটু একটু করি' আসে মক্ষী ঘেঁসে,
ভাবে, তা'র কিবা রূপ, শোভে সে কি বেশে !
ছিল অসতর্ক, তেঁই সহসা উর্ণায়ু
ঝম্প দিয়া তা'র পরে হরে তা'র আয়ু !

* * * *

স্থাপিত ক'র' না আস্থা স্তাবকের স্নেহে
পশিতে দিও না সেই প্রতারকে গেহে।
স্তুতি শুনিবারে কভু পাতিও না কাণ,
স্তুতি মতিভ্রংশ করে, হরেও সে প্রাণ।

কালোয়াৎ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই আজগুবি ধরণের চড়ুইপাখীর ইতিহাস ত এই। সে সর্ব্বদাই শালিক, কাক ইত্যাদি পাখীকে ছোট ছোট ডাল-পালা-সংগ্রহ করিয়া, দ্বারী-জজের ঝাউ-গাছে বাসা-তৈয়ার করিতে দেখিয়াছে। তাই নিজেও ঐ সকল সামগ্রী-দিয়া, জলটুঙ্গির ফোঁকরে বাসা-তৈয়ার করিল। আগেই ত বলিয়াছি, তানসেন অন্যের অনুকরণ করিতে খুব ভাল বাসে। যাহারা বড়ই অনুকরণ-প্রিয়, আমরা তাহাদিগকে "নকলনবিশ" বলি।

স্কুলের ঘড়ীতে চারিটা বাজিবার একটু আগে তানসেন বাসায় ফিরিয়া আসিল। আজ একা নহে, সঙ্গে এক সঙ্গিনী আছে। সেদিন মিশন-স্কুলের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার নীচে একটা যুবতী চটকীর স্বয়ম্বর-উপলক্ষে যে গণ্ডগোল হইয়াছিল, তাহা পাঠকের মনে আছে ত ? ভাল করিয়া দেখ ত, এই চটকী সেই প্রগল্‌ভা যুবতী চটকী কি না ? হাঁ, এ সেই বটে। এ তানসেনকে বরমালা-দান করিয়াছে। এ হয় ত তানসেনের গান শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছে

বরমালা-দান করিয়াছে বটে, কিন্তু তানসেন কাছে ঘনাইয়া

আসিলে ঠোক্‌রাইতে যায়, ঠোক্‌রায় না কিন্তু। তবু সে নানা-রঙ্গভঙ্গী করিয়া কাছে যায়, কখনও শ্যামা-পাখীর ডাক ডাকে। কখনও বা টুং-টাং করিয়া সেতারের গৎ ভাঁজে। ফলে তাহার বড় আনন্দ।

এ চটক-যুবতীর কি নাম রাখিব? ইহার নাম রাখা যাউক—গৌরবিনী।

অবশেষে গৌরবিনীর পর-পর-ভাব দূর হইয়া গেল। বোধ হয়, তানসেনের আচার-ব্যবহারের আজগবি ধরণ-ধারণ তাহার ভাল লাগিল। এইবার তানসেন গৌরবিনীকে গাছে লইয়া চলিল। আজ তানসেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে। তানসেন আগে, গৌরবিনী তাহার পিছনে চলিল। তানসেন হেলিয়া দুলিয়া পা ফেলে, দু' পা গিয়া, ফিরিয়া গৌরবিনীর দিকে তাকায়, কিচিরমিচির করিয়া কত কি বলে; আবার এক-একবার শ্যামা-পাখীর ডাকও ডাকে। উভয়ে ফোঁকরের মধ্যে বাসায় গেল, কিন্তু যাইতে না যাইতে যুবতী বাহিরে ফিরিয়া আসিল। মুখ দেখিয়া বোধ হইল, এ বাড়ী তার মনে ধরে নাই। তানসেনও এবার খাঁটি চটক-স্বরে কি বলিতে বলিতে গৌরবিনীর পিছনে পিছনে বাহিরে আসিল। আমরা এদের ভাষা জানি না, তবু বোধ হইল, তানসেন যেন সাধ্যসাধনা করিতেছিল। অনেক বাক্যব্যয়ের পর আবার গৌরবিনী ঘরের ভিতর গেল, কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই ভর্ৎসনা করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল—এ ভর্ৎসনা কিন্তু আদর-মাখা। তানসেন আবার বিশেষ সাধ্য-সাধনা করিল, অনেকরকমে বুঝাইল, অবশেষে গৌরবিনী আবার বাসায় গেল, কিন্তু কি যেন বকিতে বকিতে গেল। বোধ হয়, তানসেনকে মিঠা-কড়া দু'কথা শুনাইয়া দিল। এইবার গৌরবিনী বাসাহইতে একটুক্‌রা কঞ্চি ঠোঁটে করিয়া আনিল, আনিয়াই নীচে ফেলিয়া দিল। যেই ফেলিয়া দেওয়া অমনি উড়িয়া অদৃশ্য হওয়া। তানসেন এইবার বাহিরে আসিল। বাড়ী—যেমন তেমন বাড়ী নয়, শালিকের বাসার মত বাসা—তৈয়ার করিয়াছে বলিয়া, তাহার মনে যে আনন্দ ও অহঙ্কার হইয়াছিল, তাহা, গৌরবিনীর উড়া দেখিয়া যেন উড়িয়া পলাইল। সে ভাবিয়াছিল, ঘর দেখিয়া গৌরবিনী বড় খুশি হইবে, তা' না হইয়া চলিয়া গেল—মনের ভিতর সন্দেহ কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল। সে বাসার দ্বারে বা ফোঁকরের মুখে অতি বিরসবদনে মুহূর্ত্ত-দুই দাঁড়াইয়া রহিল, আর চিরিক্ চিরিক্ করিতে লাগিল, বোধ হয়, যেন বলিতে লাগিল, "এস, মাথা খাও, ফিরে এস;" কিন্তু তাহার প্রণয়িনী ফিরিয়া আসিল না। এইবার সে আপনি ফোঁকরের ভিতরে বাসায় গেল। গিয়াই, একটু কিচিরমিচির করিয়া, একটুক্‌রা কঞ্চি মুখে করিয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া, গৌরবিনী আগেকার কুটাগাছটা জলটুঙ্গির ভিতের গাছের গোড়ায় যেখানে ফেলিয়া দিয়াছিল, ঠিক সেইখানে ফেলিয়া দিল। সে আবার বাসায় গেল, আবার একগাছা কুটা আনিয়া নীচে ঠিক একই স্থানে ফেলিয়া দিল। এইরূপে অনেকবার যাওয়া-আসা করিয়া, এত যত্নে যে সকল ডালপালা আনিয়া ঘর বানাইয়াছিল, সে সকল ফেলিয়া দিল। একগাছি কাঠি ছিল তে-কাঠার মত, সে গাছিটা ফোঁকরের ভিতর বড় কষ্টে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সে কাঠি-গাছটাও অনেক কষ্টে আনিয়া ফেলিয়া দিল। আর দুইগাছা বাখারির চটা ছিল, ঠিক মঙ্গলু-মিস্ত্রীর মাপের ফিতার মত—কিন্তু ছোট ছোট—অতি পরিষ্কার, চাঁচা-ছোলা—সেই বাখারির চটা-দুইটুক্‌রাও আনিয়া ফেলিয়া দিল। বেচারা নীরবে এক ঘণ্টা-কাল এই করিল,—একাই করিল, গৌরবিনী ত চলিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, ফোঁকরের ভিতরে আর কুটা-কাটা কিছু নাই—কারণ জলটুঙ্গির বুনিয়াদের গোড়ায়, কাদার উপর বিস্তর কুটাকাটা জমা হইয়াছে—বেচারার এক সপ্তাহের পরিশ্রম মাটী। তানসেন গাঁজা-খোরদের মত দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বাসা-ভাঙ্গা কুটা-কাটার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিল—দাঁত থাকিলে, নিশ্চয়ই দাঁত-কড়-মড় করিত। একবার ফোঁকরের ভিতরেও গলা বাড়াইয়া দিয়া দেখিল। মুখ বড়ই মলিন। কিচির-মিচির করিয়া কি যেন বলিল। "লক্ষ্মী ছাড়ী, পোড়ামুখী" বলিয়া চটক-ভাষায় গৌরবিনীকে গালি দিল, দিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

পরদিন তানসেন আবার আসিল—একা নয়, সঙ্গে কে? গৌরবিনী! কন্যাকার মত আদর-মাখা কিচির-মিচির-শব্দ করিতে করিতে গৌরবিনীকে ফোঁকরের মুখে আবার লইয়া গেল! গৌরবিনী সলম্ফ "পাদবিক্ষেপে" ভিতরে গেল, আবার বাহিরে আসিল, আসিয়া, নীচের দিকে তাকাইয়া, যেখানে কুটাকাটা সব ছিল, দেখিতে লাগিল। আবার ফোঁকরের ভিতরে গিয়া, তানসেন যে একগাছা অতি ছোট কুটা ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহা মুখে করিয়া আনিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। আবার কুটা-গাছটা যে ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে পাঁকের উপর পড়িল, একমনে তাহা দেখিল।

এইবার কর্ত্তা-গৃহিণী উভয়ের মুখে হাসি দেখা দিল। উভয়ে বারবার ফোঁকরের ভিতর যাওয়া-আসা করিল। পরে দুইজনে একসঙ্গে উড়িল, একটু পরে দুইজন একসঙ্গেই ফিরিয়া আসিল; গৌরবিনীর ঠোঁটে কতকগুলি শুষ্ক দূর্ব্বা-ঘাস, আর তানসেনের ঠোঁটে একগাছা খড়। এইগুলি লইয়া, দুইজনে একে একে ফোঁকরের ভিতরে গেল—যাইতে যাইতে গৌরবিনী কিচিরমিচির করিয়া যেন বলিল, "এইবার আমার মনের মত ঘর বানাইব।" ফলে ঘাস ও খড় মনের মত করিয়া সাজান হইল। আবার দুইজনে গিয়া আরও গাছ-দুই-তিন খড় লইয়া আসিল। গৌরবিনী সেগুলি সাজাইতে থাকিল, তানসেন আবার খড় আনিতে গেল। এইরূপে তানসেন খড় আনিয়া দিতে, আর গৌরবিনী সেই খড় বাসায় সাজাইতে লাগিল। গৌরবিনী আর খড় আনিতে

টাওয়ার অব্ লণ্ডন—(হোয়াইট টাওয়ার)।
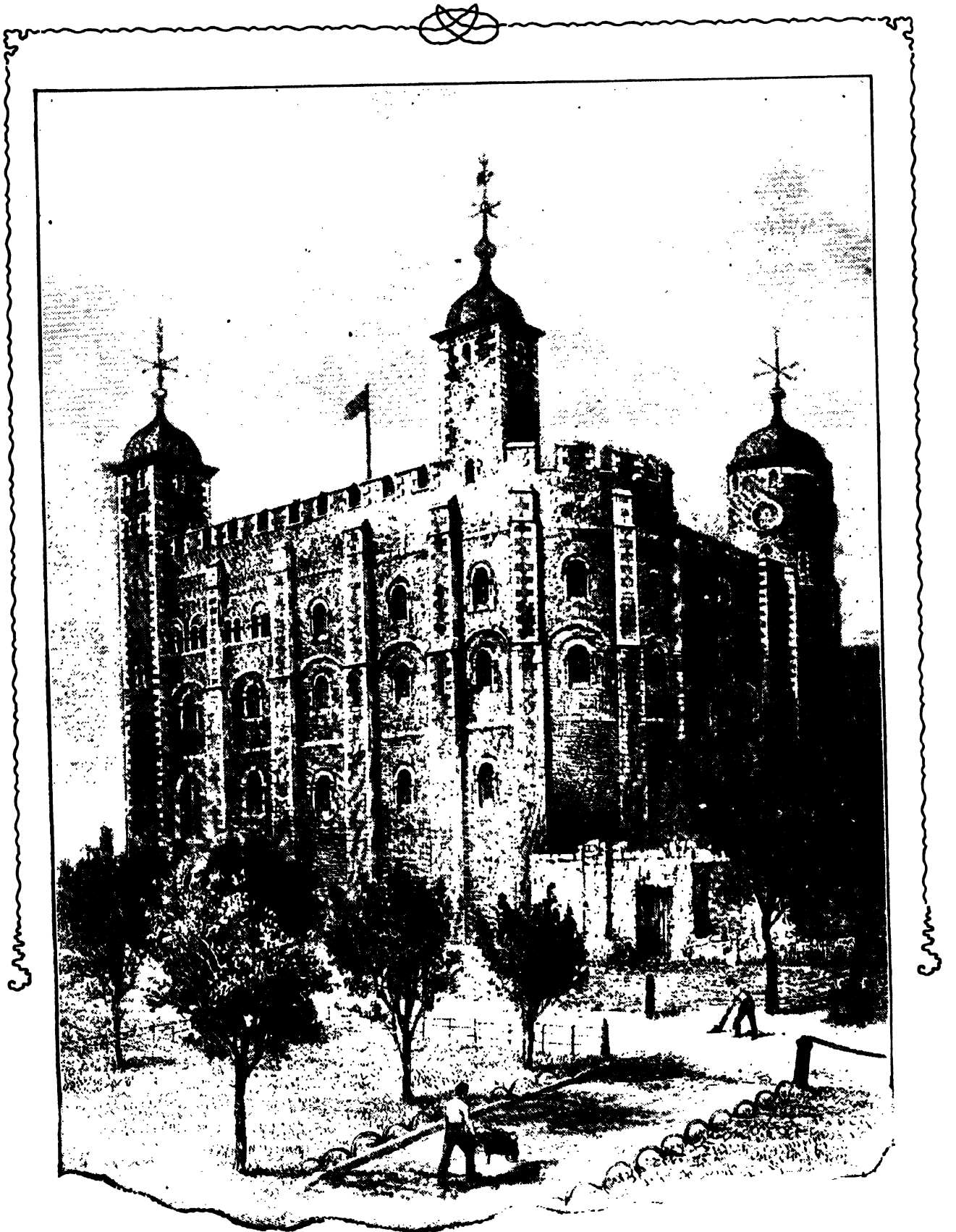
যায় না, কেবল, তানসেনের আনিতে বিলম্ব হইলে, এক-আধবার গিয়া দেখে, কেন বিলম্ব হইতেছে। মঙ্গলু-খলিফার সেতারের "সাক্‌রেদ" তানসেনের মেজাজ বড় গরম ছিল, কিন্তু গৌরবিনীর হাতে পড়াতে গরম মেজাজ ক্রমে নরম হইতে লাগিল। একদিন ভাবিলাম, এই চটক-চটকীর, কাহার কিপ্রকার রুচি, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়। জলটুঙ্গির গোলঘরে যাইবার পুলের রেলিঙ্গের উপর আমি একদিন পনেরো-গাছা পাটের দড়ির টুক্‌রা, আটগাছা লাল সূতার আর সাতগাছা রেশমী ফিতার ছোট ছোট টুক্‌রা রাখিয়া দিলাম। এই সকল জিনিস প্রথমে গৌরবিনীর চোকে পড়িল। সে নামিয়া আসিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া দড়ি, সূতা ও ফিতাগুলি দেখিল। আবার মন্দদৃষ্টি যুবকেরা যেমন করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বই খুলিয়া দেখে, তেমনি করিয়া, একবার এ চোকে, আবার ও চোকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; স্পর্শ করিল না। কিন্তু তানসেন অগ্রসর হইয়া আসিল, এইপ্রকার দড়ি, সূতা ও ফিতা উহার পক্ষে নূতন জিনিস নহে, মঙ্গলুর দোকানে এ সকল বিস্তর দেখিয়াছে। সে কাছে আসিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, দড়ির একটুক্‌রায় ঠোকর মারিল। রেশমী ফিতা ঠোঁট-দিয়া উল্টাইয়া দেখিল, অবশেষে একগাছা সূতা ঠোঁটে করিয়া উড়িয়া গেল। আবার আসিল—তানসেন ও গৌরবিনী দুইজনেই—এক-এক-জনে এক-এক-গাছা দড়ি ঠোঁটে করিয়া লইয়া গেল; কিন্তু এ টুক্‌রাগুলি পাটের দড়ির, দেখিতে ভাল নহে। এই সকল ফুরাইয়া গেলে, গৌরবিনী লাল সূতার টুক্‌রা লইল; রেশমী ফিতার কাছে যাইতে যেন ভরসা হইল না। তানসেনের ও সকল মনে ধরিল না। সে চায় একটু শক্ত জিনিস। যে জিনিস দেখিতে কাঠিপানা, এবং একটু মোটা, তাহার মতে বাসা-নির্ম্মাণের উপযোগী জিনিস তাহাই। তাহাদের বাসা-নির্ম্মাণের কার্য্য অনেকটা হইয়া আসিয়াছে। আবার একদিন তানসেন একগাছা নারিকেল-ঝাঁটার ছোট কাঠি আনিয়া বাসায় রাখিল; কিন্তু গৌরবিনীর তাহা মনে ধরিল না—সে ঠোঁটে করিয়া তুলিয়া নীচে ফেলিয়া দিল, কাঠি-গাছটা ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে পড়িল, আর গৌরবিনী সগর্ব্বে দেখিতে লাগিল। বেচারা তানসেনের "মুন্সি-গিরি" খাটিল না,—আর কেন কষ্ট করিয়া এমন ভাল ভাল কঞ্চির টুক্‌রা কুড়াইয়া আন? জজের বাগানের ঝাউ-গাছে খড়-কুটার যে বাসা দেখিয়াছ, তাহা শালিকের বাসা। সেরকম বাসায় চড়ুই-পাখীর চলে না। এক্ষণে হয় ত তাই বুঝিতে পারিয়া, গৌরবিনীর ইচ্ছামত কাজ করিতে লাগিল। এতদিন তানসেন অসংসারী ছিল, সুতরাং স্বাধীন ছিল, যা' খুশি, তাই করিত; এখন সংসারী হইয়া গৃহিণীর মতে মত দিতে শিখিল। সে বরাবর মনে করিয়া আসিয়াছে যে, কলিকাতা-সহরে মঙ্গলু-খলিফার দোকান প্রধান স্থান, আর সে নিজে সহরের প্রধান লোক; কিন্তু এই কয়দিনে তাহার এ ভ্রমের বিলক্ষণ খণ্ডন হইয়াছে, আর গৌরবিনীও বেশ বুঝিতে পারিল যে, তানসেন ঘরকন্নার কাজ-কর্ম্ম ছেলেবেলাহইতে কিছুই শিখে নাই, সুতরাং বাড়ী তৈয়ার করিতে কখন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন, তাহা উহাকে শিখাইয়া দিতে হইবে।

গৌরবিনীর ইচ্ছা, বাসাটী দেখিতে সুন্দর এবং খুব আরামের হয়, তাই দশ আনা আন্দাজ কাজ-শেষ হইলেই, সে নরম পালক ও তুলা ইত্যাদি বেশি করিয়া আনিতে লাগিল। এই দেখিয়া তানসেন ভাবিল, গিন্নীর এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। শালিক-পাখী তো ভদ্রলোক, তা'দের বাচ্ছারাও খড়-কুটার বাসায় মানুষ হয়। তাই সে একদিন, গৌরবিনী বাহিরে গেলে, কতকগুলি নরম পালক ঠোঁটে করিয়া তুলিয়া, ফোঁকরের মুখের কাছে আনিয়া ফেলিয়া দিল, দিয়া আবার ভিতরে গেল। এমন সময়ে গৌরবিনী আসিয়া উপস্থিত। সে দেখিতে পাইয়া, কচরমচর করিয়া কি বলিল, পরে উড়িয়া গিয়া পালকগুলি ঠোঁটে করিয়া ধরিল, এবং ফোঁকরের মুখে গেল। দেখে, তানসেন আর একতাড়া পালক মুখে করিয়া আসিতেছে। দুইজনে বাড়ীর সদর দরজায় সম্মুখাসম্মুখী হইয়া দাঁড়াইল। দুইজনেরই ঠোঁটে পালক, দুইজনের মেজাজ ভারী গরম; বিলক্ষণ বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই জনেরই মুখহইতে দুই-একটী করিয়া পালক উড়িয়া পড়িতে থাকিল।

ঘরকন্নার বিষয়ে সকল দেশে ও সকল প্রাণিসমাজেই স্ত্রী-লোকের কথা "হাইকোর্টের নজির।" তাই ভাবিলাম, তানসেনের এ ভারী অন্যায়। অবশেষে গৌরবিনীর কথাই শাস্ত্রবাক্যবৎ শিরোধার্য্য হইল। প্রথমে তুমুল ঝগড়া, চেঁচামেচি, পালক-ফেলাফেলি হইল; অনেক পালক বাতাসে উড়াইয়া বাগানের এখানে সেখানে লইয়া গেল। একটু পরে দুইজনেই চুপচাপ। পরদিন সমস্ত পালক আবার কুড়াইয়া বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। কেমন করিয়া যে, ঝগড়া মিটিল, জানি না—পরের ঘরের কথা জানিতে চাইও না, কিন্তু দেখিলাম, খাটুনীটা বেশি হইল তানসেনের। সে ভাল ভাল, শাদা শাদা, নরম নরম বিস্তর পালক আনিয়া দিল; যতদিন যথেষ্ট আনা না হইল, একদণ্ডও বিশ্রাম করিল না। এ কয় দিন দুইটীকেই অষ্টপ্রহর একসঙ্গে দেখিতে পাইলাম; কিন্তু একদিন গৌরবিনী কোথায় চলিয়া গেল। তানসেন বাহিরে আসিয়া এ-ছাদ ও-ছাদ দেখিল। নীচের দিকে তাকাইয়াও দেখিল; কিন্তু গৌরবিনীকে দেখিতে পাইল না—কেবল গোড়ায়, কুটাকাটাগুলি পড়িয়া আছে, ইহা দেখিল। দেখিয়া শৈশবের কথা মনে পড়িল। এইরূপ কুটাকাটায় তৈয়ারি বাসায় সে শালিকের বাচ্ছাদের গলা বাড়াইয়া মায়ের পথ চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। ইচ্ছা হইল, ঐগুলি তুলিয়া আবার আনে। সেই যে তেকাটা কঞ্চির টুক্‌রাটা, সে টুক্‌রাটাও সেইখানে পড়িয়া-ছিল। তানসেন সে গাছটা তুলিয়া আনিয়া বাসার ভিতরে রাখিল। সেবারে যেমন, এবারেও ফোঁকরের ভিতরে তে-কাটা কঞ্চির টুক্‌রা লইয়া যাইতে ও গুছাইয়া রাখিতে বিলক্ষণ কষ্ট হইল। সে বাহিরে

আসিয়া, দুই-এক-বার মনের আনন্দে শ্যামা-পাখীর ডাক ডাকিল। আবার একগাছা কুটা তুলিয়া বাসার ভিতরে রাখিল। বড়ই খুশি! এমন সময়ে গৌরবিনা কতকগুলি পালক লইয়া আসিল। দুইজনে মিলিয়া সেগুলি বাসায় ঠিক করিয়া রাখিল। এইবারে বাসার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইল। আর কিছু করিতে নাই। দুইদিন পরে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দেখি, বাসায় একটী ডিম। চড়ুই-পাখী-দুইটী আমাকে সিঁড়ি দিয়া বাসায় উঠিতে দেখিল, কিন্তু কাকের মত চেঁচাইতে ও আমার মাথার উপর ঘুরিতে লাগিল না; তাহারা উড়িয়া নিকটস্থ একটা গাছের ডালে বসিয়া, নিতান্ত ব্যস্তভাবে দেখিতে লাগিল, আমি কি করি।

তৃতীয় দিন চড়ুই-পাখীদের বাসায় তুমুল কাণ্ড হইতে লাগিল। অনবরত কিচিরমিচির। দুই-একবার ফোঁকরের মুখে একটা পাখীর লেজ দেখা গেল। ভাবে বোধ হইল, একটা চড়ুই যেন বাসাহইতে পিছাইয়া বাহিরে আসিতে চেষ্টা পাইতেছে। তাহার পরে বোধ হইল, যেন কিছু টানিয়া বাহিরে আনিতেছে। ক্রমে এতটা বাহিরে আসিল যে, দেখিয়াই চিনিলাম, এ গৌরবিনী। কিন্তু আবার যেন কিছুতে টানিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। বেশ টের পাওয়া গেল যে, কর্ত্তাগৃহিণীতে কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে। কেন এরূপ হইল, প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। অবশেষে দেখি, তানসেনের আদরের ধন সেই কঞ্চির টুকরাখানা গৌরবিনী টানিয়া, অতিকষ্টে বাহির করিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। তানসেন সে গাছটা এক কোণে পালক-চাপা দিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল; তাই বাহির হইয়া পড়াতেই ঝগড়া; কিন্তু বাধা দিলেও গৌরবিনী সে গাছটা টানিয়া আনিতে পারে না। বোধ হয়, পাছে সংসারে একটা অশান্তি জন্মে, এই ভাবিয়া তানসেন একটু নরম হইয়া গিয়াছিল। সেই কঞ্চির টুকরা লইয়া টানাটানি করাতে, এমন হইল যে, ডিমটী সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া নীচে শানের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এই ডিমটী বেচারাদের প্রথম ফল; কিন্তু ভাব দেখিয়া বোধ হইল, এই ক্ষতি যেন উহারা বড় একটা গায়ে মাখিল না। বাসাহইতে যখন পড়িয়া গেল, তখন আর ত পাইবার আশা নাই, এরূপস্থলে দুঃখে হাইল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। (ক্রমশঃ)

বিপদ্‌-বারণ।

রেলগাড়ী চড়িয়া কোন জায়গায় যখন আমরা যাই, তখন যদি গাড়ীহইতে মুখ বাড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে চোকে অনেক সময়ে কয়লার কণা আসিয়া পড়ে। ঐ কয়লার কণা কি করিয়া চোকহইতে বাহির করা উচিত? হাতদিয়া চোক কচ্‌লাইলে, কয়লায় চোকের তারকা ছড়িয়া যায়, সুতরাং হাতদিয়া চোখ-রগ্‌ড়ান উচিত নহে; যদি আমরা অনুভব করিতে পারি যে, কয়লার কণাটা এদিকে ওদিকে নড়িতেছে, তাহা হইলে প্রথমে আমাদের মুহূর্ত্তেক চোক বুজিয়া থাকিয়া দেখা উচিত, কণাটা আপনিই বাহির হইয়া যায় কি না। জোরে নাক ঝাড়িতে থাকিলে, কখন কখন চোকের কুটা বাহির হইয়া যায়। তাহাতেও যদি কিছু না হয়, তাহা হইলে আমরা বুড়া-আঙুল ও তর্জ্জনীদিয়া চোকের পাতা ধরিয়া আস্তে আস্তে পাতাটা নাকের দিকে একটু টানিয়া ধরিলে, কয়লার কণিকা বা কুটাটা বাহির হইয়া যাইতে পারে। যদি কুটাটা চক্ষুতারকার উপরিভাগে কোন স্থানে সংলগ্ন থাকে, তাহা হইলে এইরূপে সরিয়া যাইতে পারে। অন্যথা আমরা কোঁচার খুঁট পাকাইয়া চোকের তারকার উপরিভাগে বুলাইয়া কুটাটাকে সরাইয়া দিতে পারি; তখন একটা দর্পণ-ব্যবহার করিতে পারিলে, ভাল হয়। ঠাণ্ডা-জল দিয়া চোক ধুইলে এবং ঠাণ্ডা জলের মধ্যে চোক ডুবাইয়া খুলিলে, বেদনার শান্তি হয়। যদি কোন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চোকে আসিয়া লাগে, তাহা হইলে এক-ফোঁটা রেড়ীর তেল চোকে দিলে, আরাম-বোধ হইবে।

* * * *

কাণের মধ্যে হঠাৎ যদি পোকা ঢুকিয়া যায়, তাহা হইলে কাণটা রৌদ্রের বা আলোকের দিকে ফিরাইলে, পোকাটা আপনিই বাহির হইয়া আসিবে। যদি অন্য কিছু কাণে ঢুকে, তাহা হইলে কাণে কাটি দিয়া তাহা বাহির করার চেষ্টা করা উচিত নয়, তাহাতে কর্ণপটহে আঘাত লাগিতে পারে। তখন যদি আমরা কাণে জল ঢালিয়া দিই, তাহা হইলেও কোন লাভ হইবে না, বরং যে জিনিসটি কাণে ঢুকিয়াছে, সেটি ফুলিয়া উঠিতে পারে। তবে কি করা উচিত? তখন কাণ মাটীর দিকে করিয়া কাণের পিপুলপাত আস্তে আস্তে টানিতে থাকিলে, উপকার হইতে পারে। অন্যথা চিকিৎসকের আশ্রয় লওয়াই বিধেয়।

* * * *

নাকদিয়া যদি রক্ত পড়িতে থাকে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে? যদি সামান্য রক্ত পড়ে, তাহা হইলে নাকদিয়া ঠাণ্ডা জল টানিয়া লইলে, রক্তপড়া বন্ধ হইতে পারে। অন্যথা একটা রুমাল ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া নাসামূলে লাগাইলে ভাল হইবে, তখন কিন্তু একখানি চৌকীতে বসিয়া মাথাটা পিছনে হেলাইয়া এবং একটা চাবি ঘাড়ের পিছনে রাখিতে হইবে। জলের গাম্‌লা সাম্‌নে রাখিয়া ঝুঁকিয়া থাকা উচিত নহে। যদি অনবরত হুহু করিয়া রক্ত পড়িতে থাকে, তাহা হইলে বরফ আনাইতে এবং নাকের ছিদ্র তুলাদিয়া বন্ধ করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতে

হইবে। তখন আমার গলার বোতাম খুলিয়া ফেলিতে হইবে, হাত-দুইটি মাথার উপরদিকে রাখিতে হইবে, এবং নির্ম্মল বায়ুর নিশ্বাস লইতে ও পায়ে গরমজলপূর্ণ রবারের বোতলের সেঁক দিতে হইবে। সেইসঙ্গে অবিলম্বে ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইতে হইবে।

* * * *

খেলা করিতে করিতে তোমাদের শরীরের কোন-না-কোন স্থানে আঘাত লাগে। উহার একটী ঔষধ হইতেছে, কোন ঠাণ্ডা জিনিস, যেমন বরফ বা ছুরীর ফলা কিম্বা পরিষ্কার নেকড়া, ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া ছড়া জায়গায় লাগাইয়া রাখা। যে অঙ্গে আঘাত লাগিয়াছে, সে অঙ্গের চালনা করা উচিত নহে। এক চায়ের পেয়ালাপূর্ণ জলে চায়ের চামচের এক চামচপূর্ণ "আর্ণিকা" মিশাইয়া সেই জলদিয়া, আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ যদি ছিঁড়িয়া না গিয়া থাকে, ধৌত করিলে আরাম পাওয়া যায়। আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গটির চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া গেলে কালেণ্ডিউলা-প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়, তবে আহত অঙ্গটিহইতে প্রথমে ধূলি বা কঙ্কর মুছিয়া বা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। যদি আহত স্থানটি বড় বেশী ছড়িয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে পরিষ্কার নেকড়াদিয়া ক্ষত আচ্ছাদিত করিতে হইবে, কখন কখন খুব গরমজলে ধৌত করিলে, শীঘ্রই আরাম পাওয়া যায়।

* * * *

কোন রুগ্ন বিড়াল, কুকুর কিম্বা অন্য কোন জন্তু কামড়াইলে তাহার থুথু আমার রক্ত বিষাক্ত করিয়া ফেলিতে পারে। আঙুল কামড়াইলে, যেখানে কামড়াইয়াছে, তাহার একটু উপরিভাগ তখনই কশিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর ক্ষতস্থান চুষিয়া থুথু ফেলিতে হইবে। অনন্তর যেই গরমজল পাইবে, অমনই ক্ষতটি ধুইয়া ফেলিতে হইবে, তখনও রক্ত পড়িতে থাকিলে, ভালই হইবে। তাহার পর, একটী পলিতা ধরাইয়া ক্ষত স্থানটিতে ছেঁকা দিতে হইবে। কোন পোকা কামড়াইলে, একটু মাথা ঘষিবার বা গুঁড়া সোডা অল্প সিক্ত করিয়া লইয়া ক্ষত স্থানে মলিলে, ভাল হইবে।

বোল্‌তা বা মৌমাছি কামড়াইলে, দষ্টস্থানটি টিপিয়া ধরিলে কিম্বা তদুপরি আঙটি দিয়া ঘষিতে থাকিলে, হুল বাহির হইয়া যাইতে পারে।

* * * *

হঠাৎ কোন পুকুরে বা নদীতে পড়িয়া গেলে এবং সাঁতার না জানা থাকিলে, কি করা উচিত? চেঁচাইয়া দম বাহির করা উচিত নহে, হাঁপঝাঁপ করা উচিত নহে; প্রত্যুৎপন্নমতিতার সহিত যদি আমরা চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে জলই আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখিবে। বাস্তবিকই আমাদের হাত নীচু করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকাই উচিত, অনন্তর কেহ যেন আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য করে, তজ্জন্য অবশ্য আমাদিগকে চেঁচাইয়া লোক ডাকিতে হইবে, কিন্তু তখন অধীর হইয়া কোনই লাভ নাই। পরে আমাদের সাহায্যার্থে কেহ যদি বাঁশ বা দড়ি বাড়াইয়া দেয়, তাহা আমাদিগকে ভাল করিয়া মুঠাইয়া ধরিতে হইবে; কিন্তু কোন মানুষ যদি আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসেন, তাহা হইলে, সাবধান হইতে হইবে, আমরা যেন তাঁহার গলা, কাঁধ বা কোমর জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে সুদ্ধ লইয়া ডুবিয়া না মরি!

ধূর্ত্ত, জ্যোতিষী, শিকারী ও দরজীর গল্প

একজন বৃদ্ধ দরিদ্রলোক তাহার চারিপুত্রকে বলিল,—"দেখ, তোমাদের খাওয়াইতে পারি আর আমার এমন শক্তি নাই; অতএব তোমরা নিজে নিজে উপার্জ্জন করিতে শিখ।" ইহাতে সেই চারি ভাই নিজ নিজ অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য বহির্গত হইল। কিছুদূর যাইবার পর, তাহারা একটী চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা চারিজনে চারিটী রাস্তা ধরিয়া চলিল।

কিছু পরে জ্যেষ্ঠপুত্রের একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাইতেছ?" সে উত্তর করিল, "আমি অর্থোপার্জ্জন করিতে যাইতেছি।" লোকটী বলিল, "আমার সহিত আইস, কিরূপে ধূর্ত্ত হইতে হয়, তাহা আমি তোমাকে শিখাইব।" ইহাতে সে তাহার সহিত গেল এবং একজন শ্রেষ্ঠ ধূর্ত্ত হইল।

দ্বিতীয় পুত্রও ঐরূপ একজন লোককে দেখিতে পাইল। তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় সে বুঝিতে পারিল যে, সেই লোকটী একজন জ্যোতিষী। ইহা জানিয়া, সে সেই লোকটীর সহিত গেল এবং এত বড় একজন জ্যোতিষী হইল যে, সেই লোকটী সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে একখানি কাচ দিল। সেই কাচখানির এমন গুণ যে, তাহার দ্বারা পৃথিবীর যাহা ইচ্ছা তাহাই দেখিতে পাওয়া যাইত।

তৃতীয় পুত্র পথে চলিতে চলিতে একজন শিকারীকে দেখিতে পাইল এবং তাহার সহিত যাইয়া একজন শিকারী হইল। বিদায়ের সময় সেই লোকটী তাহাকে একটী ধনুক দিয়া বলিল, "তুমি ইহার দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই ভেদ করিতে পারিবে।"

কনিষ্ঠপুত্রও ঐরূপ একজন লোক দেখিতে পাইল। লোকটী তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসার পর বলিল, "তুমি কি দরজী হইতে ইচ্ছা কর?" ছেলেটী বলিল, "না, না, চুপ করিয়া বসিয়া কাজ করা আমার পোষাইবে না।" লোকটী বলিল, "আমার কাজ সেরূপ নয়; তুমি আমার সহিত চল, তাহা হইলেই বুঝিতে

পারিবে।" ছেলেটী নিরুপায় হইয়া তাহার সহিত গেল। লোকটীর নিকটহইতে চলিয়া আসিবার সময় তাহাকে একটী ছুচ দিয়া বলিল, "এই ছুচ-দিয়া তুমি লোহার মত শক্ত অথবা তুলার মত নরম, যাহা ইচ্ছা, তাহাই জোড়া লাগাইতে পারিবে।"

ইহার কিছুকাল পরে তাহারা চারি ভাই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাদের পিতাকে নিজ নিজ বিদ্যার পরিচয় দিল। একদিন তাহারা বাটীর সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে বসিয়া আছে, এমন সময়ে তাহাদের পিতা বলিল, "আজ তোমাদের বিদ্যা-পরীক্ষা করিব।" এই বলিয়া দ্বিতীয় পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই গাছের উপর যে একটী কাকের বাসা আছে, তাহাতে কতগুলি ডিম আছে, বল দেখি?" জ্যোতিষী তখন সেই কাচ-খানির দিকে চাহিয়া বলিল "পাঁচটী ডিম।" তখন তাহাদের পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন তুমি ঐ ডিমগুলি এত সন্তর্পণে নামাইয়া আনিবে যে, উহাদের উপরে যে পাখীটী তা দিতেছে, সে যেন কিছুই জানিতে না পারে। ধূর্ত্ত তাহাই করিল। তখন পিতা সেই পাঁচটী ডিম লইয়া, চারিদিকে চারটী এবং মাঝখানে একটী রাখিয়া তৃতীয় পুত্রকে বলিল, "এই ডিম-গুলিকে একতীরে দুইখণ্ড করিয়া ফেল।" শিকারী তাহার ধনুক লইল এবং একতীরে সব ডিমগুলিকেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল! তখন পিতা তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিল,—"এখন তুমি এগুলিকে এরূপ সেলাই কর, যাহাতে শাবকগুলির অনিষ্ট না হয়।" দরজী তাহার ছুচ লইল এবং ঠিক সেইরূপে জোড়া লাগাইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, খুব একটা গোলযোগ শুনা গেল যে, সেই দেশের রাজকন্যাকে একটা রাক্ষসে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রাজা প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে পারিবে, সে-ই তাঁহার স্বামী হইবে।

এই কথা শুনিয়া আমাদের এই গল্পোক্ত চারি ভাই ঠিক করিল যে, তাহারা রাজকন্যাকে উদ্ধার করিবে। যে জ্যোতিষী, সে তাহার কাচ দিয়া দেখিয়া বলিল, "রাজকন্যা একটী দ্বীপে রহিয়াছেন; আর তাঁহার পাশে রাক্ষসটা পাহারা দিতেছে।" তখন তাহারা রাজার নিকটহইতে একখানা জাহাজ চাহিয়া লইল এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া সেই দ্বীপে উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে, রাক্ষসটা রাজ-কন্যার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। ইহা দেখিয়া শিকারী কহিল, "রাক্ষসটাকে মারিতে এখন আমার সাহস হয় না, কারণ তীর রাজকন্যার পায়ে লাগিয়া যাইতে পারে।" তখন সেই ধূর্ত্ত এত সন্তর্পণে রাজকন্যাকে লইয়া আসিল যে, রাক্ষসটা কিছুই জানিতে পারিল না। রাজকন্যাকে লইয়া তাহারা নৌকা করিয়া জাহাজের দিকে যাইতে লাগিল।

ইতোমধ্যে রাক্ষসটা জাগিয়া উঠিল। রাজকন্যাকে পাশে দেখিতে না পাইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সে তাহাদের নৌকার উপর আসিয়া পড়িবামাত্র শিকারী ধনুক লইয়া তাহাকে একতীরে বধ করিল; কিন্তু রাক্ষসের দেহের ভারে নৌকা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন দরজী নৌকার একখানা তক্তার উপর বসিয়া ছুচ দিয়া নৌকাখানির সংস্কার করিল এবং অন্যান্য সকলকে তাহাতে তুলিয়া লইয়া জাহাজে পঁহুছিল। বাটীতে আসিয়া তাহাদের মধ্যে বড়ই গোলযোগ বাধিল। প্রত্যেকেই বলিতে লাগিল "আমি না থাকিলে, রাজকন্যার উদ্ধার হইত না; অতএব আমিই রাজকন্যাকে বিবাহ করিব।" তখন রাজা বলিলেন, "তোমাদের বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। কেহই রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে আমার রাজ্যের এক চতুর্থাংশ দিব।" ইহাতে তাহারা সকলে সম্মত হইল এবং তাহাদের বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

শ্রীহরিদাস ঘোষ।

এপিকটেটসের উপদেশ।

১। ভাল হইতে চাও তো আগে আপনাকে মন্দ বলিয়া বিশ্বাস কর।

২। কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, ভাবিয়া দেখিবে, কি তুমি করিতে যাইতেছ।

৩। "আমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই যেন ঘটে" এইরূপ, আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, "যাহাই ঘটুক না কেন, অম্লান বদনে গ্রহণ করিব"—এইরূপ যদি তোমার মনের ভাব হয়, তাহা হইলেই তুমি সুখী হইবে

৪। তোমার ভাই তোমার ক্ষতি করিতেছে, করুক, তাহার সহিত তোমার যে সম্বন্ধ, তাহা তুমি রক্ষা করিয়া চল।

৫। তুমি সক্রেটস্‌ না হইতে পার, কিন্তু সক্রেটসের মত জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করা তোমার সাধ্যাতীত নহে।

—:•:—

সৎসাহস।

মানুষ সৎসাসাহসের অভাবে অনেক সৎকাজ অসম্পূর্ণ করিয়া রাখিতেছে। আমরা অনেক সময়ে বুঝি, অমুক কাজটী করিলে, দেশের ও দশের কল্যাণ হইবে, তবু আমরা সেই কাজটী করিতে সাহস পাই না। নিম্নোদ্ধৃত চিত্রে যে বৃদ্ধটিকে দেখিতে পাইতেছ, উনি কিন্তু সৎকার্য্যের নিমিত্ত সৎসাহস-প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

তোমরা জান, প্রাচীন রোমকেরা অনেক নৃশংস কার্য্য করিয়া আমোদ-অনুভব করিত; ঐপ্রকার নৃশংস কার্য্যের মধ্যে দুই-জন ক্রীতদাসকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে উত্তেজিত ও বাধ্য করা একটী ছিল। এই চিত্রে তোমরা দেখিতে পাইতেছ, দুইজন ক্রীত-দাসে দ্বৈরথযুদ্ধ হইতে ছিল, একজন আঘাত পাইয়া ভূপতিত হইয়াছে. বিজয়ী ক্রীতদাস বিজিত ক্রীতদাসকে হত্যা করিবে কি না, এই বিষয়ে দর্শকদিগের অনুমতির অপেক্ষায় আছে। নির্দ্দয় দর্শকেরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নামাইয়া বিজিত ক্রীতদাসকে হত্যা করিতে ইঙ্গিত করিল, অমনি চিত্রলিখিত বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া দুই প্রতি-দ্বন্দ্বীর মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়কে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিল। ইহাতে দর্শকেরা মহাক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধের উপরে আসিয়া পড়িল এবং অধ্যক্ষের আদেশ পাইয়া তাঁহাকে বধ করিল; কিন্তু বৃদ্ধ টেলিমেকসের মৃত্যু নিরর্থক হয় নাই। ঐ ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই সম্রাট্ অনরিয়স্ আইন করিয়া ঐপ্রকার নিষ্ঠুর আমোদ উঠাইয়া দেন।

জগতে যত মহৎকার্য্য হইয়াছে, সকলেরই মূলে মনুষ্যের ঐ-প্রকার সৎসাহসই নিহিত ছিল; কিন্তু ছোট ছোট কাজগুলিতেও, সৎসাহস-প্রকাশের প্রচুর অবকাশ পাওয়া যায়। অনেকে "দস্তুরের" দাস। অমুক উৎসবের দিন অমুক অশ্লীল রঙ্গটি করিতেই হইবে। কেন? না করিলে যদি মনুষ্যের মনুষ্যত্ব গৌরবের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তবে গড্ডলিকাপ্রবাহে যোগ না দিতে ভয় পাইব কেন? মনুষ্যের লক্ষ্য কি প্রথা-পালন না মানুষ হওয়া?

রাস্তা দিয়া একজন ফেরীওয়ালা হাঁকিয়া চলিয়াছে—"চীনা-বাদাম, গরমা-গরম!" একজন লোক কিনিয়া দেখিলেন, ফেরীওয়ালার সেই চীনা-বাদামগুলি ঠাণ্ডা হিম! তাই তিনি তাহাকে বলিলেন,—"কি রে, এই কি তোর গরম চীনে-বাদাম—ঝুঠ্ কাহে বোলতা?"

চীনা-বাদামওয়ালা অ-ম্লান বদনে উত্তর দিল, —"এসন না বোল্‌লে, আপনি লেবিন কেনো?" আমরাও অনেকে ঐ চীনা-বাদামওয়ালার মত ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে মানুষের সমান সকলই দেখিতে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না সুধু আসল বস্তুটী— মনুষ্যত্ব। সৎসাহসের অভাবে আমরা অনেকে জাতিগত বা ব্যক্তিগত-ভাবে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারি না; কিন্তু আমাদের জানা উচিত, ভীরুতা ক্লীবতারই নামান্তর-মাত্র। যেখানে সৎসাহস-প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেখানে তাহা প্রকা-শিত করা উচিত, তখন পরিণাম-চিন্তাই বরং উত্তেজনাহারিণী হইয়া থাকে। আমাদের সকলেরই স্মরণে রাখা উচিত, কোন মানুষই আপনার জন্য জন্মে নাই, সে পরের জন্য—ঈশ্বরের জন্যই জন্মিয়াছে; সুতরাং সৎ-সাহস-প্রকাশ-কালে আত্ম-চিন্তা একে-বারেই পরিহার করা কর্ত্তব্য। যে কর্ত্তব্য বুঝিয়াও কর্ত্তব্যবিমুখ

সে দিন দিন কর্ত্তব্যবুদ্ধিহীনই হইয়া পড়ে। বালকেরা অনেক সময়ে সৎসাহসের অভাবে কুকার্য্য করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু অসৎ-প্রস্তাবে "না" বলিবার সাহস থাকা চাই এবং সৎপ্রস্তাবে লোকে কি বলিবে বা তোমার পরিণাম কি হইবে, তাহা তুমি কথনই ভাবিবে না। যিনি তোমাকে প্রাণ দিয়াছেন, তিনি যখন তোমার নিকটহইতে তোমার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু প্রতিদান চাহেন, তখন তুমি তাঁহাকে "না" বল কোন্ মুখে?

একটী বাঙ্গালী বালকের সাধুতা

বিগত গ্রীষ্মকালে বসির মহম্মদ খাঁ-নামক একজন কাবুলি বণিক বঙ্গদেশহইতে আফগানিস্থানে প্রত্যাগমনকালে পঞ্জাবের বান্দা-নামক নগরে ২।৪ দিন অবস্থিতি করেন। ঐ নগরের প্রান্তভাগে একটী বিস্তীর্ণ উদ্যান আছে। মহম্মদ খাঁ সেই উদ্যানে জিনিস-পত্র লইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। যাইবার সময় তাড়াতাড়ি করাতে তিনি একটী টাকার থলি ভুলিয়া যান। ঐ থলিতে ৫ হাজার টাকা ছিল, কিয়দ্দূর গমন করিয়া মুদ্রার থলি না দেখিতে পাইয়া মহম্মদ পুনরায় ঐ উদ্যানের অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। পথিমধ্যে তের বা চৌদ্দ বৎসর-বয়স্ক একটী বাঙ্গালী বালকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; ঐ বালকটী তাঁহাকে ব্যস্ত-সমস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি কিছু হারাইয়াছেন?" মহম্মদ খাঁ উত্তর করিলেন,—"আমার একটী টাকার থলি খোয়া গিয়াছে।" বালক তাঁহাকে থলি দেখাইয়া, প্রত্যর্পণ করিল। কাবুলি থলি খুলিয়া বালককে উহার মধ্যস্থিত ৫ হাজার টাকা দেখাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এই টাকার লোভ কি করিয়া দমন করিলে?" বাঙ্গালী বালক বলিল, "আমি ছেলেবেলাহইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, পরের দ্রব্য কাষ্ঠ বা প্রস্তরের ন্যায় জ্ঞান করা উচিত।" বালকের এই কথা শুনিয়া কাবুলির মনে বড়ই আনন্দ হইল এবং তিনি ভাবিলেন যে, যে জননীর এই বালক এরূপ পুত্ররত্ন, না জানি তিনি কত সুখিনী।

বণিক বালকটীকে তাহার সৎকার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ ৫টী টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু বালক বলিল,—"আমি ত আপনার কোন বিশেষ উপকার করি নাই যে, তজ্জন্য টাকা লইতে পারি, আপনারই টাকা আপনাকে দিয়াছি, ইহা তো আমার কর্ত্তব্য কার্য্য।" উক্ত কাবুলী একটী ইংরাজি সংবাদ-পত্রে উপরোক্ত বৃত্তান্ত-প্রকাশ করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "টাকাগুলি আমার নহে। আমি যাহার চাকুরি করি, তাহারই। যদি বালক টাকার থলিটী আত্মসাৎ করিত, তাহা হইলে আমাকে কারারুদ্ধ হইতে হইত। বালকটী যে, আমার কি উপকার করিয়াছে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। উহার প্রতি আমি যে কিরূপে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিরূপে উহার সাধুতার প্রশংসা করিব, তাহা জানি না। আমি ঐ বাঙ্গালী বালকটীকে ইহজীবনে ভুলিব না। তাহার দীর্ঘ-জীবন ও সুখসম্পদের জন্য আমি চিরকাল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। আমার একান্ত বাসনা এই যে, যেন সে জীবনে কখন কোন দুঃখ না পায়, এবং সফলতা-লাভ করে।" বালকটীর নাম বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বরের এই সৎকার্য্যের বৃত্তান্ত জগতে প্রচারিত হউক, তাহা হইলে অন্যান্য বালকে তাহার সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবে।

শ্রীপরমানন্দ দত্ত।

আমরা অন্ধকারে দেখিতে পাই না কেন?

অন্ধকার কি?—আলোকের অভাব। আর শব্দের অভাবকে কি বলে—যখন আমরা কোন আওয়াজ শুনিতে পাই না, তখন সেই অবস্থাকে আমরা কি বলিয়া থাকি?—নিস্তব্ধতা। অতএব অন্ধকার কি? না, আলোকরাহিত্য; আর নিস্তব্ধতা কি? না, শব্দরাহিত্য।

কিন্তু এই সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলা দরকার। ঈথর-নামক একপ্রকার পদার্থে ছোট একটী ঢেউ খেলিয়া একটু চঞ্চলতা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহা কেহ দেখিতে না পাইলে, তাহাকে আলোক বলা উচিত হইবে না। তেমনি হাওয়ায় ছোট একটি ঢেউ খেলিয়া একটু চঞ্চলতা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহা কেহ শুনিতে না পাইলে, তাহাকে শব্দ বলাও উচিত হইবে না।

দেখা ও শুনা, তাহা হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগহইতে স্বতন্ত্র কিছু একটা হওয়ার উপরে এবং দ্বিতীয়তঃ সেই কিছু একটাকে আমাদের অনুভব করিতে পারার উপরে নির্ভর করে।

এইজন্যই আমরা অন্ধকারে দেখিতে পাই না, কারণ আঁধারে আলোক থাকে না; আমরা কেবল আলোকই দেখিতে পাই; কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দর্শন-কার্য্যও আবশ্যক। অন্ধকারময় ঘরে সত্যই একটা মেজ রহিয়াছে, কিন্তু আমরা দেখিতে

পাইতেছি না। ঘরে আলো নাই, তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু অন্ধকার সত্তেও যখন আমরা মেজটাকে দেখিতে চেষ্টা করি, তখন আমরা মেজহইতে আলোক আসিতে দেখি, আর সেই আলোকের আকার দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, ঘরে সত্যই একটা মেজ রহিয়াছে। অন্ধ লোক আলোকেও দেখিতে পায় না। মহাকবি মিল্টন তাঁহার অন্ধদশায় লিখিত একটি কবিতায় বলিয়াছেন—

"মধ্যাহ্নের দীপ্তালোকে
কিছুই না দেখি চোকে,
সকলই আঁধার, আঁধার, আঁধার!"

এই সুবিখ্যাত ছত্রটি মনে রাখিলে তোমরা, অন্ধকার কি, তাহা বুঝিতে পারিবে—উহা হয় আলোকরাহিত্য, নয় দর্শন-ক্ষমতারাহিত্য।

তবে বাঘ ও বিড়াল অন্ধকারে দেখিতে পায় কেন? তোমাদের জানা উচিত যে, সম্পূর্ণ অন্ধকারে কোন জীবই দেখিতে পায় না। অন্ধকার বলিতে তোমাদের সচরাচর বুঝা উচিত, আলোক এত কম যে, তোমরা দেখিতে পাইতেছ না।

মানুষের চোক অল্পালোক দেখিতে পায় না, কিন্তু কোন কোন জীব নিবিড় অন্ধকারে চোকের তারা এমন করিয়া বিস্তৃত করিতে পারে যে, অতি মৃদু আলোকও দেখিতে সমর্থ হয়। বিড়ালের উহাই হয়, তোমরা যদি অন্ধকারে বিড়ালের চোক লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তাহার চোকের তারা খুব বড় হইয়াছে। ইহাতেই বিড়াল, অন্ধকারে যতটুকু আলো থাকে, ততটুকুই দেখিতে পায় এবং এইজন্যই বিড়াল ও অন্য কোন কোন জীব আঁধারে দেখিতে পায়।

প্রতিযোগিতা

এই চিত্রাবলম্বনে পয়ার ছন্দে "বালকের" অৰ্দ্ধপৃষ্ঠাপরিমিত একটি হাসির কবিতা-রচনা করিতে হইবে। উক্ত কবিতা এই মাসের শেষ-তারিখের মধ্যে আমার হস্তগত হওয়া চাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচক একখানি ইংরাজী পুস্তক-পুরস্কার পাইবে। রচনাটি কাগজের একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া চাই। রচয়িতার নাম, ধাম ও বয়স, রচনার নিম্নে লিখিয়া দিতে হইবে।—"বালক"-সম্পাদক।

৩য় বর্ষ।] মার্চ্চ, ১৯১৪। [৩য় সংখ্যা।

কুড়ানী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

এক্ষণে মণিরাম যেখানে যায়, সেইখানেই শুনিতে পায় যে, শিয়ালের দৌরাত্ম্য বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই সে মণিছড়া-নালার আশে পাশে, নানা জায়গায় ফাঁদ পাতিল, যাঁতি-কল বসাইল এবং বিষমাখা মাংস রাখিয়া দিল। আর "দেবিসিংহ"-সাহেবের বাঘা-কুকুর লইয়া, বদরপুর ছাড়াইয়া, অনেক দূরে শিয়াল-শিকার করিতে মধ্যে মধ্যে যাইতে লাগিল। যে জঙ্গলে বিষ-মাখা মাংস দিয়া কলপাতা হয়, সে জঙ্গলে কুকুর লইয়া যাইতে মানা। এইরূপে সে শীত-কালে অনেক চেষ্টা করিয়া কতকগুলি শিয়াল মারিল। কুড়ানীর দলস্থ গোটা-দুই বোকা শিয়াল ফাঁদে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। মণিরাম কয়েকটা নেকড়ে-বাঘও মারিল। তথাপি শীত-কালটা ধরিয়া এই অঞ্চলে শিয়ালে বড়ই উপদ্রব করিল। আর সকলেই বলিতে লাগিল যে, একটা লেজকাটা শিয়াল এই শিয়াল-দলের ওস্তাদ্।

এবারকার উপদ্রবে অনেকেই যার-পর-নাই জ্বালাতন হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার পরেই মণিছড়া-চা-বাগানের নিকটেই শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। ডাক শুনিয়া, যেখানে যত কুকুর ছিল, সকলে ঘেউ-ঘেউ করিয়া উঠিল। "বুলু-তেড়িয়া"-কুকুরটা আল্গা ছিল। শিয়ালের ডাক শুনিয়া, সেটা সেইদিকে ছুটিল। একটু পরে সেটা ফিরিয়া আসিল, কিছুই করিতে পারিল না। একটু পরে আবার শিয়ালেরা ডাকিয়া উঠিল—এবার কিন্তু খুব কাছে। ডাক শুনিয়াই "বুলুতেড়িয়া"-কুকুর আবার ছুটিল। কুকুরের হাঁকানী শুনিয়াই বোধ হইল, শিয়াল দেখিতে পাইয়া তাড়া করিয়াছে। ভয়ানক ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে কুকুরটা ক্রমেই দূরে গিয়া পড়িল। অবশেষে তাহার ডাক আর শুনিতেই পাওয়া গেল না। সকালবেলা বাগানের কুলিরা জঙ্গলের অবস্থা দেখিয়া রাত্রিকার ঘটনার মর্ম্ম বেশ বুঝিতে পারিল। প্রথমবার যে শিয়ালেরা ডাকিয়া উঠিয়াছিল, সেই ডাক ডাকিয়া জানিতে চাহিয়াছিল, কুকুরগুলি সমস্তই খোলা আছে কি না; যখন টের পাইল যে, কেবল একটা কুকুর খোলা আছে, তখন এক ফিকির খাটাইবার মতলব করিল। পাঁচটা শিয়াল পথের দুই ধারে লুকাইয়া রহিল। একটা একটু কাছে গিয়া আবার ডাকিল। সেই ডাক শুনিয়া সেই খোলা কুকুরটা তাড়া করিয়া আসিল, সে সেটাকে দেখিয়া অন্য দিকে সরিয়া পড়িল, কুকুরও তাড়া করিয়া গেল। একটু দূরে গিয়া যেই পড়িল, ছয়টা শিয়ালে মিলিয়া কুকুরটার উপর পড়িল। একটা কুকুরে ছয়টা শিয়ালের সঙ্গে পারিবে কেন? শিয়ালেরা কুকুরটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া খাইয়া ফেলিল। এই-খানে একবার "বুলুতেড়িয়া" কুড়ানীকে কষ্ট দিয়াছিল। সকালবেলা কুলিরা এই অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিল যে, শিয়ালেরা বিলক্ষণ বুদ্ধি খাটাইয়া, ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজটা করিয়াছে, আর সেই চতুর লেজকাটা শিয়ালটা এদের ওস্তাদ। সকলেরই ভারী রাগ হইল। তোতার মামা ত রাগে কটমট করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। মণিরাম বলিল, "লেজকাটা শিয়ালটাহইতেই এসব হইয়াছে। সেইটাই বুলুতেড়িয়াকে মারিয়াছে।"

৬

বসন্তকাল দেখা দিল। মাঘ-ফাল্গুন-মাসে যেমন হিন্দুসমাজে বিবাহের ধূম পড়িয়া যায়, বসন্তকালের আরম্ভে আসামের অরণ্যে শৃগাল-সমাজে তেমনি প্রণয়-পরিণয় হইয়া থাকে। সমস্ত

শীতকাল কৃষ্ণসার আর কুড়ানী একজন অন্যজনের সঙ্গী ও সঙ্গিনী-মাত্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে দুইজনেরই প্রাণে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। ঘটক-ঘট্‌কী বা কাঁচা-পাকা দেখার দরকার হইল না। দলস্থ অন্য কোন শিয়াল কুড়ানীর প্রতি একটু টান দেখাইলে, কৃষ্ণসারের হিংসা হয়। সম্প্রদান বা গোত্রান্তর ইত্যাদি কোন-প্রকার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইল না। কয়েকমাস ধরিয়া দুইজনে বন্ধুভাবে একই বনে বাস করিয়া আসিয়াছে; এক্ষণে বর "বরকর্ত্তা" আর কন্যা "কন্যাকর্ত্তা" হইয়া উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইল। মানুষে যেমন "ওগো," "হাঁগা," "বলি, শুনছ" ইত্যাদি বলিয়া স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে ডাকে, শিয়ালেরা তা' করে না; আবার বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী-সাহেবদের মত স্ত্রী-পুরুষে "নাম-ধরাধরিও" করে না। শিয়ালেরা এক বিশেষ-রকমের ডাক ডাকে, সেই ডাকদ্বারা স্ত্রী স্বামীকে ও স্বামী স্ত্রীকে ডাকে। গলার আওয়াজে তাহারা চিনিয়া লয়, কে কাহাকে ডাকিল।

দলস্থ অন্য শিয়ালেরাও "পাণি-গ্রহণ" করিয়া স্বতন্ত্র "সংসার পাতিল," কাজেই দল ভাঙ্গিয়া গেল। আর গ্রীষ্মকাল আসিয়া পড়াতে গো-সাপ, খরগোশ ইত্যাদি যথেষ্ট পাওয়া গেল, সুতরাং দল বাঁধিয়া শিকারে বাহির হইবার বড় একটা প্রয়োজন রহিল না। সচরাচর শিয়ালেরা গর্ত্তে বা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া ঘুমায় না। রাত্রি নিতান্ত গরম না হইলে, সমস্ত রাত্রি এদিক্-সেদিক্ ঘুরিয়া বেড়ায়; দিনের বেলা কেবল পাহাড়ের গায়ে রৌদ্রে পীঠ দিয়া শুইয়া খানিকক্ষণ ঘুমাইয়া লয়, এমন স্থানে ঘুমায়, যেখানহইতে মানুষের গতিবিধি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বসন্ত-কালে প্রণয়-পরিণয় হইলে, বিশ্রামের বন্দোবস্ত অন্যপ্রকার হয়।

গ্রীষ্মকালের আরম্ভেই কুড়ানী ও কৃষ্ণসার ভাবি-সন্তানদের থাকিবার জন্য একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে ব্যস্ত হইল। একটা টীলার গায়ে বেতবনের আড়ালে একটা গুহা বা ছোট গর্ত্ত ছিল। উভয়ে মিলিয়া সেই গুহার একধারে বাচ্ছাদের বাসের উপযোগী একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া লইল। কতকগুলি পাতা ও ঘাস লইয়া গিয়া বিছানা করিল। গুহাটা টীলার দক্ষিণ-গায়ে, বেশ শুষ্ক, প্রায় সমস্ত দিন রৌদ্র পাওয়া যায়—আর গ্রামহইতে ক্রোশ-দুই দূরে। একটু উপরে টিকড়ের মাথায় উঠিলেই বড়-চক্র-নদী ও নদীতীরস্থ শিমুল-বন দেখিতে পাওয়া যায়। এই টিকড়ের গায়ে খুব ঘন উলুবন। মানুষের চখে পাহাড় ও এই নদীর দৃশ্য মনোহর—কিন্তু শিয়ালের চখে কিরূপ, জানি না।

কুড়ানী ঘরকন্না লইয়া এবং "ভাবী ভাবনায়" ব্যস্ত। বেচারী গর্ত্তের আশে-পাশেই থাকে, কৃষ্ণসার যাহা আনিয়া দেয়, তাহাই খায়। নিজেও নিকটে যা' পায়, শিকার করিয়া আনে। যেদিন কিছু না যুটে, সেদিন, মাটিতে যাহা পুতিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই কিছু তুলিয়া খায়। এ অঞ্চলের কোথায় কি পাওয়া যায়, কুড়ানীর সমস্তই জানা ছিল।

এই গর্ত্তের একটু দূরেই বিস্তর খরগোশ থাকে। যেদিন কুড়ানী পলাইয়া আইসে, ও যেদিন তাহার লেজ কাটা যায়, সেইদিন খরগোশের আড্ডার ভিতর দিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তখন জানিত না যে, ওখানে এত "খাদ্য" ছিল। তবে এখন কি করে, দেখ। এইখানে, আর সকলের গর্ত্তহইতে অনেক দূরে, একযোড়া খরগোশ এক গর্ত্তে বাস করে। কুড়ানী দেখিতে পাইয়া একদিন এই গর্ত্তের মুখে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল, কিছু আছে কি না। তখন গর্ত্তে খরগোশ ছিল না। নর খরগোশটা একটু দূরে ঘাস খাইতেছিল। যেখানে অনেক খর-গোশের আড্ডা, সেখানে খরগোশ ধরা কঠিন ব্যাপার, কারণ একটা শত্রুকে দেখিতে পাইলে, সকলকে সাবধান করিয়া দেয়, কিন্তু যেখানে কেবল একটা, সেখানে খরগোশ-শিকার করা শিয়ালের পক্ষে সহজ কথা। কুড়ানী এইটাকে শিকার করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু এমন খোলা জায়গা, না আছে ঝোঁপ-জঙ্গল, না আছে বেতের ঝাড়, এখানে কেমন করিয়া খরগোশটাকে ধরিবে? সিংহলী হাতীধরারা যেমন বে-মালুম খুব কাছে গিয়া হাতীর পায়ে দড়ি বাঁধে, কুড়ানী তেমনি করিয়া খরগোশ ধরিবে। পিছনদিকের পায়ে ভর দিয়া না দাঁড়াইলে, খরগোশ দূরে কি আছে না আছে, ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। আর যখন মাথা হেঁট করিয়া ঘাস খাইতে থাকে, তখন খরগোশের চক্ষু থাকা না থাকা সমান কথা—তখন ঘাস-বই আর কিছু দেখিতে পায় না। কুড়ানীর এ সব জানা ছিল। আবার কটাবর্ণ উলুবনে কটাবর্ণ প্রাণী যতক্ষণ না নড়ে, ততক্ষণ টের পাওয়া যায় না। ইহাও যেন কুড়ানীর জানা ছিল। অতএব হামাগুড়ি না দিয়া, বা লুকাইতে চেষ্টা না করিয়া কুড়ানী মাথা খাড়া করিয়া খরগোশের দিকে চলিল। মাথা খাড়া করিয়া চলিল, খরগোশটা কখন্ কি করে, যেন দেখিতে পাওয়া যায়। খরগোশ যেই একগোছা ঘাস মুখে করিয়া দাঁড়াইয়া চিবাইতে আরম্ভ করে, কুড়ানী অমনি উলুবনে স্পন্দহীন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে—যেন এক-আঁঠি উলু-খড়। আবার যেই খরগোশটা মাথা হেঁট করিয়া ঘাস ধরে, অমনি নিঃশব্দে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আবার ঘাস মুখে করিয়া দাঁড়াইয়া খরগোশ যখন দূরবর্ত্তী খরগোশদের গতিবিধি-নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করে, কুড়ানী অমনি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, যেন থাকবস্তার ইটের থাম। দুই-একবার দূরবর্ত্তী খরগোশদের কিচিরমিচির-শব্দে এই খরগোশটা যেন একটু চমকিয়া উঠিল, কিন্তু ঘাড় তুলিয়া কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার ঘাস খাইতে লাগিল। ক্রমে কুড়ানী বে-মালুম খরগোশের নিতান্ত কাছে আসিল। এমন সময়ে যেই খরগোশটা ঘাস খাইবার জন্য মাথা হেঁট করিল, কুড়ানী অমনি লম্ফ দিয়া পড়িয়া, তাহাকে ধরিয়া মুখে করিয়া নিজ গর্ত্তের দিকে ছুটিল। যে অবোধেরা সমাজ ছাড়িয়া স্বতন্ত্র বাস করে, তাহাদের এই দশাই হয়।

অনেকবার শিকার করিতে গিয়া কুড়ানীকে বিপদেও পড়িতে হইয়াছে। একদিন কুড়ানী জামগাছতলায় একটা বানরের বাচ্ছা দেখিতে পাইয়া ধরিতে গেল। কুড়ানীকে দেখিয়াই বাচ্ছাটা গাছে লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু ধাড়ীটা আসিয়া কুড়ানীর মাথায় এমন সজোরে এক চড় মারিল যে, সেদিন আর কুড়ানীকে কিছু করিতে হইল না। সে ইহার পর আর কখনও বানরের বাচ্ছা ধরিতে যায় নাই—তাহার বুদ্ধি ছিল। দুই-একবার সাপের হাত-হইতেও বড় বাঁচিয়া গিয়াছিল। দুই-একবার কুলিরা তাহাকে দেখিয়া তীর মারিয়াছিল, কিন্তু লাগে নাই। পাছে চিতাবাঘের হাতে পড়ে, এজন্য কুড়ানীকে অনেকবার অতি সাবধানে চলিতে হইয়াছে। চিতাবাঘ প্রায় শিয়াল ধরিতে পারে না—কারণ চিতা-বাঘেরা দৌড়ে শিয়ালের সঙ্গে পারিয়া উঠে না। সচরাচর চিতা-বাঘের ডাক শুনিলে বা গন্ধ পাইলে শিয়ালেরা নীরবে সরিয়া অন্যত্র যায়।

চিতাবাঘে ও অনেক শিয়ালে যেমন করে, কুড়ানী তেমনি কিছু-না-কিছু মুখে করিয়া বেড়াইত। সেই "কিছু-না-কিছু" কাজের জিনিষ বটে, কিন্তু লোভনীয় সুখাদ্য নয়। অনেক সময়ে সে হয় ত একখান শুষ্ক হাড়, মহিষের শুষ্ক খুর, বা শিং মুখে করিয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, আবার ঐরূপ অন্য কিছু দেখিতে পাইলে, মুখের জিনিসটা ফেলিয়া দিয়া সেইটা মুখে তুলিয়া লয়। রাখালেরা বলে যে, মাড়ি শক্ত করি-বার ও অভ্যাসটা রাখিবার জন্য শিয়ালেরা হাড় মুখে করিয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকে। শিয়ালেরা, আপনাদের এলাকার মধ্যে যে যেখানে যায়, পথে এক-এক-স্থানে, চিতাবাঘ ও জঙ্গলী কুকুরদের মত, কোন-না-কোনপ্রকার চিহ্ন রাখিয়া যায়। কোথায়ও বা একটা মহিষের মাথার খুলি, কোথায়ও বা একখান হাড় ফেলিয়া রাখে। যেখানে এ সকল পাওয়া যায় না, সেখানে কোনপ্রকার গাছ বা বড় পাথর চিহ্নস্বরূপ হয়। এই-প্রকার চিহ্ন-স্থানে কোন শিয়াল আসিলে, পূর্ব্বে অন্য শিয়াল আসিয়াছিল কি না, গন্ধদ্বারা তাহা টের পায়। এমন কি, সে শিয়াল নর কি মাদী, কোন্ দিক্‌হইতে কোন্ দিকে গিয়াছে, তাহাপর্য্যন্ত গন্ধ ও চিহ্ন-দ্বারা ধরিয়া ফেলে। বনের যেখানে সেখানে শিয়াল, কুকুর এবং চিতাবাঘের চিহ্ন থাকে। অনেক সময়ে বিশেষ কিছু করিবার না থাকিলে, কোন শিয়াল হয় ত এক-খানা শুষ্ক হাড় বা শিং মুখে করিয়া, এদিক্-ওদিক্ বেড়াইয়া বেড়ায়, কিন্তু চিহ্নের পাথর, গাছ বা আর কিছু দেখিতে পাইলে, মুখের হাড় ফেলিয়া গন্ধ শুঁকিয়া দেখে, আর কোন শিয়াল এখানে আসিয়াছিল কি না; যদি আসিয়া থাকে, কোন্ দিক্‌হইতে আসিয়া কোন্ দিকে গিয়াছে। যাইবার সময়ে অন্যমনস্ক হইয়া হাড়খানা ভুলিয়া ফেলিয়া যায়। কালক্রমে আড্ডার চিহ্ন-স্থানে বিস্তর হাড়, শিং ইত্যাদি জমা হয়।

শিয়ালদের এই অভ্যাস থাকাতে, একবার মণিছড়া-বাগানের বাঘা-কুকুরদের সর্ব্বনাশ এবং শিয়ালদের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। একবার মণিরাম বড়-বক্র নদীর পশ্চিম-পার দিয়া স্থানে স্থানে বিষ-পোরা মাংসের টুক্‌রা ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কুড়ানীর বেশ জানা ছিল যে, ঐ মাংসে বিষ আছে, তাই খাইল না; কিন্তু যাইতে যাইতে পথে একস্থানে দেখিল, ছাগলের কাঁচা চামড়ায় নাড়ী-ভুঁড়ী বাঁধা আছে। গন্ধ লইয়া বুঝিল, তাহাতে বিষ দেওয়া। কুড়ানী সেই পোঁট্‌লাটা মুখে করিয়া মণিছড়া-বাগানের খুব কাছে গেল।

এমন সময়ে বাগানের কুকুরগুলি কোন কারণে ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। কুড়ানী অমনি সেই পোঁট্‌লাটা ফেলিয়া পলাইল। সকাল-বেলা কেনারাম-সর্দ্দার কুকুর লইয়া সেইখানে যেই বেড়াইতে গিয়াছে, অমনি সেগুলি গিয়া সেই বিষ-দেওয়া নাড়ী-ভুঁড়ী খাইয়া ফেলিল। দশ-মিনিটের মধ্যে "দেবিসিং"-সাহেবের হাজার টাকার কুকুর মারা গেল। চা-কর সাহেবেরা জিলার হাকিমকে বলাতে হুকুম-জারি হইল যে, এ বনে কেহ বিষ দিয়া কোন-রূপে শিয়াল বা চিতাবাঘ ইত্যাদি মারিতে পাইবে না। ইহাতে শিয়ালজাতির বড় উপকার হইল।

এই কয়েকমাস বনে বাস ও শিকার করিয়া কুড়ানী বেশ টের পাইল যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী-শিকার করিতে ভিন্ন ভিন্ন উপায় ত অবলম্বন করিতে হয়ই, আবার একজাতীয় কোন কোনটার বেলা বিশেষ বিশেষ ফিকির খাটাইতে হয়। খরগোশ ধরা সহজ আর খরগোশ সুখাদ্যও বটে, কিন্তু নিকটে যে খরগোশের আড্ডা, সেখানে অনেক খরগোশ দল বাঁধিয়া বাস করে। এই আড্ডাকে খরগোশ-পল্লী বলিলেই হয়। পল্লীর মধ্যস্থলে, একটু উচ্চ স্থানে এক গর্ত্তে একটা অতি প্রকাণ্ড খরগোশ থাকে। এইটা এই পল্লীর মোড়ল। কুড়ানী ঢের চেষ্টা করিয়াছে, তবু "মোড়লকে" ধরিতে পারে নাই। একদিন কুড়ানী হামাগুড়ি দিয়া দিয়া, এত কাছে আসিল যে, একলম্ফে মোড়লকে ধরিতে পারে, কিন্তু যেই লাফ দিবার চেষ্টা করিবে, অমনি সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সাপ গর্ত্তের

ভিতরহইতে মাথা বাহির করিয়া, ফোঁস্ করিয়া উঠিল। এই সাপটা যে খরগোশ-পল্লীর চৌকিদার বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহা নহে। সাপটার ইচ্ছা নয় যে, কেহ গর্ত্তের কাছে আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করে। সাপ কুড়ানীর দুই চক্ষের বিষ; কাজেই সাপ দেখিয়া সে পলাইতে পথ পাইল না। কুড়ানী বেশ বুঝিতে পারিল যে, এরূপে গা-ঢাকা দিয়া গিয়া মোড়লকে হাত করা অসম্ভব, কারণ এমন ভাবে খরগোশেরা গর্ত্ত করিয়া আছে যে, যেদিক্ দিয়া যাও, কাহার না কাহারও চখে পড়িতেই হইবে। তাই কুড়ানী নূতন ফিকির খাটাইবার চেষ্টায় রহিল।

বনের কোন্ পথে কি যায়, না যায়, শিয়ালেরা দিনের বেলা কোন টীলার উপরহইতে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখে। কোন কিছু চলিয়া গেলে পর, গিয়া দেখে, কিছু ফেলিয়া গিয়াছে কি না। কুড়ানীও এইরূপ করিত, কিন্তু আপনাকে "বাঁচাইয়া"।

একদিন একটা হাতীর পীঠে বোঝাই দিয়া দুইজন লোক অনেক জিনিস লইয়া বনের পথ দিয়া চা-বাগানহইতে দক্ষিণদিকে কোথায় গেল। কুড়ানী একটা জারুলগাছের আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, হাতীর পীঠের একটা ঝোড়াহইতে কি যেন রাস্তার একধারে পড়িয়া গেল। মাহুত হাতী চালাইয়া অনেক দূর গেলে, কুড়ানী গাছের আড়ালহইতে বাহির হইয়া রাস্তা শুঁকিতে শুঁকিতে—এইরূপ করা ইহার অভ্যাস—সেইখানে গেল। যে জিনিসটা পড়িয়াছিল, সেটা একটা বাতাবি-লেবু—এদেশে জাম্বুরা বলে। কুড়ানীর মনে ধরিল না; জিনিসটা গোলাকার, বর্ণ হরিৎ, গন্ধ একরকমের! সে গন্ধ শুঁকিয়া দেখিল, পা দিয়া লেবুটা ঠেলিয়া দিল, দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া আবার দেখিল। না জানি, কি মনে করিয়া, লেবুটা পা দিয়া আবার ঠেলিয়া দিল, এবং অবশেষে মুখে করিয়া টীলায় উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে সে খরগোশদের আড্ডায় গিয়া পঁহুছিল। এমন সময়ে দুইটা প্রকাণ্ড বাজপক্ষী উড়িয়া গেল, সেটাকে দেখিয়া রাজ্যের খরগোশ কিচির কিচির করিয়া উঠিয়া একটা অপরটাকে সাবধান করিয়া দিয়া, যে যাহার গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়িল। সবগুলি গর্ত্তে গিয়া লুকাইলে পর, কুড়ানী অগ্রসর হইয়া মোড়লের গর্ত্তের মুখের কাছে গেল। বলা বাহুল্য, এই হৃষ্টপুষ্ট খরগোশটাকে দেখিলে, কুড়ানীর জিহ্বা দিয়া জল পড়ে। গর্ত্তের নিকটেই বাতাবি-লেবুটা রাখিয়া দিয়া, মোড়লের গর্ত্তের মুখে নিজ মুখ দিয়া কুড়ানী মোড়লের লোভনীয় গাত্রগন্ধের ঘ্রাণ লইতে লাগিল—লইয়া কুড়ানী গন্ধে মোহিত হইল—পোস্তায় আম কিনিতে গেলে আমের সুগন্ধে আমরা যেমন মোহিত হই! কুড়ানী আরও গোটাকতক গর্ত্তের ঘ্রাণ লইল, কিন্তু তাহার বিবেচনায় মোড়লের গাত্র-গন্ধ বেশী লোভনীয়, বেশী উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল। বাতাবি-লেবু মোড়লের গর্ত্তের মুখের কাছে রাখিয়া কুড়ানী হাত-কুড়িক নীচের দিকে গড়ানে জায়গা দিয়া নামিয়া বেত-বনে লুকাইয়া রহিল।

একটু পরে গোটাকতক সাহসী খরগোশ গর্ত্তের মুখ দিয়া গলা বাড়াইয়া একপ্রকার ক্যাঁচর-ম্যাচর-শব্দ করিল—বোধ হইল, এই শব্দ করিয়া পল্লীর আর সকল খরগোশকে খবর দিল যে, আর কোন ভয় নাই। একে একে সকলেই বাহির হইয়া পড়িল। সকলের শেষে স্থূলকায় বৃদ্ধ মোড়ল বাহির হইল। মোড়ল বড় "হুঁশিয়ার"—চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, ভয়ের কারণ আছে কি না। খরগোশের গর্ত্তের মুখটা খাড়া, কিন্তু ভিতরে আঁকা-বাঁকা। মুখের কাছে উইএর ঢিবির মত ঢিবি, সেইটা ইহাদের "টং"—এইখানে দাঁড়াইয়া চৌকি দেওয়া হয়। শত্রুকে দেখিলেই টপ্ করিয়া গর্ত্তে পড়ে, পড়িলে, কোন ভয়-ভাবনা থাকে না। এক্ষণে গর্ত্তের মুখের কাছে গোলাকার এক অদ্ভুত জিনিস দেখিয়া মোড়লের ভয় হইল। তবু একটু কাছে গিয়া, ভাল করিয়া দেখিয়া বোধ হইল, ভয়ের কোন কারণ নাই—জিনিসটা কাজের জিনিস হইলেও হইতে পারে। একবার এগয়, একবার পেছয়, এইরকম করিয়া আরও কাছে গেল, লেবুর গন্ধ মনে ধরিল; ক্রমে আরও কাছে গিয়া যেই কামড় দিতে গেল, লেবুটা অমনি গড়াইয়া গেল। লেবুটা গোল, স্থানটী ঢালু, কাজেই গড়াইল। মোড়ল সঙ্গে সঙ্গে গিয়া লেবুটাতে কামড় দিল, কামড় দিতেই বুঝিতে পারিল যে, উহা সুখাদ্য, কিন্তু যেই আবার কামড়াইল, লেবুটা গড়াইয়া আর একটু নীচের দিকে গেল। এইরূপে যত কামড়াইল, লেবু ততই গড়াইয়া নীচে গিয়া পড়িল। পল্লীর সমস্ত খরগোশ বাহির হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কাজেই ভয়ের কোন কারণ নাই ভাবিয়া মোড়ল লেবুর সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকে যাইতে লাগিল।

লেবুটা গড়াইতে গড়াইতে বেতবনের দিকে আসিল। লেবুর একটু স্বাদ পাওয়াতে, বৃদ্ধের লালসা বাড়িতেই থাকিল। সে সমস্ত ভুলিয়া, লেবুর সঙ্গে সঙ্গে, লেবু খাইবার আশায়, আড্ডা ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। এতক্ষণ আড়ালে থাকিয়া কুড়ানী সলোভ দৃষ্টিতে মোড়লের গতিবিধি-নিরীক্ষণ করিতেছিল। যেই কাছে আসিল, অমনি একলম্ফে গিয়া মোড়লকে ধরিয়া বধ করিল।

খরগোশের গর্ত্তের কাছে যে বাতাবী-লেবু রাখা, এটী দৈবঘটনা কি জানিয়া শুনিয়া রাখা, কে বলিবে? তবে কথা এই, যদি কোন চালাক শিয়ালের বেলা দুই-একবার এইরূপ ঘটে, তবে এটা বড় কাজের কথা—শিকারের এটা নূতন ফিকির।

কুড়ানী পেট ভরিয়া খাইয়া, বাকিটা একস্থানে বালিচাপা দিয়া বলিল—ভবিষ্যতের জন্য। এইরূপ আরও রাখিয়াছিল। যখন আর দৌড়ধাপ করিয়া বড় একটা শিকার করিতে পারিত না, তখন তাহা কাজে লাগিত। এই মাংস একটু পচিয়া যাইত বটে, কিন্তু কুড়ানী পোকা-মোকাসমেত সমস্ত উদরসাৎ করিত।

(ক্রমশঃ।)

সেকেলে ডাক্তার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)*

বেলের স্বামী সাণ্ডার্সের জ্বর হইয়াছে। লণ্ডনের এক ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছে, সে ছয়ঘণ্টার বেশী বাঁচিবে না; শুনিয়া-অবধি বেল কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। ড্রাম্‌স্নুক্‌ বলিল,—"বেল! যতক্ষণ সাণ্ডার্স্‌ বেঁচে রয়েছে, ততক্ষণ তুমি অমন ক'রে কেঁদ না। আমি তো ম্যাক্‌লিওরের মুখে কোন কথা না শু'ন্‌লে, ওর জীবনের আশা ছা'ড়্‌'চি না।"

ম্যাক্‌লিওর আসিলেন। তিনি সাণ্ডার্স্‌কে ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিলেন না। রোগীকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখের ভাব ভয়ানক রুদ্র হইয়া উঠিল—লোকে তাহাদের মহাশত্রুদের দেখিয়াই ঐরূপ রুদ্রমূর্ত্তি-ধারণ করে। গত চল্লিশবৎসরে ড্রাম্‌টথ্‌টির মারাত্মক রোগগুলির সহিত ম্যাক্‌লিওরের ঐরূপ একটা বিসদৃশ অহি-নকুল-সম্বন্ধই দাঁড়াইয়াছে। য'হা হউক, রোগীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করার পর, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"লণ্ডনের ডাক্তার কি ব'লেছে,—ভোর হ'বার আগেই সাণ্ডার্স্‌ ম'রে যা'বে? জ্বর আর ঐরকম আর কোন কোন রোগসম্বন্ধে সে যে বিশেষজ্ঞ, তা'তে সন্দেহ নেই, সুতরাং সে ওকথা ব'ল্‌তে পারে।

আমি যদি এখন অন্য কথা কই, তা' হ'লে লোকে ভা'ব্‌বে, আমি বড়াই কচ্ছি। আর তা'র ঐ মত দেবার পরও সাণ্ডার্সের বেঁচে থাকা সেই ডাক্তারের পক্ষে বড় সম্মানের কথা হ'বে না।

কিন্তু সেই ডাক্তারটি রুগীর অবস্থাটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারে নি, একথা আমি তা'র মত বিচক্ষণ ডাক্তারকে অপদস্থ ক'রবার জন্যে ব'ল্‌ছি না।

বিদ্বান্‌ লোকে যেমন গড়্‌গড়্‌ ক'রে কেতাব প'ড়ে যায়, ঐ ডাক্তারও তেম্‌নি কা'র কিরকম জ্বর হ'য়েছে, তা' সহজে ধ'র্‌তে পারে। কিন্তু ড্রাম্‌টথ্‌টির লোকদের ধাত্‌ যে কি কড়া, তা' তো তা'র জানা নাই।

কারু যদি সাণ্ডার্সের মত ঐরকম জ্বর হয়, তা' হ'লে বু'ঝ্‌তে হ'বে, তা'র ধাতের সঙ্গে আর ঐ জ্বরের সঙ্গে বাঘে-ভাল্লুকে লড়াই হ'বে। অবিশ্যি সে যদি রোগা-পট্‌কা, মস্‌লাদার আমিরী খানা আর চা-খেকো লোক হয়, আর তা'র দেশের আবহাওয়া যদি খারাপ হয়, তা' হ'লে এই জ্বরে সে, ঝোড়ো হাওয়ার পিদ্দিমের আলোর মত, ফুস্‌ ক'রে নিবে যা'বে. কিন্তু সাণ্ডার্স আজ ৩৫বছর ড্রাম্‌টথ্‌টির ভাল হাওয়ার মধ্যে বাস ক'র্‌ছে, ছোলার খুদ এর প্রধান খাদ্য, গরুর নির্জ্জলা টাট্‌কা দুধ এর প্রধান পানীয়, তা'ছাড়া এ ক্ষেতে গিয়ে তা'র সোঁধা-গন্ধ শুঁ'ক্‌তে শুঁ'ক্‌তে লাঙল দেয়, ফসল পেকে উঠ্‌'লে ফূর্ত্তিতে কচাকচ্‌ কাস্তে চালায়, এর হাত-পা সব লোহার মত শক্ত, তা'ই এ তো আর সহজে টস্‌কা'বে না! এর ছাতিখানাই দেখনা কত চওড়া!

আজ একে একটু খারাপ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু এ পাথরে আছ্‌ড়া'লে মরে না, এর প্রাণ যাওয়া কি এতই সহজ? না, না এ কখন স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করে নি, এখন তা'ই স্বভাবই এর সহায় হ'বে।

বেল, এ যে নিশ্চয়ই বাঁ'চ্‌বে, আমি তা এখন ব'ল্‌ছি না, কেননা এ রোগটা সয়তানের মত ফেরেববাজ, কিন্তু আমি বাঁ'চ্‌বে নাও ব'ল্‌ছি না, সুতরাং তোমার এখন হতাশ হ'বারও দরকার নেই।

কাল সকাল ছ'টার মধ্যে যা' হোক একটা 'ইস্‌পার উস্‌পার' হ'য়ে যা'বে। ফলটা ঠিক যে কি হ'বে, তা' এখন কেউ ব'ল্‌তে পারে না, কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত জানা আছে, যদি আমার সাধ্যি হয়, আমি ড্রাম্‌টথ্‌টির কোন লোককে অকালে ম'র্‌তে দেব না।

বেল, তুমি খেটে খেটে আধমরা হ'য়ে প'ড়েছ। তুমি যা' পেরেছ, করেছ। আজ রাতে তুমি ওকে আমার আর ড্রাম্‌স্নুকের হাতে স'পে দাও।

এখন তুমি শোওগে যাও, ঈশ্বরের যদি ইচ্ছে হয়, কাল সকালে আমি একে জীয়ন্ত অবস্থায় তোমার হাতে দিয়ে যা'ব। আর যদি তা' না হ'য়ে অন্যরকম হয়, তা' হ'লে শীগ্‌গিরই তোমাকে ডেকে পাঠা'ব। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি।"—এই বলিয়া, ডাক্তার তাঁহার সবল, লোহিতবর্ণ হাতখানি বেলকে বাড়াইয়া দিলেন।

বেল বিছানার দিকে ঝুঁকিয়া তাহার স্বামীকে দেখিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একপ্রকার কুসংস্কার-মূলক ভয়ে অভিভূতা হইয়া পড়িল।

"দেখ, ডাক্তার, মরণের ছাওয়া এর মুখের ওপর এসে প'ড়েছে, স'র্‌ছে না! আমার বাবা আর মা যখন মারা প'ড়েন, তখন তাঁ'দেরও মুখে আমি এইরকম ছাওয়া দেখেছিলেম। ও, আমি একে ছেড়ে থা'ক্‌তে পা'র্‌ব না।"

"হাঁ, ছাওয়াটা এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও এর ওপর পড়ে নি, ঈশ্বর করুন, কখনও যেন না পড়ে। তুমি যাও, একটু ঘুমোও গে, কারণ আমাদের এখন কাজ ক'র্‌তে হ'বে।"

* স্থানাভাবে এবারেও এই গল্পটি শেষ করা গেল না। "বালক"-সম্পাদক।

টেমস্‌-নদীতে কোন নৌকা বা জাহাজে আগুন লাগিলে, এই বহ্নিনির্ব্বাপণী তরণীদ্বারা আগুন নিবান হয়।

বেল চলিয়া গেলে, ম্যাক্লিওর ড্রাম্‌সুক্‌কে কহিলেন,—"সহরে 'নার্স' পাওয়া যায়, যন্ত্রপাতিও জুতসই, কিন্তু এখেনে আজ আমাদেরই নার্স হ'তে, আর যা' যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়, তাই দিয়ে কাজ চালা'তে হ'বে।

সমস্ত রাত উদ্বেগে কা'ট্‌বে, কিন্তু, তুমি আমার পুরাণো বন্ধু, গোঙাচ্ছে, স্ত্রী কোন কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌লেও, জবাব দিতে পাচ্ছে না, দেখে কষ্ট হয়।

উইলাম, তোমার কি মনে হয়, ওর কি বাঁচ্‌বার সম্ভাবনা আছে?"

"হাঁ, তা' আছে।"

আমি চাই, তুমিই আজ আমার কাছে থাক। কি বল, ভয় পা'বে না তো?"

"আমি ভয় পাব? ওকথা মনে ঠাঁইও দিও না। সাণ্ডার্স যখন আমার কাছে কাজ ক'র্‌তে আসে, তখন একেবারে ছেলে-মাহুষ, এখানে বিশ বছর আছে, একটু মুখবোজা লোক, কিন্তু খুব বিশ্বেসী চাকর। সকালথেকে সন্ধেপর্য্যন্ত বেচারা প'ড়ে প'ড়ে

এই কথা বলিতে বলিতে ডাক্তার তাঁহার কোট ও ওয়েষ্টকোট খুলিয়া দরজার পিছনে টাঙাইয়া দিলেন। তাহার পর, তাঁহার পিরিহাণের আস্তিন গুটাইয়া ফেলিলেন। তখন দুইখানি হাত বাহির হইয়া পড়িল, সে হাতদুইখানিতে অস্থি ও পেশীব্যতীত আর কিছু নাই।

তাহার পর, তিনি ড্রাম্‌সুক্‌কে কহিলেন,—"তুমিও তোমার

কোটটা খুলে ফেল, আজ সমস্ত রাত তোমাকে পিঠ কুঁজো ক'রে থা'কতে হ'বে। যাও, বাড়ীতে যে ক'টা বাল্‌তি আছে, যোগাড় কর, ঝর্ণায় গিয়ে সেগুলিতে সব জল ভ'রে ফেল। তা'র পর তোমাতে আমাতে সেগুলো ব'য়ে আ'ন্‌ব।"

খানিক পরে দেখা গেল, দুইজন লোক ঝর্ণার ঢালু পথ দিয়া দুইহাতে দুইটি করিয়া জলপূর্ণ বাল্‌তি লইয়া আস্তে আস্তে আসিতেছে। ম্যাক্‌লিওর আগে আগে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছেন, ড্রাম্‌মুক্ তাঁহার পিছনে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে আসিতেছে। ঘরে আসিয়া বোঝা নামাইয়া ঘরের মধ্যে যে আসবাবগুলি ছিল, তাহা তাঁহারা একপাশে সরাইয়া ফেলিলেন, একটা বড় বাল্‌তি ঘরের মধ্যস্থলে রাখিলেন। তখন ড্রাম্‌মুক্ ডাক্তারের দিকে একরকম করিয়া তাকাইয়া রহিল।

"দে'খ্‌ছ কি? আমি পাগল নই; ভয় পেও না; আজ তোমাকে ডাক্তারীতে হাতে-খড়ি দেব। যদি রুগীকে বাঁচা'তে পারি, এই উপত্যকায় তোমার নাম হ'য়ে যা'বে।

দু'টো বিপদ্ আছে—সাণ্ডার্স নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়্‌তে পারে, জ্বরও বেড়ে উ'ঠ্‌তে পারে। আমাদের দাওয়াইও ঠিক দু'টো। ঐ যে তাকের ওপর একবোতল হুইস্কী আর দুধ আছে, ওতে গায়ে জোর থা'ক্‌বে, আর এই ঠাণ্ডা জলে জ্বর বা'ড়্‌তে পা'বে না।"

"তুমি কি তবে সাণ্ডার্সকে ঠাণ্ডা জলে চুবোবে না কি?"

"এই, এতক্ষণে তুমি তবে কথাটা বু'ঝ্‌তে পেরেছ। আর এই কাজেই আমি তোমার সাহায্য চাই।"

সপ্তাহ-খানিক-পূর্ব্বে সাণ্ডার্সকে দেখিলে বোধ হইত, তাহার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ লোক বুঝি নাই, কিন্তু এখন সে নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে। তাহাকে দেখিলে, মায়া হয়।

ম্যাক্‌লিওর তাহাকে তিনবার সেই টবের জলে চুবাইলেন। প্রথম দুইবার তিনি একটিও কথা কহেন নাই। তিনবারের বার তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এর জীবনের একটু আশা হচ্ছে, এ-ছাড়া এখন আর কিছু বলা যায় না। তিনঘণ্টা পরে যা' হো'ক কিছু হ'বে।

ড্রাম্‌মুক্, আর জল চাই নি; তুমি বাইরে গিয়ে একটু হাওয়া খাও। আমি এক্‌লাই এর কাছে বসি।"

ভোর হইতে আর এক ঘণ্টা বাকী আছে। ড্রাম্‌মুক্ তাহার আজন্ম-পরিচিত মাঠগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গরুবাছুর চারণ-ক্ষেত্রে ঘুমাইতেছে। নালার জল কল্ কল্ করিয়া শিলাগুলির উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে সে একটি বাঁধ বাঁধিয়াছিল, তাহা শীতকালপর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। একটা পেচক ডাকিল, তাহা শুনিয়া ড্রাম্‌মুক্ চমকিয়া উঠিল। সে যখন বালক ছিল, তখন একবার পেচকের চীৎকার শুনিয়া তাহার মায়ের কাছে ছুটিয়া পলাইয়াছিল—তিরিশবৎসর হইল, তিনি ইহলোকহইতে বিদায় লইয়াছেন। পক্ক শস্যের সৌরভে বায়ু সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে, ঐ শস্য শীঘ্রই কাটিয়া গোলাজাত করা হইবে। সে দূর-হইতে তাহার বাড়ীর রেখাচিত্রটি অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছে, চারিদিক্ অন্ধকারময় ও শীতল, সে যাহাদের ভাল বাসিত, তাহাদের কেহই আর ঐ গৃহে নাই। সাণ্ডার্সের কুটীরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সেখানে সাণ্ডার্স এখন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু ঐ ঘরে ভালবাসা বিরাজিত। এই একক ব্যক্তির মনে এখন একক-জীবনের নিষ্ফলতার কথা উঠিতে লাগিল, এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। মানবের আয়াসমাত্রই কি অসার, মানব-জীবন কি রহস্যময়!

ড্রাম্‌মুক্ দাঁড়াইয়া আছে; রাত্রিটি তাহার অজ্ঞাতসারে ভিন্ন-ভাব-ধারণ করিল। মৃদুল মারুত বহিয়া আসিয়া তাহার কাণে কাণে যেন কি একটা কথা ফুস্‌ফুস্ করিয়া বলিতে লাগিল। ড্রাম্‌মুক্ মাথা তুলিয়া পূর্ব্বাকাশের দিকে তাকাইল। দূরে তুষারভূষণা উষার ম্লানজ্যোতিঃ তাহার নেত্রগোচর হইল, দেখিতে দেখিতে একখণ্ড মেঘে পদ্মরাগের প্রভা ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু তখনও শিশু-ভানুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, উহা তখন উদীয়মান, তাই উহার তখন অগ্রদূতেরাই কেবল প্রত্যক্ষ হইয়াছে। গোরুবাছুরগুলা নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিল, একটা কৃষ্ণকায় পক্ষী, কোকিলের কুটুম্ব, সহসা কাকলী তুলিল, তাহার পর ড্রাম্‌মুক্ সাণ্ডার্সের ঘরে পা দিতে না দিতে প্রথম রবিরশ্মি গ্রাম্পিয়ান-শৈলমালার একটী চূড়ায় পড়িয়া চূর্ণিত হইল।

ম্যাকলিওর তখন রোগীর শয্যাপার্শ্ব-পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মুখোপরি নিপতিত আলোকের সাহায্যে ড্রাম্‌মুক্ তাঁহার মুখ দেখিয়া অনুমান করিতে পারিল যে, রোগীর অবস্থা ভাল।

"এখন সাড়েপাঁচটা বাজে, এখন এর অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ নয়, কিন্তু বেশি কিছু বল্‌তে পারা যায় না, তবে এখনও আশা আছে, তুমি ব'সে ব'সে একটু ঘুমোও, একটু ঘুমোন তোমার দরকার। তোমারই জন্যে এ বেঁচে গেল।"

ড্রাম্‌মুক্ ঢুলিতে ঢুলিতে দেখিল, ডাক্তার কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়া আছেন, একটা হাত মুঠা করিয়া বিছানার উপরে রাখিয়াছেন, জয়োল্লাসে ইতোমধ্যেই তাঁহার লোচনদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

ড্রাম্‌মুক্ জাগিয়া দেখে যে, সেই প্রকোষ্ঠটি সূর্য্যালোকে প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে, গত রাত্রিতে যে সমস্ত সামগ্রী লইয়া কার্য্য করা হইয়াছিল, সে সমস্তই স্থানান্তরিত হইয়াছে।

ডাক্তার রোগীর দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত কথা কহিতেছে,—"সাণ্ডার্স, আমি, ডাক্তার ম্যাক্‌লিওর, দে'খ্‌তে পাচ্চ? আমার সঙ্গে কথা কইবার কি নড়্‌বার চেষ্টা ক'র না। এই দুধটুকু খেয়ে ফেল—প্রাতর্ভোজ তো খাওয়া চাই—খেয়ে, আবার ঘুমিয়ে

পড়।" মিনিটপাঁচেক-পরে সাণ্ডার্স সুস্থ ব্যক্তির মত গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল, সেই বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করা, গোঙান সব বন্ধ হইল। তাহার পর ম্যাক্‌লিওর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া ওয়েষ্টকোট ও কোট পরিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

ড্রাম্‌স্নুক্‌ও নীরবে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। নীহারখচিত ক্ষুদ্র উদ্যানটি পার হইয়া তাঁহারা গাভীর কাছ দিয়া চলিলেন। সে তখন বেলের আগমন-প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া শিকল ঝন্ ঝন্ করিতেছে, সাণ্ডার্স এখনও তাহাকে পক্ক শস্যের একটু পল্লব খাইতে দিতেছে না কেন? তাহার পর তাঁহারা একটা খোলা মাঠে পড়িলেন। সেইখানে পঁওছিয়া তাঁহারা থামিলেন। ডাক্তার ম্যাক্‌লিওর তখন জীবনে একবার আপনাকে আনন্দে আত্মহারা হইতে দিলেন।

কোটটা খুলিয়া পূর্ব্বদিকে ছুড়িয়া ফেলিলেন, ওয়েষ্টকোটটা পশ্চিমদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। সাণ্ডার্সের বাড়ীহইতে মাঠটা যদি আধক্রোশ তফাতে থাকিত, তাহা হইলে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন। তাহার অপেক্ষা কম দূরবর্ত্তী স্থান তাঁহার হৃদয়-ভাব-প্রকাশের পক্ষে প্রচুর নহে! আনন্দে তিনি ড্রাম্‌স্নুক্‌কে এমন এক কিল লাগাইলেন যে, তাহাতে সেই জোয়ান লোকটা একেবারে ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল। তখন ড্রাম্‌টখুটির ভিষকপুঙ্গব নিজ অভিমত-প্রকাশ করিলেন,—

"কাল রাতে সাণ্ডার্সের বাঁ'চ্‌বার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু এখন এই মুহূর্ত্তপর্য্যন্ত সে বেঁচে আছে, আর সে বাঁ'চ্‌বেও।

বেল জেগে উঠে কি সুসংবাদই পাবে! সে আর বিধবা হ'ল না, ছেলেরাও পিতৃহীন হ'ল না।

ড্রাম্‌স্নুক্, তুমি আমার দিকে অমন কট্‌মট্ ক'রে চেও না। সময়ে সময়ে হাত-পা ঠিক থাকে না, ফূর্ত্তিটা একটু বেশী হ'য়েছিল, সাম্‌লা'তে পারি নি, কিন্তু আর কিছু ক'রব না।"

তখন ড্রাম্‌স্নুক্ বুঝিল যে, ডাক্তার একটু নৃত্য করিতেছেন।

বেল এ আনন্দ-সংবাদ পাইয়া ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে তাঁহার হস্ত-চুম্বন করিয়া ফেলিল! ডাক্তার তো থতমত খাইয়া লাজুক ছেলের মত "ধেৎ" বলিয়া হাত সরাইয়া লইলেন, কেহ যেন তাঁহার হাতটা পোড়াইয়া দিল!

পরদিন গির্জ্জায় পাদ্রীসাহেব প্রার্থনায় ডাক্তারের কল্যাণ-কামনা করিলেন। মণ্ডলীর লোকেরা জড় হইয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া ডাক্তারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার দেখা পাইয়া, সেদিন বিশ্রামবার হইলেও, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে জেম্‌স্ ভড়্‌কাইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া কিন্তু লোকগুলির মনে হইল, পাদ্রীসাহেব কি মনে করিবেন? এদিকে কিন্তু পাদ্রীসাহেব স্বয়ং সে আনন্দে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করিলেন না!

(বারান্তরে সমাপ্য।)

পঠন-সহায়

মূর্খ এক—পড়িতে না জানে—
বন্ধুসহ পথে বাহিরায়;
লেখা আছে একটি দোকানে,—
"চস্মা! চস্মা! পঠন-সহায়!"

বন্ধু তা'র পড়ে তা' চেঁচা'য়ে,
মূর্খ তাহা শুনি' হরষিত!
পরদিন বন্ধুরে লুকা'য়ে
সে দোকানে হয় উপনীত।

একে একে লাগায় লোচনে
দশবিশ "পঠন-সহায়"!
মনোসাধ র'য়ে যায় মনে,
পড়িতে সে পারেনাক, হায়!

এদিকেতে বিক্রেতা ত আর
যোগাইতে পারে না 'সহায়'!
ভাবে মনে,—'আচ্ছা খরিদ্দার
যুটিয়াছে আজ পহিলায়!'

ত্যক্ত হ'য়ে মূর্খেরে সুধায়,
'প'ড়্‌তে-শু'ন্‌তে জানেন ম'শায়?'
মূর্খ তা'য় সবিস্ময়ে চায়,
হয় শেষে গরম বেজায়!

'কি বলিস্ ঠগ্—জুয়াচোর!
প'ড়্‌তেই জা'ন্‌ব যদিস্যাৎ,
প'ড়্‌বের চস্মা কেন তোর
কি'ন্‌তে তবে আসি রে হঠাৎ?'

এত বলি মূর্খ ক্রোধভরে
গর্‌গর্ করি' যায় চলি'!
ব্যবসায়ী চিন্তে ক্ষণতরে,
তা'র পরে হেসে' পড়ে ঢলি'!

আলু।

ত্রিরসাত্মক।

(১) বীররস।

ভোঃ ভোঃ আলু! তুমি অতীব বীর্য্যালু। হে অখণ্ডমণ্ডলাকার! তুমি সর্ব্বখাদ্যসার। যে তোমাকে বদন ভরিয়া অদন করে, সে বুঝি কখনও শমন-সদনে গমন করে না। সুদূর আমেরিকা তোমার আদিম নিবাস, তথাহইতে মনস্বী স্যার ওয়াল্‌টার র‍্যালে তোমাকে মহারাজ্ঞী এলিজ্যাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে আনয়ন করেন, তদবধি তুমি মহাব্রিটনের আপামর-সাধারণ প্রত্যেক অধিবাসীর প্রধান খাদ্য হইয়া আসিতেছ এবং তোমাকেই ভক্ষণপূর্ব্বক বলীয়ান হইয়া ইংরাজ আজ অর্দ্ধভূমণ্ডলের অধিপতি হইয়া উঠিয়াছে। হে দ্বিরদরদশুভ্র (অবশ্য খোসা ছাড়াইলে) উদ্ভিদ্‌বর! তোমার তাবৎ গুণের কীর্ত্তন আমার সাধ্য নহে। তুমি সকল ঋতুতেই খাদ্য এবং সকলেরই অর্থ-সাধ্য। তোমাতে সকলেরই পুষ্টি—সকলেরই তুষ্টি! হে উদ্ভিদার্য্য! তুমি সর্ব্ব ব্যঞ্জনেই ব্যবহার্য্য। মানবজীবনে তুমি একেবারে অপরিহার্য্য। হে সারাৎসার, তোমায় কোটী কোটী নমস্কার

(২) করুণরস।

হায় আলু! আমার কিছুই হজম হয় না, কি করি? তাহার উপর আবার বহুমূত্র দেখা দিয়াছে। তাই ডাক্তার তোমায় খাইতে বারণ করিয়াছে, আলু রে আমার কি হ'ল রে! কাঁচকলা খাইয়া খাইয়া পেটে যে চড়া পড়িয়া যাইতেছে! আহা হা আলু! কচু, ওল, উচ্ছে, ঝিঙে এ সকল খাইতে নিষেধ না করিয়া ডাক্তার তোমাকেই কেন খাইতে মানা করিল? ওহো আলু, তোমা-বিহনে আমার প্রাণ যে যায়! সকলেই আমার চোকের সাম্‌নে বসিয়া গপাগপ্ ঝোলে, দাল্‌নায়, কালিয়ায়, চড়্‌চড়ীতে, সর্‌সড়ীতে, ভাতে ও ভাজা তোমায় খাইতেছে! দেখিয়া আমার জিভের অবস্থা যে কি হয়, তা' আর তোমাকে কি বলিব? পোড়া চোকে জল আর রাখিতে পারি না, আলু! বুক ফাটিয়া যায়। হায়, তোমাকে পোড়াইয়াও কেহ আমাকে খাইতে দেয় না। কি আমার পোড়া কপাল! আমার বহুমূত্র না হইয়া অন্য কোন রোগ কেন হইল না? তাহা হইলে হয়ত তোমার মধুর রসাস্বাদ করিয়া জীবন-সার্থক করিতে পারিতাম। এককালে তোমায় খাইয়াছি, আলু, এখন আর স্পর্শ করিবারও জো নাই। হা আলু, হা আলু, আমি যে তোমাগত প্রাণ ছিলাম, এখন তুমি কেমন করিয়া আমাকে ছাড়িয়া অন্যের উদরস্থ হইতেছ? তোমার কি আমার প্রতি কিছু-মাত্র মমতা নাই? যে তোমাকে বাল্যাবধি বন্ধু মনে করিয়া আসি-য়াছে, আজ তুমি তাহারই উদরের বৈরী হইলে? তোমাবিহনে আমার দিন যে কেমন করিয়া কাটিতেছে, তাহা যদি অনুভব করিতে পারিতে, তাহা হইলে তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া পচিয়া যাইতে!

(৩) হাস্য-রস

হা, হা, হা আলুভায়া! চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া তোমাকে খাঁটি সরিষার ছাঁকা তেলে ভাজিয়া দিয়াছে যে, তোমার সঙ্গে আলাপ করিব কি, তোমার ও ভাজা ক'খানা সাবাড় না করিলে, জিহ্বা-মহাশয় বিলাপ করিবেন। আরে, আবার চা'র টুক্‌রা হইয়া ঝোলেও যে দর্শন দিলে, তবেই সারিয়াছ! এই রে আবার আলুর দম! বাপরে বাপ্! এত কি হয় হজম! আলু, আমি জানি, তুমি বড় কৃপালু, কিন্তু, দাদা, এত পেটে সইবে কেন? তোমার সঙ্গে বিড়াল ডিঙাইতে পারে না এত উঁচু একথালা মল্লিকাফুলের মত ঝর্‌ঝরে ভাতও যে পেটের মধ্যে বাসা লইল! দোহাই, আলু, আর ঐ আলুর চপরূপে দেখা দিও না, দাদা! একটা সাদা কথা বলি, পেটটা ফাঁসিয়া যাইবার জো হইয়াছে। আলু, মনে করিতে-ছিলাম, আর তোমায় খাইব না, কিন্তু, দেখ দেখি, আবার অম্বলেরও যে তুমি সম্বল হইয়া আসিলে! তুমি কি উদ্ভিদ-রাজ্যের পুরোহিত যে, তোমাকে না হইলে কোন কাজই চলিবে না?

হি, হি, হি আলু-ভায়া! বৈকালেও যে তুমি গরম গরম পাত সরগরম করিতেছ! আলুর ফুলুরী? মরি মরি কি মাধুরী! খাই তবে বদন পূরি'! আলু, তুমি খোসাসুদ্ধ রসগোল্লা! আচ্ছা, আলু, তুমি গোল কেন? ফুটবল বিপক্ষের 'গোলে' ঢুকিলে, যেমন আনন্দ হয়, তোমাকে পেটে ঢুকাইলে তেমনই আরাম পাওয়া যায়, তাই কি? সিদ্ধ করিলে, কি 'তুল্‌তুলে' নরম তুমি! কিন্তু নৈনি-তালে গিয়া একটু ফেঁস ফেঁসে আর লম্বা হইয়া পড় কেন? তা হ'ক তখনও তুমি ফেল্‌না যাও না। আলু, তোমার মাহাত্ম্য কি বর্ণিব? কচু—মানকচু-পোড়াও খাওয়া গালাগালি; কিন্তু তোমার পোড়াও বেশ! একবার আলু-পোস্তায় আগুন লাগিয়াছিল, মোণ মোণ তুমি ঝল্‌সিয়া গিয়াছিলে। এক ভিখারী তোমাকে পোড়া অবস্থায় পাইয়া পেট পূরিয়া খাইয়া তৃপ্ত হইয়া মহাজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বাবু, আলুর গুদোমে আবার কবে আগুন লা'গ্‌বে গা?"

লোকে বলে, "ঘী খাও, দুধ খাও, মাংস খাও, গায়ে জোর হ'বে", কিন্তু তুমি যে এক-একটি "বুলেট্" তা', বোধ করি, কাহারই জানা নাই। তোমাকে না হইলে গৃহস্থের সংসারই চলে না। খোকা ভাত খাইতে চাহিতেছে না, তাহাকে তোমার লোভ দেখা-ইলাম, অমনি সে পেট পুরিয়া অন্নাহার করিল। কর্ত্তার সকাল ৯॥৹টায় আফিসে হাজিরি দিতে হয়, তোমাকে ভাতে দিলাম, আর দিলাম কলাইএর দাল; তিনি তোমার 'টাক্‌না' দিয়া হাপুস্ হাপুস্ করিয়া একথালা কলাইর দা'ল ও ভাত খাইয়া চাকুরী করিতে

ছুটিলেন। কোন তরকারী মজাইতে বা বাড়াইতে হইলে, তোমার খানকতক টুক্‌রা তাহাতে ফেলিয়া দিলাম, তরকারী বাড়িল, মজিলও বটে। ফাল্গুন-চৈত্রমাসে একটু তিত খাইতে হয়; খাইতে তো হয়, কিন্তু খায় কে? উচ্ছে, বেজায় তিত; কিন্তু আলু-উচ্ছে ভাতে? কা'র অরুচি তা'তে? তোফা, বেড়ে! কেরাণীগিরিতে যেমন বাঙ্গালী সকল দেশেই আছে, তরকারীর মধ্যে তেমনই আলু—সব ব্যঞ্জনেই পা'বে। আমার কিন্তু আলু-ভাতেটাই বেশী ভাল লাগে। বাঙ্গালী-মুসলমানেরা বলে, আলু-ভর্ত্তা। ভর্ত্তাই বটে, যে ভরণ করে, সেই ভর্ত্তা। আলুর চেয়ে আমাদের ভর্ত্তা কে? আলুর খোসাসুদ্ধ ফেলিবার জিনিস নয়। যা'র হাত দিয়া সহজে জল গলে না, সে তা'র ছেঁচ্‌কী করিয়া খায়! নূতন আলু খোসাসুদ্ধ কাটিয়া ছেঁচ্‌কী করিয়া খাও, তা'র সঙ্গে এক 'খোরা' ভাত কর্পূর-বৎ কোথায় উবিয়া যাইবে।

পাঠক, তুমি চাকুরীর জন্য কাহারই উমেদারী করিও না, পার যদি, আলুর উমেদারী করিও, তাহা হইলে জমিদারী করিয়া ফেলিবে! একমোণ আলুর চাষ করিলে, অনেক আলু হয়, অবশ্য একটু উমেদারী করিতে হয়। চাকুরী ঝক্‌মারী, তা'র চেয়ে আলুর চাষ কর, আলু খাও, আঁতে-দাঁতে দিতে কিছু পা'বে।

ক্ষুদ্র।

তোমরা অনেকেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে, গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাও না, হাঁটিয়াই যাও। আবার তোমাদের অনেককেই হয়ত অন্ততঃ পোয়াটাক পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হয়। এই যে পথটুকু দুইবেলা স্কুলে যাইতে ও স্কুলহইতে ফিরিতে হাঁটিতেছ, ইহার মধ্যে কি একটি সত্য লুকান আছে, তাহা কি কখন ভাবিয়া দেখিয়াছ? ধর, তোমার পায়ের চেটোর মাপ ৯ ইঞ্চি, আর ধর তোমাকে প্রতিদিন স্কুলে যাইতে-আসিতে আধক্রোশ পথ হাঁটিতে হয়। আধক্রোশ = একমাইল। ১৭৬০ গজে একমাইল, ৩৬ ইঞ্চিতে একগজ। ১৭৬০ × ৩৬ = ৬৩৩৬০ ইঞ্চি! তুমি তোমার ৯ ইঞ্চি পা-দিয়া রোজ অত ইঞ্চি পথ হাঁটিতেছ, বিশেষ কোন কষ্ট-অনুভব কর না, আশ্চর্য্য-বোধও কর না। ইহাহইতে কি একটি সত্য-শিক্ষা করা যাইতেছে?—ক্ষুদ্র তুচ্ছ নয়। পর্ব্বতের উপরে প্রস্রবণ থাকে, তাহাহইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িয়া সমতল স্থানে গড়াইয়া আসিয়া নির্ঝরিণী হইয়াছে, সেই রকম দুই-দশটি নির্ঝরিণী মিলিয়া গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি নদ বা নদীর উদ্ভব হইয়াছে; ভাব দেখি, ছোট একটি জলের ফোঁটা কালে কি না হইয়া উঠিতে পারে! এক মুহূর্ত্তে কিছু হয় না, কিন্তু যে প্রতিমুহূর্ত্তের কর্ত্তব্যটি করিয়া যায়, সে দিনশেষে দেখে, একটা কিছু সম্পন্ন হইয়াছে। ছোটকে যত্ন করিলেই, বড়কে পাওয়া যায়। এক গ্রন্থকারের কাছে তাঁহার লিপিকর রোজ ২০মিনিট করিয়া দেরী করিয়া আসিত, গ্রন্থকার সেই কুড়ি-মিনিট নিজের হাতে একখানি বই লিখিতেন, বৎসরের শেষে বইখানি প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল; তখন তিনি তাঁহার সেই অকালতৎপর লিপিকরকে কোন্ সময়ে বসিয়া সেই প্রকাণ্ড পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা জানাইলেন, শুনিয়া সে লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল!

তবে তোমাদের কি দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে?

(১) বড় আর কিছু নয়, ছোটর সমষ্টি; সুতরাং ছোটকে কাহারই উপেক্ষা করা উচিত নহে।

(২) মহত্ত্ব দুর্লভ নয়, বরং সকলেরই পক্ষে সুলভ হইতে পারে। কি করিয়া?—ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা না করিয়া।

বিদ্বান্ বালক।

(বালকের রচনা—সংশোধিত।)

বা রোবছরের ছেলে, বড় বুদ্ধি তা'র,
ল ক্ষ লক্ষ লোকে তা'র কাছে মানে হা'র!
ক ড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পণ—মুখে খই ফোটে,
স ট্'কে ব'ল্‌তে জিভে "মেল ট্রেণ" ছোটে!
ক ভু যদি কেহ তা'রে কোন প্রশ্ন পুছে,
লে হন করিয়া ওষ্ঠ, কহে নাক মুছে'—
পা চ-কড়া?—তিন গণ্ডা! চার পাচে?—বারো!
ঠ কাইতে ধারাপাতে কে তাহারে পারো?
ক ত শত এই মত প্রদানি' উত্তর,
র চিতে আঁকের বই হ'ল সে তৎপর!

এ ইরূপে কিছুকাল হইলে বিগত,
ভা ল ভাল পুস্তক সে হয় পাঠে রত।
রী তিমত নানাজ্ঞানে হ'ল সে মণ্ডিত,
ম স্ত বড় ইংরাজীতে হ'ল সে পণ্ডিত!
জা হাজাকে বলে "goat", ছাগলকে "boat";
র গের ইংরাজী "throat", পা'জামার "coat"!
ব লত দেখেছ কোথা এত ভাল ছেলে?
ই হলোকে নাই, যদি পরলোকে মেলে!

শ্রীঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য

ব্যাড্‌মিণ্টন।

শিক্ষানবীশদিগের প্রতি সঙ্কেত।

যাহারা ব্যাড্‌মিণ্টন শিখিতেছে, তাহারা যেন, যতদুর সম্ভব, ভাল খেলোয়াড় হয়, তজ্জন্য একজন সুবিখ্যাত খেলোয়াড় Daily News-নামক ইংরাজী পত্রিকায় একটি উপকারী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের সার-সঙ্কলন করিয়া দিলে, "বালকের" পাঠকদিগের উপকার হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী লিখিতে বসিলাম। সাধারণ মানবজীবনে যেমন, সবরকম খেলাতেও তেমনই কু-অভ্যাস বড় ভয়ানক ব্যাপার; একবার একটি কু-অভ্যাস জন্মিয়া গেলে, তাহা দুর করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। কাজেই আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, কোনরকম খেলা শিখিতে গেলে, গোড়াথেকে ভাল প্রণালীতে খেলা করা দরকার; যেমন তেমন করিয়া খেলা করিলে, চলিবে না। এ বিষয়ে প্রথম কথা হইতেছে এই যে, ব্যাট্ যেমন তেমন করিয়া ধরিলে, চলিবে না। ব্যাটটী এমনভাবে ধরিয়া থাকিতে হইবে, যেন উহার সম্মুখভাগ নয়, কিন্তু একধারই তোমার বিপক্ষদের দিকে হয়, নহিলে তুমি তেমন জোরে কন্দুক মারিতে পারিবে না।

আর একটী কথা মনে রাখা দরকার :—কন্দুক তোমার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, এমন সময়েই, যদি সম্ভবপর হয়, তাহাতে আঘাত করিবে। অনেক খেলোয়াড়, যেপর্য্যন্ত না কন্দুক আরও নীচে আসিয়া পড়ে, সেইপর্য্যন্ত তাহাতে আঘাত করিতে প্রায়ই চেষ্টা করে না; এইরূপে কন্দুককে খেলোয়াড়ের কোমর-পর্য্যন্ত পড়িতে দেওয়া বড় ভুল। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, কন্দুকটী উপরহইতে নীচে ছুড়াতে যেমন স্কোর করা যায়, নীচুথেকে উপরদিকে ছুড়িলে, তেমন স্কোর করা যায় না। যাহারা যখন বিপক্ষ-দলকে আক্রমণ না করিয়া কেবল আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারা তখন উক্ত দ্বিতীয় প্রকারে কন্দুকে আঘাত করে, কিন্তু খেলোয়াড়ের পক্ষে এইপ্রকার আঘাত করিয়া জয়লাভ করা একান্ত দুঃসাধ্য। ফলতঃ উল্লিখিত একপ্রকার আঘাতকে আক্রমণকারী ও অন্যপ্রকার আঘাতকে আত্মরক্ষাকারী খেলোয়াড়ের উপায় বলিলেও, চলে।

শিক্ষানবীশের প্রথম শিক্ষার বিষয় এই—মাথার উপর হাত তুলিয়া কন্দুকে এমনভাবে আঘাত কর, যেন উহা বিপক্ষ-দলের ব্যাক্-বাউণ্ডারি-লাইনের কাছে উড়িয়া যায়। কন্দুকটি খেলোয়াড়ের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেলে, এই অভ্যাস করা কঠিন নহে, কিন্তু খেলিবার সময়ে আমরা সব সময়ে কন্দুকে এইরূপ আঘাত করিবার সুযোগ পাই না, কাজেই অন্য একপ্রকার আঘাত-অভ্যাস করা দরকার। এইপ্রকার আঘাতকে ইংরাজীতে ব্যাক্-হ্যাণ্ড বলে। কন্দুক যখন খেলোয়াড়ের বাঁ-পার্শ্বে পড়িয়া যাইতেছে, তখন ব্যাক্-হ্যাণ্ড-আঘাতের দ্বারা উহা মারিতে হয়। ব্যাক্-হ্যাণ্ড-আঘাতে খেলোয়াড় কেবল বাহু নয়—সমস্ত শরীরকে প্রয়োগ করে। আঘাত করিতে গেলে, খেলোয়াড়ের ডাইন স্কন্ধ বা পিঠও জালের দিকে হইবে। খেলোয়াড় বাঁ-স্কন্ধের উপর ব্যাট্ তুলিয়া কন্দুক মারিবার সময়ে নিজ শরীর এমনভাবে ঘুরাইয়া দিবে যে, আঘাত-শেষ করিলে, তাহার মুখ জালের দিকেই হয় এবং ব্যাটটি ডাইন-স্কন্ধের উপরে পড়ে। অনেক সময়ে দেখা যায়, কন্দুক খেলোয়াড়ের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেলেও, সে উহা বিপক্ষদের কোর্টের মধ্যে জোর করিয়া নিম্নাভিমুখে ছুড়িবার সুযোগ পায় না। সেস্থলে সে কন্দুকটী উপর-দিকে ছুড়িয়া বিপক্ষদের ব্যাক্ বাউণ্ডারি-লাইনের কাছে পঁহুছাইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু, সম্ভব হইলে, সে জোর করিয়া নিম্নাভিমুখে ছুড়িবে; এইরকম আঘাতকে ইংরাজীতে স্ম্যাশ বলে। স্ম্যাশ ব্যাডমিণ্টনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আঘাত; ইহা ভাল করিয়া না শিখিলে, নয়। স্ম্যাশ করিতে গেলে, খেলোয়াড় ডাইন-পা একটু পিছাইয়া দিয়া তাহাতে শরীরের ভার দিবেন, এমন সময়ে সে মাথার কাছে ব্যাট্ ঘুরাইয়া খুব জোরে কন্দুক মারিবে। মারিবার সময়ে খেলোয়াড় ব্যাটটি যথাসাধ্য মাথার উপর তুলিয়া বাড়াইবে এবং ডাইন-পায়ে আর ভর না দিয়া বাঁ পায়েতে সমস্ত ভর দিবে। তবে, খেলোয়াড় ভাল করিয়া স্ম্যাশ করিলে পর, তাহার অবস্থান কিরূপ হইবে, তাহা একবার দেখা যাইক। খেলোয়াড় বাঁ-পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ডাইন-পা সম্ভবতঃ আর ভূমি-স্পর্শ করিতেছে না; তাঁহার ব্যাট্ ভূমির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। এইপ্রকার আঘাত বড়ই উপকারী।

আর একরকম আঘাত আছে, যাহা খেলোয়াড়ের অনেক উপকারে আসিতে পারে; ইহাকে ইংরাজীতে ড্রপ্-শট্ বলে। খেলোয়াড় জালের কাছে থাকিলে, এই আঘাত করিবার সুযোগ পাইতে পারে। তাহার অভিপ্রায় এই, যেন কন্দুক জালের উপরিভাগ-অতিক্রম করিয়া জালের খুব কাছেই পড়িয়া যায়। এই আঘাত হাতের কব্জির সঞ্চালনদ্বারাই করা যায়।

বলা বাহুল্য, ভাল করিয়া 'সার্ভ' করিতে শিখা দরকার, কেননা ইহার উপর খেলোয়াড়ের কৃতকার্য্যতা অনেকটা নির্ভর করে। এমনভাবে 'সার্ভ' করিতে হইবে যেন, কন্দুক কোন্‌দিকে ও কিরূপে আসিতেছে, বিপক্ষ খেলোয়াড় তাহা কিছুতেই বুঝিতে না পারে। ফলতঃ বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ঠকান দরকার।

ব্যাডমিণ্টন-শিক্ষানবীশদিগের প্রতি সম্প্রতি আমাদের শেষ-কথা এই যে, ভাল খেলোয়াড় হইতে চাহিলে, রীতিমত অভ্যাস করিতে হইবে। বিশেষতঃ, সুযোগ পাইলে, ভাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলা করিবে। এইরূপে মন দিয়া অভ্যাস করিলে, হয়ত, তুমি একদিন সুনিপুণ খেলোয়াড় হইয়া উঠিতে পারিবে।

কুকুরের কীর্ত্তি।

মফীজুদ্দীন মণ্ডল চাষা; চাষবাস করে, তাহাছাড়া তাহার 'বোক্‌রীর' (ছাগলের) কারবার আছে। সোমবার সোমবার ঝুমঝুমপুরে বড় একটা হাট বসে। সেদিন মফীজুদ্দীন একটা 'ঘিয়েভাজা, বেটো' ঘোড়ায় চড়িয়া একপাল ছাগল তাড়াইতে তাড়াইতে ঐ হাটে যায়; হাটে ছাগল বেচিয়া দরকারী জিনিস-পত্র খরিদ করিয়া বাড়ীতে ফিরিতে তাহার রাত হইয়া পড়ে।

মধ্যে একদিন ঝুমঝুমপুরের পথে একটা রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া-অবধি নসীবন-বিবি (মফীজুদ্দীনের স্ত্রী তাহাকে "সাঁজ" করিয়া বাড়ী ফিরিতে মানা করে; কিন্তু মফীজুদ্দীন জোয়ান মরদ, গায়ে অসীম বল, সে সুধু হাসিয়া উড়াইয়া দেয়।

আজ আবার সোমবার। মফীজুদ্দীন গোটা দশ-বারো ছাগল লইয়া হাটে বেচিতে চলিল। নসীবন মাথার 'কিরা' দিয়া বলিল,—"একটু রোস্‌নি থাক্‌তি থাক্‌তি আইসো।"

মফীজুদ্দীন হাসিয়া বিদায় লইল। ছাগল বেচিতে বেচিতে সওয়া-চারিটা হইল; বেশ দু'পয়সা মুনাফা হইয়াছে, মফীজুদ্দীন-মিঞার দেল্ খোস্ হইয়া উঠিয়াছে। সে হাসিমুখে বাড়ী ফিরিতেছিল, আজ 'পুঁটুর মা' (নসীবন) না জানি কত সোহাগ করিবে!

ক্রমশঃ ঘুটঘুটে আঁধার হইয়া উঠিল। এখানে সেখানে অশ্বত্থ, শ্যাওড়া, বট প্রভৃতি গাছে জোনাকী ঝিকিমিকি করিতে লাগিল। শিয়ালের হুক্কাহুয়া, আর বেঙের খাম্বাজী গলা শুনা যাইতে লাগিল। একটা কুকুর হাটহইতে মফীজুদ্দীন-মিঞার পাছু নিয়াছে, তাড়াইলেও যাইতেছে না। মফীজুদ্দীন ভাবিতে লাগিল,—"আজব কুকুর যা' হোক! আরে, এডা চায় কি?"

এইবার সে একটা বাঁশবনের মধ্য দিয়া চলিল। বেশী দূর যাইতে না যাইতে দুইদিক্‌হইতে দুইটা ষণ্ডাগোছের লোক আসিয়া একজন তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিল, আর একজন মাথার উপরে প্রকাণ্ড একটা লাঠি উচাইয়া বলিল, "মিঞাসাহেব! মেহেরবানি কইরে ত'বিলটা এ তাঁবেদারের হাতে দিবার ইচ্ছা করেন।"

এমন সময়ে কোথাহইতে সেই কুকুরটা আসিয়া একজন ডাকাতের টুঁটি কামড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চিৎপটাং করিয়া ভুঁয়ে ফেলিয়া দিল! তখন মফীজুদ্দীন দোস্‌রা ডাকাতটাকে আচ্ছা করিয়া ঘোড়ার চাবুক দিয়া চাব্‌কাইয়া দিল। সে পিস্তল বাহির করিল; মফীজুদ্দীন তাহার হাতের কব্জির উপর খুব জোরে এক-ঘা চাবুকের বাঁটের বাড়ি লাগাইল, তাহার হাতহইতে পিস্তলটা খসিয়া পড়িল। ঘোড়াটা তখন পলাইয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মফীজুদ্দীন তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার উপর সওয়ার হইল। ঘোড়াটা বুঝি বিপদ্ বুঝিল, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে উধাও হইয়া গেল। কুকুরটা তখনও পহেলা ডাকাতের বুকের উপর বসিয়াছিল।

যখন মফীজুদ্দীন দূরহইতে তাহার কুটীরের আলোক দেখিতে পাইল, তখন তাহার যেন ধড়ে প্রাণ আসিল। তখন সে কুকুরটা তখনও তাহার পিছু পিছু আসিতেছে কি না, তাহা দেখিতে কৃতজ্ঞচিত্তে পিছন ফিরিয়া চাহিল। তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ঘরে পঁহুছিলে, তাহার বিবি বলিল,—"এই বুঝি তোমাগোর রোস্‌নি থাক্‌তি থাক্‌তি আইসা? মোর জানডার ভিতর যে কি ক'র্‌তেছিল, তা'র তুমি কি জানবা? কুথাথিকে আবার এড্ডা ধেইড়ে কুত্তা আইছে, দূর্ দূর্ কইরে কত তাড়াইবার লাগছি, ড্যাগরা যা'বার মন করে না!"

"কই সে কুত্তা কোহানে?"

নসীবন কুকুরটাকে দেখাইল। মফীজুদ্দীন দেখিল, সেই হাটের কুকুর। তখন সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, উহাকে পেট ভরিয়া খাইতে দাও। উহার খাওয়া না হইলে, আজ আমি "খানা" ছুঁইবই না। নসীবন কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মফীজুদ্দীন তখন পথের ডাকাইতির কথা বলিল। পরে কুকুরটাকে আদর করিতে করিতে যাহা বলিল, তাহার ভাব এই, তুমি আমার 'জান' বাঁচাইয়াছ, যতদিন আমি বাঁচিব, তোমাকে পুষিব। কুকুরটি পেট পুরিয়া মুরগীর গোশ ও ভাত খাইয়া লেজ নাড়িয়া আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিল।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পরদিন সকালে মফীজুদ্দীন তাহাকে বিস্তর 'তালাস' করা সত্ত্বেও কোথাও খুঁজিয়া পাইল না!

সে মফীজুদ্দীনের প্রাণ দিয়াছিল, কিন্তু বুঝি তাহার গলগ্রহ হইয়া থাকিতে চাহে নাই!

আজব বোতল।

একটি কাচের বোতল লইয়া তাহার তলায় হীরার ছুরী দিয়া কয়েকটি ছোট ছোট ছেঁদা কর। তাহার পর বোতলটি একটি জলের বাল্‌তিতে গলাটুকু বাদ দিয়া চুবাও। পরে তাহাতে জল ভরিতে থাক, কানায় কানায় জল ভর। তাহার পর উহার মুখ একটি ভাল ছিপি-দিয়া ভাল করিয়া আঁটিয়া দাও। অনন্তর উহা জলহইতে তুলিয়া উহার গা ভাল করিয়া একটি শুক্‌ নেক্‌ড়া দিয়া মুছিয়া ফেল। তাহার পর তুমি তোমার এক বন্ধুর হাতে উহা দিয়া বল,—"এই বোতলের জল না ফেলিয়া তুমি ইহার ছিপি খুলিতে পারিবে না।" সে অবশ্য বলিবে,—"কেন পারিব না, নিশ্চয়ই পারি।"

কিন্তু যেই সে বোতলের ছিপি খুলিবে, অমনি দেখিবে, কোথা-হইতে টস্‌ টস্‌ করিয়া বোতলহইতে জল পড়িয়া যাইতেছে! বোতলটি যতক্ষণ জলভরা ও ছিপি আঁটা ছিল, ততক্ষণ বোতলের বাহিরের হাওয়ার চাপে বোতলহইতে জল পড়িতে পাইতেছিল না, কারণ তখন বোতলের ভিতরে হাওয়ার চাপ ছিল না, কিন্তু যেই বোতলের ছিপি খুলিয়া ফেলা হইল, অমনি বোতলের ভিতরের হাওয়া উপরে উঠিয়া চাপ দিতে লাগিল, ফলে তখন বোতলের তলার ছেঁদা দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

ধাঁধা।

নিবাস মানস-সরে, মোরা মহাবংশ,—
বুঝিতেই পারিতেছ, মোরা রাজহংস।
মধ্য-অঙ্গ না রহিলে, যাইব তো মরি,'—
সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে যা'ব শাতের বদরী!
মহানন্দে ভুঞ্জি মোরা "মানস"-মৃণাল,
হিমারণ্যবাসী নাম দিয়াছে "——"।

২

সোজায় অনেকগুলি, উল্টাইলে রম্ভা;
দিতে পার পরিচয়, ধন্যা তব অম্বা!

আধাআধি কর মোরে, সন্ধি যদি জান,
প্রথমার্দ্ধ খুকীর পায়,
শিঞ্জিতে সে ঘর মাতায়,
সপ্তাহেতে চন্দ্রযোগে দ্বিতীয়ার্দ্ধে আন।
আছি তব নবগ্রন্থে, কর যাহা পাঠ,
মাথা কেটে কি করিবে?—হ'ব আমি লাট

ডিম কোন্‌ লিঙ্গ?

"না ফু'ট্‌লে কি ক'রে বলি?"

পণ্ডিতমহাশয় ব্যাকরণ পড়াইতেছেন।
"তারক, অণ্ড কি পদ?"
"বিশেষ্য, পণ্ডিতমশাই।"
"বেশ! কোন্‌ লিঙ্গ?"
তারক মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল
"আরে গর্দ্দভ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ না ক্লীবলিঙ্গ?"
"ডিম না ফু'ট্‌লে তা' কি-ক'রে বলি, পণ্ডিতমশাই?"

খরগোশ-তাড়া।

(খেলা।)

এই খেলার মত আমোদজনক ও স্বাস্থ্যকর খেলা অতি অল্পই আছে। শনিবার-দিন বেলা দুইটার সময় স্কুলের ছুটি হয়, তখন এই খেলাটি বেশ খেলা যাইতে পারে। যাহারা সহরে থাকে, তাহারাও সহরহইতে সহরতলীতে সহজেই ট্রামে চড়িয়া গিয়া পড়িতে পারে, এবং সহরতলীতে গিয়া এই খেলা খেলিতে পারে।

যত জন বালকে ইচ্ছা করে, ততজন বালকেই খরগোশ-তাড়া-খেলায় যোগ দিতে পারে। বারো বড় কম সংখ্যা নয়, সচরাচর বারোজন ছেলে এই খেলাটি বেশ খেলিতে পারিবে। ইহাদের মধ্যে দুইজন খরগোশ হইবে, বাকী দশজন নেকড়ে-বাঘ হইয়া ইহাদের তাড়া করিয়া যাইবে। খরগোশ-দুইজন খানিক আগে-হইতে এমন একটী জায়গা দিয়া ছুটিয়া পলাইবে, যে জায়গাটির কথা বাকী ছেলেরা কিছুই জানে না। তাহারা যখন ছুটিয়া যাইবে, তখন টুকরা কাগজ ছড়াইতে ছড়াইতে যাইবে। নেকড়ে-বাঘেরা মিনিট-দশ-পনের অপেক্ষা করিবে, তাহার পর খরগোশ-দিগকে 'ধাওয়া' করিয়া যাইবে। খরগোশদের ধরাই তাহাদের কাজ, খরগোশেরা বরাবর একসঙ্গে থাকিবে। নেকড়েরা কাগজের চিহ্ন দেখিয়া খরগোশদের সন্ধান করিতে থাকিবে। যেদিন ঝোড়ো হাওয়া বয়, সেদিন এখেলা করা তত সুবিধার নয়, কারণ হাওয়ায় কাগজগুলি এদিকে ওদিকে উড়িয়া যায়, তাহাতে নেকড়েরা খরগোশদের পথ-নির্ণয় করিতে পারে না।

এই খেলাটি খেলিবার সময় কিরকম পোষাক পরা উচিত? যাহারা ধুতি পরে, তাহারা "মালকোচা মারিয়া" ধুতি ও একটী গেঞ্জী বা হাতকাটা ফতুয়া পরিবে। যাহারা "কোটপ্যাণ্ট" পরে, তাহারা একটী "হাফপ্যাণ্ট" ও গেঞ্জী পরিলেই ভাল হয়। পায়ে জুতা ও মোজা থাকিলেই ভাল হয়, কাম্বিসের হাল্‌কা জুতাই ভাল, কারণ সকলকেই হয়ত বেড়া ডিঙাইতে, নানা বন-বাদাড় দিয়া যাইতে হইবে, মাঝে মাঝে এক-আধটা পগারও লাফাইয়া পার হইতে হইবে।

আগেহইতে অনেক কাগজ কুচাইয়া রাখিতে হইবে, এবং ছুটিবার সময় খরগোশ-দুইজন দুই-দুইটি থলিয়ায় ঐ কুচান কাগজ ঠাসিয়া পুরিয়া থলিয়া-দুইটি দুই কাঁধে ঝুলাইয়া ছুটিতে থাকিবে। অবশ্য যদি অনেক দূর ছুটিতে হয়, তবেই দুইটি করিয়া থলিয়ার প্রয়োজন হইবে, নচেৎ একটী করিয়া থলিয়াই প্রচুর হইবে।

যাহারা এই খেলা খেলিতে চাহে, তাহাদের কিছুদিন আগে-হইতে ছুটা-অভ্যাস ও ভাল করিয়া খাইয়া-দাইয়া গায়ে জোর করিয়া লইতে হইবে।

ইহাছাড়া ছুটিবার কিছুদিন আগেহইতে তাহাদের ভাল করিয়া ঘুমানও দরকার; কারণ যাহারা দেরী করিয়া ঘুমাইতে যায়, তাহা-দের ছুটিবার শক্তি কমিয়া যায়। অনেক সময়ে ঠিক সময়ে ঘুমাইতে যাইতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু যে খরগোশ-তাড়া-খেলায় যোগ দিতে চায়, সে যেন অন্য কোন কুড়ে খেলায় মাতিয়া রাত না জাগে; কারণ তাহাতে তাহার শরীরের পেশীগুলি ছুটিবার উপযোগী থাকিবে না, দমও কমিয়া যাইবে।

খরগোশ-তাড়া-খেলা ঠিক "মাইল-রেসের" মত নয়। এ খেলার পথ-ঘাট ঠিক থাকে না, একদমে ছুটিয়া যাওয়া যায় না, মাঝে মাঝে নূতন করিয়া দম লইতে হয়। সুধু জোরে ছুটিলেই, এখেলায় জিতা যায় না, দম রাখা চাই। প্রথম দম ফুরাইলেই, এই কথাটি বেশ বুঝা যায়। যে উচিতমত দৌড়ান-অভ্যাস করি-য়াছে, ভাল করিয়া খাইয়াছে, ভাল করিয়া ঘুমাইয়াছে, সে দ্বিতীয়-বার যখন ছুটিতে থাকে, তখন বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া স্ফূর্ত্তিতে ছুটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অন্যের পক্ষে তখন ছুটা একান্ত কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠে।

নেকড়েরা অন্ততঃ প্রথমে সকলে একসঙ্গে থাকিবে, তাহা না হইলে উৎসাহ থাকিবে না, ছুটিতে মজাও লাগিবে না। তাহার পর যখন তাহারা খরগোশদের দেখিতে পাইবে, তখন, ইচ্ছা করিলে, যে পারিবে সে আগে গিয়া তাহাদের ছুঁইবে। যে পথ দিয়া কখন খরগোশ-তাড়া করা হয় নাই, সেই পথ দিয়া ছুটিলেই, আমোদ বেশী হয়, কারণ চারিদিকে যাহা দেখা যায়, সবই নূতন, বেশ সব নানা জিনিষ দেখিতে দেখিতে ছুটা যায়; কিন্তু সাধারণতঃ খরগোশেরা নূতন নূতন নেকড়েদের সহিত পুরাণো পথেই ছুটিতে থাকে, আর কোন্ নেকড়ের দল বেশী বাহাদুর, তাহা পরীক্ষা করা হয়। এই খেলায় খরচ কিছু নাই বলিলেই হয়, সুতরাং বলবান্ ও সুস্থ বালকমাত্রেরই এই খেলায় যোগদান করা উচিত।

দিয়াশলাই-বাক্সের দেরাজ।

অনেক জিনিস আমরা আর কোন কাজে লাগিবে না ভাবিয়া ফেলিয়া দিই; কিন্তু এই কথাটি মনে রাখিও—"যা'কে রাখ, সেই রাখে।" দিয়াশলাইএর কাঠি ফুরাইয়া গেলে, বাক্সটি ফেলিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু সেই খালি বাক্সগুলি দিয়া কেমন একটি সুন্দর জিনিস করা যায়, দেখ—খানিকটা ভাল আঠা-যোগাড় কর; দশটি দিয়া-শলাইএর বাক্সের প্রথমে কেবল উপরের ঢাকনীগুলি লও, সেগুলি

দুইটি দুইটি করিয়া লম্বালম্বিভাবে পাশাপাশি রাখিয়া প্রথমে একটির দিয়াশলাই ঘষিবার স্থানের সহিত আর একটির দিয়াশলাই ঘষিবার স্থান যুড়িয়া ফেল, পাঁচযোড়া দিয়াশলাইএর বাক্সের ঢাকনী এই রকমে যোড়া হইলে, একযোড়ার উপর আর একযোড়া ঢাকনী রাখিয়া আবার যোড়, এইরকম করিয়া পাঁচথাক্ই যুড়িয়া ফেল, তখন দুই কাল পাশে, মাথায় ও তলায় আবার পাৎলা "পিচ্‌বোড" কাটিয়া যোড়, কোন রঙ্গীন বাহারি কাগজ কাটিয়া মাথায় ও দুই-পাশে যোড়, ভিতরকার বাক্সের যেদিক্‌টা সাম্‌নে রাখিবে, সেই-দিকটাতেও ঐপ্রকার রঙ্গীন কাগজ যোড়; তাহাদের আবার একটী করিয়া হাতল করিতে হইবে, কি করিয়া করিবে? বুট-জুতায় বোতাম থাকে, দেখিয়াছ তো? তাহার দশটি যোগাড় কর। প্রত্যেক দেরাজের সমুখের ঠিক মাঝামাঝি চাকু-ছুরী-দিয়া সাবধানে চিরিয়া সেই বোতামের তারের বা রিংএর দিক্‌টা ঢুকাইয়া দাও; রিংএ একটী সরু কাঠি ঢুকাইয়া দাও, বাস্, দেরাজের হাতল হইয়া গেল। দেরাজের পায়াও চাই। একটুক্‌রা মোটা পিচ্‌বোড লও। কম্পাসের সাহায্যে তাহাতে পেন্সিলদিয়া কতগুলি বৃত্ত আঁক,—যতগুলি আবশ্যক, ততগুলি বৃত্ত আঁক; প্রত্যেক বৃত্তটি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তের অপেক্ষা মাপে একটু ছোট করিবে; কাতুড়ী বা ধারাল ছুরীর সাহায্যে বৃত্তগুলি কাটিয়া বাহির কর, সবগুলি কাটা হইলে, প্রথমে বড় বৃত্তটি দেরাজের তলার এক-কোণে যোড়, তাহার পর তাহার ছোটটি তাহাতে যোড়, এইরকম করিয়া পর পর সব চাক্‌তিগুলি যুড়িয়া ফেল, যে রঙ্গীন কাগজ দিয়া দেরাজের মাথা ও পাশ ছাইয়াছ, তাহা দিয়া এই পায়াও ছাও, এইপ্রকারে আর তিনটি পায়াও যোড়, তাহার পর দেখিবে, চমৎকার একটি দেরাজ হইয়াছে।

শিশির ও শেফালী

দুর্ব্বাদলে ঝলমলে শিশিরের ফোঁটা,
ক্ষুদ্র বলি' কেহ তা'রে দিওনাক 'খোঁটা'
কিবা শুচি তনুরুচি দেখ, দেখ তা'র,
কোমল সে, নিদর্শন ঈশ-করুণার!
গোপনে সে ধরণীর হিতব্রতে রত,
হে বালক, হে বালিকে, হও তা'র মত।

নিশার নীহার-স্নাত শেফালিকাগুলি
ঝরিয়া পড়িয়া গেছে, আহা, আন তুলি'!
দেখ, দেখ ঝরাফুলে কিবা শুভ্রশোভা,
কি স্নিগ্ধ সুবাস তা'র মরি মনোলোভা!
গাঁথি' তা'র মঞ্জু মালা পর, বালা, গলে,
রঞ্জ তব সূক্ষ্মবাস ছিঁড়ি তা'র দলে!
যাহার জীবন ভাল, ভাল মৃত্যু তা'র,
শেফালী শিখায় এই নীতি চমৎকার।

গর্ব্ব খর্ব্ব

'বাইকে'তে চ'ড়ে বেণী বেড়িয়ে বেড়ায়,
যেতে যেতে পথে কত কায়দা দেখায়,—
কভু সে 'পেডেল'থেকে পা তুলেই রাখে,
কভু বা মিনিটটাক স্থির হ'য়ে থাকে;
কখন 'হ্যাণ্ডেল' ছেড়ে' খুব জোরে ছোটে,
কখন 'পেডেল''পরে খাড়া হ'য়ে ওঠে;
তা' দেখে' অবশ্য কেউ বাজায় না শাঁখ,
তবুও বেণীর জাঁকে ফুলে ওঠে নাক!

কিন্তু তা'র বীরত্বটা একেবারে মেকি;
কি জানি কুকুর এক কেন হ'য়ে খেঁকি,
ঘেউ ঘেউ ক'রে তা'রে যেই তেড়ে' আসে;
অমনি বেণীর প্রাণ উড়ে যায় ত্রাসে!
ও বাবা গো, মা গো ব'লে কেঁদে উঠে' সটাং
'বাইক'হইতে বীর হন চিৎপটাং!

—:•:—

বালক

৪র্থ বর্ষ। মার্চ্চ, ১৯১৫। ৩য় সংখ্যা

পাচিকার পুত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পথে বাহির হইয়া প্রবোধ লজ্জায় চোকের জল মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর বড়ই অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে লাগিল। সে তখন ভাবিতেছিল, আমার নাম-কাটা গিয়াছে শুনিয়া মা কি ভাবিবেন, কর্ত্তা-বাবুই বা কি মনে করিবেন? আমি যে চুরী-চুরী করি নাই, ইহা কি তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন? কর্ত্তা-বাবু না করুন, মা নিশ্চয়ই করিবেন, মা আমার কোন্ কথা না জানেন? তবু আজ মার মনে না জানি কতই কষ্ট হইবে।

মা মনে কষ্ট পাইবেন, ইহা ভাবিয়া প্রবোধের মনে বড় কষ্ট হইল, তাহার চোকে আবার জল দেখা দিল। সে সলজ্জভাবে আবার তাহার চোকের জল তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটদিয়া মুছিয়া ফেলিল, তাহার পর চারিদিকে একবার ক্ষিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করিল, কেহ তাহাকে কাঁদিতে দেখে নাই তো! অতঃপর আবার সে ভাবিতে লাগিল, তাই তো এখন কি করি? কোন্ ইস্কুলে আবার ভর্ত্তি হই? আর কোথায় বিনামাহিনায় পড়া যায়? মাকে কি করিয়া এ মুখ দেখাইব?

এমনই সব ভাবিতে ভাবিতে প্রবোধ হেদুয়ার বাগানের কাছে আসিল। সেখানে খানিকক্ষণ বসিয়া সে বিডনষ্ট্রীট ধরিয়া বিডন-উদ্যানের কাছে আসিল। সেই বাগানে ঢুকিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে তাহার কি মনে হইল, সে বিডন-উদ্যানে না ঢুকিয়া চিৎপুর রোড ধরিয়া বরাবর দক্ষিণমুখে চলিতে লাগিল। অবশেষে সে বড়বাজারে উপস্থিত হইল।

বড়বাজারের মধ্যে ঢুকিয়া সে প্রতি বিপণি অবাঙ্মুখে দেখিতে দেখিতে চলিল। এক দোকানের কাছে পঁহুছিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই দোকানের দ্রব্য-সম্ভার লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। উহা সল্মা, চুমকী, রেশমী সাড়ীর পা'ড়, জরী প্রভৃতি বিক্রয়ের দোকান। দোকানদার এক প্রকাণ্ড পরিধিবিশিষ্ট বিপুলোদর বৃদ্ধ। উদরের অতিস্ফীতিহেতু তাহার ধুতি সে খুব নামাইয়া পরিয়াছে। গায়ে একটী মেরজাই, উহার তলহইতে তাহার স্থূলোদর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গোঁফ কাঁচা-পাকা ও চমৎকারভাবে তা-দেওয়া, মস্তকে একটী দোপাল্‌টা মস্‌লিনের টুপি, সুচারুভাবে ইস্ত্রি-করা ও গিলা-দিয়া কোঁচান। গলায় একছড়া পাকা-সোণার হার। এক কাণে একটী খড়িকা গোঁজা রহিয়াছে; পাণ খাইয়াছে, তাই পিকের দাগে তাহার দুই কশ অনুরঞ্জিত। সে তাহার উদরেরই ন্যায় স্থূল এক অতি মলিন তাকিয়ায় ঠেস দিয়া আড়ভাবে বসিয়া আছে। প্রবোধকে একাগ্রমনে তাহার দোকানের দ্রব্যসম্ভার-নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি, ম'শয়, কি লেবিন?"

প্রবোধ। কিছু না।

দো। কুছু না? তবে এতো ক্ষণ দেখেন কি?

প্রবোধ গমনোদ্যত হইল।

দোকানদার বলিল,—"আরে ম'শয়, ভাগেন কেনো? শুনেন, শুনেন।"

প্রবোধ ফিরিয়া বলিল,—"কি?"

দোকানদার। আপনে কোথায় থাকেন?

প্রবোধ। দর্জ্জিপাড়া।

দোকানদার। দারজী-পা—ড়া? কোর্‌ছেন কি?

প্রবোধ। আঁ্যা?

দোকানদার। বলি, কি করেন, পড়েন-উড়েন, না টৌ টৌ কোম্পানীর বাড়ী কাম করেন? হা, হা, হা!

প্রবোধ। পড়ি।

দোকানদার। কৌন্ ইস্কুলে।

প্রবোধ। ফ্রি-কলেজে।

দোকানদার। ফিরি কালিজে? বেশ! বেশ! কৌন গিলাসে প'ড়্‌ছেন?

প্রবোধ। ফোর্থ ক্লাসে প'ড়তুম, আজ আমার নাম-কেটে দিয়েছে?

দোকানদার। নাম কেটে দিল? কেনো?

প্রবোধ তখন সমস্ত ব্যাপার বলিয়া ফেলিল। বলিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দোকানদারেরা একবিষয়ে বড় অভিজ্ঞতা-লাভ করে। তাহারা এত লোকের মুখ দেখে যে, কে কেমন লোক, তাহা অনেক সময়ে মুখ দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারে। এই বালকের সরল মুখশ্রী দেখিয়া তাহার প্রতীতি হইল, এ নির্দ্দোষ। ফলে সে প্রবোধকে নানা কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। এমন সময়ে একজন অল্পবয়স্ক গৌরাঙ্গ বালক, দেখিয়া বোধ হইল, দোকানদারের পুত্র, দোকানে আসিয়া বসিল। তাহার পর পিতার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, "বাবুজী, ভুখ্ লগা।"

দোকানদার তখন তাহার হাতে কিছু পয়সা দিয়া চুপি চুপি কি বলিয়া দিল; বালক প্রবোধের মুখপ্রতি তাকাইতে তাকাইতে দৌড়িয়া চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে দোকানদার প্রবোধের সম্বন্ধে নানা কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইল। এই নিরক্ষর ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে যেপ্রকার উদারতা ও সহৃদয়তা দেখা যায়, শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেক সময়ে সেপ্রকার উদারতা ও সহৃদয়তা দেখা যায় না।

দোকানদারের ছেলে খাবার লইয়া আসিল। দোকানদার তখন সেই খাবার তিনভাগ করিয়া বেশীর ভাগটা প্রবোধকে খাইতে দিল। অপর দুই ভাগ বাপ-বেটায় মিলিয়া উদরসাৎ করিতে করিতে বাপ বলিল, "পেরবোধবাবু, আগে থোড়া-বহুৎ জাল্ খায়ে মিজাজ তো ঠাণ্ডা কর, তা'র পর তুমার মামলা ফের শু'না যা'বে। আরে, আরে, ছোটা লাড়্কা, এত সরম করো কেনো? খাবার সময় লজ্জা করে, যে বোকা লোক।"

অগত্যা প্রবোধ জলযোগ করিল। তখন বাস্তবিকই সে যেন কিছু সুস্থবোধ করিল। আহারান্তে সকলে আচমন করিল। তখন দোকানদার যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই—দোকানদারের ঐ পুত্র ফার্ষ্টবুক পড়ে, প্রবোধ যদি উহাকে প্রত্যহ বিকালে ইস্কুলের পর আসিয়া পড়ায়, তাহা হইলে সে তাহাকে মাসে পাঁচটাকা করিয়া বেতন দিবে, তাহাতে সে স্বয়ংও কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া বেতনদিয়া পড়িতে পারিবে। ইহাতে প্রবোধ যদি সম্মত হয়, তাহা হইলে সে কাল সকালে দশটার সময়ে আসিলে, দোকানদার তাহাকে, সে যে স্কুলে বলিবে, সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবে। তখন ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লওয়ার নিয়ম ছিল না।

প্রবোধ তাহার মাতার অনুমতি লইবার কথা বলিয়া সেদিনকার মত বিদায় লইল। তখন তাহার হৃদয়ে এত আনন্দ হইতেছিল যে, পাখীর মত ডানা থাকিলে, সে বুঝি উড়িয়াই তাহার মায়ের কাছে চলিয়া যাইত।

৬

এদিকে প্রবোধের মায়ের আজ প্রাণ আইঢাই করিতেছে, সে কোন কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছে না। পাকশালে পাক করিতে করিতে মাঝে মাঝে এক জানালার মধ্যদিয়া রাস্তা দেখিতেছে, তাহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন প্রকট, তাহার চোক-দু'টি জলভরে ছলছল করিতেছে। অন্য দিন প্রবোধ প্রায় সাড়ে-চারিটার সময় বাড়ী ফিরে। আজ সাড়েপাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, তবু প্রবোধের দেখা নাই। বাড়ীর গৃহিণী প্রবোধের মার উদ্বেগ লক্ষ্য করিলেন,—"হ্যাঁ গা, বামুন-মেয়ে, আজ তুমি অত ছট্‌ফট্ ক'র্‌ছ কেন?"

প্র-মা। মা, সাড়েপাঁচটা বেজে গেল, এখনও আজ প্রবোধ ইস্কুলথেকে ফি'র্‌ল না, পথে গাড়ী চাপা প'ড়্‌ল না কি হ'ল।

এই বলিয়া প্রবোধের মা কাঁদিয়া ফেলিল।

দয়াবতী গৃহিণীর মাতৃ-হৃদয়ে বেদনা বাজিল, তিনি বলিলেন, "ষাট্, ষাট্, অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে, বামুন-মেয়ে? ছেলে গাড়ী চাপা প'ড়্‌বে কেন? প্রবোধ বড় সাবধানী ছেলে। আজ বোধ হয়, ইস্কুলে কিছু আছে, তাই আস্‌তে দেরী হচ্চে।"

এই কথা বলিয়া গৃহিণী প্রবোধের মাকে সান্ত্বনা দিলেন বটে, কিন্তু তিনিও একটু উদ্বিগ্না হইলেন।

ক্রমে কর্ত্তাও আফিসহইতে ফিরিলেন, কিন্তু প্রবোধের দেখা নাই। তখন প্রবোধের মা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে প্রবোধ আসিয়া মার গলা জড়াইয়া ধরিল। তখন প্রবোধের মার চোকহইতে দরদরিত ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সে প্রবোধের পথশ্রমহেতু রক্তাভ গণ্ডে চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়া তাহার হাত ধরিয়া পাকশালে লইয়া গেল।

প্রবোধ আজ মুড়ি খাইল না, তাহার পেট ভরা ছিল। সে মার কাছে বসিয়া আজিকার সমস্ত ঘটনা তাহাকে জানাইল। মা কাহিনীটি শুনিয়া প্রথমে বিষণ্ণ, শেষে প্রফুল্ল হইল। তাহার ছেলে যে চোর, ইহা তাহার মনে হইল না। তবে ছেলের পরিশ্রম বাড়িল, তাহাছাড়া বড়বাজারের পথে বড় ভিড়, তাই একটু ভাবনা হইল; কিন্তু আর কোন উপায় নাই, তাই সে ভগবানের চরণে পুত্রকে সঁপিয়া দিল। মানুষের স্বভাবই এই, যতক্ষণ উপায় থাকে, ততক্ষণ মানুষ আপনারই উপরে নির্ভর করে, নিরুপায় হইলে, ঈশ্বর-চরণে আশ্রয় লয়। সকল সময়েই ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করা কিন্তু সুবুদ্ধির কার্য্য।

কর্ত্তা গৃহিণীর মুখে শুনিলেন যে, প্রবোধের নাম-কাটা গিয়াছে, শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। প্রবোধকে ডাকাইয়া তাহার নিজমুখে সমস্ত কথা শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার কেমন সন্দেহ হইল যে, ইহাতে কিছু চক্রান্ত আছে। তিনি সেই রাত্রিতেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে একখানি পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলেন যে, এই চুরীর যেন আর একবার ভাল করিয়া তদন্ত করা হয়।

পরদিন প্রধান শিক্ষক সেই পত্রখানি পাইলেন। তিনি প্রবোধের নাম কাটিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রবোধের নিরপরাধের ন্যায় মুখশ্রী তাঁহাকে মর্ম্মপীড়া দিতেছিল, তাই তিনি প্রবোধের মার প্রভুর পত্রখানি পাইয়া সত্যসত্যই পুনরায় তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে জানিবার চেষ্টা করিলেন, শ্রেণীতে প্রবোধের কাহারও সঙ্গে ঝগড়া ছিল কি না। নানা কৌশলে তিনি বাহির করিয়া ফেলিলেন যে, সনতের প্রবোধের উপরে ভারি রাগ ছিল। খোঁজ করিয়া জানিলেন, সনৎ ভারি বদমায়েস ছেলে, তখন অন্য কয়েকজন ছেলেকে জেরা করিয়া তিনি আসল কথাটা বাহির করিয়া ফেলিলেন। ফলে সনৎকে তিনি উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়া বিদ্যালয়হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অন্য কয়েকজন বালককেও কায়িক দণ্ড-প্রদান করিলেন। অনন্তর প্রবোধের মার প্রভুর কাছে বিচার-বিভ্রাট করার দরুণ ক্ষমা-প্রার্থনাপূর্ব্বক প্রবোধকে পুনরায় বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিলেন।

এদিকে প্রবোধ কিন্তু সেই দোকানদারের সহায়ে একটী ভাল বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছে, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের শিক্ষা-পদ্ধতি ফ্রি কলেজের শিক্ষকদিগের শিক্ষা-পদ্ধতির অপেক্ষা তাহার ভাল-বোধ হইয়াছে; তাহাছাড়া এ বিদ্যালয়ের তাহাকে আর অবৈতনিক ছাত্র থাকিতে হইবে না, দুই টাকা বেতন সে নিজেই দিতে পারিবে। উপরন্তু তিনটাকা তাহার হাতে থাকিবে, তাহাতে তাহার ও তাহার মায়ের উপকার হইবে, সুতরাং সে আর পুরাণো বিদ্যালয়ে ফিরিয়া

'বালক' পড়িতে মত্ত, না রাখে পথের তত্ত্ব।

যাইতে চাহিল না। তবে সে মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, সে কোন দিনই অসাবধানভাবে পথ চলিবে না। (ক্রমশঃ।)

বৈজ্ঞানিক তথ্যত্রয়

সমস্যামাত্রেরই সমাধান আছে। কোন কোন সময়ে সমস্যাবিশেষের সমাধান করিতে বড় বেশী সময় লাগে, কিন্তু যতই আমরা নানা পদার্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও গুণ নির্ণয় করিতে পারি, ততই
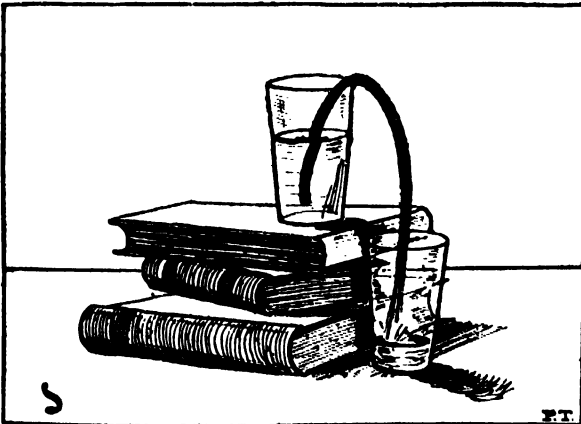
বেশী আমরা রহস্যসমূহের সমাধানে সমর্থ হই, আর যেই আমরা কোন রহস্যের সমাধান করিতে পারি, অমনই সেই রহস্যটি আর রহস্য থাকে না।

আয়নায় তোমার মুখ দেখ। সব জিনিসই আয়নার সামনে দেখা যায় কেন? কারণ উহার পরাবর্ত্তন-গুণ আছে। একখানি বই লইয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিলে, কি দেখা যায়? উহা ভূতলে পড়িয়া যায়। আকাশে উড়িয়া যায় না কেন? পাশে ছুটিয়া যায় না কেন? উহা নিম্নেই পড়ে এই কারণে যে, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি উহাকে নিম্নেই টানিয়া লয়।

আমরা এখন একটী আশ্চর্য্য খেলা দেখাইব। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি কি, তাহা যদি তোমরা জান, তাহা হইলে ঐ খেলাটি তোমরা বুঝিতে পারিবে। এই খেলাটি দেখাইবার জন্য দুইটি কাচের গেলাস, খানিকটা জল আর একটুক্‌রা সরু রবারের নলের প্রয়োজন হইবে। একগেলাস জল দুই-তিনখানি বই একটির উপর আর একটী রাখিয়া মেজের উপরে স্থাপিত কর, সকলের উপরে জলের গেলাসটি রাখ।

তাহার পর খালি গেলাসটি বইগুলির কাছে ঘেঁসাইয়া রাখ। যে গেলাসটিতে জল রহিয়াছে, সে গেলাসটি তাহা হইলে খালি গেলাসটির অপেক্ষা উপরে রহিল। এইবার রবারের নলের একমুখ উপরের গেলাসের জলে চুবাইয়া দাও। তাহার পর তাহার আর একমুখ তোমার মুখে পুরিয়া একটু জল গেলাসহইতে নলে

টানিয়া লও। নলটি জলে পূর্ণ হইলে, উহার যে মুখটি তোমার মুখবিবরে ছিল, তাহা বুড়া-আঙুল ও তর্জ্জনী-দিয়া খুব জোরে টিপিয়া

ধর। তাহার পর সেই মুখটি খালি গেলাসে প্রবেশ করাইয়া দাও, বলা বাহুল্য, তখন যেন নলের অন্যমুখটি উপরের গেলাসের জলের মধ্যেই চুবান থাকে। তখন নলের যতটা উপরের গেলাসের মধ্যে থাকিবে, তাহার অপেক্ষা যতটা বাহিরে ঝুলান থাকিবে, তাহা যেন লম্বায় বেশী হয় (১নং চিত্র দেখ)।

নলের যে মুখটি আঙুল-দিয়া টিপিয়া ধরিয়া আছ, এখন তুমি যদি তাহা ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে উপরের গেলাসের জল অনবরত নলের মধ্যদিয়া নীচের গেলাসের মধ্যে পড়িতে থাকিবে। যদি নলের উপরিস্থ মুখটা উপরের গেলাসের তলায় ঠেকিয়া থাকে, তাহা হইলে উপরের গেলাসের সমস্ত জলই নীচের গেলাসে পড়িয়া যাইবে, নয় তো সে নলের ঊর্দ্ধস্থ মুখটি উপরের গেলাসের জলের মধ্যে যতটাপর্য্যন্ত ডুবান আছে, ততটা জলই নীচের গেলাসে পড়িয়া যাইবে।

কেন এইরূপ হইল, তাহা কি তুমি কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পার? একগাছি টোন-দড়ির একমুখে যদি তুমি একটী হাল্কা পাথরের কুচি এবং অন্যমুখে একটী ভারি পাথরের কুচি বাঁধিয়া দড়িটার মাঝামাঝি কোন মসৃণ লোহার রেলের উপরে ঝুলাইয়া দাও, তাহা হইলে তুমি দেখিবে, যেদিকে ভারি পাথরের কুচিটা বাঁধা ছিল, সেইদিকে সমস্ত দড়িটা ঝুঁকিয়া পড়িল।

দুইটি গেলাসের মধ্যে যেদিকে রবারের নলটা বেশী ঝুলান ছিল, সেইদিক্টা দড়ির ভারি পাথরের দিকের মত, তাই উপরের গেলাসের জল নীচের গেলাসে পড়িয়া গিয়াছিল। তবে তুমি বলিতে পার, দড়িতে পাথরের কুচি-দুইটি বাঁধা ছিল, নলে তো গেলাসের জল বাঁধা ছিল না। এ কথা সত্য; কিন্তু নলের মধ্যে যদি হাওয়া না ঢুকে, তাহা হইলে কার্য্যতঃ জলের গুরু স্তম্ভটা যেন জলের লঘু স্তম্ভের সহিত বাঁধাই থাকে। সম্ভবতঃ এইরূপ বলিলে তুমি আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে যে, জলের গুরু স্তম্ভটা নীচে পড়িয়া লঘু স্তম্ভটাকে চুষিয়া উপরে তুলিয়া লয়। তখন জলের লঘু স্তম্ভ গুরু স্তম্ভে পরিণত হয় এবং ততক্ষণই অধিকতর জল চুষিয়া লইতে থাকে, যতক্ষণ না, যতটা জল চুষিয়া লওয়া সম্ভব, ততটা জল চুষিয়া লইতে পারে। তাহার পর নলদিয়া সেই জল পড়িয়া যাইতে থাকে।

আর একটী খেলা দেখাই। এই খেলায় একটী আধুলি জলের উপরে যেন ভাসিয়া উঠিবে! সত্যসত্যই যে আধুলিটা ভাসিয়া উঠিবে, তাহা নয়, আমাদের মনে হইবে, যেন আধুলিটা ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই খেলাটি কিন্তু বড়ই বিস্ময়জনক। এই খেলায় দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, বায়ু-ভেদ করিয়া আমরা যেমনভাবে দেখিতে সমর্থ হই, বারি ভেদ করিয়া আমরা তেমনভাবে দেখিতে সমর্থ হই না।

মেজের উপরে একটা কানা-উচু এনামেলের সান্কী রাখ। উহার ঠিক মাঝখানে একটী আধুলি রাখ, তখন ২নং চিত্রের মত সান্কী ও আধুলিটিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখন কেহ এমনভাবে নীচু হইয়া মেজের কাছে বসুক, যেন সান্কীর উচু কানা তাহার আধুলিটাকে দেখিবার দৃষ্টি-পথ-অবরোধ করে। তাহা হইলে তখন সে সান্কীটাকে দেখিবে, কিন্তু আধুলিটি দেখিতে পাইবে না (৩নং চিত্র দেখ)।

দর্শক স্থিরভাবে বসিয়া থাকুক, তুমি ইত্যবসরে সান্কীতে জল ঢালিতে থাক। তখন দর্শক ক্রমে ক্রমে আধুলিটাকে দেখিতে পাইবে। আধুলিটা সত্যসত্যই ভাসিয়া উঠে না। জলই আধুলিটাকে ভাসমানবৎ প্রতীয়মান করায়। লোকে যখন বায়ু-ভেদ করিয়া কোন কিছু দেখে, তখন সে সোজাভাবে দেখে, কিন্তু লোকে যখন বায়ু ও বারি উভয়ই ভেদ করিয়া দেখে, তখন সে তির্য্যগ্‌ভাবে দেখে (৪নং চিত্র দেখ)।

জলের এই বিচিত্র গুণকে তির্য্যগ্বর্ত্তন-গুণ বলে। যখন তোমরা পদার্থবিদ্যার আলোচনা করিবে, তখন জলের এই তির্য্যগ্বর্ত্তন-গুণ-সম্বন্ধে আরও অনেক রহস্য জানিতে পারিবে।

আরও একটী খেলা দেখাই, তাহা হইলে তুমি আরও একটী অদ্ভুত ব্যাপার জানিতে পারিবে।

কাগজের কড়া (কটাহ) হয়, একথা শুনিলে লোকে হাসিবে; কিন্তু সত্যই আমরা কাগজের কড়ায় জল গরম করিতে পারি। প্রথমে আমাদের একটী কাগজের কড়া তৈয়ার করিতে হইবে। একটুক্রা সাধারণ লিখিবার কাগজ লও। অনন্তর ৫নং চিত্রের অনুরূপ করিয়া ঐ কাগজের টুক্রাটিকে ভাঁজ কর। ঐপ্রকারে ভাঁজ-করা কাগজের দুই পার্শ্বস্থিত ভাঁজে দুইটি পিন্ গুঁজিয়া দাও (৬নং চিত্র দেখ), তাহা হইলে ঐ কাগজের টুক্রাটি একটী কৌটার আকার-ধারণ করিবে। এখন ঐ কৌটার দুই পার্শ্বসংলগ্ন পিনের ভিতরদিকে একগাছি সরু সূতার এক-একমুখ বাঁধিয়া দাও; তাহার পর কাগজের কৌটাটি কিছুতে টাঙাইয়া দাও (৭নং চিত্র দেখ)। এইবার সেই কাগজের কৌটাটি প্রায় পূর্ণ করিয়া জল ঢাল। জল খুব সাবধানে ঢালিবে, যেন কৌটাটা ছিঁড়িয়া না যায়। অতঃপর ঐ কৌটার নীচে একটী মোমবাতি বা স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বালিয়া দাও। তখন দেখা যাইবে, কাগজের কৌটাটা জ্বলিয়া উঠিতেছে না, বরং কৌটার মধ্যস্থ জল ক্রমশঃ গরম হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে! ইহা বড়ই বিস্ময়জনক-বোধ হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐরূপ হইবার আসল কারণ এই, জল কাগজে তাপ-সঞ্চয় হইতে দেয় নাই, আপনিই সেই তাপাকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজে সুপরিজ্ঞাত তাপের বিকীরণ-গুণহেতু ঐপ্রকার আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। তাপহেতু কাগজ আপনিই ক্রমশঃ অধিকতর উত্তপ্ত না হইয়া ঐ তাপ জলকে দিতে থাকে, তাই জলই ক্রমশঃ অধিকতর উত্তপ্ত হইতে থাকে।

কালোয়াৎ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৪

ইহার পরে চটকদম্পতি দিনকতক বেশ সম্প্রীতিতে কাটাইল। গোটাকতক ডিম পাড়িল। সাত-আট-দিনের মধ্যে পাঁচটা ডিম হইল। এখন কর্ত্তাগৃহিণীর মুখ আনন্দমাখা—উভয়েই বড় সুখী। আনন্দে তানসেন ছাদের কার্ণিসে বসিয়া এক-একবার শ্যামা-পাখীর ডাক ডাকে। স্ত্রীলোকেরা ঘাটে জল ভরিতে গিয়া, সেইদিকে চাহিয়া থাকে। কখন কখন মঙ্গলু খাঁচা হাতে করিয়া আইসে। তানসেন ত এই করে, এদিকে গৌরবিনী আরও পালখ, আরও তূলা আনিয়া ডিমগুলি খুব গরমে রাখিল—সে হয় ত মনে করিয়াছিল, শীঘ্রই ভারী বাদল হইবে। একদিন আমি এক বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলাম। একদিন ছাতে উঠিয়া, চড়ুই-পাখীর বাসায় একটা মার্ব্বেল (যে মার্ব্বেল-দিয়া ছেলেরা খেলা করে) রাখিয়া দিলাম। কর্ত্তাগৃহিণী দুইজনেই তখন চৌধুরীদের ছাদে বসিয়া "হাওয়া খাইতেছিল"। আমি নামিয়া আসিলে পর, উহারা বাসায় গিয়া কি করিল, বলিতে পারি না, কিন্তু পরদিন সকালবেলা পোড়াবাজারের দক্ষিণে, হরমণি-হাঁড়ীওয়ালীর দোকানের পাশে, নর্দ্দমার ধারে, দেখি, বিস্তর লোক দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছে। গিয়া দেখি, দুইটা চড়ুই-পাখীতে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। চেঁচাচেঁচি বেশি নাই, ঠোক্রা-ঠুক্রী, ঝাপ্টা-ঝাপ্টি খুব চলিয়াছে —কেহই রণে ভঙ্গ দিতেছে না। নিকটেই এত লোক, দুই-একজনে হাততালিও দিতেছে, তবু একটা অপরটাকে ছাড়িতেছে না। তাই বুঝিলাম, উহারা এত মাতিয়া গিয়াছে যে, প্রাণের ভয় নাই। এমন সময়ে হরমণির মেয়ে গোলাপী খানিকটা জল ছড়াইয়া দিল। বাধা পাওয়াতে চড়ুই-দুইটা উড়িয়া গেল না, কেবল একটু পিছনে হটিয়া লেজে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া "দম" লইল। তখন দেখি, এরা সেই তানসেন ও গৌরবিনী—কর্ত্তাগৃহিণীতে বেজায় লড়াই—দেখিয়া অবাক্ হইলাম। আবার যেই দুইজনেই "দে রণ" বলিয়া অগ্রসর হইল, অমনি একটী ছেলে ছাতা খুলিয়া ভয় দেখাইল, পাখী-দুইটা তাড়া পাইয়া স্কুলের কার্ণিসের উপর গেল। বোধ হয়, সেখানে গিয়া আবার লড়াই করিয়াছিল। বৈকালবেলা জলটুঙ্গিতে গিয়া দেখি, জানালার নীচে পাঁচটী ডিম ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিয়াছে; সেই মার্ব্বেলটাও রহিয়াছে। তখন বুঝিলাম, গৌরবিনী মার্ব্বেল দেখিয়া মনে করিয়া থাকিবে, এই শক্ত ডিম নিশ্চয়ই তানসেন আনিয়াছে—সেই রাগে, সেই হিংসায় এত কাণ্ড।

নিজের যে, কোন দোষ নাই, তাহা তানসেন গৌরবিনীকে পরে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু গতিক দেখিয়া বোধ হইল, "যা' হবার তা' হইয়া গিয়াছে, এখন সাবেক কথা ভুলিয়া যাওয়া যাউক" বলিয়া উভয়ে আবার ভাব করিয়াছে। "এই বাসা বড় অপয়া—আর এখানে আসিয়া-অবধি ঝগড়া হইতেছে," এই ভাবিয়া দুইজনে মিলিয়া এ বাসা, বাসার পালখটালখ, যেখানকার যা,' সমস্ত ফেলিয়া চলিয়া গেল। যেখানে ঝড়-বাতাস লাগিবার সম্ভাবনা নাই, গৌরবিনী এমন স্থানে বাসা বানাইতে ভাল বাসে। তাই এবার লণ্ডনমিশন স্কুলের বারান্দায় কড়িকাঠের দুই পাশে যে ছিদ্র ছিল, তাহারই একটা ছিদ্রে বাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারাও কাজে হাত দিল, এদিকে জোরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। তবু সাত-আট-দিনের মধ্যেই বাসা তৈয়ার করিয়া ফেলিল। গাড়ী-বারান্দায় সমস্ত রাত্রি বায়বালোক জ্বলে, তাই ভাবি, এমন কড়া আলোতে রাত্রিকালে উহারা কেমন করিয়া বাসায় ঘুমাইবে। যাহা হউক, গৌরবিনীর এই স্থানটী বেশ মনে ধরিয়াছিল; আর তানসেনও কিছু আপত্তি করিল না; সে এখন বুঝিয়াছে যে, কেবল "হুঁ" দিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু

ডিম পাড়িবার আগেই বাড়ীর মেরামত-আরম্ভ হইল, এবং একদিন রাজমিস্ত্রীর লোকেরা বাঁশ বাঁধিয়া উঠিয়া দেওয়াল ঘসিতে ঘসিতে বাসাটা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। কাকের বাসা এইপ্রকারে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে রাজমিস্ত্রীর লোকেরা নিরাপদে নামিয়া আসিতে পারিত না; কিন্তু চড়ুই-পাখী তেমন উদ্ধত নহে; আর উহাদের ধৈর্য্যশক্তি ও আশা বড়ই বেশি। চটক-দম্পতি হয় ত ভাবিল, বাসাটী হয় ত ঠিক বানান হয় নাই। বোধ হয়, মাল-মসলার কোন দোষ ছিল। যাহা হউক, এবার অন্যপ্রকারে বাসা তৈয়ার করিতে হইবে। অনন্তর নিকটস্থ একটা পাখীর বাসাহইতে কয়েকগাছা লম্বা খড়-চুরি করিয়া লইয়া গিয়া, লাটপাদ্রির গির্জার হাতায় একটা বড় ঝাউগাছের এক কোটরে রাখিল। এইরূপ করিয়া তানসেনকে যেন জানান হইল যে, এবার এইখানে আমরা বাসা বানাইব। তানসেন এখন বেশ জানে, গৌরবিনীর কথায় সায় দিয়া গেলেই নির্ব্বিঘ্নে থাকা যায়, নিজের মতামত-প্রকাশ করিলেই সংসারে অশান্তি জন্মে, তাই সে কোনপ্রকার আপত্তি করিল না; বরং ঝাউ-গাছের ডালে বসিয়া, টুং টাং করিয়া সেতারের গৎ ভাঁজিতে লাগিয়া গেল। তানসেন গড়ের মাঠের নানাস্থানে ঘুরিয়া বাসা-নির্ম্মাণের জন্য মাল-মসলা-সংগ্রহ করে; পালখ ও তুলা দেখিলে মুখ বাঁকায়; কিন্তু ঝাঁটার কাঠি বা তথাবিধ কোন কিছু দেখিতে পাইলে বড় খুশি!

৫

ঝাঁড়ির পাশে একটা বড় অশ্বত্থগাছের কোটরে এক চটক-দম্পতির বাসা ছিল। চটকসমাজে ঐ দুইটীকে সকলে দুই চোকের বিষ দেখে। স্বভাব-দোষে চটকটা সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়াছে। চটকটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গলার কৃষ্ণবর্ণ পালখগুলি বড় চমৎকার; কিন্তু চলনে, চরিত্রে ঠিক যেন একটা বানরপালের গোদা। চটক-সমাজে "যা'র লাঠি, তা'র মাটি।" খাদ্য, বর বা কন্যা-নির্ব্বাচন, থাকিবার স্থান, এবং বাসা-নির্ম্মাণের মালমসলা, এই লইয়া চটক-সমাজে পরস্পর বিবাদ ও মারামারি হয়। আমরা মনুষ্য, নিজে-দিগকে শ্রেষ্ঠ, আর পশু-পক্ষী ইত্যাদিকে ইতর প্রাণী বলিয়া থাকি; আমাদেরও ত এই সকল বিষয় লইয়া বিবাদ-বিচ্ছেদ, থানা-পুলিস, অবশেষে হাইকোটপর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কেবল বাহুবলের গুণে সে চটকসমাজের "নুরজাহানকে" বিবাহ করিয়াছে। যে অশ্বত্থ-গাছের কোটরে উহার বাসা, সে গাছটী বড় উত্তম স্থানে, আর কোটরটাও বড় আরামের ও নিরাপদ্। নাম না হইলে, আমাদের চলে না—আমরা এই চটক ও তাহার "নুরজাহানের" নাম রাখিলাম, গদাধর ও রূপসী। আমি নানাবর্ণের রেশমী ফিতা দিয়াছিলাম, কিন্তু তানসেন ও গৌরবিনী তাহা লয় নাই; রেশমে ও পাটের দড়িতে যে কি ভিন্নতা, উহারা তাহা জানে না। আপনাদের যা' পছন্দ হইয়াছিল, তাই লইয়াছিল। চৌধুরীদের দ্বারবানের টিয়া-পাখীর গোটাকতক ছোট ছোট পালখ কুড়াইয়া আনিয়া দুইটা চড়ুই-পাখী আপনাদের বাসায় রাখিয়াছিল, একদিন তাহাদের অবর্ত্তমানে আর দুইটা চড়ুই সেগুলি চুরি করিয়া লইয়া আপনাদের বাসায় রাখে। আবার তাহাদের বাসাহইতে অন্য চড়ুই-পাখীরা লইয়া যায়। এইরূপে পালখগুলি অনেক চড়ুই-পাখীর বাসা ঘুরিয়া এক্ষণে গদাধর ও রূপসীর বাসায় আনীত হইয়াছে। গদাধর গড়ের মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণের রাজা, যাহা খুশি করে। একদিন তানসেন গাছের ডালে বসিয়া শ্যামা-পাখার ডাক ডাকিতেছে, এমন সময়ে সেই ডাক গদাধরের কাণে গেল। শুনিবামাত্র গদাধর তাহার কাছে গেল। জলটুঙ্গির বাগানের সমস্ত চটক তানসেনকে ভয় করিয়া চলিত, কিন্তু গদাধর তাহাকে ভয় করিবার পাত্র নহে। দুইজনে সংগ্রাম বাধিল। তানসেন হারিয়া গেল, এবং রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। তানসেন হারিয়া যাওয়াতে গদাধরের অহঙ্কার অনেকটা বাড়িল। সে তানসেনকে তাড়া করিয়া তাহার নূতন বাসাপর্য্যন্ত গেল। বাসাটীর কোথায় কি আছে, আগে তাই ভাল করিয়া দেখিল, পরে আপনার বাসায় দিবার জন্য তানসেনের বাসার দুই-এক-গাছ দড়ির টুক্‌রা ধরিয়া টানিতে লাগিল। তানসেন হারিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু আপনার বাড়ী লুট করিতে দেখিয়া তাহার ভারী রাগ হইল। সে অমনি গিয়া গদাধরকে আক্রমণ করিল। উভয়ে জড়াজড়ি করিতে করিতে গাছের ডালহইতে মাটীতে পড়িল। আরও চটক আসিয়া জুটিল, কিন্তু তাহারা গদাধরের পক্ষাবলম্বন করিল,—কারণ তান-সেনের সঙ্গে তাহাদের বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল না। গদাধর তানসেনকে বড়ই মারিল, বেচারার গায়ের পালখ উড়িয়া যাইতে লাগিল। এমন সময়ে কিচিরমিচির করিতে করিতে এক যুবতী-চটকিনী, তানসেনের গৌরবিনী, আসিয়া সংগ্রামে যোগ দিল। তাহার প্রচণ্ড ভাব দেখিয়া, আর যে সকল চটক আসিয়া জুটিয়া-ছিল, তাহারা সরিয়া দাঁড়াইল; ভয়ঙ্কর ঠোক্‌রাঠুক্‌রি আরম্ভ হইল, অবশেষে গদাধর হারিয়া গেল। সে রণে ভঙ্গ দিয়া, আপনার বাড়ীর দিকে উড়িল, আর শিয়াল-তাড়া করিয়া কুকুর যেমন যায়, গৌরবিনী তাহার লেজের পালখ ঠোঁটে ধরিয়া তেমনি করিয়া চলিল। অবশেষে সেই পালখটা গোড়াসমেত উঠিয়া পড়িল। গৌরবিনী সেটা আর গদাধরের নিকটহইতে আপনা-দের বাসার যে সকল জিনিস-রক্ষা করিয়াছিল, সেই সকল বাসায় বেশ করিয়া সাজাইয়া রাখিল। অনেকে মনে করিতে পারেন, চটক-সমাজে হয় ত ন্যায়-বিচার ও দণ্ডবিধানের রীতি নাই, কিন্তু এই ঘটনাতে ঐরূপ কিছু যেন দেখিতে পাওয়া গেল। কি বল? দুইদিন পরে, তোতা-পাখীর যে পালখ গদাধরের বাসস্থান উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহা গৌরবিনীর নূতন বাড়ীতে আনীত হইল। "যার লাঠি, তার মাটী" এই আইন-অনুসারে কার্য্য হওয়াতে প্রতিবাসী চটক-পক্ষীরা কোন "ওজর-আপত্তি" করিল না।

(ক্রমশঃ।)

জিউ-জিৎসু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মানুষ বা পশু, ইহারা সকলেই, কাহাকে আক্রমণ করিতে হইলে, কণ্ঠ বা টুঁটি হাত-দিয়া বা কামড়াইয়া ধরে। বাগাইয়া টুঁটি ধরিতে পারিলে, আক্রান্ত মানুষ বা পশু নিতান্ত "কাবু" হইয়া পড়ে। মনে কর, তুমি কোন মানুষকে আক্রমণ করিবে। আচ্ছা, দুই হাতে, সম্মুখদিক্‌হইতে, বিপক্ষের কণ্ঠ, ঠিক কণ্ঠ-নালীর নীচে, সজোরে ধরিয়া, কণ্ঠনালীর যে হাড়টুকু একটু বাহির হইয়া থাকে, দুই হাতে বুড়া-আঙুল-দিয়া সেই হাড় খুব চাপিয়া ধর। এরূপ ধরিতে পারিলে, বিপক্ষের আর ট্যা ফোঁ করিবার শক্তি থাকিবে না।

এইরূপে বিপক্ষকে আক্রমণ করিলে, সে চুপ করিয়া থাকিবে না; আপনার রক্ষার জন্য সেও তোমাকে আক্রমণ করিবে—সেই আক্রমণকে প্রতি-আক্রমণ বলা যায়। এই প্রতি-আক্রমণ দুইপ্রকার—দুইটাই খুব কাজের। তুমি যেই টুঁটি চাপিয়া ধরিবে, সে অমনি দুই হাতে তোমার দুই বাহুতে খুব জোরে ঘন ঘন "কিল" মারিতে থাকিবে। গোটাকতক কিল মারিতে পারিলেই, তুমি তাহার টুঁটি ছাড়িয়া দিতে পথ পাইবে না। এই একপ্রকার, আর একপ্রকার বলি। বিপক্ষ আপনার দুই হাত, নমস্কার করিবার ভাবে, জোড় করিয়া, সম্মুখে তোমার দুই বাহুর মধ্যস্থলে আনিয়া, তোমার দুই বাহু ফাঁক করিয়া দিতে চেষ্টা পাইবে। এরূপ করিতে থাকিলে, তোমার বিপক্ষই এক্ষণে আক্রমণকারী হইয়া দাঁড়াইবে, এবং আপন দুই হাতে তোমার ঘাড় ধরিয়া নোওাইতে থাকিবে। বিপক্ষ এইপ্রকারে ঘাড় ধরিয়া তোমার মাথা হেঁট করাইতে থাকিলে, তোমাকেও তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা দেখিতে হইবে। সেই চেষ্টাকে প্রতি-আক্রমণ বলিব। একপ্রকার প্রতি-আক্রমণই খুব কাজের—তুমি একবার ডা'নদিকে, আবার বামদিকে মাথা নোওাইতে থাকিবে—এমন ভাবে নোওাইবে, সে যেন ভাবে, তাহারই চাপনে নোওাইতেছ। এইরূপ করিতে পারিলে, প্রায়ই হাত ছাড়াইয়া লইতে পারা যায়।

পিছনদিক্‌হইতেও বিপক্ষের টুঁটি বাগাইয়া ধরা যায়। পিছনদিক্‌হইতে দুই বাহুতে বিপক্ষের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, ঠিক তাহার টুঁটির হাড়ের উপরে ডা'ন-হাতে তোমার বাম-হাতের কব্‌জি কশিয়া ধরিবে। ডা'ন বা বাম-হাঁটু বিপক্ষের কোমরের একটু নীচে ঠেকাইয়া জোরে ঠেলিতে এবং মাথাটা তোমার দিকে টানিতে থাকিবে। এ আক্রমণেরও প্রতি-আক্রমণ আছে। আক্রান্ত ব্যক্তি পিছনদিকে বাহু ঘুরাইয়া লইয়া, তোমার দুই বাহু জড়াইয়া ধরিবে, এবং ইতঃপূর্ব্বে যে সকল স্নায়ুর কথা বলিয়াছি, বৃদ্ধ-অঙ্গুলি-দিয়া তাহার কোনটা টিপিয়া ধরিবে। তোমার হাত অমনি বাঁকিয়া যাইবে। এরূপ করিতে পারিলে, আক্রমণকারী আক্রান্ত ব্যক্তির মাথা ডিঙ্গাইয়া মাটীতে পড়িয়া যাইবে।

পিছনদিক্‌হইতে কণ্ঠ-আক্রমণ-ছাড়া আরও কয়েকপ্রকারে আক্রমণ করা যায়। একপ্রকার আক্রমণকে ইংরেজ কুস্তি-ওয়ালারা Full Nelson কহে। এপ্রকারে কেহ তোমাকে আক্রমণ করিলে, তোমার দুই হাত পিছনদিকে লইয়া গিয়া, বিপক্ষের ঘাড় চাপিয়া ধরিবে। এরূপে ধরিতে পারিলে, না তুমি, না তোমার বিপক্ষ, কাহারও নড়িবার যো থাকিবে না; বিপক্ষকে চাপিতে গেলে, নিজেকেই বেশি "কাবু" হইতে হইবে। এইরূপে ধরিয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তি যদি আপনার মাথাটা নীচু করিয়া, ঢুঁ মারিবার ভাবে খুব শীঘ্র শীঘ্র নাড়িতে থাকে, বিপক্ষকে "ডিগ্‌বাজী" খাওয়াইয়া, নিজের মাথার উপর দিয়া, ফেলিয়া দিতে পারে। আবার পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, তেমনি করিয়া যদি বিপক্ষের ঘাড়ের বা আর কোন স্থানের স্নায়ু টিপিয়া ধরিতে পার, সে তোমায় ছাড়িয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িবে।

পিছনদিক্‌হইতে বিপক্ষের হাতের কব্‌জি ধরিয়া, হাতের তলা একবার ভিতরদিকে, আবার বাহিরদিকে করিয়া যদি বাহু সজোরে ঠেলিয়া রাখিতে পার, আপনার রক্ষার্থে আক্রান্ত ব্যক্তির কিছুই করিবার সাধ্য থাকিবে না—খানিকক্ষণ উক্তরূপে ঠেলিতে পারিলে, আক্রান্ত ব্যক্তির বাহুর হাড় সরিয়া যাইবে। এ অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি যদি বিপক্ষকে খুব লাথি মারিতে থাকে, তবেই রক্ষা, নচেৎ আর কোন উপায় নাই।

বিপক্ষ যদি তোমাকে দুই বাহুতে (দুই হাতে) জড়াইয়া ধরিয়া, কোলের দিকে টানিতে থাকে, তাহা হইলে তুমি অমনি বসিয়া পড়িবে, তাহাতে তোমার এক বাহু (হাত) আল্‌গা হইবে এবং যে বাহু বিপক্ষ তখনও ধরে নাই, সেই হাতে তাহার কাঁধ আঁকড়িয়া ধরিবে, ধরিয়া তাহাকে মাটীর দিকে ঠেলিতে থাকিবে। এরূপ করিতে পারিলে, তুমিই আক্রমণকারী এবং বিপক্ষ আক্রান্ত হইবে।

এইপ্রকার এবং আর সকলপ্রকার জিউ-জিৎসু-ব্যায়াম-ক্রিয়ায় আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য যাহা করিতে হয়, তাহা শীঘ্র এবং পাকারকমে করিবে; আন্দাজী কিছু করিতে নাই। কয়েকপ্রকার আক্রমণের প্রতি-আক্রমণ বা আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় আছে; এরূপস্থলে, আক্রান্ত হইলে, পাকা-রকমে প্রতি-আক্রমণ বা আত্ম-রক্ষার সেই উপায়-অবলম্বন করিবে; কারণ প্রথম প্রতি-আক্রমণে

যদি ফল না দর্শে, বিপক্ষ এমন সাবধান হইবে যে, তোমার আর দ্বিতীয়বার প্রতি-আক্রমণ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠিবে না। আবশ্যক হইলে, বিপক্ষের আঁকড়ানর ভিতর খানিকক্ষণ থাকিবে, এবং আত্মরক্ষার উপায় ভাবিবে, অনন্তর বিপক্ষ যেই একটু ঢিল দিবে, অমনি হ্যাঁচ্‌কানি দিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া আসিতে চেষ্টা করিবে।

এইপ্রকারে বিপক্ষের হাত এড়াইবার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত একবার দেখিয়াছিলাম। আক্রান্ত ব্যক্তি মাটীতে পড়িয়া রহিল, যেন নিতান্ত কাবু হইয়াছে, পাঁচ-মিনিট-কাল এইভাবে পড়িয়া রহিল। এমন সময়ে আক্রমণকারী ছিট্‌কিয়া একদিকে "ডিগ্‌বাজী" খাইয়া পড়িয়া গেল, কাজেই তাহার হার হইল। আক্রান্ত ব্যক্তি পাঁচমিনিট-কাল পড়িয়া থাকিয়া প্রতি-আক্রমণের উপায় ভাবিতেছিল।

৫

হিন্দুস্থানী ডন্‌গিরেরা "ঘুসি" মারে, বা হাত মুষ্টি করিয়া তর্জ্জনীর দিক্‌-দিয়া আঘাত করে। বাঙ্গালীরা হাত মুঠা করিয়া, কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিক্‌-দিয়া কিল মারে। বোধ হয়, এই কিলই বা সংস্কৃত "মুষ্ট্যাঘাত"। আরও বোধ হয়, "দ্বন্দ্ব"যুদ্ধে বা হাতা-হাতি লড়াইতে সেকালের আচার্য্যেরা "কিল" মারিতেন। আমরা আর্য্য-সন্তান, তাই আমরা কথায় কথায় বলি, এক কিলে মাথা ফাটাইয়া দিব। সে যাহা হউক, জাপান-দেশের ডন্‌গিরেরাও কিল মারে, অথবা বাহুর অগ্রভাগদিয়া আঘাত করে। জাপান-দেশে "সমুরাই"-নামে একশ্রেণীর লোক আছে। আমাদের দেশে যেমন সেকালের ক্ষত্রিয়েরা কেবল যুদ্ধ করিতেন, জাপানের সমুরাই-জাতীয় লোকেরা তাই করিত; ফলে ইহারা জাপানদেশের ক্ষত্রিয়। একজন সমুরাই সেকালে দেখিলেন যে, হাত মুঠা করিয়া, ও বাঁকা করিয়া ধরিয়া, কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিক্‌দিয়া কিল মারিলে, বাঁশপর্য্যন্ত ভাঙ্গা যায়। এইজন্য সমুরাইরা একখানি তক্তায় কিল মারিতে মারিতে কনিষ্ঠাঙ্গুল ও কনুইপর্য্যন্ত হাতের ঐ ধারটা এমন শক্ত করিয়া ফেলে যে, হাত ঘুরাইয়া কিল মারিলে, কোন কোন হাড়-পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়।

ডাক্তার এস, এন, রায়, এম, বি। ডাক্তার জে, এম, দাস-গুপ্ত এম, বি।
এই দুইজন ডাক্তার ভারতীয় সৈন্যদলের চিকিৎসক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ডন্‌গিরের সঙ্গে লড়িতে হইলে, যে জন ভালরূপে জিউজিৎসু-ব্যায়াম জানে, ডন্‌গির তাহার সঙ্গে কোনমতে পারিয়া উঠে না। না পারিয়া উঠিবার কয়েকটী কারণ দেখাইতেছি। ডন্‌গির ঘুসি বা কিল মারিলে, হাত মুঠা করিয়া কনিষ্ঠ-আঙ্গুল যেদিকে, সেই-দিকে বাঁ বাহুর অগ্র-ভাগের অর্থাৎ কনুইর খানিক উপরের দিকে "সামলাইয়া" লইবে। তক্তায় ঠুকিয়া বা "ঠাসিয়া" কনিষ্ঠ-অঙ্গুলির দিক্‌টা ও কনুইর উপর দিক্‌টা শক্ত হইয়া গেলে, কিল মারিলে, ডন্‌গিরের হাতেই বেশি লাগিবে, যাহাকে মারিবে, তাহাকে, বলিতে গেলে, লাগিবেই না। যদি বাগাইয়া ধরিতে পার, তাহা হইলে ডন্‌গিরের বাম-হাত দিয়া তাহার ডা'ন-হাতে ও ডা'ন-হাত-দিয়া বাম-হাতের ঘুসি বা কিল সামলাইতে পারিবে। ডন্‌গির যদি বাম-হাতে কিল মারে, দুই হাতে তাহার মুঠা-করা হাত ধরিয়া ফেলিবে। এরূপে ধরিলে, সে তোমাকে মারিবার জন্য ডা'ন-হাত তুলিবে। এখন এক কাজ কর—ডন্‌গিরের বাম-হাত ঘুরাইয়া তুলিয়া তাহার ডা'ন-হাতের কিল তাহার বাম-হাতের কনুইর উপরে ধরিয়া লও।

বারকতক এইরূপ করিতে পারিলে, ডন্‌গিরের হাতের কনুই-য়ের উপর দিক্‌টায় ভারী ব্যথা হইবে। বাস্তবিক ঐ স্থানে বার বার সজোরে মারিলে, বড় লাগে। মনে কর, এখনও তুমি ডন্‌গিরের বাম-হাতের মুঠা ধরিয়া আছ। এখন থপ্‌ করিয়া উহার পিছনদিকে যাও—খবরদার, উহার বাম-হাতের মুঠা ছাড়িও না।

এবং উহার গলার টুঁটি অস্তহাতে (বাহুতে) বাগাইয়া ধরিয়া উহাকে মাটীতে ধপাস্ করিয়া ফেলিয়া দেও।

তুমি যখন জিউ-জিৎসু জান, তখন আর এক ফিকির আছে। ডন্‌গির যে মুখে আছে, খপ্ করিয়া তুমি সেই মুখী হও। মনে কর, এখনও তাহার বাম-হাতের কব্জি ছাড় নাই। এখন দুই-হাতে কব্জি ধরিয়া, তোমার কাঁধের উপর তাহার বাহুটা আনিয়া, হ্যাঁচ্‌কা-টান মারিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেও। আবার যদি তাহার বাম-হাত তোমার বাম-হাতে ধরিয়া, ডা'ন-হাতে ডন্‌গিরের কোমর বা কোমরের কাপড় ধরিয়া টান মার, সে আরও কায়দায় পড়িবে। কাজেই আর রক্ষা থাকিবে না—তাহাকে পড়িয়া যাইতেই হইবে। মনে রাখিও, তাহার বাম-বাহু তোমার ডা'ন-কাঁধের দিয়া বাম-হাত চালাইয়া দেও। দিয়া একবার পিছনদিকে, আবার সম্মুখদিকে বাঁকাইতে থাক। এপ্রকারে ধরিতে পারিলে, আক্রান্ত ব্যক্তি সহজেই কাবু হইয়া পড়িবে।

আর একপ্রকার আক্রমণের পন্থা কোমর ও থুৎনি ধরা। একহাতে বিপক্ষের এক হাত বা বাহু বা কোমরের কাপড় কশিয়া ধরিয়া নিজের দিকে টানিবে, অপরহাতে তাহার থুৎনী পিছনদিকে ঠেলিতে থাকিবে।

৬

স্কুলের ছেলেমাত্রেই মনে করে, পায়ে পা বাধাইয়া দিয়া, অন্য ছেলেকে আমি বেশ ফেলিয়া দিতে পারি, কিন্তু উচিতমতে

সমর-ক্ষেত্রে চিকিৎসার্থে যাইবার পূর্ব্বে ডাক্তার এস. এন. রায় এবং ডাক্তার জে. এম. দাস-গুপ্তের বিদায়-অভ্যর্থনা।

উপর আনিবে, বাম-কাঁধের উপর নয়—যদি তাহার বাম-বাহু তোমার ডা'ন-কাঁধে, অথবা ডা'ন-বাহু বাম-কাঁধের উপর আন, সে তোমার ঠিক পিছনদিকে পড়িবে, কাজেই পিছন-দিক্‌হইতে তোমার গলা আঁকড়িয়া ধরিতে পারিবে।

আর একপ্রকার আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ফন্দী আছে—এই-প্রকার আক্রমণ ও আত্মরক্ষা এ দেশের কুস্তিওয়ালারা তো জানেই না, ইংরেজ ডন্‌গিরেরাও জানে না।

বাহু ধরিয়া তোলা-নামা। বিপক্ষের ডা'ন-বাহু আঁকড়িয়া ধর, হাতের পাতা উপরদিকে রাখিয়া ঠেলিতে থাক। বাম-হাতদিয়া বিপক্ষের ডা'ন-হাতের কব্জি আঁকড়িয়া ধর, তাহার বাহুর অগ্র-ভাগের, অর্থাৎ কনুইর উপরিভাগের একটু উপরে পিছনদিক্‌টা ফেলিয়া দিতে বা ফেলিয়া দিবার উত্তম ফিকির অনেকেই জানে না। পায়ে পা বাধাইয়া ফেলিয়া দেওয়া। বিপক্ষ বালকের গায়ের কোট বা জামা কশিয়া ধরিয়া, বাম বা ডাইন-পায়ের হাঁটুর উপর তাহাকে ফেলিয়া দেও। ডা'ন-হাঁটুর উপর যখন ফেলিবে, তখন ডা'ন-জানুর উপর দিয়া ফেলিবে, আর যখন বাম-হাঁটুর উপর ফেলিবে, তখন বাম-জানুর উপর দিয়া ফেলিবে। যদি দাঁড়া ভাবে ফেলিতে চাহ, তবে ঠিক উল্টা করিতে হইবে। বাম-জানুর উপর দিয়া ডা'ন, ও ডা'ন-জানুর উপর দিয়া বাম-জানু চাপিবে। বিপক্ষের হাত, বাহু বা দেহ ধরিয়া অকস্মাৎ খুব জোরে তাহার ডা'ন কি বাম-পা সম্মুখের দিকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিবে, এবং হাত-দিয়াও সেইদিকে ঠেলিবে।

দাঁড়াভাবে ফেলা। পূর্ব্বে জানুর ও পায়ের ব্যায়ামের বিষয় যেমন বলিয়াছি, এও সেইরূপ।

আর এক উপায় আছে—এটাও খুব কাজের। বিপক্ষ বালকের গায়ের জামা বা কোট ধরিয়া নীচের দিকে জোরে টানিবে, এরূপে ধরিলে, সে হাত-দিয়া বড় একটা কিছু করিতে পারিবে না; পরে তাহাকে হয় ডা'ন না হয় বাম-পাদের দিকে ফেলিবে।

পিছনদিক্‌হইতে ফেলিতে হইলে, দুই হাতে অকস্মাৎ বিপক্ষের কাঁধ ধরিবে, এবং তাহার ডান বা বাম-পাদ সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিবে। অথচ হাত-দিয়া কাঁধও সম্মুখের দিকে ঠেলিতে থাকিবে। তড়ি-ঘড়ি ও খুব জোরে এইরূপে ধরিতে পারিলে খুব কাজ দেখে। রহিয়া-বসিয়া করিতে গেলে, বিপক্ষ তোমার হাত ছাড়াইয়া লইয়া তোমাকেই ফেলিয়া দিবে।

ধরিবার ও ফেলিবার ভাল ভাল প্রণালী বলা হইল। এক্ষণে, বিপক্ষ মাটীতে পড়িয়া গেলে, কি উপায়ে বিপক্ষকে কাবু করিতে হইবে, তাহা বলিব। ইংরেজ ডন্‌গিরদের মতে বিপক্ষকে মাটীতে ফেলিয়া, তাহার দুই কাঁধ মাটীতে চাপিয়া ধরিতে পারিলেই, "জিত" হইল। জাপানীরা এরূপ করিতে পারিলেই, জয় হইল বলিয়া মানে না। তাহাদের মতে বিপক্ষকে মাটীতে ফেলিয়া এমন করিয়া ধরিতে হইবে, যে তাহার আর নড়িবার জো থাকিবে না। কাজেই আক্রমণকারী যখন তাহাকে মারিতে বা বাঁচাইতে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, তখনই জিত। আমাদের দেশেও এই করিতে পারিলেই, জয়-পরাজয় মঞ্জুর হয়। আর ইহা যুক্তিসঙ্গত বটে। কারণ মনে কর, যদি পথে ঘাটে ডাকাইতের সঙ্গে তোমার লড়াই হয়, তুমি কি তাহাকে ফেলিয়া, তাহার দুই কাঁধ মাটীতে চাপিয়া ধরিয়াই ক্ষান্ত হইবে, না তাহাকে এমন কাবু করিবে যে, সে যেন তোমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে? সেইজন্য জিউ-জিৎসু-মতে কাঁধ চাপিয়া ধরিলেই, জিত হয় না।

কোট ধরিয়া কনুইপর্য্যন্ত আনিয়া বিপক্ষকে কাবু করিবার উপায়। বিপক্ষকে মাটীতে ফেলিতে পারিলে, তাহাকে যদি আরও কাবু করিতে চাও, তবে উল্টা করিয়া তাহার দুই বাহু চাপিয়া ধরিবে। এখন তোমার বাম-হাতে তাহার বাম-বাহু ধর, এবং হাতের পাতা উপরদিকে করিয়া, ডা'ন-হাঁটুর উপরে আন। ডা'ন-হাতে তাহার থুৎনি পিছনদিকে চাপিতে থাকে। থুৎনি ধরিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। সকলেরই বুকের ডা'ন-দিকে অতি কোমল স্থান আছে (ডন্‌গিরেরা আপনাদের বুকে হাত বুলাইয়া সে স্থান কোথায়, তাহা জানিয়া লয়), সেই কোমল স্থানে তোমার ডা'ন-হাত মুঠা করিয়া, আঙ্গুলের গাঁট সেই স্থানে জোরে ঘসিতে থাকিবে। ঐ স্থানটী কোথায়, তাহাও বলি। কণ্ঠাস্থি ও সকলের উপরকার পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থলে ঐ কোমল স্থান।

মাটীতে পড়িয়া গেলে বিপক্ষকে কেমন করিয়া আরও কাবু করিতে হয়? হাত উল্টা করিয়া ধরাতে ত বিপক্ষের কষ্ট হইবেই, কিন্তু বুকে রগড়াইলে এমন যাতনা হইবে যে, সে অমনি হা'ল ছাড়িয়া দিয়া বসিবে। ঐ কোমল স্থানে আঙ্গুলের গাঁইট ঘসিলে কিরূপ যাতনা হয়, যদি না জানা থাকে, তবে নিজের বুকে হাত ঘসিয়া দেখ। জোরে ঘসিও না, বড় লাগিবে।

আর একপ্রকারে ধরা যায়; তাহা কতকটা ঐরূপই। বিপক্ষের বাম-হাত তোমার ডা'ন-হাতে ধর, এবং বাম-হাঁটুর উপর চাপিয়া রাখ, অথচ বিপক্ষের বুকের ডা'নদিক্‌টা বাম-হাতে ঘসিতে থাক। এরূপ আক্রমণকালে আক্রমণকারী যেদিকে মুখ করিয়া থাকিবে, আক্রান্ত ব্যক্তি তাহার উল্টাদিকে মুখ করিয়া থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্বে যে আক্রমণের কথা বলিলাম, তাহাতে দুইজনেরই মুখ একদিকে থাকে।

এককালে জানু ও বাহু-দিয়া ধরার উপায়। বিপক্ষের কণ্ঠের উপরে ডা'ন-জানু-দিয়া চাপিয়া ধর। কাজেই তাহার মাথা নাড়িবার যো থাকিবে না। এদিকে তোমার বাম-জানু-দিয়া বিপক্ষের বাম জানু চাপিয়া ধর, কাজেই তাহার ডা'ন-জানু তোমার বাম-জানুর উপরে থাকিবে। এক্ষণে দুই হাতে (বাহুতে) বিপক্ষের বাম-বাহু বা হাত ধর, এবং হাতের পাতা উপর-দিকে রাখিয়া, নিজের ডা'ন-জানুর উপরে জোরে চাপ। এরূপ আক্রমণ বড় কাজের—আক্রান্ত ব্যক্তির উল্টিয়া আক্রমণ করিবার উপায় থাকে না।

উপসংহারকালে কিছু সুপরামর্শ দিতে চাই—মন দিয়া শুন। মল্লযুদ্ধ বা ব্যায়ামকালে ঠিক্ সকলই মনের মত না হইলেও, রাগ করিও না—মেজাজ গরম হইলে, সব মাটী। বেজায় বল-প্রয়োগ করিও না। তবে যেখানে দরকার, সেখানে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবেই। স্কুলে বা বাড়ীতে ব্যায়ামের সময়ে খুব সাবধান হইবে, যেন খেলার সঙ্গীকে আঘাত না লাগে। ভাল করিয়া না শিখিয়া কাহাকেও কোনপ্রকারে আক্রমণ করিও না।

সমাপ্ত।

মেরুপ্রান্তে চিত্রকর

রুষীয় চিত্রকর প্রথিতনামা এম্ এ বরিসফ্ তাঁহার চিত্রকর-জীবনে যত দুর্ঘটনার মধ্যে পড়িয়াছিলেন ও যত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এত আর কোন তুলিকা-চালক বা চালিকাই করেন নাই। এই চিত্রকরের কল্পনা সাধারণ দৃশ্যের উপর লীলা করিয়া তৃপ্ত হয়

না। ইনি উত্তরমেরু-প্রদেশের তুষারময় স্থলেই নানা সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য দেখিয়া থাকেন, সাধারণ দৃশ্য ইঁহার রুচিকর নহে। ইঁহার মতে উত্তরমেরুর তুষারপ্রান্তর, বিশালবপু তুষারশৈল ও প্রশস্ত তুহিন-প্রবাহই প্রকৃতির চিত্রশালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র।

ইনি বলিয়াছেন, "আমি সর্ব্বদাই মেরুপ্রদেশে যাইয়া তথাকার সুমহৎ হিম ক্ষেত্র স্বচক্ষে দেখিবার বাসনা করিতাম। বাল্যকালে আমি মেরুপ্রদেশের আবিষ্কারকদিগের দুর্ঘটনাপূর্ণ ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িতে বড় ভাল বাসিতাম। আমার তখন বোধ হইত, ঐ মেরুপ্রদেশের আবিষ্কারকদিগের মত মহৎ লোক জগতে আর নাই। তাঁহারা যেপ্রকারে বিপদোত্তীর্ণ হইতেন, তাহা শুনিয়া আমার তরুণবয়সের কল্পনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। তাই আমি প্রকাণ্ডকায় শ্বেতভল্লুক ও সীলের বিহার-ভূমি মেরুপ্রদেশের সেই তুষার-ক্ষেত্র স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমার ঐ মহাবাসনা আমি ঝটিতি চরিতার্থ করিবার কোনই সুযোগ পাই নাই। কয়েকবৎসর পরে আমি ঐ সুযোগ পাইলাম। এক সন্ন্যাসাশ্রমে ছাত্রস্বরূপে থাকিয়া আমি অনেক ছবি আঁকিয়াছিলাম। অনন্তর আমার এক বন্ধুর কাছে আমি মেরুপ্রদেশে গিয়া শ্বেতভল্লুক ও সিন্ধুঘোটকের ছবি আঁকিবার অভিপ্রায়-প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি আমার ঐ অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমাকে মেরুপ্রদেশে যাইবার পাথেয়-সংগ্রহ করিয়া দেওয়াতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।

এম, এ, বরিসফ্।

উহার অত্যল্পদিন পরেই আমি আমার দুইজন কষ্টসহিষ্ণু ও বিশ্বস্ত সঙ্গীকে সমভিব্যহারে লইয়া স্লেজে চড়িয়া মেরুপ্রদেশে যাত্রা করিলাম। সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত আমি জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না। মেরুপ্রদেশের মোহকর দৃশ্যনিচয় দেখিয়া আমি একনাগাড়ে বহু দণ্ডযাবৎ মন্ত্র-মুগ্ধবৎ স্লেজের উপরে বসিয়া ছিলাম। তত্রত্য দৃশ্যসমূহের বিবিধ বর্ণের চারু সৌন্দর্য্য-সম্পাদন যে দেখে নাই, সে ধারণাই করিতে পারিবে না। তথায় নিশ্চয়ই শীত বড় বেশী, ছবি আঁকিতে চাহিলে, হাতে খুব পুরুপশুলোমময় দস্তানা পরিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও কোন কোন সময়ে ছবি খুব তাড়াতাড়ি আঁকিয়া লইতে হয়, কারণ রং অধিকক্ষণ খোলা হাওয়ায় পড়িয়া থাকিলে, জমিয়া যায়। এই প্রথম যাত্রায় আমি যাটিখানির উপর ছবি আঁকি এবং দেশে ফিরিয়া মহারুষিয়ার নানা নগরের চিত্রশালাসমূহে সেই সকল ছবি বেচিয়া ফেলি।

ইহাতে আমার কিঞ্চিৎ অর্থের সংস্থান হয়। এই অর্থ লইয়া আমি পুনরায় উত্তর-মেরু-প্রদেশে যাত্রা করিলাম। এইবার আমি, তুষারশৈলনিচয়ে সবিশেষ মনোযোগার্পণ করিতে লাগিলাম, আর অনেকগুলি তুষারগিরির চিত্রাঙ্কণ করিয়া ফেলিলাম। তুষার-শৈলে পদার্পণ আদৌ সুসাধ্য ব্যাপার নহে। প্রথমে ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া দাঁড়-দিয়া তুষার-পরিষ্কার করিয়া তুষার-শৈলের সন্নিহিত হইতে হয়। সময়ে সময়ে তুষার শৈলে সোপান-কর্ত্তন না করিলে, উহাতে চড়াই যায় না। চারিজন বা ছয়জন নাবিককে সঙ্গে লইয়া কোন তুষার-শৈলে উঠিতে কখন কখন আমার ঘণ্টাখানিক সময় লাগিত। ঐ কার্য্য বড়ই বিপজ্জনক ও দুরূহ। ঐ শৈলগুলির কূর্ম্মবৎ উল্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই থাকিত, তাহাতে যাহারা ঐ সমস্ত শৈলোপরি থাকিত, তাহাদের মুহূর্ত্তমধ্যে মৃত্যুমুখে পড়িবারও সম্ভাবনা থাকিত। আমি অনেকবার তুষার-শৈলের উপরে বসিয়া ছবি আঁকিয়াছি। একবার চিত্রাঙ্কণ-দণ্ড স্থাপিত করার অব্যবহিত পরেই একটা শ্বেত-ভল্লুক দেখিতে পাইয়া আমাকে অবিলম্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইয়াছিল!

হিম-শৈলগুলির গঠন ও আকার একই প্রকারের নহে। ছোট তুষার-শৈলগুলিকে দেখিয়া লোকের আরবদিগের তাম্বু মনে পড়ে। কোন কোন বড় তুষার-শৈল যুদ্ধের জাহাজ, অত্যুচ্চ উচ্চনীচ পাহাড়, দুর্গ এবং পর্ব্বতীয় দৃশ্যের একাংশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তাহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য বিপুল বিস্ময়জনক—শুচিশুভ্র, হরিৎ এবং, ছায়াময় অংশে, চারুনীল,—নীলাকাশ প্রতিবিম্বিত হওয়ার ফল। কখন কখন একপ্রকার মনোজ্ঞ নীলবর্ণের পাইড় তাহাদের অঙ্গ বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, দেখা যায়। ঐ পাইড়গুলি পানীয় জলের ধারা, শৈল রচিত হইবার পূর্ব্বে জমিয়া গিয়াছে।

মেরু-চিত্রাবলী লোকে খুব কিনিতে চায় দেখিয়া আমি নোভা জেম্ব্লা-দ্বীপে একটী প্রবাসাশ্রম-স্থাপনের কল্পনা করিলাম। এই মেরুপ্রদেশীয় দ্বীপটি চিরভীতিপ্রদ "কারা"-সাগর ও "বারেন্ট"-সাগরের মধ্যে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩০০ ক্রোশ, কিন্তু ইহার প্রস্থ সংকীর্ণ, তিরিশক্রোশের অধিক হইবে না। তদ্দেশবাসী কয়েকব্যক্তির সাহায্য লইয়া আমি এখানে একটী চিত্রশালা-স্থাপন করিলাম, ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বোত্তরস্থিত চিত্রালয়। চতুর্দ্দিকে চাকচিক্যময় বরফ ও তুষারে আচ্ছন্ন এই চিত্রশালিকায় দারুণ শীতে বসিয়া আমি অনেক ছবি আঁকিয়াছি। এক-এক-সময় শীত এত বেশী পড়িত যে, তুলিকা-সঞ্চালনের চেষ্টা করিলে, তাহা ভাঙিয়া দুইটুকুরা হইয়া যাইত। রং লইয়াও জ্বালাতনে পড়িতাম,

তুষারপাতহেতু রঙের তেল বড় বেশী ঘন হইয়া যাইলে, আমি কাঠকয়লা ও পোড়িং-ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতাম।

পাঁচবৎসর-যাবৎ গ্রীষ্মকালে আমি ঐ দ্বীপে গিয়া ছবি আঁকিতাম। ইহাছাড়া আমি মেরুবৃত্তের বহুদূরে তিনবার বসন্তকালে ও একবার শীতের মাঝামাঝি গিয়াছিলাম। অনেকবার আমাকে অনেক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, অনেকবার মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছি।

অবশেষে কিন্তু আমার সাফল্য আমাকে বড়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিল, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে গিয়া আমি ও আমার সাতজন সঙ্গী আমরা প্রায় প্রাণ দিতে বসিয়াছিলাম। নোভা জেমৃলার চতুর্দ্দিকে অনেক স্থান অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। আমি ঐ সমস্ত স্থানের মানচিত্র ও কয়েকখানি ছবি আঁকিতে দৃঢ়সংকল্প হইলাম। ঐ উদ্দেশ্যে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-মাসে মেচটা-নাম্নী তরণী চড়িয়া আমি নোভা জেমৃলা-দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। ঐ তরণীখানি এমনভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যেন বরফের চাপ সহিতে পারে। দ্বীপস্থিত আড্ডায় খাদ্যাদি সঞ্চিত রাখিয়া আমরা নৌকায় চড়িয়া মাটোচ্‌কেন শার-নামক এক সূক্ষ্ম ও বিসর্পিত সমুদ্রপথ দিয়া "কারা"-সাগরের দিকে যাত্রা করিলাম। ঐ সমুদ্রপথটি জেমৃলা-দ্বীপকে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। আমরা যেই ভয়াবহ "কারা"-সাগরে পড়িয়াছি, অমনই দূরবীণের সাহায্যে একটা শ্বেতভল্লুককে দেখিতে পাইলাম।

নৌকাতে আমরা যে ডোঙ্গা লইয়া গিয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ তাহাতে চড়িয়া, পশুটা যাহাতে পলাইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলাম। তখন সেই প্রকাণ্ড-কলেবর পশুবর তীর ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল এবং মাঝে মাঝে থামিয়া, তাহার মস্তক তুলিয়া বায়ু-আঘ্রাণ করিতেছিল। একটা বহিঃনিঃসৃত পাহাড়ের অন্তরালে লুকাইবার সুবিধা পাইয়া আমরা সত্বর ডোঙ্গা-হইতে নামিয়া বন্দুকহস্তে তাহাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলাম। তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় আমরা অবনতভাবে অবস্থিতি করিয়া রহিলাম; কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইল, তথাপি ভল্লুকটাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমরা অর্দ্ধোত্থিত হইয়া দেখিলাম, চতুর পশুটা আমাদের গন্ধ পাইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। তদ্দর্শনে আমরা তীরের দিকে ছুটিলাম এবং ডোঙ্গায় চড়িয়া তাহাকে তাড়া করিয়া চলিলাম। ভল্লুকটা বেশ সাঁতার কাটিতে লাগিল, আমাদের দাঁড়িরা অতিকষ্টে তাহার নাগাইল ধরিতে সমর্থ হইল। আমরা তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, সে জলে ডুব দিল এবং বহুক্ষণ জলতলে অবস্থিতি করিল। আমরা ক্রমশঃ তাহার খুব কাছে ঘেঁসিয়া যাইতে লাগিলাম, তাহার পর তাহাকে উপর্য্যুপরি দুইবার গুলী করিলাম। পশুটা জলমধ্যে পাক খাইয়া খাইয়া বিষমভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার পর আমরা তাহাকে আরও দুইবার গুলী করিলাম, কিন্তু আমরা তাহাকে বধ করিতে পারিলাম কি না, তাহার

চরম অভিযান।—(এই চিত্রখানি রুষিয়ার জার কিনিয়া লইয়াছেন।)

নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এই পশুরা যে, কেমন চতুর ও ফন্দীবাজ, তাহা জানিতাম বলিয়া আমরা তাহার আর নিকটে গেলাম না, দূরে থাকিয়াই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কারণ তাহার একটা থাবার আঘাতেই আমাদের ছোট ডোঙ্গাখানি চূরমার হইয়া যাইতে পারিত; কিন্তু আমাদের কুকুরদের নিমিত্ত উহার মাংসের প্রয়োজন ছিল, এইজন্য তাহার নিকটহইতে বারো-গজ তফাতে থাকিয়া আমরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পোলো ছুড়িলাম, তাহাতেই পশুটা পঞ্চত্ব পাইল। তখন আমরা তাহার মৃতদেহটা তরণীতে তুলিয়া লইলাম।

নোভা জেম্‌ব্লার বিপরীত দিক্‌স্থিত উপকূলটি আবিষ্কৃত করাই আমার এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। আমরা তরণীতে, তিনমাসপর্য্যন্ত চলিতে পারে, এত খাদ্যদ্রব্য এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও আমার চিত্রণ-কার্য্যের সরঞ্জাম প্রভৃতি আনিয়াছিলাম। "কারা"-সাগরে কয়েকদিন-যাবৎ ইতস্ততঃ ভাসমান থাকার পর, আমি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, আমরা উত্তরদিকে ভাসিয়া না গিয়া দক্ষিণদিকে ভাসিয়া চলিয়াছি! ঐদিকে যাইবার আমাদের কোনই ইচ্ছা ছিল না। তরণী স্রোতের প্রতিকূলে চলিতে পারে না, তাই আমরা তরণী-ত্যাগ করিয়া স্লেজে ও ডোঙ্গায় চড়িয়া গৃহে ফিরিতে মনস্থ করিলাম। ইহার অপেক্ষা বিষম ভুল আমি আর জীবনে করি নাই। ইহার জন্য আমাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হইয়াছিল। যখন তরণী-ত্যাগ করি, তখন আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, সপ্তাহখানিকের মধ্যে নোভা জেম্‌ব্লায় ফিরিতে পারিব।

কিন্তু আমরা তরঙ্গতাড়িত হইয়া আমাদের গন্তব্য মার্গের বাহিরে গিয়া পড়িলাম এবং তিনসপ্তাহের পরেও আমাদের লক্ষ্য স্থলের কিছুমাত্রই নিকটবর্ত্তী হইলাম না। তাহাছাড়া, আমরা যে তিরিশটি কুকুর লইয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাদের অনেককে হারাইয়াছিলাম, তাই আমরা আমাদের সাজ-সরঞ্জামও, যতদূর সম্ভব, কমাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমরা আমাদের দুইখানি ডোঙ্গা ছাড়িয়া গিয়াছিলাম এবং খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রাদি লইয়া যাইবার জন্য স্কী-দিয়া, অর্থাৎ বরফের উপরদিয়া চলিবার জন্য দারুময়ী বিচিত্র বিনামা-দিয়া, দুইটি স্লেজ-নিম্মাণ করিয়া লইয়াছিলাম; এই কারণে যখন আমরা যাত্রারম্ভ করি, তখন কতকটা প্রফুল্লচিত্ত ছিলাম। প্রথমে পর্য্যটন-কার্য্য কতকটা সহজেই নির্ব্বাহিত হইতেছিল। অনন্তর আমরা এমন একটা স্থলে উপনীত হইলাম, যে স্থানটা বড়ই আবুড়া-খাবুড়া, কাজেই আমরা বড়ই ধীরে ধীরে অগ্রগমন করিতেছিলাম। আমাদের ডোঙ্গা বা স্লেজ প্রায়ই বরফের ফাটলে বা গর্ত্তে ঠেকিয়া যাইতেছিল, একদা প্রত্যূষে আমাদের একটা বরফ-যান একটা ফাটলের মধ্যে পড়িয়া অন্তর্হিত হইল। তখন আমাদের একজন লোক সাহসে ভর করিয়া শীতল জলে নামিয়া কুকুরদের সাজ কাটিয়া দিল, কিন্তু আমরা অতি অল্পসংখ্যক কুকুরেরই প্রাণ-রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম।

এই তুষার-যানটি নষ্ট হওয়াতে আমাদের খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া গেল, তাহাছাড়া অনেক মূল্যবান্ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও চিত্রও নষ্ট হইল। এই কষ্টের উপর আমরা হঠাৎ জানিতে পারিলাম যে, যে বরফের চাপের উপরদিয়া আমরা যাত্রা করিতেছিলাম, তাহা আমাদিগকে এক্ষণে দক্ষিণমুখে, আমাদের গন্তব্য স্থলহইতে দূরে লইয়া চলিয়াছে। এই নৈরাশ্যের যাতনা অসহ হইল। তখন এই বরফের চাপের কিনারায় গিয়া জলে পড়িয়া একটা স্থির বরফের চাপের উপর লাফাইয়া পড়া-ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর রহিল না, সেই স্থির বরফের চাপের পরপারে আমরা উপকূল দেখিতে পাইতেছিলাম। বরফের চাপের কিনারায় পঁহুছিয়া আমরা আমাদের তাবৎ দ্রব্যই সেই বিশাল তুষার-ক্ষেত্রে ছুড়িয়া ফেলিলাম, ঐ ক্ষেত্রের বহিঃনিঃসৃত কিনারা কিন্তু আমরা যে বরফের চাপের উপরে ছিলাম, তাহার বহিঃনিঃসৃত কিনারার সহিত জুড়িয়া গিয়া আমাদের সেই দ্রব্যগুলিকে চূরমার করিয়া ফেলিল, সমস্ত জিনিসই ভয়ানকভাবে তালগোল পাকাইয়া মণ্ডবৎ হইয়া গেল। আমাদের তখন মনে হইল, প্রকৃতির একটা মহাশক্তি মুক্ত হইয়া ঐ অসীম বল-প্রকাশ করিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফখণ্ড, প্রত্যেকটি ওজনে ২,৭০,০০০/ মোণেরও বেশী, আবর্ত্তিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষিত হইতে লাগিল, পরে পুনরায় বিপরীতদিকে মহানিনাদে বিক্ষিপ্ত ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া তুষার-কণিকার ন্যায় অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ফলে আমরা অতিমানুষিক চেষ্টার পর সেই সচল বরফের চাপ-ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলাম। উপযুক্ত ক্ষণে লাফ দিয়াই আমরা সেই স্থির বরফের চাপে পদার্পণ করিতে পারিলাম; কিন্তু এই পার হওয়ার ফলে, আমাদের যে ডোঙ্গায় শয্যাদি ছিল, তাহা এবং খাদ্য ও যন্ত্রাদি জলার্দ্র হইয়া গেল।

সকলে পার হইলে, আমি দেখিলাম, আমার লোকজন বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই আমরা পূরা একদিন বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলাম। তখন আমাদের যে দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিলে লোকের চোকে জল আসিত। রজনীতে এত প্রবলবেগে শীতবায়ু বহিতে লাগিল যে, আমরা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমাদের সেই বরফে চলিবার জুতা ও ডোঙ্গা-দিয়া প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া লইলাম। ডোঙ্গার মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া এবং পা বাহিরে ঝুলাইয়া আমরা রাত্রিতে নিদ্রা গেলাম। আমাদের পাগুলি শীঘ্রই তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এখন আমরা পানীয় জলাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলাম। তুষারেও লবণের স্বাদ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাইতে লাগিল। সেই তুষার-ভোজন করিয়া আমাদের তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া গেল। অন্য সমস্ত লোককে খাদ্য যোগাইবার জন্য আমাকে ক্রমে ক্রমে একটির পর একটা করিয়া কুকুর মারিয়া ফেলিতে হইতেছিল। সত্য বলিতে কি, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য লোকেরা সেই কুকুরদিগের তপ্ত শোণিত সাগ্রহে পান করিতে লাগিল।

বরফ-ক্ষেত্রে পর্য্যটনের মত ক্লেশকর কার্য্য অধিক নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, বরফ-ক্ষেত্র দিয়া সোজা উপকূলে পঁহুছান যাইবে কিম্বা উপকূলের এত নিকটে উপস্থিত হওয়া যাইবে যে, পরে ডোঙ্গায় করিয়া উপকূলে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইবে না; কিন্তু এ বিষয়েও আমার ভুল হইয়াছিল। স্থির বরফের চাপের কিনারায় পঁহুছিয়া আমরা দেখিলাম, উপকূল তখনও বহুদূরে, সম্ভবতঃ ষাটি-ক্রোশ তফাতে, রহিয়াছে। উপকূল ও স্থির বরফের চাপের মধ্যে এক খরস্রোত প্রণালী ছিল, তাহার পরে আবার ছিল, সমুদ্রে ভাসমান সুবিস্তীর্ণ নীহার-ক্ষেত্র; আমরা ডোঙ্গায় চড়িয়া প্রণালী পার হইলাম, তাহার পর প্রথম নীহার-ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। ডোঙ্গায় তিনজনের বেশী লোক ধরে না, তাই আমাদের সমস্ত লোক ও মালপত্র পার করিতে পাঁচবার ডোঙ্গা এপার-ওপার করিল।

অতঃপর একটী তুষার-ক্ষেত্রহইতে আর একটী তুষার-ক্ষেত্রে যাইতে আমরা ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার অনেকবার মনে হইয়াছিল, বোধ করি, আমাদিগকে এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা-ত্যাগ করিতে হইবে। একবার তাই আমি এই প্রস্তাব করিলাম যে, গুলিবাঁট করিয়া আমাদের মধ্যে কোন্ তিনজন উপকূলে যাইবে, তাহার নির্ণয় করা হউক। তিনজন নাবিক বিবাহিত লোক ছিল, সুতরাং আমি এই প্রস্তাব করিলাম, ইহারাই ইহাদের সঙ্গে বন্দুক, মানচিত্র, দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্র এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া ডোঙ্গায় চড়িয়া উপকূলের অভিমুখে যাইবার চেষ্টা করুক। আমার কথা-শেষ হইতে না হইতেই, একজন বিবাহিত নাবিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল, তাহারা কিছুতেই আমাদের ফেলিয়া যাইবে না। সে বলিল,—'এইরূপ করিলে, আমাদের পরিতাপের অবধি থাকিবে না। মরিতে হয়, সকলেই একসঙ্গে মরিব, গুলিবাঁট করিয়া কাজ কি?' অনন্তর আমরা সকলে জানু পাতিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম। সেই দিনের শেষভাগে আমরা গুলী করিয়া একটী সীল মারিলাম। এ সময়ে আমাদের সমস্ত কুকুরই নিহত হইয়াছিল। সীলের ক্ষতস্থানে একটী বাটি ধরিয়া আমরা তাহার রক্ত সেই বাটিতে লইলাম এবং সেই রক্ত সাগ্রহে পান করিলাম এবং তাহার যকৃৎ ও ফুস্‌ফুস্ কাঁচাই খাইয়া ফেলিলাম। অনেক কষ্টের পর আমরা একটু আগুন জ্বালিতে পারিলাম, আর সেই সীলটাকে প্রথমে পেট্রোলিয়মে, পরে তাহারই বসায়, সিক্ত করিয়া পোড়াইলাম। আমি সত্য বলিতেছি, সেই মেরুপ্রদেশের সেই নীহার-ক্ষেত্রে প্রায় অপক্ব কয়েকখণ্ড সীলের মাংস আমি যেমন উপাদেয় মনে করিয়া সাগ্রহে খাইয়াছিলাম, তেমন করিয়া সাগ্রহে জীবনে আর কোন খাদ্যই খাই নাই!

এখন আমরা সকলেই সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলাম, নীহার-ক্ষেত্রে আর বেশীদিন থাকিলে, মৃত্যু অবধারিত, এইজন্য আমরা সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কয়েক সপ্তাহ দুঃসহ ক্লেশ-ভোগ করার পর, একজন নাবিক বলিল, সে ধুঁয়ার গন্ধ পাইতেছে। যতক্ষণ না আমি একটী খুব শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্যে দূরে একজন তদ্দেশবাসী লোকের কুটীরহইতে ধূমোদ্গম হইতেছে দেখিতে পাইলাম, ততক্ষণ ঐ নাবিকের কথায় কাণ দিলাম না। অতঃপর আমরা ক্রমাগত ছয়ঘণ্টা এক হিমশিলাহইতে আর এক হিম-শিলায় গিয়া অতিবাহিত করিলাম। তখন আমরা উপকূলে লোকের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পারিলাম। আমি শূন্যে দুইবার গুলী করিলাম। তৎক্ষণাৎ কে দুইবার গুলী করিয়া আমাকে উত্তর দিল। তখন আমরা আনন্দে চীৎকার করিতে ও নাচিতে সুরু করিয়া দিলাম। আমাদের প্রাণ-রক্ষা হইল! শীঘ্রই আমরা এত নিকটবর্ত্তী হইলাম যে, চীৎকার করিয়া দূরবর্ত্তী লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে পারিলাম। অতঃপর ঘন কুয়াসায় দেশটী আচ্ছন্ন হইল, আমরা আমাদের ভাবী উদ্ধারকর্ত্তাদিগকে আর দেখিতে পাইলাম না। যাহা হউক, পরদিন প্রভাতে আমরা আবার তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম। একটু বেলা হইলে, তাহারা ডোঙ্গায় করিয়া আমাদের কাছে আসিল এবং আমাদিগকে ডাঙ্গায় লইয়া গেল।"

বাঘা বেন্দা

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বৃন্দাবন ইতি নামধেয় কিশোর-বয়স্ক বালক বোস-পাড়ায় দু'-তিনজন ছিল, কিন্তু "বাঘা বেন্দা" কেবল একজনই ছিল; ইহা ঐ পাড়ার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, এই কাহিনীটির শেষপর্য্যন্ত পড়িয়া তা' তোমরাই বিচার করিয়া দেখিও; তাহার তাড়ায় কিন্তু বোস-পাড়ায় সর্ব্বদাই সাড়া পড়িত। নূতনরকমের কোন দুষ্টামি পাড়ায় হইতে দেখিলে, পাড়ার লোকে বলিত, এ আর কা'রও নয়, বাঘা বেন্দারই কাজ! বাঘার তো এমনই সদ্‌গুণ ছিল, তবু তাহাকে পাড়ার সকলেই, ক জানি কেন, বড়ই ভাল বাসিত, বাঘাবিহনে তাহাদের জীবনের ভার দুর্ব্বহ-বোধ হইত; কিন্তু বাঘাকে সবচেয়ে স্নেহ করিতেন, ঐ পল্লীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের যুবক প্রধান শিক্ষকমহাশয়। ইনি বোস-পাড়ার যুবকদলের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। উঠন্ত বয়সে পাড়ার ছেলেগুলা যাহাতে বহিয়া বা বকিয়া না যায়, সে বিষয়ে ইনি সর্ব্বদাই খর-দৃষ্টি রাখিতেন। ইঁহার সদয় স্বভাব ও প্রকৃত মনুষ্যোচিত চরিত্র-

গুণে ইনি পল্লীর তরুণবয়স্ক যুবকমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন; তাহারা যাহা কিছু করিত, সকলই ইঁহাকে জানাইত, দুষ্টামি করিলেও, ইঁহার কাছে আসিয়া বলিত।

বোস-পাড়ার আর একটী তরুণ যুবকের নাম বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্র পিতৃহীন, বিধবা মায়ের আদুরে ছেলে। বীরেন্ যে, সম্পূর্ণরূপে সদ্‌গুণশূন্য ছিল, তাহা নহে। মায়ের আদর তো অমৃত, কিন্তু বীরেন্ তাহা অতিরিক্ত-পরিমাণে পাইত বলিয়া, তাহার পক্ষে তাহা হলাহলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে তাহার সদ্‌গুণগুলি সর্ব্বদাই তাহার মায়ের আদর-চাপা থাকিত, প্রায়ই ফুটিতে পাইত না। তাই একদিন হরিসাধন-বাবু (প্রধান শিক্ষকমহাশয়) বাঘাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাঘা, বীরেন্‌টাকে তুই একটু-আধটু দেখিস্-শুনিস্, ওটা গোল্লার দোরে যা'বার দাখিল হ'য়ে আছে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রধান শিক্ষক-মহাশয়কে পাড়ার সকল যুবকই প্রেম-ভক্তি করিত, বাঘাও করিত, তাই সে বলিল, "মাষ্টার-ম'শায়, আমাকে বীরেন্‌কে দে'খ্‌তে ব'ল্‌ছেন, আমাতে আর বীরেনে যে, পূবপশ্চিম ফারাক! তবে আপ্‌নি ব'ল্‌ছেন, দে'খ্‌ব।"

সেই-অবধি বাঘা সত্যসত্যই বীরেনের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। দেখিয়া প্রধান শিক্ষকমহাশয় ও বীরেনের মা উভয়েই বড় প্রীত হইলেন।

বাঘাদের অবস্থা পূর্ব্বে মন্দ ছিল না, কিন্তু তাহারা জাতিতে কায়স্থ, বাঘার পূরা নাম—বৃন্দাবনচন্দ্র বসু, তাহার পিতার ছেলের মধ্যে সে-ই—'একশ্চন্দ্র তমোহন্তি'! তাহার ভগিনীর সংখ্যা কিন্তু পূরা একগণ্ডা! ঢালিতে ঢালিতে কলসীর জল সবই ফুরাইয়া যায়। বাঘার দিদীদের বিবাহ দিতে দিতে তাহার পিতা প্রায় নিঃসম্বল হইয়া পড়েন, ফলে প্রবেশিকা-শ্রেণীতে উঠিলেই, বাঘাকে অর্থের অভাবে বিদ্যামন্দিরহইতে চিরবিদায় লইতে হয়। এদিকে বীরেনের মায়ের যে বেশী টাকা ছিল, তাহা নয়, তবুও সেকারণে নয়, বীরেনের বুদ্ধির বিচিত্র প্রাখর্য্য ও মায়ের আদরের পরম প্রাচুর্য্যহেতু সেও বাঘার চেয়ে বড় বেশী 'ইলম্‌দার' হইতে পারিল না। এখন দু'জনেই তাই এক-গোয়ালে ঢুকিয়াছে অর্থাৎ একই সওদাগরী হৌসে পনের বা কুড়িটাকা-বেতনের পেঁচী কেরাণীগিরি করিতেছে।

বাঘা সর্ব্বত্রই সমান; আফিসেও সে তাহার সদ্‌গুণরাজির পরিচয় দিতে ছাড়ে নাই! সকল কেরাণীই তাহার রঙ্গ, রসিকতা, ফচ্‌কিমী ও ফিচ্‌লেমীর জ্বালায় ওষ্ঠাগত-প্রাণ, কিন্তু তবুও, এখানেও কেন জানি না, সকল কেরাণীই বাঘাকে প্রীতির চোকে দেখে। যেদিন কোন কারণে বাঘা আফিসে অনুপস্থিত থাকে, সে দিন সকল কেরাণীই বিরসবদনে দিন-যাপন করিতে থাকে, কাহারও কোন কাজ-কর্ম্ম করিতে যেন গা লাগে না। এমন কি চিরমেঘান্ধকার মম-মুখ বুড়া "বুক্-কীপার"-বাবুও বীরেন্‌কে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁ হে, আজ বেন্দাবনের কি হ'য়েচে, সেটা আজ এল না কেন?" তাহাছাড়া কবিতাপ্রিয় কেনারাম-বাবু হঠাৎ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাই তুলিতে তুলিতে সখেদে বলিয়া উঠেন, "তাই তো হে, আজ 'বৃন্দাবনচন্দ্র-বিনা নন্দপুর যে অন্ধকার'!"

এদিকে বীরেন্‌কে আফিসের সকলেই গোবেচারী ভালমানুষ বলিয়া জানে; তাহার হাতের লেখা ভাল, সকলেই সেইজন্য তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে। তবে বাঘা দুষ্ট হইলে কি হয়, ভারি চালাক, খুব কাজের লোক। তাই আফিসের বড়সাহেবপর্য্যন্ত বলেন, "Bose is a smart chap."

তখন "ভুলার খেলা" কলিকাতা-সহর তোলপাড় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আফিসের হরলাল-বাবু একজন পয়লানম্বরের জুয়াড়ী; তাহার স্বভাবে অন্যান্য দোষও আছে। এইজন্য অনেক কেরাণীই তাহাকে একটু ঘৃণা করিয়া থাকে এবং পারতপক্ষে কেহ তাহার কোন সংস্পর্শে আসে না। অল্পদিনহইতে বীরেনের সঙ্গে তাহার কিন্তু বড়ই মাখামাখি ভাব দেখা যাইতেছে; বাঘা ইহা দেখিয়া বীরেন্‌কে টুকিয়াছিল, কিন্তু বীরেনের বাঘার সেই মুরুব্বী-আনা ভাল লাগে নাই, তাই সে সেদিন বাঘার উপরে একটু বিরক্ত হইয়াছিল।

আজ আফিসের টিফিনের সময়ে বাঘা ও বীরেন্ টিফিন-ঘরে বসিয়া টিফিন খাইতেছে, এমন সময়ে হরলালবাবু আসিয়া বলিল, "কি, বাবা মাণিকযোড়, উভয়ে বসিয়া বদন ভরিয়া অদন হচ্ছে কি? আরে ছো! খান-দুই ক'রে হিঙের কচুরী আর একটা ক'রে মতিচুর—মোটের ওপর এক-একগণ্ডার মাম্‌লা? আরে ছো ছো ছো!"

বাঘা। দৈনিক অষ্টগণ্ডার রোজগেরে ক'গণ্ডার টিফিন খেয়ে থাকে, চাঁদ? ফুটানি মা'র্‌ছ, তুমি আজ ক'পয়সার টিফিন খেয়েছ বল তো?

হর। Here you are, sir!

এই বলিয়া হরলালবাবু একখানা Cash Memo বাঘাকে দেখাইল। বাঘা দেখিল, হরলাল Hindu Restaurantহইতে একটাকার টিফিন খাইয়াছে। হাসিয়া বলিল, I see, বেরালের ভাগ্যে আজ শিকে ছিঁড়েছে, কিন্তু কা'র ঘাড় ভেঙেছ, দাদা?

হর। কি, বেরালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে? কারুর ঘাড় ভেঙেছি? আমি কি তেম্‌নি? এই দেখ্, এই দেখ্, আমি তোর মত নই।

এই বলিয়া হরলাল আরও কয়খানা Hindu Restaurantএর Cash Memo দেখাইল।

বাঘা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "হুঁ, তা' হ'লে গাঁটথেকে 'রেস্ত' খসে বটে, কিন্তু কি ক'রে হয়, বাবা? রাস্তায় লোকের গাঁঠ কাট না কি?"

হরলাল হটিবার পাত্র নয়, বলিল, "সোঁদর গাধা কি না, তাই ঐ কথা ব'ল্‌চি'স্‌। গাঁঠ কাট্‌লেই হ'ল আর কি? বাবার বাবা আছে, তা' জানিস?"

বাঘা। তবে কি ক'রে জোটাও, মাইনে তো আমার ডবলের চেয়ে বেশী নয়? স্ত্রী আছে, ছেলে আছে, আরও কত কি আছে।

হর। বাবা, হরলাল কি চিজ, তা' জা'নলে ওকথা ব'লতে না। রূপেয়াসে রূপেয়া খিঁচতা। একটু কারিকুরি ক'রে টাকা খেলা'তে জা'নলে, আর পড়তা মন্দা না হ'লে, একটাকায় লাক-টাকা হয়।

বীরেন্‌ বলিল, "সে কিরকম?"

হর। কেন, রকম তো পড়েই রয়েছে। আজ চারনম্বরে ষোলটাকার "ভাও" রয়েছে, কোন বেটা ও নম্বরে ঘেড়োচ্ছে না, সব দু'নম্বরেই লাগাচ্ছে, কিন্তু, দেখো, উ'ঠবে ঠিক চারনম্বরই। ঐ নম্বরে আজ পাঁচটাকা ঝা'ড়তে পা'রলে, পাঁচষোলম্‌ আশীটাকা কে ঘোচায়?

বাঘা। এই আরম্ভ হ'ল, জুয়াড়ীর জুয়োর কথা। তুলোর খেলাটা তো একটা humbug! যা' হোক, আমরা রাতারাতি বড়-লোক হ'বার কোনই আশা রাখি নে, আমাদের সে বরাতও নয়। তুমি যত ইচ্ছে তুলোর খেলা খেল, দাদা, রোজ Hindu Restaurantএ গিয়ে tiffin খাও, we don't envy your luck.

হর। তোমার দরাজ বরাত, তুমি তো ক'রবেই না! বীরেন্‌, আমি সত্যি ব'ল্‌'চি, আজ ৪নম্বরে পাঁচটাকা লাগালে, অব্যর্থ লেগে যা'বে, ধাঁ ক'রে আশাটে টাকা পকেটে এসে যা'বে। আমি দশটাকা লাগিয়েছি, আমার কথা শোন, তুমিও কিছু লাগাও, আমার কথা একচুল এদিক্‌-ওদিক্‌ হ'বে না। যদি হয়, তুমি আমার নামে একটা কুকুর পুষ।

আজ মাসের ৪ঠা, বীরেন্দ্রের পকেটে ৪৸০ আছে। সে তাহার বেতনহইতে মাসে ৫৲ টাকা আফিসে জল খাইবার নিমিত্ত মার নিকটহইতে পায়। তাহার বেতন অল্প, কিন্তু প্রাণে সাধ অপরিমেয়, সুতরাং জীবনে তাহার একটুও সন্তোষ নাই। সে হরলালকে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে বাঘা বলিয়া উঠিল, "কেন, বাবা, গরীবের বাছার মাথাটী খাচ্ছ? তোমার নামে কুকুর পুষে আমাদের কি লাভ হ'বে? দু'-একটাকা যা' হাতে আছে, তা'ও গেলে, এ মাসে চারপয়সার ক'রে টিফিনও বরাতে জু'টবে না। আর বক্তৃতায় কাজ নেই, আস্তে আস্তে স'রে পড়।"

এমন সময়ে আফিসের বড়বাবু আসিয়া বলিলেন, "বা! বীরেন্‌, বড়-সাহেব তোমাকে ডাক্‌চেন আর তুমি এখানে ব'সে গল্প জুড়ে দিয়েচ?"

ইহা শুনিয়া মসীজীবি-ত্রয় আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া স্ব স্ব আসনে গিয়া বসিল। দ্যূতপ্রসঙ্গ তখন আর অধিক বিকাশ-লাভ করিবার অবকাশ পাইল না।

* * * *

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। আফিসের ছুটী হইয়াছে। বাঘা ও বীরেন্দ্র রোজ যেমন যায়, আজও তেমনই একসঙ্গে বাড়ী চলিয়াছে। আজ হরলাল আবার তাহাদের সঙ্গে জুটিয়াছে। ৫৲ টাকা দিলে, আশীটাকা পাওয়া যাইবে, এই কথা শুনিয়া-অবধি আজ বীরেন্দ্র কোন কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারে নাই, কেবল ঐ কথাই ভাবিয়াছে। এখনও বীরেনের মুখমণ্ডল চিন্তা-মলিন। চতুর হরলাল তাহা দেখিয়া বীরেন্দ্রের উদ্দেশে কহিল, "তা' হ'লে কত টাকা লাগা'বে স্থির ক'রেছ?"

বাঘা। একপয়সাও নয়, জুয়োখেলা আমাদের কুষ্ঠীতে লেখে না। কেন, বাবা, আজ তুমি আমাদের পেছনে লেগেছ?

হর। আরে, তোমাকে কে কি ব'ল্‌'ছে, তুমি ট্যাক্‌ ট্যাক্‌ ক'র্‌'ছ কেন? বীরেন্‌ কি কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খায় নাকি? বীরেনের ওপর ভারি টান, মা বিয়ল না বিয়ল মাসী, ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়া-পড়্‌শী! তুই চেটার পো চেটায় থাক্‌, তোর অত বড়্‌ বড়্‌ ক'রে কি হ'চ্ছে? হচ্ছে আমাতে বীরেনে কথা, উনি মাঝখানথেকে ফোড়ণ দিচ্ছেন!

(পরসংখ্যায় সমাপ্য।)

একখানি চিঠী।

মাননীয় সম্পাদক-মহাশয়—

আপনার ফেব্রুয়ারী মাসের বালকে "বিপদ্‌-বারণ" বলিয়া যে প্রবন্ধটী ছিল উহাতে চক্ষুর বিষয়ে কিছু লেখা ছিল। আমার মনে হয়, এই কথা-কয়টীও থাকিলে ভাল হইত।

(১) চক্ষুতে কিছু পড়িলে রগড়াইবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক এবং এত প্রবল যে, উহাহইতে বিরত থাকা একপ্রকার দুঃসাধ্য। রগড়াইলে একটা অতৃপ্ত আনন্দ পাওয়া যায়, সেকারণে কেহই ইহার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। কিন্তু যদি নির্দ্দোষ চক্ষুটীকে রগড়ান যায়, তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তিও চরিতার্থ হয় এবং এই আনন্দহইতেও বঞ্চিত হইতে হয় না। অথচ রগড়ানর জন্য বিপরীত চক্ষুহইতে জল নির্গত হইতে থাকে বলিয়া পতিত দ্রব্যটী উহার সহিত ধুইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে।

(২) ইহাতে বাহির না হইলে, যদি কেহ নিকটে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখান উচিত। তিনি চক্ষুর তারা, সাদাক্ষেত, উপরের পাতা ও নীচের পাতা দেখিবেন। চক্ষুর উপরপাতা উল্টাইয়া দেখা আবশ্যক, কারণ সময়ে সময়ে পতিত দ্রব্যটী চক্ষুর উপরপাতায় আট্‌কাইয়া থাকে, যদি কিছু থাকে বাহির করিয়া দিবেন। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ছেলেদিগকে চক্ষুর পাতা উল্টাইতে শিখান ভাল।

(৩) কিন্তু যদি কেহ নিকটে না থাকেন, তাহা হইলে উপরপাতাকে নীচের পাতার উপরে টানিয়া মুছিতে হয়। ইহাতে করিয়াও দ্রব্যটী বাহির হইয়া আসিতে পারে।

(৪) তথাপি যদি বাহির না হয় এবং চক্ষু করকর করিতে থাকে, তাহা-হইলে, 'ও কিছু পড়ে নাই, চক্ষু উঠিতেছে,' এইরূপ মনে করিয়া এটা-ওটা দেওয়া উচিত নহে। অবিলম্বে কোন শিক্ষিত চিকিৎসকের নিকটে যাওয়া উচিত। যদি চক্ষু উঠা হয়, তাহা হইলে তিনি শীঘ্র আরামের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আর যদি চক্ষু উঠা না হয়, কোন কিছু পড়িয়া তারাতে (কাল ক্ষেতে) বিঁধিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলেও তিনি বাহির করিয়া দিবেন। কয়লার গুঁড়া বা একপ্রকার পোকার শক্ত কাল ডানা-ভাঙ্গা প্রায়ই এরূপস্থলে দেখা যায়। উহা তারায় বিঁধিয়া থাকিলে সাধারণে দেখিতে পান না বটে, কিন্তু চিকিৎসকেরা সহজেই ধরিতে পারেন ও বাহির করিয়া দেন। এই পোকা এত ক্ষুদ্র যে, সহজে নজরে পড়ে না, কিন্তু কখন কখন বৈকালে বেড়াইতে যাইলে এত জোরে চক্ষুতে আসিয়া পড়ে যে, তাহাতে ইহাদের ডানা ভাঙ্গিয়া বিঁধিয়া যায়। ইতি।

বিনীতা—

শ্রীমতী শান্তিলতা ব্রহ্মচারী।

৩য় বর্ষ।] এপ্রিল, ১৯১৪ [৪র্থ সংখ্যা।

কুড়ানী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বসন্তের আরম্ভে আসাম-দেশের পাহাড়ে বনে, নদীতীরে সকলই প্রফুল্ল, সকলই সুন্দর, সকলই মনোহর। পাহাড়ে, টীলায়, টিকড়ে নানাজাতীয় গাছে নূতন পাতা হইয়াছে ও নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়াছে। নদীর তীরে এক-একস্থানে কাঞ্চন-ফুল এত ফুটিয়াছে যে, দেখিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়। এখানে সেখানে বিল—এদেশে বিল বলে, ফলে কিন্তু এগুলি হ্রদ। এক-এক-হ্রদে পদ্মবন—জল দেখিতে পাওয়া যায় না—শরৎকালে হ্রদময় পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে। দলে দলে বন্য মহিষ এইসকল হ্রদে গ্রীষ্মকালে গিয়া পড়িয়া থাকে। পাহাড়, মাঠ, টীলা ইত্যাদি যেমন বৃক্ষলতাময়, তেমনি প্রাণীময়। ফলে আসাম-দেশে যতপ্রকার উদ্ভিদ ও পশু-পক্ষী, এত ভারতবর্ষের আর কোন অঞ্চলে নাই। বসন্তকালে কোন পাহাড়ে গাছের তলায় গিয়া বসিলে, অসংখ্যপ্রকার ফুল দেখিতে এবং নানাজাতীয় পাখীর গান শুনিতে পাওয়া যায়। উপরে আকাশ ও নীচে বন-জঙ্গল—এ দুই-ই মনোহর, নানা বর্ণে যেন চিত্রিত। এই কারণেই, বোধ হয়, দেশের লোকেরা এই দেশকে "অসম"-দেশ বলে। ফলে ভারতবর্ষে এটী "অসম"-দেশই বটে।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মকাল আসিয়া উপস্থিত। বসন্তে পাহাড়, বন, জঙ্গল সমস্তই ফুলময় ছিল, এক্ষণে সকলই ফলময় হইল। গ্রীষ্মকালে ঈশ্বরের নিয়মমতে শিয়ালদের বাচ্ছা হয়।

মাকে নিরুপায় বাচ্ছাগুলিকে ভালবাসিতে শিখিতে হয় না। বাচ্ছারা ভালবাসা সঙ্গে করিয়া আনে, বেশীও না, কমও না। যথেষ্ট ভালবাসা, খাঁটি ভালবাসা লইয়া আইসে।

কুড়ানীর কয়েকটী বাচ্ছা হইল। কুড়ানী আপন গর্ত্তে তাহাদিগকে লইয়া, নানাপ্রকার স্নেহমাখা খেলা খেলিতে লাগিল। কখনও তাহাদিগকে চাটে, কখনও বা টানিয়া বুকে আনে, আবার কখনও বুকে করিয়া শুইয়া থাকে। এই ভালবাসা, এই স্নেহ কুড়ানীর পক্ষে যেমন, বাচ্ছাগুলির পক্ষেও তেমনি নূতন।

এই স্নেহ-ভালবাসাজনিত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এক মহাভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। রহিয়া রহিয়া কুড়ানীর মনে এই ভাবনা উঠিতে লাগিল, কেমন করিয়া এদের রক্ষা করি; চারিদিকে শত্রু! সন্তান হইবার পূর্ব্বে কুড়ানীকে কেবল নিজের ভাবনাই ভাবিতে হইত। বাচ্ছাকালে যাহা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, বড় হইয়া ঠেকিয়া ঠকিয়া যেসকল শিক্ষা পাইয়াছে, এসকলই এতকাল নিজের প্রাণরক্ষার জন্য খাটাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখন আর নিজের ভাবনা ভাবিবার অবসর নাই—এখন "প্রাণের প্রাণ" সন্তান-দিগের ভাবনায় আকুল। প্রথম ভাবনা, বাচ্ছাগুলি লইয়া যে গর্ত্তে আছে, পাছে বনের আর কোন প্রাণী সেই গর্ত্ত টের পায়। প্রথম প্রথম দিনকতক এ বিষয়ে বেশী ভাবিতে হইল না—কারণ সে নিজে বাচ্ছাগুলিকে লইয়া অষ্টপ্রহর চুপচাপ থাকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা নিতান্ত সহিয়া না থাকিতে পারিলেই দুই-তিন-দিন-অন্তর এক-একবার বাহিরে যায়। গর্ত্তহইতে বাহির হইবার আগে গলা বাড়াইয়া চারদিক্ দেখে, কাছে কোন প্রাণী আছে কি না; আবার শিকার করিয়া বা ঝর্ণার জল-পান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়েও এরূপ করে—পাছে কেহ তাহার সবে-ধন বাচ্ছাদের গর্ত্ত টের পায়। মানুষে শিয়ালকে যে চখে দেখে, শিয়ালের বাচ্ছারা মাকে সে চখে দেখে না বটে, কিন্তু যে যে চখে দেখে, ঠিক দেখে। মানুষে জানে মনুষ্যের মধ্যে নাপিত, পক্ষিগণের মধ্যে কাক, পশুগণের মধ্যে শিয়াল অতি ধূর্ত্ত। পণ্ডিতের বচন না জানিলেও আসামের পাহাড়ী লোকেরাও জানে যে, শিয়াল অতি ধূর্ত্ত, লোভী, নিষ্ঠুর, কেবল ছাগল, মেষ, হাঁস, মুরগী মারিয়া

খায়, আর নানা অনিষ্ট করিয়া দেশময় বেড়ায়। আর বাচ্ছাগুলি জানে যে, তাহাদের মায়ের প্রাণ স্নেহ-ভালবাসায় ভরা—আর মায়ের কোলে থাকিলে, যমেও তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়ের কোল তাহাদের নিরাপদ্, স্নেহপূর্ণ আশ্রয়-স্থান। মা তাহাদিগকে কত আদরে খাওয়ায়, কত যত্নে, কত সাবধানে রক্ষা করে, ক্ষুধা পাইলে, মা তাহাদিগকে অমনি খাইতে দেয়। শত্রুর গন্ধ পাইলেই, নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যায়, আর সাহসে ভর করিয়া কত উপায়ে তাহাদিগকে শিকার করিয়া খাদ্য আনিয়া দেয়।

শিয়ালের কচি বাচ্ছা একতাল মাংসমাত্র—না আছে গড়ন, না আছে জ্ঞানবুদ্ধি—তবে মায়ের আদরের ধন বটে। কিন্তু চক্ষু ফুটিলে, পাগুলি বশে আসিলে, ভাই-ভগিনীদের সঙ্গে গর্ত্তের বাহিরে

আসিয়া খেলিতে আরম্ভ করিলে, মা শিকার মুখে করিয়া আসিয়া যেই এক প্রকার শব্দ করে, অমনি সেই শব্দ শুনিয়া বাচ্ছা-গুলি দৌড়িতে দৌড়িতে, নাচিতে নাচিতে মায়ের কাছে যায়। ফলে তখন শিয়ালের বাচ্ছাদের রঙ্গ-ভঙ্গী দেখিলে তুমি না হাসিয়া থাকিতে পারিবে না। কুড়ানীর বাচ্ছারা যখন এই বয়সের হইল, তখন আর উহাদিগকে আমোদিত করিবার জন্য মাকে উস্কাইয়া দিতে হইল না।

গ্রীষ্মকাল আসিল। কুড়ানীর বাচ্ছারা এখন টাট্‌কা মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কুড়ানী আর কৃষ্ণসার, দুইজনে আপনাদের ও বাচ্ছাদের জন্য শিকার করিয়া আনে। কুড়ানী কোন দিন একটা খরগোশ মারিয়া আনে, কোন দিন বা একটা গোসাপ অথবা ইন্দুর মুখে করিয়া আনে। একদিন অনেক ফিকির করিয়া, একটা জঙ্গলী ছাগলের বাচ্ছা মারিয়া আনিয়া নিজের বাচ্ছাদের দিয়াছিল।

খাওয়া হইয়া গেলে, বাচ্ছাগুলি খানিকক্ষণ গুহাতে রৌদ্রে পীঠ করিয়া মাটীতে পড়িয়া থাকে, বা খেলা করিয়া বেড়ায়। এমন সময়ে কুড়ানী একটু উচ্চ স্থানে পিছনদিকের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া একমনে একদৃষ্টিতে কখনও আকাশপানে, কখনও বা পৃথিবীপানে চাহিয়া দেখে, কোন মারাত্মক শত্রু আপনাদের বাসস্থান দেখিতে পাইতেছে কি না। এদিকে বাচ্ছাগুলি প্রজাপতি দেখিয়া তাড়া করিয়া যায়, বা একটা আর একটাকে তাড়া করিয়া ধরে, বা আপনাদের উচ্ছিষ্ট চামড়া পা-দিয়া ধরিয়া দাঁত-দিয়া ছিঁড়িতে, কিম্বা হাড় ও পালক লইয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। সকলের ছোটটী সদাই মায়ের কাছে কাছে থাকে, কখনও মায়ের গা বহিয়া উঠে, কখনও বা মায়ের লেজ কামড়াইয়া ধরিয়া টানে। ইহাদের খেলা দেখিতে বড় সুন্দর। মাঝখানে যেগুলি হুড়োমুড়ি করিতেছে, প্রথমে সেইগুলির উপরেই চক্ষু পড়ে; কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে, মায়ের দৃশ্যই অধিক মনোহর। ধাড়ীটা একমনে, ধীরভাবে, কোন্ বাচ্ছাটা কি করে, না করে, দেখিতেছে; মুখে একটু ভাবনার ভাবও আছে, কিন্তু তা' থাকি-লেও, মুখখানিতে মাতৃস্নেহ প্রকাশ পাইতেছে। শৃগাল-মাতার মনে না জানি, কত আনন্দ, কত সুখ। সে এইরূপে বসিয়া, শাবকদের ভাব-ভঙ্গী দেখে, তাহাতে তাহার প্রাণে ভালবাসা

যেন উথলিয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে গর্ত্তে যাইবার সময় হইলে, বা কোনপ্রকার বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে, একপ্রকার ঘড়-ঘড়-শব্দ করে। শব্দ করিবামাত্র বাচ্ছাগুলি গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়ে। পরে কোথায় কি বিপদের আশঙ্কা, তাহা দেখিতে ও শত্রুর ফন্দী ব্যর্থ করিতে চলিয়া যায়।

মণিরাম টাকা-উপার্জ্জন করিয়া বড়মানুষ হইবার জন্য ঢের ফিকির খাটাইল, কিন্তু যাহা করিতে যায়, তাহাতেই খাটিতে হয়, কাজেই সেটা ছাড়িয়া দিয়া আর একটা ধরে। মণিরামের মত প্রকৃতির অনেক লোকেই কখন-না-কখনও মনে করে, রাজহাঁস পুষিলে বিস্তর লাভ। ভাবে ইহাতে পরিশ্রম নাই, হাঁসেরা বনের ঘাস আর নদীর মাছ খাইবে, আমাদিগকে কুটাগাছটীও নাড়িতে হইবে না। মণিরাম হঠাৎ গোটাকতক টাকা পাইল। অবশেষে, সাত-পাঁচ না ভাবিয়াই, সেই টাকা-দিয়া গোটা-বারো রাজহাঁস কিনিয়া আনিল। আপনার কুটীরের গায়ে চালা তুলিয়া হাঁসগুলি রাখিল। ভারী যত্ন, দিনকতক হাঁস লইয়াই ব্যস্ত। সেগুলিকে কখনও মাঠে লইয়া যায়, কখনও নদীতে ছাড়িয়া দেয়, আবার তাড়াইয়া বাড়ী লইয়া আইসে। শীঘ্রই মণিরামের সখ মিটিল— এখন বিরক্তি-বোধ হইল, হাঁস-দেখা-শুনা আর ভাল লাগিল না। আবার সে আগেকার মত এগ্রামে, সেগ্রামে গিয়া নানাস্থানে পরের বাড়ীতে অন্নধ্বংস করিতে, আর পাহাড়ের গায়ে গাছতলায় বসিয়া, বা শুইয়া তামাকের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল। মণিরাম প্রায় বাড়ী থাকে না। কাজেই হাঁসগুলি অরক্ষক অবস্থায় রহিল। আপনারাই মাঠে ঘাস খায়, নদীতে চরে—আপনারাই ঘরে আইসে। মণিরাম দুই-চারি-দিন পরে এক-একবার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখে, হাঁস কমিয়া গিয়াছে, অবশেষে সবগুলি গেল, কেবল একটা বুড়া হাঁস রহিল।

এতগুলি হাঁস যে গেল, সেজন্য মণিরামের দুঃখ নাই। শিয়ালে বা নেকড়ে-বাঘে হাঁস খাইয়াছে, তাই নেকড়ে-বাঘ ও শিয়ালের উপর তাহার বিষম রাগ হইল।

মণিছড়া ও আর কয়েক চা বাগানের সাহেবেরা মিলিয়া মণিরামকে উদ্ধারন্দ-অঞ্চলে চিতা বাঘ, শিয়াল ইত্যাদি হিংস্র জন্তু মারিবার কাজে নিযুক্ত করিল। তাহাকে বিষ, যাঁতি-কল, ফাঁদ ও ঘোড়া দেওয়া হইল। সরকারি বক্‌শিশ্ ত সে পাইবেই, তাহাছাড়া গ্রামের লোকেরা তাহাকে কিছু কিছু ধান দিবে। মণিরামের উপর লোকের ষোল-আনা বিশ্বাস থাকিলে, মাসে মাসে সে অল্পবিস্তর বেতনও পাইত; কিন্তু লোকের বিশ্বাস হইল না।

যাহারা এই কাজ করিয়া খায়, তাহারা বেশ জানে যে, বৎসরের কয়েকটী বিশেষ সময়ে শিকারে বাহির হইতে হয়।

শীতের শেষে ও বসন্তের আরম্ভে যখন বিড়ালজাতীয় পশুদের "লগ্নসার," তখন বাঘা-কুকুরেরা মাদী নেকড়ে-বাঘ কোনমতে মারে না। এই সময়ে কুকুরেরা মদ্দা নেকড়ে তাড়া না করিয়া মাদী নেকড়ে তাড়া করিয়া যায় বটে, কিন্তু ধরিয়া ফেলিলে, একটু আলাপের পর বেচারীকে চলিয়া যাইতে দেয়। বর্ষাকালে শিয়াল ও নেকড়ের বাচ্ছারা মাকে ছাড়িয়া একা একা বেড়াইতে আরম্ভ করে। শিকারীরা এইগুলিকে এই সময়ে সহজে ফাঁদ পাতিয়া ধরিতে ও বিষ খাওয়াইয়া মারিতে থাকে। যেগুলি ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া থাকে, মাসখানিক পরে সেগুলি ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া, আপনাদিগকে বাঁচাইয়া চলিতে সমর্থ হয়। কিন্তু শিকারীরা জানে যে, গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বদরপুর-পাহাড়ের সর্ব্বত্র শিয়াল ও নেকড়ের গর্ত্তে বিস্তর বাচ্ছা থাকে। এক-একটা গর্ত্তে পাঁচটা-হইতে পনেরটাপর্য্যন্ত বাচ্ছা থাকে। কিন্তু গর্ত্ত খুঁজিয়া বাহির করা বিষম সমস্যা।

শিকারীরা কোন উচ্চ টীলায় বসিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখে, শিয়ালেরা বাচ্ছাদের জন্য শিকার মুখে করিয়া কোন্ দিকে যায়। এ কাজে দৌড়-ধাপ নাই; কেবল গাছতলায় হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকা। তাই কাজটী মণিরামের মনের মত হইল। মণিছড়া-বাগানের বড়সাহেব মণিরামকে এক দূরবীক্ষণ (দুরবীণ) দিয়াছিলেন। এক্ষণে মণিরাম সেই দূরবীক্ষণ চখে দিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া শিয়ালের গর্ত্ত খুঁজিতে রোজ বাহির হয়। সে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে অন্নধ্বংস করিয়া, পাহাড়ের গায়ে কোন গাছ-তলায় বসিয়া হুঁকা টানিতে থাকে, টানিতে টানিতে আলস্য-বোধ হইলে, একআঁঠি খড় মাথায় দিয়া শুইয়া, নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে থাকে। যখন ঘুম আর হয় না, তখন নাপর্য্যমানে দূরবীক্ষণ চখে দিয়া এদিক্-ওদিক্ তাকাইতে থাকে।

শিয়ালেরা ঠেকিয়া শিখিয়াছে, পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন জায়গা দিয়া যাওয়া-আসা করিলে বিপদে পড়িতে হয়, তাই বেত ও কাওলা-বনের ভিতর দিয়াই যাওয়া-আসা করে; কিন্তু সকল সময়ে তা' ঘটিয়া উঠে না। একদিন হরিটিকড়-পাহাড়ের ঢালুতে বসিয়া মণিরাম দুরবীণ চখে দিয়া পশ্চিমদিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, কৃষ্ণবর্ণ একটা কিছু যেন পাহাড়ের গা বহিয়া যাইতেছে। ফলতঃ প্রাণীটা মেটে-বর্ণ। লেজ নামান, মণিরাম জানিত, শিয়ালের লক্ষণ, এটা যদি নেকড়ে হইত, তবে লেজ খাড়া থাকিত। খ্যাঁকশিয়াল হইলে, কান-দুইটা বড় বড়, খাড়া, লেজ লম্বা ও ঝাঁকরাল, আর হরিদ্রাবর্ণ হইত। হরিণ হইলে, গলা লম্বা হইত, মাথায় শিং থাকিত, এবং আকারে একটু বড় হইত। মণিরাম আরও দেখিল, প্রাণীটার মুখে কালোপানা কিছু আছে—হয় ত শিকার করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছে। তবে উহার গর্ত্তে বাচ্ছাও আছে।

মণিরাম স্থানটী বেশ করিয়া চিনিয়া রাখিল। পরদিন আসিয়া, শিয়ালকে যেখানে দিয়া শিকার মুখে করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল,

তাহারই নিকটে একটু উচ্চ স্থানে বসিয়া দেখিতে লাগিল। সমস্ত দিন গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। পরদিন আসিয়া, বসিয়া থাকিতে থাকিতে, দেখিতে পাইল, একটা প্রকাণ্ড শিয়াল একটা বড় পাখী মুখে করিয়া যাইতেছে। বলিয়া রাখি, এটা আমাদের কুড়ানীর কৃষ্ণসার। দুরবীণ চখে দিয়া বেশ দেখিতে পাইল যে, শিয়ালের মুখের পাখীটা রাজহাঁস। তখন মণিরাম ভাবিল, তবে ত আমার হাঁসের চালা-ঘর একেবারে খালি। বাকি হাঁসগুলি কাহার পেটে গিয়াছে, তাহাও মণিরামের বুঝিতে বাকি রহিল না। রাগে কটমট্ করিয়া দিব্য করিল, এর গর্ত্তে যদি একটাকেও জীয়ন্ত রাখি, তবে আমি রাজবংশীর "পোলাই" নহি। কৃষ্ণসার যেদিকে গেল, মণিরাম একদৃষ্টিতে যতদুর পারিল, লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কিন্তু বেশী দূর নহে। পরে যেখানে কৃষ্ণসারকে প্রথম দেখিয়াছিল, সেইখানে গিয়া কোন্‌দিকে শিয়ালটা গিয়াছে, ঠাওর করিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু কোনপ্রকার চিহ্ন চখে পড়িল না। আর যে গহ্বরে কুড়ানীর বাচ্ছারা খেলা করিত, সে গহ্বরও দেখিতে পাইল না।

এদিকে কৃষ্ণসার গহ্বরে গর্ত্তের নিকটে আসিল, আসিয়া, একপ্রকার কোঁ-কাঁ-শব্দ করিল। ডাক শুনিয়া বাচ্ছাগুলি তাড়াতাড়ি, জড়াজড়ি করিয়া—ঘণ্টা বাজিলে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিতে লোকে যেমন করিয়া যায়—গর্ত্তহইতে বাহির হইল। হইয়াই রাজহাঁসটাকে টানা-টানি, কামড়া-কামড়ি আরম্ভ করিয়া দিল। অবশেষে সেটাকে ছিঁড়িয়া, এক-একটা বাচ্ছা এক-এক-টুক্‌রা লইয়া একপাশে গেল এবং খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। আর একটাকে কাছে আসিতে দেখিয়াই দাঁত বাহির করিয়া সেটাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। যে বাচ্ছাগুলি হাঁসের নরম অংশের টুক্‌রা পাইয়াছিল, সেগুলির ভাল ভোজন হইল। কিন্তু তিনটা বাচ্ছা বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই—তাহারা হাঁসটার বাকিটুকু লইয়া তুমুল সংগ্রাম—কাড়া-কাড়ি করিতে লাগিল। ইহাতে এই হইল যে, কেহই বেশি কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। কুড়ানী এই দেখিয়া আসিয়া পড়িল এবং রাজহাঁসটার যেটুকু বাকি ছিল, তাহা তিন-চারি টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। তখন এক-একজনে এক-এক-টুক্‌রা লইয়া, একবার মাটীতে ফেলিতে, পা-দিয়া চাপিয়া ধরিতে, আবার মুখে তুলিয়া ওষ্ঠ বাঁকাইয়া মাড়িতে ফেলিয়া চিবাইতে ও নানা রঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া উদরস্থ করিতে লাগিল। এদিকে সকলের ছোট বাচ্ছাটা হাঁসের গলাসমেত মাথাটা মুখে করিয়া সগর্ব্বে গর্ত্তে গেল।

(ক্রমশঃ।)

সেকেলে ডাক্তার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ডাক্তার ম্যাক্‌লিওরের একবার পা ভাঙিয়া যায়, তখন তিনি দুইমাস শয্যাগত ছিলেন; সে সময়ে ড্রামটথ্‌টির লোকদের কিল্‌-ড্রামির ডাক্তারের হাতে পড়িতে হইয়াছিল; তখন যে তাহাদের কি অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল, তাহা তাহাদের বেশ মনে আছে। চল্লিশবৎসর-যাবৎ একনাগাড়ে খাটিয়া ম্যাক্‌লিওরের যে স্বাস্থ্যহানি হয় নাই, তাহা বলিলে, সত্য কথা বলা হইবে না। তবে তিনি কখন তাঁহার নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা কাহাকেও জানাইতে বা বলিতে ভালবাসিতেন না।

ইদানীং সকলেই অনুভব করিতে লাগিল যে, ম্যাক্‌লিওরের সেই যৌবনের উৎসাহ বা বল আর যেন নাই; তিনি যেন ক্রমশঃ রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। আহা, অমন ডাক্তার আর হইবে না! ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি কেমন ভুলাইতে পারেন, স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা করিবার সময়ে তিনি কেমন কোমল হন। ড্রামটথ্‌টির লোকদের ম্যাক্‌লিওর-বিহনে কেমন করিয়া চলিবে? কিন্তু চল্লিশবৎসর-যাবৎ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করার পর, তাঁহার অবশ্যই কিছুদিন বিশ্রাম করার প্রয়োজন হইয়াছে। ড্রামসুক্ তাঁহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পুরাণো বন্ধুতার খাতিরে ম্যাক্‌লিওর কি তাহার সঙ্গে যাইবেন না? ডাক্তার কহিলেন,—"না, না, ড্রামসুক্, চল্লিশবৎসর অবিশ্রাম খেটেছি, শেষ বয়সে ছুটী নিয়ে দুর্নাম কিনি কেন?

তুমি আমার শরীরের অবস্থা বু'ঝ্‌তেই পা'র্‌ছ—চিরবিশ্রামের আর আমার দেরী নেই, সে সুখথেকে আমি বঞ্চিত হ'তে চাই না, বরং তা'রই জন্যে আমি এখন লালায়িত হ'য়ে রয়েছি।"

শরৎকাল কাটিয়া গিয়া আবার শীতকাল আসিল। উপত্যকার লোকেরা দেখিল যে, ডাক্তারের মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার আচরণের সমস্ত রূঢ়তা বিদূরিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা সকলে একপরামর্শ হইয়া তাঁহার সেবায় মন দিল। অ্যানী মিচেল তাঁহার নিমিত্ত একটী প্রকাণ্ড গলাবন্ধ বুনিয়া দিল। অ্যানীর খাতিরে ডাক্তার তাহা একদিনমাত্র অতিকষ্টে পরিয়া থাকিয়া পরদিন বসিবার ঘরের প্রাচীর-সজ্জাস্বরূপে তাহা সেই ঘরের দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখিলেন। হিলক্‌স প্রায়ই তাঁহাকে কিছু-না-কিছু উষ্ণ পানীয় পাঠাইয়া দিত, আর একদিন ঝড়ের সময়ে ঝড় না থামা-পর্য্যন্ত তাঁহাকে তাহার গৃহমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিল।

ম্যাক্‌লিওর ধীরে ধীরে লোকদের মনোভাব বুঝিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন জেমি বলিয়া একজন বন্ধুর কাছে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলেন,—"লোকগুলোর কি হ'য়েছে ব'ল্‌তে পার? এখন তা'রা প্রায়ই আমাকে মুড়িসুড়ি দিয়ে থা'কৃতে, আর বৃষ্টি-বাদলায় ঘরে থা'কৃতে ব'ল্‌ছে; এমন হপ্তা যায় না, যে হপ্তায় তা'রা কিছু-না-কিছু উপহার না পাঠায়; ভারি লজ্জায় পড়েছি আমি।"

"কি হয়েচে শুন্‌তে চাও, ডাক্তার? তুমি চিরটা কাল আমাদের কাছথেকে ফি নিয়ে তোমার পেট মোটা ক'রেছ; অবলা স্ত্রীলোকদের দিকেও চেয়ে দেখ নি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পিতৃমাতৃহীন ক'রেছ। এখন তোমার সব বিদ্যে ধরা পড়েছে; তাই লোকগুলো এখন শোধ নিচ্ছে; বু'ঝ্‌তে পেরেছ কথাটা?"

ম্যাক্‌লিওর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"গরীব-দুঃখীদের আমি অতি অল্পই উপকার কর্ত্তে পেরেছি। জেমি, তোমার মন ভাল, তাই তুমি অমন কথা ব'ল্‌ছ।"

* * * *

সেদিন ডিসেম্বর-মাসের এক কন্‌কনে ঠাণ্ডা রবিবার। ম্যাক্‌লিওরের বৃদ্ধা দাসী গিয়া ড্রাম্‌সুক্‌কে সংবাদ দিল যে, ডাক্তার আর উঠিতে পারিতেছেন না, তাই আজ বৈকালে তাহাকে ডাকিয়াছেন।

শুনিয়া হিলক্‌স কেমন একভাবে মাথা নাড়িল। ড্রাম্‌সুক্

গির্জ্জায় চাঁদা তুলিতে তুলিতে চারিটা বেঞ্চ মনের ভুলে বাদ দিয়া গেল। জেমি এমনই রুদ্রমূর্ত্তি ধরিল যে, কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখে যায়!

দাসী জেনেট ঘরে একটা অব্যবহৃত চুল্লীতে আগুন দিয়াছে। জানালায় একটা র‍্যাপার টাঙাইয়াছে; কিন্তু ঘরটীতে আসবাব-পত্র কিছু নাই—ফাঁকা ঘর, ভয়ানক শীত পড়িয়াছে, ড্রাম্‌সুক্ যখন সেই ঘরে ঢুকিল, তখন তাহার মনে হইল, যেন একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা আসিয়া তাহার বুকে লাগিল।

ডাক্তার এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, দেখিলে দুঃখ হয়, তিনি তাঁহার মাথাপর্য্যন্ত তুলিতে পারিতেছেন না, তবু আগন্তুককে দেখিয়া তাঁহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তাহার দক্ষিণ হস্তটি বাহির করিয়া ড্রাম্‌সুকের করমর্দ্দন করিলেন, সে হস্ত এখন আর ইতরশ্রেণীর লোকের মত নহে, ভদ্রশ্রেণীর লোকের হাতের মত বেশ শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে।

"এস, ব'স, ড্রাম্‌সুক্। এই দুর্দ্দিনে তোমাকে কষ্ট দিলুম; কিন্তু তুমি বোধ হয় কিছু মনে ক'র্‌বে না।

কাল রাতের আগেপর্য্যন্ত আমি আমার অবস্থাসম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জা'ন্‌তে পারি নি; তার পরে বু'ঝ্‌তে পারলুম, আর বড় দেরী নাই, তাই আজ সকালথেকেই তোমাকে দে'খ্‌বার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েচি।

ছেলেবেলা আমরা একস্কুলে একসঙ্গে পড়েচি। তাই আমি চাই, আমার জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তটাতেও তুমি আমার সঙ্গে থাক। পুরাণো বন্ধুতার খাতিরে তুমি আজ রাতে এখেনে থা'ক্‌বে, প্যাট্রিক?"

ড্রাম্‌সুক্ বড় বিচলিত হইয়া উঠিল। ডাক্তারকে তাহার আদ্য নাম-উচ্চারণ করিতে শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মায়ের পরলোকগমনের পর সে আর কখন কাহারও মুখে তাহার আদ্য-নাম শুনে নাই। আজ তাহার তাই মনে হইল, কে বুঝি তাহাকে পরজগৎহইতে ডাকিতেছে।

"উইলাম, তোমার মুখে তোমার মৃত্যুর কথা শোনা আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টকর। আমি সহ্য ক'র্‌তে পারি নে। মিউর টাউনের ডাক্তারকে ডাকা যা'ক্, তা' হ'লে তুমি শিগ্‌গিরই ভাল হ'য়ে উ'ঠ্‌বে।

তোমার নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক অসুখ হয় নি। অনেক দিনযাবৎ হাড়ভাঙা মেহনৎ ক'রেছ, তাই একটু বিশ্রামের দরকার হ'য়েছে। উইলাম, আমাদের তুমি ছেড়ে চলেছ—এ কথা ব'ল না। ড্রাম্‌টথ্‌টিতে তোমাবিহনে আমাদের একদিনও চ'ল্‌বে না।"—এই বলিয়া ড্রাম্‌সুক্ ডাক্তারের দিকে সতৃষ্ণ-লোচনে চাহিয়া রহিল।

"না, না, প্যাট্রিক্, এখন আর কোন আশা নেই; ডাক্তার ডাকবার সময় আর নেই। ডাক যে পড়েছে, তা'তে আর কোন ভুল-চুক নেই—কাল রাতে ডাকটা শুনেছি। অপর লোকের জন্যে আমি চল্লিশবৎসর মৃত্যুর সঙ্গে যুঝেছি, এখন আমার নিজের সময় এসেছে।

উল্লেখযোগ্য কোন কষ্টই আমার হচ্ছে না। আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল, এখন একটু শ্লৈষ্মিক জ্বর হ'য়েছে। কিন্তু আমার শরীর ক্ষয় হ'য়ে পড়েছে, প্যাট্রিক্; ঐ হচ্ছে আমার আসল কসুর, ও আর ভাল হ'বে না।"

ড্রাম্‌সুক্ চুল্লীর কাছে গিয়া খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, আগুন খোঁচাইতে লাগিল। ধোঁয়া লাগাতে নাক-চোকদিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। পুরুষমানুষ কিনা, কাঁদিতে লজ্জিত হইতেছে!

ডাক্তার বলিলেন,—"তোমার সময় হ'লে, আমি তোমাকে দুই-একটি কথা ব'ল্‌তে চাই। যতক্ষণ মাথাটা পরিষ্কার থা'ক্‌বে, ততক্ষণ ব'ল্‌তে পা'র্‌ব।

আমি টাকা-কড়ির হিসেব-পত্র রা'খ্‌তুম না, আমার স্মরণ-শক্তি ভাল ছিল। সেইজন্যে আমি ম'রে গেলে, কাউকে কোন দেনার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হ'বে না। তোমাকেও হিসেব-পত্র কিছুই ক'র্‌তে হ'বে না।

কিন্তু ড্রাম্‌টথ্‌টির লোকেরা বড় সৎ। কেউ কেউ হয় তো তোমাকে টাকা দিতে আ'স্‌বে। তুমি তখন তা'দের আমার মনের ইচ্ছে জানিও। যদি কোন গরীব লোক টাকা দিতে আসে, তা'লে তা'কে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে এই বুড়ো ডাক্তারকে মনে রা'খ্‌বার জন্যে সেই টাকা-দিয়ে কিছু একটা দরকারী জিনিস কি'ন্‌তে ব'ল। যদি কোন বড়লোক টাকা দিতে আসে, তা'লে আদ্ধেক টাকা নিও, আর যখন কোন গরীব লোকের অসুখ ক'র্‌বে, তখন সেই টাকা-দিয়ে তা'র চিকিৎসা করিও।"

"তার জন্যে ভেবো না, উইলাম। সেই একশো টাকা এখনও আছে, সে টাকাটার যা'তে সদ্ব্যবহার হয়, তা' আমি দে'খ্‌ব।

তোমাতে আমাতে একবার একটী সৎকাজ ক'রবার সুযোগ পেয়েছিলুম, তুমি সে রাতের কথা ভোল নি বোধ হয়? আর তোমার সেই নাচের কথাটাও অবশ্য মনে আছে।"—শুনিয়া ডাক্তারের চক্ষু একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সেই মহাজয়ের কথা-স্মরণ করিয়া ড্রামসুক্ কিছু আত্মসম্বরণ করিতে সমর্থ হইল।

"তুমি না থা'ক্‌লে, আমাদের কি হ'বে ডাক্তার? অন্য ডাক্তারদের সঙ্গে আমাদের ভাল ব'ন্‌বে না—তা'রা আমাদের ধাতই বু'ঝ্‌তে পারে না।"

"যা হচ্ছে, ভালই হচ্ছে, প্যাট্রিক্; অল্পদিনেই তুমি তা' বু'ঝ্‌তে পা'র্‌বে। আমি স্পষ্ট দে'খ্‌তে পাচ্ছি, আমার সেকাল আর নাই, এখন তোমাদের একজন জোয়ান ডাক্তারের দরকার।

নতুন নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতি, যতদূর পা'র্‌তুম, জা'ন্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তুম, কিন্তু আমার বই প'ড়বার বড় সময় ছিল না, ভ্রমণের সময় তো একটুও ছিল না।

সেকেলে ডাক্তারদের ভেতর আমিই শেষ। সহুরে ডাক্তারদের মত আমি তত কেতাদুরস্ত, সভ্যভব্য ছিলুম না। তোমরা আমার বেয়াদবী ধ'র্‌তে না—আমার বিদ্যাসাধ্যের কথাও তু'লতে না। তোমরা বরাবর আমার ওপর সদয় ছিলে, আমার সম্বন্ধে বড় বিবেচনা ক'র্‌তে।"

ড্রাম্‌সুক্‌ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল,—"উইলাম, তুমি অমন সব কথা আর ব'ল না, ব'ল্‌লে, আমি এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যা'ব, আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পাচ্ছি না।"

"আমি সত্যি কথাই ব'ল্‌ছি, প্যাট্রিক; কিন্তু আমার সময় ফুরিয়ে আ'স্‌ছে—কাজের কথা বলি।

জেনেটের যদি কিছু আসবাব দরকার হয়, দিও। আর বাকী সব জিনিস বিক্রী ক'রে অন্ত্যেষ্টির খরচ চালিও। নতুন ডাক্তার যে আ'স্‌বে, সে যদি তেমন বড়লোক না হয়, তা'কে আমার যন্ত্র-পাতি আর বইগুলো দিও।

কিন্তু জেসকে বিক্রী ক'র' না। বেচারা বিশ্বস্তভাবে চিরটা কাল আমায় পিঠে ক'রে বয়েছে—সে আমার সখীর মত। দেরাজে দুই-একটা নোট দে'খ্‌তে পা'বে, যে তা'কে যতদিন না সে আমার অনুগামিনী হয় ততদিন একটু দানা-পানী আর আশ্রয় দিতে রাজি হ'বে, তা'কে দিও।"

ড্রাম্‌সুক্‌ বলিয়া উঠিল,—"কি ব'ল্‌ছ, ডাক্তার? আমাকে এরকম কোন কথা বলা তোমার নিষ্ঠুরতা। ড্রাম্‌সুকে ছাড়া জেস আর কোথায় যা'বে? যতদিন সে বাঁ'চ্‌বে, সেইখানেই দানাপানি পা'বে। আর কেউ তা'র ওপরে চ'ড়্‌লে, উপত্যকার লোকে তা সইবে কেন? তোমার বুড়ী ঘুড়ীকে কেউই ছোঁবে না।"

"তুমি কিছু মনে ক'র না, প্যাট্রিক; তুমি যে ঐ কথা ব'ল্‌বে, আমি তা' আশাই করেছিলুম।

যা' হোক আমার যা' ব'ল্‌বার, বলেছি। বাকী যা' ক'র্‌বার আছে, তা' তুমি নিজেই ক'র। আমার আত্মীয়-কুটুম্ব কেউ নেই, তোমরাই আমাকে কবর দিও।

আমার চোক বুজে আ'স্‌ছে। বেশীক্ষণ আমি আর তোমার কথা বু'ঝ্‌তে পা'র্‌ব না। তুমি শাস্ত্রথেকে একটু পড়।

দেরাজের মধ্যে তুমি আমার মায়ের ধর্ম্ম-পুস্তকখানি পা'বে। কিন্তু তোমাকে আমার খুব কাছে এসে প'ড়্‌তে হ'বে। এখন আমি, তুমি যখন এসেছিলে, তখনকার মত দে'খ্‌তে শু'ন্‌তে পাচ্ছি না।"

ড্রাম্‌সুক্‌ চোকে চস্‌মা দিয়া শাস্ত্রের একটি সান্ত্বনাপ্রদ অংশ-পাঠ করিতে লাগিল। বাতির আলোক তাহার কম্পিত হাতের ও ডাক্তারের মুখের উপর পড়িতে লাগিল। সেই মুখে এখন মৃত্যুচ্ছায়া ক্রমশঃ নিবিড়তর হইতেছিল।

শাস্ত্রপাঠ হইলে ডাক্তার কহিলেন,—"প্যাট্রিক, একটু প্রার্থনা ক'রতে পার?"

ড্রামসুক্‌ প্রার্থনা করিতে তত পটু নহে, বলিল, "পাদ্রীসাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইব?"

"না, তার সময় নাই, তুমি যা' পার একটু প্রার্থনা কর। স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের ত্রুটি সেরে নেবেন।"

ড্রাম্‌সুক্‌ হাঁটু গাড়িয়া এই প্রার্থনাটি করিল—

"সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর! তুমি উইলাম ম্যাক্‌লিওরের কঠিন বিচার করিও না, সে ড্রাম্‌টথ্‌টির কাহারই উপর কঠিন হয় নাই। সে এই চল্লিশবৎসর আমাদের উপর সদয় ব্যবহার করিয়াছে, তুমিও তেমনি তাহার উপরে সদয় হইও। যদি সে কোন অন্যায় করিয়া থাকে, ক্ষমা করিও, তাহার দোষের কথা তাহার কাছে তুলিও না। যে সমস্ত লোকদের সে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের তুমি মনে রাখিও—সেই সব স্ত্রীলোকদের, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। তাহাকে তুমি সাদরে তাহার নিজগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইও, কারণ সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের পর এখন তাহার সেইখানে গিয়া বিশ্রাম করিবার বড় দরকার হইয়াছে।"

"তোমায় ধন্যবাদ করি, প্যাট্রিক। বন্ধু, তবে, নমস্কার। তোমার হাত দাও, এর পরে আর তোমায় হয়ত চি'ন্‌তে পা'র্‌ব না।"

ছেলেবেলা মায়ের কাছে ডাক্তার একটি প্রার্থনা শিখিয়াছিলেন, এখন সেইটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"আজি যামিনীতে আরাম লভিতে
করিনু শয়ন, প্রভু!
এ ঘোর আঁধারে এ মোর আত্মারে
করিও রক্ষণ, প্রভু!
না মেলিতে আঁখি যদি প্রাণপাখী
করে পলায়ন, প্রভু!
আত্মায় আমার চরণে তোমার
দিও গো শরণ, প্রভু!"

ঐ ছন্দোময়ী প্রার্থনাটি আবৃত্তি করিতে করিতে ডাক্তার ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি ড্রাম্‌টথ্‌টির লোকদের বিপদে সাহায্য করিতে যাইতেছেন।

ড্রামসুক্‌ তাহার বন্ধুর হাত ধরিয়া বসিয়াছিল। ডাক্তার মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে ড্রাম্‌সুকের হাত জোরে টিপিয়া ধরিতেছিলেন। ড্রামসুক্‌ তাঁহার প্রতি তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে দেখিতে পাইল যে, তাঁহার মুখের ভাব ক্রমশঃ বদলাইয়া যাইতেছে। ক্রমে তাঁহার মুখের ক্লান্তি-রেখাগুলি অপসৃত হইল, যেন ঈশ্বর তাঁহার মুখের উপর হাত বুলাইয়া সেই রেখাগুলি মুছিয়া দিলেন, এবং তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুর্দ্বয়ে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের শান্তি আসিয়া আসন পাতিল।

এখন তিনি তাঁহার পরিণত বয়সের শ্রমকষ্টগুলি ভুলিয়া গেলেন। তিনি যেন পুনরায় তাঁহার বাল্যজীবনে ফিরিয়া গেলেন। তিনি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—"ঈশ্বর আমার পালক,

আমার অভাব হইবে না।" এইরূপ আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি শেষ-পদপর্য্যন্ত পঁহুছিলেন, তাহার পর তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—" 'অবশ্য মঙ্গল ও দয়াই যাবজ্জীবন প্রতিদিন আমার অনুচর হইবে' "।

"'অনুচর হইবে······আর······আর'······তা'র পরে কি? মা বলেছিলেন, তাঁ'র আ'স্বার আগেথেকে আমাকে প্রস্তুত হ'য়ে থা'ক্‌তে হ'বে।

'উলী, তুমি ঘুমুতে যা'বার আগে আমি আ'স্‌ব, কিন্তু তুমি গীতটী শেষ না ক'র্‌লে, আমি তোমায় চুমো দেব না।' 'আর আমি ঈশ্বরের গৃহে চিরকাল'—তা'র পরের কথাটা মনে প'ড়্‌ছে না—'চিরকাল, চিরকাল—'

এখন বড় অন্ধকার হ'য়ে প'ড়েছে, কিছু পড়া যাচ্চে না, মা এক্ষুণি আ'স্‌বেন।"

ড্রাম্‌গুক্‌ অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিল, "উইলাম্‌, 'বসতি করিব'।"

"হাঁ, হয়েচে, এইবার হয়েচে; কে ব'ল্‌লে?—

'আর আমি ঈশ্বরের গৃহে চিরকাল বসতি করিব।'

এখন আমি প্রস্তুত হয়েছি। এখন মা এলে, তাঁ'র চুমো পা'ব। তিনি আ'স্‌ছেন না কেন? আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, ঘুমুতে চাই।

ঐ তাঁ'র পায়ের আওয়াজ পাচ্চি···তিনি একটী বাতি হাতে ক'রে আ'স্‌চেন; আমি দরজা ফুঁ'ড়ে দে'খ্‌তে পাচ্চি।

মা, তুমি তবে তোমার ছেলেকে ভুলে যাও নি। তুমি আ'স্‌বে ব'লে প্রতিজ্ঞে ক'রে গিয়েছিলে, আমি গীত ত শেষ ক'রেছি। 'আর আমি ঈশ্বরের গৃহে চিরকাল বসতি করিব।'

চুমো দেও মা! আমি এতক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেম, বড় ঘুম পা'চ্চে, এক্ষুণি ঘুমিয়ে প'ড়্‌ব।"

ড্রাম্‌গুক্‌ তখনও তাহার বন্ধুর শীতল হস্তটী ধরিয়া আছে, এমন সময় উষার ধুসর আলোক তাহার উপরে আসিয়া পড়িল। সে তখন একটী নির্ব্বাপিত চুল্লীর প্রতি তাকাইয়া ছিল, কিন্তু তখন ডাক্তারের মুখমণ্ডলের উপর শান্তির যে স্নিগ্ধ রশ্মিটুকু প্রতিভাত হইতেছিল, তাহা যে শ্রমান্তে বিশ্রাম করিতে থাকে, কেবল তাহারই মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ হয়।

সমাপ্ত।

বৃত্তি-বিদ্বেষ

তুচ্ছকারণে বা অকারণে মানুষ যেমন মানুষকে ঘৃণা করে, এমন বোধ করি, আর কোন জীব করে না। পরের অবস্থাটা বুঝিবার মত আমাদের যদি সহৃদয়তা ও সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই মনুষ্য হইয়া সহমনুষ্যকে ঘৃণা করিতে পারিতাম না। মেথর, ধাওড়, মুর্দ্দাফরাস, হাড়ি, ডোম, ছুতার, কামার, কুমার, তাঁতি, ধোবা, নাপিত প্রভৃতি লোকেরা সমাজের যে কি হিতসাধন করে, তাহা যদি আমরা একটু স্থিরবুদ্ধিতে ভাবিয়া দেখিতাম, তাহা হইলে তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে হৃদয়ের কাছে টানিয়া লইতাম!

মেথর না থাকিলে, মলমূত্রের দুর্গন্ধে আমাদের অন্নপ্রাশনের অন্নপর্য্যন্ত উঠিয়া আসিত; ধাওড় না থাকিলে, আমাদের পথ-ঘাট ও পয়োনালীগুলি আবর্জ্জনা ও পঙ্কময় হইয়া উঠিত; মুর্দ্দাফরাস না থাকিলে, আমাদের মৃতদেহগুলির সংকার হইত না; হাড়ি-ডোম না থাকিলে, কেই বা মলমূত্র-পরিষ্কার করিত, কেই বা চুপড়ী-ইত্যাদি প্রস্তুত করিত? ছুতার না থাকিলে, আমরা অনেক নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে বড়ই কষ্ট পাইতাম; কামার না থাকিলে, আমাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না, আমাদের না চলিত গ্রাসা-চ্ছাদন, না চলিত হিংস্রজন্তুর আক্রমণহইতে আত্মরক্ষা! কুমার না থাকিলেও, আমাদের কষ্টের অবধি থাকিত না; নাপিত না থাকিলে, আমরা বন্যজীবের ন্যায় হইয়া থাকিতাম। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা ঐ সমস্ত লোককে, বড়ই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া থাকি; অনেক সময়ে আমরা বাড়ীর পোষা বিড়াল বা কুকুরটির প্রতি যে সদ্ব্যবহার করি, উহাদের প্রতি সে সদ্ব্যবহারটুকুও করি না। দেখিয়াছি, অনেক 'বাবু' বাড়ীর পোষা কুকুরটির খাদ্য ভৃত্যের দ্বারা পাক করাইতেছে, কিন্তু সেই 'বাবু'ই, বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হইলে, যাহা তাহার সেই প্রিয় কুকুরেও ঘৃণা করিয়া খাইবে না, এমন পর্য্যুষিত ও উচ্ছিষ্ট, অতি কদর্য্যভাবে চট্‌কান খাদ্য কোন মেথর বা ধাওড়কে খাইতে দিতে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত পাইতেছে না। অথচ মানুষ, যতই হীনজাতি হউক না কেন, মানুষের পদলেহন করিবে না, কিন্তু কুকুরে তাহা করিয়া থাকে। যদি কতিপয় ঘৃণাকারজনক পদার্থ-স্পর্শ করে বলিয়াই তুমি একশ্রেণীর মানুষকে ঘৃণা কর, তবে তোমার পূজনীয়া মাতৃঠাকুরাণী শৈশবে তোমার নিমিত্ত অনেক অস্পৃশ্য বস্তু-স্পর্শ করিয়াছেন বলিয়া অদূর-ভবিষ্যতে তুমি কি তাঁহাকেও ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিবে? পূর্ব্বে লোকে ধাত্রীকে দ্বিতীয়া জননীর ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিত, ধাত্রী পান্না-প্রভৃতির কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। এখন লোকে মাতৃস্বরূপা ধাত্রীকেও অবজ্ঞার চ'খে দেখে—এ কি আমাদের উন্নতি হইতেছে না অবনতি? আগে গ্রামে গ্রামে ধোপা, নাপিত, কামার, কলু লোকের কাছে যথাযোগ্য সমাদর পাইত, এখন আমাদের এমনই অধঃপতন হইয়াছে যে, আমরা আর তাহাদিগকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না।

প্রাগুক্ত বৃত্তি-বিদ্বেষব্যতীত আজকাল আবার আর একপ্রকার

জীবিকা-ঘৃণা দেখা দিয়াছে। যে পেশায় পয়সা বেশী, লোকে আজিকালি সেই পেশারই খাতির করে, যে পেশায় পয়সা কম, লোকে সেই পেশা বা পেশাদারকে বড় ঘৃণাই করিয়া থাকে। একদিন ট্রামে চড়িয়া "বালক"-কার্য্যালয়ে আসিতেছিলাম। ট্রামের কন্‌ডাক্টারটি যাত্রীদিগকে টিকিট-বিক্রয় করিতেছিল, এমন সময়ে একটা গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া বেচারা বড়ই জখম হইল, আমরা কি হইয়াছে দেখিতে পাই নাই, তাই একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয় কি হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন,—"কন্‌ডাক্টার-বেটাকে একটা মোষের গাড়ীর ধাক্কা লেগেছে।" তাহা শুনিয়া আর এক যাত্রী কহিলেন,—"ওঃ কন্‌ডাক্টারটাকে? আমি ভা'ব্‌ছিলুম, কোন ভদ্দরলোক প'ড়ে গেছেন।" আমরা ভাবিলাম,—"ইঁহারা উভয়েই, দেখিতেছি, বড়ই 'ভদ্দরলোক', কন্‌ডাক্টার ১৫৲ বা ২০৲ বেতন পায়, অতএব সে ভদ্রলোক নহে, মানুষই নহে!" এইরূপ প্রকৃতির বৃত্তি-বিদ্বেষের উদাহরণ আজকাল বিরল

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত টি, পালিত।

নহে। ছাপাখানার কম্পোজিটার ও ডিষ্ট্রিবিউটার, ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার, ট্রামের কন্‌ডাক্টার, উকীলের মুহুরী, অল্পবেতনের কেরাণী, ভদ্রসন্তান হইলেও, আজিকালি আর ভদ্রপদবাচ্য নহেন। ইঁহারা অস্পৃশ্য কিছু স্পর্শ না করিয়াও মাসে দুইশত মুদ্রা স্পর্শাক্ষম বলিয়া ধনীর ও বড় চাকুরিয়ার প্রায় অস্পৃশ্য হইয়া উঠিতেছেন।

ফলতঃ আমরা বুঝি না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও অভিপ্রায়েই আমরা কেহ মেথর, কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট; কেহ কলু, কেহ কালেক্টার; কেহ রজক, কেহ রাজা; কেহ কন্‌ডাক্টার, কেহ কন্‌ট্রোলার; কেহ ডোম, কেহ ডিপুটী; কেহ মুচী, কেহ মুন্সেফ। এই পৃথিবীতে বৃত্তিমাত্রেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। যে ঘৃণ্যকারজনক পদার্থ-স্পর্শ করিতে আমার অকথ্য ঘৃণা উপস্থিত হয়, সেই ঘৃণ্যকারজনক পদার্থ আমারই ন্যায় আর একজন মনুষ্য আমারই হিতার্থে স্পর্শ করিতেছে বলিয়া, আমার তাহাকে কখনই পশুর অপেক্ষাও হীনজ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে, বরং যখন সে স্নান করিয়া পরিষ্কৃত হয়, তখন তাহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত আলিঙ্গন-দান করা উচিত, কেননা মনে ঘৃণা সকলেরই আছে, সে আমারই জন্য সেই ঘৃণাদমন করিয়াছে।

প্রকৃত কথা এই, যাহা আমাদের বাহির অপরিষ্কৃত করে, তাহা আমাদিগকে প্রকৃতপ্রস্তাবে হীন বা হেয় করিতে পারে না, কিন্তু লেডি ম্যাক্‌বেথ যে হত্যাকারিণীর কলুষিত মন লইয়া শোণিত-লেশহীন পাণিতলে বৃদ্ধ-নৃপতি ডন্‌ক্যানের পাতিত রক্ত প্রত্যক্ষ করিত, সেইরূপ মনই আমাদিগকে অশুচি করে। তুমি যে বৃত্তিই অবলম্বন কর না, যদি তাহাতে তোমাকে কোনপ্রকার অন্যায় না করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার সে বৃত্তি হীনবৃত্তি বা উঞ্ছবৃত্তি নহে; কিন্তু যদি তুমি এমন কোন বৃত্তি-অবলম্বন কর, যাহাতে তোমার বিবেককে প্রতিদিন বলি দিতে হয়,—জানিয়া-শুনিয়া, চোক-কাণ বুজিয়া মিথ্যা কথা কহিতে, জাল-জুয়াচুরী করিতে হয়, তাহা হইলে সেইরূপ বৃত্তিই তোমাকে সাধুর দৃষ্টিতে—ঈশ্বরের দৃষ্টিতে হীন ও হেয় করিয়া তুলিবে।

দুলালের দাঁত

তোমরা বোধ হয় দুলালচন্দ্র সেনকে চেন না—চেন কি? দুলাল ছোক্‌রা বেশ সভ্যভব্য, কিন্তু একটা আস্ত গরু। আমার বোধ হয়, তাহার বাবার একবার সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়াছিল বলিয়াই, সে ওরকম বোকা হইয়াছে। সে বলে, বড় হইলে, সে "জেনারাল" হইবে, কিন্তু ইতিহাসে সে যেরকম পণ্ডিত, তাহাতে সে যদি জেনারাল না হয় তো, হইবে কে? প্রথম পাণিপথের যুদ্ধটা কোন্ সালে হইয়াছিল, তাহাই তাহার মনে থাকে না!

যাহা হউক, এখন দুলালের দাঁতের 'কেচ্ছা'টা সুরু করা যা'ক। তাহার উপরকার পাটির সামনের দুইটা দাঁতের মধ্যে একটা দাঁত পড় পড় হইয়াছে—বড় নড়্‌নড়্ করিতেছে। তাই সে এখন কথা কহিবার চেষ্টা করিলেই, ফৎ-ফৎ করিয়া একরকম এমন বিশ্রী আওয়াজ হইতেছে যে, শুনিলে হাসি সাম্‌লান দায় হইয়া উঠিতেছে। দুলাল দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু ঐ দাঁতটা কাৎ হইবার জো হইয়াছে বলিয়া, তাহাকে আর ঠিক কার্ত্তিকের মত যে দেখাইতেছে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

দুলালের "পরমারাধ্যা শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতাঠাকুরাণী" তাহার দাঁতটা তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আগে একবার দুলালের একটা দাঁত তুলিয়া দিয়াছিলেন, সেবারে দুলাল বিশেষ কোন সুখ-বোধ করে নাই, কাজেই ঐ কথা শুনিয়া তাহার মায়ের নিকটহইতে সে সাতহাত তফাতে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, —"না, বাবা, তোমার আর আমার দাঁত তুলে কাজ নাই, আরবারকার কথা আমার বেশ মনে আছে।" মা বিস্তর বুঝাইয়াও তাহাকে রাজি করিতে পারেন নাই। শেষে সে বলে,—"মা, তুমি যদি আমায় একটা টাকা দাও, তা' হ'লে আমি নিজেই নিজের দাঁতটা তুলে ফে'ল্‌ব।" মা অবশ্য তাহাতে সহজে রাজি হন নাই, কিন্তু দুলাল সেই নড়্‌নড়ে দাঁতটা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, মার তাহা দেখিয়া হাত নিস্‌পিস্ ও গা গিস্‌গিস্ করিতেছিল, তাহাছাড়া তাঁহার মনে পড়িয়াছিল, দুলালের প্রথম দাঁতটা যখন পড় পড় হয়, তখন দাঁতের ডাক্তারকে চারটাকা ভিজিট দিতে হইয়াছিল। তাই তিনি তাহাকে আটআনা আটআনা বলিয়া শেষে একটা টাকাই দিতে রাজি হন; কিন্তু তবুও দুলাল নিজে নিজের দাঁতটা তুলিতে পারিতেছিল না; সেই অবস্থায় সে স্কুলে আসিয়াছে।

কথা কহিতেছে—ফক্‌ফক্ করিয়া দাঁতটা বিতিকুৎসিত-রকমে নড়িতেছে; দেখিয়া আমাদের যেমন গা গিস্‌গিস্ করিতেছে, তেমনই হাসি পাইতেছে। যাহার দাঁত নড়িতে থাকে, তাহার যে কি "অসোয়াস্তি"-বোধ হইতে থাকে, তাহা তোমাদের মধ্যে যাহার যাহার দাঁত পড়িয়াছে, তাহাদের নিশ্চয়ই খুব ভালরকমই মনে আছে, দাঁত নড়িতে থাকিলে, সুবিধারকমে কোন কিছু বদনে দেওয়া যায় না, সমস্ত কথাই জড়াইয়া জড়াইয়া বাহির হয়, আরও নানা অসুবিধা হয়। তাই দুলালেরও দাঁতটা তুলিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু পুরা একটা টাকার লোভেও সে দাঁতটায় হাত দিতে সাহস করিতেছে না। সে ঠিক 'ভীতু' নয়, কিন্তু কোনরকম কায়িক কষ্ট সহিতেও ইচ্ছুক নয়। আপনি আপনার

দাঁত তুলিতে হইলে, ভয়ানক কড়া ধাত চাই। আমার ভাইএর ক'টা দাঁত আমার সাম্‌নেই পট্‌পট্‌ করিয়া তুলিয়া ফেলা হয়, তাহাতে আমি একটুও ভয় পাই নাই; কিন্তু আমার নিজের যখন একটা দাঁত-তোলা হয়, ওঃ সে কষ্টের কথা কহতব্য নয়!

দুলাল তিন-চারিবার দাঁতটা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রত্যেকবারেই দাঁতে আঙুল ঠেকাইয়াই, শিহরিয়া হাত সরাইয়া লইল! একবার সে ফণিকে তাহার সেই নড়্‌নড়ে দাঁতটায় একগাছা 'টোন-দড়ি' বাঁধিয়া, সে দড়ির অপরপ্রান্ত একটা দরোজার কড়ায় বাঁধিতে দিয়াছিল, কিন্তু টান মারিতে সাহস করে নাই, ফণি দরোজাটা সরাইবার চেষ্টা করিতে না করিতে তাহার মতলব বদ্‌লাইয়া যায়, ফলে ফণি তাহার দাঁতের বাঁধন খুলিয়া দেয়। আজ আমরা ইস্কুলের ছুটীর সময় তোকে চাঁদা ক'রে চাঁটি লাগা'তে লাগা'তে বাড়ী যা'ব। তোর একার জন্যে আমরা সকলে মার খেয়ে ম'র্‌বো কেন র‍্যা?'

শুনিয়া অবশ্য দুলের পিলে চম্‌কিয়া উঠিল। কি করে বেচারা? বলিল,—'আচ্ছা তোরা তবে কেউ আমার দাঁতটা তুলে' দিস।'

কিন্তু কে দাঁতটা তুলিবে?

দুলে বলিল, 'কেউ যদি আমার দাঁতটা একটানে তুলে' দিতে পারে, তা'লে তা'কে আনা-আষ্টেক পয়সা জলখেতে দেব।'

পয়সার লোভে সবাই দাঁত তুলিতে চাহিতে লাগিল। দাঁত একটা, অতগুলো 'ডেন্টিষ্ট' খাড়া হইল, সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিল। শেষে সতীশ (তাহার বাপ এবছর মিউনিসিপালিটির কমিশনার

যতক্ষণ সে আর ফণি ঐ চেষ্টা করিতেছিল, ততক্ষণে ক্লাস বসিয়া যায়; সেটা "ইংলিশের আওয়ার"; হেমবাবু (মাষ্টার) দেরী করিয়া ক্লাসে আসার দরুণ দুইজনকেই বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দেন।

আজ দুলাল পড়া বলিবার সময়ে ক্লাসের সকলকেই ভারি মুস্কিলে ফেলিল। পড়িবার সময় তাহার এমন বিশ্রী দাঁত নড়িতে লাগিল ও তাহার উচ্চারণগুলা এমনই বেতর হইতে লাগিল যে, আমরা ক্লাসসুদ্ধ ছেলে হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। আর যাই কোথা? হেমবাবু আসিয়া সকলকেই 'এলোপাতাড়ি' বেত কশাইয়া দিলেন; ফলে আমাদের হতভাগা 'দুলে'টার ওপর ভারি রাগ হইল।

ইংলিশের আওয়ার হইয়া গেলে, মতি দুলেকে গিয়া বলিল, 'দেখ্‌ তুই যদি টিফিন আওয়ারে তোর ঐ লক্ষীছাড়া দাঁতটা না তুলে' ফেলিস কিম্বা আমাদের কাউকে তু'ল্‌তে না দিস, তা' হ'লে হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্দ্ধচন্দ্র পাইয়াছেন) বলিয়া উঠিল,—'আচ্ছা ভোটে যাহার নাম উঠিবে, সেই দাঁত তুলিবে।' সকলেই তাহাতে রাজি হইল। সতীশের পরামর্শমত 'ভোটিং-পেপার'-সংগ্রহ করিয়া মতি দেখিল,—সকলেই নিজের নামে ভোট দিয়াছে! দেখিয়া মতি ঘোষ রাগে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করিতে করিতে বলিল, 'এবার যে নিজের নামে ভোট দেবে, তা'কেই আমরা ছুটীর পর সবাই মিলে মাথায় গাঁট্টা দিতে দিতে বাড়ী যা'ব!' সুতরাং এবার বেশী ভোট পাইল, রমেশ; তাহার বাবা ডাক্তারী করেন, সে বলে, 'বড় হ'লে আমিও বাবার মত ডাক্তার হ'ব।' বাস্‌! সব হ্যাঙ্গামা চুকিয়া গেল। পণ্ডিত-মহাশয় সংস্কৃত পড়াইতে ক্লাসে ঢুকিলেন,—আমরা সকলে উপক্রমণিকা খুলিয়া 'গজ গজৌ গজাঃ' আওড়াইতে লাগিলাম।

দেড়টার সময় টিফিনের ছুটী হইল। তখন আমি, মতি, রমেশ

আর দুলাল আমরা চারজনে ক্লাসে রহিলাম, বাকী ছেলেদের ক্লাসের বাহির করিয়া দিয়া বলিলাম, যে যে এই দাঁত-তোলা দেখ্‌তে চায়, সে সে এক-একপয়সা না দিলে, ক্লাসে ঢু'কতে দেব না। অনেকেই এক-একপয়সা মতির কাছে জমা দিয়া দাঁত-তোলা দেখিতে আসিল। এখন একবার রমেশের দিকে চাহিয়া দেখ, তাহার মুখ কিরকম 'চূণ' হইয়া গিয়াছে, যেন তাহারই দাঁত-তোলা হইবে। সে ভয়ানক থতমত খাইতে লাগিল। প্রথমে তো সাব্যস্তই করিতে পারিল না যে, সে বসিয়া বসিয়া দুলালের দাঁত তুলিবে কি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তুলিবে; একবার বসিতে, একবার দাঁড়াইতে লাগিল। দুলালকে হাঁ করিতে বলিয়া নিজেই ভয়ানক হাঁ করিয়া ফেলিল। তাহার মুখহইতে খানিকটা লালা মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার পর সে দুলালের দাঁত ধরিয়া টান দিতে লাগিল। দুলালটা অঃ অঃ অঃ করিয়া ভয়ানক চেঁচাইতে লাগিল, শেষে রাগিয়াই খুন। কেন্‌রে বাপু, রাগিস কেন? তোর রাগের কে ধার ধারে? 'মরদ্‌কা বাত হাতীকা দাঁত'। করারমত কাজ করিতে দাও। তখন সে যাহা অ অ অ করিয়া বলিল, তাহার ভাবার্থ এই, রমেশ তাহার যে দাঁতটা নড়িতেছিল না, সেই দাঁতটা সজোরে টানিয়া একটু আল্‌গা করিয়া দিয়াছে!

টিফিনের ছুটী ফুরাইয়া গেল। সকলে কাজেই যে যাহার জায়গায় গিয়া বসিল। তখন স্থির হইল, রমেশ ছুটীর পর এবার ঠিক করিয়া দুলালের দাঁত তুলিয়া দিবে, নহিলে তাহাকেই আট-আনা জরিমানা দিতে হইবে। ছুটীর পর দুলাল কোথায় পলাইয়া গেল। রমেশের তখন আস্ফালন দেখে কে? ফটকের বাহিরে দুলাল ধরা পড়িল। সকলে মিলিয়া তাহাকে পাকড়াও করিল। সে বলিল, 'আমার দাঁত আর কাউকে তু'ল্‌তে হ'বে না --এই দেখ্‌।' তাহার সেই নড়্‌নড়ে দাঁতটা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে! রমেশের ভারি রাগ হইল। বলিল, 'কই দেখি তোর সেই দাঁতটা'।

দুলাল বলিল,—'কোথা পা'ব? গিলে ফেলেছি যে!'

মতি বলিল,—'বেশ ক'রেছ, বাবা; মজাটা টের পা'বে অখন।'

রমেশ বলিল,—'তোর appendicitis হ'বে।'

শুনিয়া দুলালের মুখ শুকাইয়া গেল।

তবু সে বাড়ী গিয়া মার নিকটহইতে টাকা তো আদায় করিয়া ছাড়িল; তবে সে যে দাঁতটা গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা তাঁহাকে জানাইল না। সে কথা বলিলে, সে টাকা তো পাইতই না, উপরন্তু বাড়ীতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যাইত।

দুলাল মরে নাই, এখনও সশরীরে বর্ত্তমান আছে।

শিয়াল-পণ্ডিত।

(সবিশেষ সংশোধিত—বালকের রচনা।)

গর্ত্ত খুঁড়ে' নদীতীরে শিবা এক ক'র্ত্ত বাস,
হ'ক তা'র প্রতিপত্তি—ছিল ভারি অভিলাষ;
সদা মুখে শুদ্ধ-কথা, পাছে লোকে ভাবে 'ষণ্ড',
আখ নয়—উঁ উঁ—'ইক্ষু', লাঠি নয়, বল 'দণ্ড'!
পড়া'য়ে সে ফেরে ঘরে, হাতে দেড়গজি বেত,
দেখিল পথের ধারে সুন্দর আখের ক্ষেত।
সারাদিন পড়া'য়ে সে হ'য়েছিল ভারি ক্লান্ত,
মনে মনে ভাবে তাই ক'র্ত্তে হ'বে ক্ষুধা শান্ত।
ইক্ষুক্ষেত্রমধ্যে ছিল—ভৃঙ্গের ভীষণ চাক্,
ইক্ষু-ফল ভাবি' তা'রে তা'র প্রতি করে 'তাক্'!
আনন্দেতে আত্মহারা সেদিকে ছুটিয়া যায়;
সুরসাল ইক্ষুদণ্ড, ফল 'রসগোল্লা'-প্রায়—
এই ভেবে শিবা-ভায়া যেই গেছে তা'র পাশে,
ভীমরুল-কুল তা'রে হুল ফুটাইতে আসে!

দৌড় দেয় শিবাশর্ম্মা, ফিরিয়া না চায় পিছে,—
ওরে বাবা, ইক্ষু-ফলে থাকে যে বিষম বিছে!
বাড়ী এসে ভাবে শিবা, মিষ্ট বটে ইক্ষুফল,
কিন্তু তাতে থাকে বড় বিষদন্ত কীটদল!
সাধনায় সিদ্ধিলাভ—কীটকুল ক'র্লে দূর,
আস্বাদিতে পা'ব তা'র রস-শস্য সুমধুর।
এই ভেবে একদিন ফের দেয় চাক্‌নাড়া,
ভীমরুল-কুল তা'রে আবার করিল তাড়া।
নাকে, মুখে, চোখে তা'র ফুটাইয়ে দিল হুল,
যন্ত্রণায় শিয়ালের ভেঙে গেল সব ভুল!
বিদ্যা-বুদ্ধি 'অষ্টরম্ভা', করে মুখে মহাজাঁক,
তা'র তো গুমোর হয় এমনই ক'রে ফাঁক!

শ্রীদাশরথী চৌধুরী।

বেতন-বৃদ্ধি

একটী লোক ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময়ে আফিসে কাজ করিতে যাইত, আর ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময় কাজহইতে ফিরিত। টিফিনের সময় সে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আধ ঘণ্টাই টিফিন খাইত। আফিসের কেরাণীদের যখন মাহিয়ানা বাড়িল, তখন তাহার মাহিয়ানা বাড়িল না দেখিয়া সে দুঃখিত ও বিস্মিত হইল; কিন্তু তাহার মাহিয়ানা কেন বাড়িল না, বলিতে পার? আমি, বোধ করি, পারি। সে কাজ করিতে করিতে কখন্ পাঁচটা বাজে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিত; সে সর্ব্বদাই অসন্তুষ্টভাবে কাজ করিত; তাহার কাজের কিছু-না-কিছু সর্ব্বদাই বাকী পড়িয়া থাকিত; তাহার আপনার উপরে বিশ্বাস নাই; সে মনিবকে বিস্তর প্রশ্ন করিত; কোন কাজ অবহেলা করিলেই, সে বলিত, "ভুলে গিয়েছি"! পদবৃদ্ধির নিমিত্ত সে প্রস্তুত ছিল না; সে আগ্রহের সহিত সমস্ত মনঃপ্রাণদিয়া কাজ করিত না। ভুল করিলে, সে কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিত না। সে তাহার অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের সহিতই বন্ধুতা করিত। নিজে বিচার করিয়া সে কোন কাজ করিতে পারিত না। কেমন করিয়া তাহা করিতে হয়, তাহা সে কখন শিখিবার চেষ্টাও করিত না। সে তাহার দক্ষতা দেখাইবার পরিবর্ত্তে মনিবকে তাহার বড়ঘরানাগিরিই দেখাইত। সে প্রতি সন্ধ্যাতেই কোথাও না কোথাও আমোদ করিতে ছুটিত। যেমন-তেমন করিয়া কাজ করিত বলিয়া, তাহার জীবনের আদর্শ খাটো হইয়া পড়িয়াছিল। সে একথা বুঝে না যে, তাহার পারিশ্রমিকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ—তাহার বেতন নহে।

ঠোঁটকাটা বীর

আমার বয়স যখন দশবৎসর, তখন আমার ঘোড়া চড়িবার সখ হয়। বাবাকে অনেক অনুরোধ করিয়া, কিছুতেই ঘোড়া কিনিতে রাজি করিতে পারিলাম না। অবশেষে আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য তিনি বলিলেন যে, একটা পাশ না করা-পর্য্যন্ত ঘোড়া পাইবে না। ঠাকুরমা'কে এই কথার সাক্ষী রাখিয়া, নিশ্চিন্ত হইলাম।

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিতে লাগিল। সতেরবৎসর-বয়সে "এণ্ট্রান্স-পাশ" করিয়া ফেলিলাম। বাবার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, জমিজমার আয়ে একপ্রকার চলিয়া যায়, কোন অভাব হয় না। তাহার উপর আমি 'সবে ধন নীলমণি,' একটা পাশ করিয়া ফেলিয়াছি,—মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইয়াছে, আর চাই কি? এইবার সেই ঘোড়া,—পাশ করিলে ঘোড়া পাইব,—পাশ ত করিয়াছি—এখন ত ঘোড়া চাহিলে পাইব! বাবাকে কিছু না বলিয়া, ঠাকুর-মা'কে সুপারিষ ধরিলাম। ঠাকুরমা, আমার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া, আশ্বাস দিলেন। সেদিন আনন্দে কাটিয়া গেল। রাতে বাবা আহারে বসিয়াছেন, মা খাবার দিলেন, ঠাকুরমা পাশে বসিয়া, এটা খাও সেটা খাও, বলিয়া অনুরোধ করিতেছেন। বাবার অর্দ্ধভোজন হইয়াছে, এমন সময় ঠাকুরমা ঘোড়ার কথা পাড়িলেন।

বাবা বলিলেন—"একটা স্তোক দিয়া রাখিয়াছিলাম, ছেলের সব আব্দার কি শুনিতে আছে? আবার দেখ না বলিব, আর একটা পাশ করিলে, তবে ঘোড়া দিব, বলিয়া ধাপ্পা দিয়া রাখিব, একটু উন্নতি হইলে, আপনার উপায়হইতেই আপনি ঘোড়া কিনিবে; আমাকে আর কিনিয়া দিতে হইবে না।"

ঠাকুরমা—"সে কি রে? সোনার-চাঁদ ছেলে, তায় পাশ ক'রে তবে ঘোড়া চেয়েছে,—তা'র একটা আব্দার শু'নতে নেই? যদি এখনথেকে তুই ওর সঙ্গে ধাপ্পাবাজি ক'র্‌বি, তোর দেখাদেখি ও ও তো ধাপ্পাবাজি শি'খ্‌বে, তখন কি হ'বে বল্ দেখি? ছেলেকে নিজেরা সৎশিক্ষা না দিলে, কি হয়? ওদের যেমন আয়ুষ্কামনা করা, লেখাপড়া-শেখান, তেমনই সত্যকথা-শেখান উচিত। ধাপ্পাবাজি, ফেরেব-বাজি শি'খ্‌লে, আপনাদেরই ভু'গ্‌তে হ'বে। তো'র ত অভাব কিছু নেই যে, ঘোড়া কেন্‌বার টাকা জু'টচে না ব'লে একটা ওজর করা? কত ছেলে কত আব্দার করে, ও'র তো আমার কোন আব্দার নেই! যখন একটা বাই ধ'রেছে, তখন ওর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, ওকে একটা ঘোড়া দিতেই হ'বে। তুই নিজের মুখে স্বীকার ক'রেছিলি, তাই ও চাচ্চে, নয়ত তোর কাছে চাইত না। আর তুই যদি একান্ত না দিস্, আমিই ওকে একটা ঘোড়া কি'নে দেব।"

মা—"ছেলেকে ঘোড়ার বাই দেখিয়ে কি হ'বে? বরং ওর একটা বিয়ে দেও, বউএর মুখ দেখি। ছেলে বড় হ'তে চ'ল্‌ল, পাশ করেচে, ওর বিয়ের একটা যোগাড় কর।"

বাবা—"ছেলে এখন ছেলেমানুষ, ওর বিয়ে দেওয়া ঠিক্ নয়। আর মার যখন অত জেদ, তখন একটা ঘোড়া কিনে দিতেই হ'বে।"

বাবার আহার-শেষ হইলে, ঘোড়ার কথা পাকাপাকি হওয়ায় ঠাকুরমা সে সুখবরটা আমাকে দিবার জন্য, আমার ঘরে ঢুকিয়া, তাঁহার ওকালতির সার-মর্ম্ম, এবং অন্যান্য কথার, যথাযথ বর্ণনা করিয়া, চলিয়া গেলেন।

আহ্লাদে রাত কাটিল। সকাল-বেলা উঠিতে একটু দেরি হইল। ঘুম ভাঙ্গিয়া, তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় গিয়া দেখি,—ঘোড়া কিনিবার বন্দোবস্ত সব ঠিক হইয়াছে। আমাদের প্রজা, হানিফ

মণ্ডল, আজ তিনবৎসর হইল, হরিহরছত্রের মেলাহইতে একটা ঘোড়া আনিয়াছিল, তিনবৎসর ক্রমান্বয়ে অজন্মা হওয়ায়, তাহার অবস্থা খারাব হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার ঘোড়াটী বিক্রয় করিবে। আমার জন্য সেই ঘোড়া কেনা হইবে স্থির হইয়াছে। বৈকালে সত্যসত্যই ঘোড়া আসিল, আহ্লাদে প্রাণ আটখানা হইল।

রোজ একটু একটু ঘোড়াচড়া-অভ্যাস করি, আর ঠাকুরমা'র কাছে আমার ঘোড়ায় চড়ার গল্প করি—বলি, আজ ঘোড়ায় চড়িয়া অমুক গ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানে একটা প্রজার হাঁস, ঘোড়ার পায়ে চাপা পড়িয়া, মরিয়াছে, আমি তাহার হাঁসের দাম দেওয়ায়, সে ভারি খুশি হইল ইত্যাদি। ঠাকুরমা, আমার এই ঘোড়ায় চড়ার কাহিনী হাঁ করিয়া শুনেন, আর আমার বীরত্বের প্রশংসা করেন।

এইরূপে দিনকতক কাটিয়া গেলে, আমার জীবনের পট-পরিবর্ত্তন হইল। একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছি, এমন সময়, হারাণেবেটা একটা মস্ত লাঠী হাতে করিয়া, একটা গরু তাড়াইয়া আমার দিকে আনিতে লাগিল। নিষেধ করিবার আগেই, গরুটা আমার অতি নিকটে আসিল, তাহাকে দেখিয়া আমার ঘোড়াটা ভয় পাইয়া, হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল। হতভম্ব হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, যদি রেকাবটী আমার পায়ে জড়াইয়া যায়, আর ঘোড়াহইতে পড়িয়া যাই, তাহা হইলে পা উপরে থাকিবে, আর মাটিতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে যাইবে, তখন আমার দশা কি হইবে? এই ভাবিয়া রেকাবহইতে পা খুলিয়া লইলাম। জিন্‌টী আল্গা করিয়া বাঁধা থাকায়, আমি গড়াইয়া পড়িয়া গেলাম। হায় দুর্দ্দশা! পড়িয়া গিয়া, আমার ঠোঁট কাটিয়া একটী সম্মুখের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল! দুষমন্ হারাণেবেটা আমাকে কাঁধে করিয়া বাড়ী পঁহুছাইয়া দিল।

ডাক্তারের লোশন ও মলমে আমি আরাম হইলাম। দাঁতটী বাঁধাইয়া লইলাম, কিন্তু ঠোঁট-কাটার দাগ মিলাইল না। আরাম হইয়া, ফুটবল ক্লাব, ডিবেটীং ক্লাব, লাইব্রেরী, স্পোটীং ক্লাবে যোগ দিলাম, কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! সকলেই আমাকে দেখিয়া হাসে, আর বলে, কি হে ঠোঁট-কাটা বীর!

একে একে সব আড্ডা ছাড়িলাম, কিন্তু কি মুস্কিল! বেটারা বাড়ী বহিয়া আসিয়া আমাকে "ঠোঁট-কাটা" বীর বলিতে লাগিল। ভগবানের কাছে একদিনের রাজত্ব পাইবার জন্য কত প্রার্থনা করিলাম। একদিনের রাজত্ব পাইলে, সব বেটাকে ফাঁসি দিয়া, নিশ্চিন্ত হইতাম। কিন্তু ভগবান প্রার্থনা শুনিলেন না। অগত্যা আমাকে নির্ব্বাসিতের মত কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিতে হইয়াছে। "হস্তী হস্ত-সহস্রেণ, শতহস্তেন বাজিনঃ" ইতি মহাজন-বাক্যের উপদেশানুসারে ঘোড়া-ত্যাগ করিয়াছি। কলিকাতায় বন্ধুবান্ধবদিগকে বলি যে, ঢাকার ঘোড়দৌড়ে মাক্‌ডোনাল-সাহেবের একটা দুর্দ্দান্ত ঘোড়ার সওয়ার মিলিতেছিল না, অবশেষে আমি সওয়ার হইয়া বাজি জিতিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার ঠোঁটটী কাটিয়া যায়।

আমার ঠোঁট কাটার দরুন কোন কন্যাপক্ষ আমাকে পছন্দ করেন না, সুতরাং এপর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই। আমি দেশ ছাড়িয়াছি, তবু সেদিন আমাদের পাড়ার হরিদাস আমার বাসায় আসিয়া আমাকে "ঠোঁট-কাটা" বীর বলিবার মতলব করিতেছিল, তাহা জানিতে পারিয়া আমি লুচি, আলুর দম, কচুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি খাদ্যের দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়াছি। কলিকাতায় বন্ধুবান্ধবের নিকট পাছে আমার বীরত্ব-কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে আমি বাসা বদ্‌লাইব স্থির করিয়াছি!

শ্রীতারাভূষণ পাল।

গত ফেব্রুয়ারীমাসের প্রতিযোগিতায় নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধটি প্রথম স্থানাধিকার করিয়াছে। "বালক"-সম্পাদক।

"কপাটী-খেলা"

আমাদের দেশী খেলার মধ্যে কপাটী-খেলাই প্রধান। এই খেলা দেখিতে যেমন আনন্দজনক, খেলিতেও তেমনি তৃপ্তিকর ও বলকারক। ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল প্রভৃতি বিদেশী খেলার প্রচলনে দেশী খেলাগুলি উঠিয়া যাইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত লুপ্তপ্রায় খেলার মধ্যে আজিও কপাটী-খেলা বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে চলিত আছে। পল্লীবাসিগণ, কি বালক, কি যুবক, কিরূপ উৎসাহের সহিত এই খেলা খেলিয়া থাকে, তাহা দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারি, এই খেলা কিরূপ আমোদজনক, বলপ্রদ ও পুষ্টিকর। এই খেলা যতজন ইচ্ছা লোক লইয়া খেলা যায়। সাধারণতঃ আট-দশ-জন লোক লইয়াই এই খেলা হয়। এই খেলাতে দুইটি দল থাকে। উভয় দলই সমানভাগে বিভক্ত। খোলা মাঠে খুব বড় খানিকটা জায়গা লইয়া এই খেলা হয়। এই জায়গার ঠিক মাঝখানে চওড়াদিকে একটী দাগ কাটা হয়। এই দাগটিকে 'চড়াই' বলে। আর দাগের উভয় পার্শ্বস্থ জায়গাকে এক-একটী 'কোট' বলে। দুইটি দল দুই 'কোটে' সারি দিয়া দাঁড়ায়। তাহার পর খেলা-আরম্ভ হয়। তাহার পর একদলের একটী লোক 'চড়াই'হইতে এক-নিশ্বাসে, "চুরে রাং চাং, সোনা-দিয়ে বাঁধাব ঠ্যাং, মারিব ঠ্যাংএর বাড়ি, পাঠাব যমের বাড়ী।" ইত্যাদি কোন শব্দ করিতে করিতে অপর 'কোটে' যায়। এইরূপ করিয়া যাওয়াকে 'দম' লইয়া যাওয়া বলে। সে সেই 'কোটে' যাইয়া সেই দলের কোন একজন খেলোয়াড়কে মারিয়া একদমে নিজের 'কোটে' পলাইয়া আসিতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে বিপক্ষের

লোকেরা তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া 'দম' বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করে। যে 'দম' লইয়া গিয়াছিল, সে যতক্ষণ বিপক্ষের 'কোটে' থাকিবে, ততক্ষণ দ্বিতীয়বার নিঃশ্বাস লইতে পারিবে না। প্রথমে যে নিঃশ্বাস লইয়া 'চু' বলিয়া বিপক্ষের 'কোটে' গিয়াছিল, সে সেই একনিঃশ্বাসে একদমে একসুরে ঐ 'চু'-শব্দ করিতে থাকিবে। যদি সে দুইবার কিম্বা ততোধিকবার নিঃশ্বাস লয় এবং নিজের 'কোটে' পলাইয়া আসিবার পুর্ব্বে বিপক্ষের কোন লোক তাহাকে ছুঁইয়া দেয়, তাহা হইলে সে 'মোর' হইয়া যায়। সে দান সে খেলিতে পারিবে না। আর যতক্ষণ না তাহার নিজের দলের কোন লোক বিপক্ষদলের কাহাকেও 'মোর' করিতে পারে, ততক্ষণপর্য্যন্ত সে খেলিতে পারে না। বিপক্ষের দলের কোন লোক 'মোর' তাহাদের কাহাকেও নিজের 'কোটে' টানিয়া লইয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে যে প্রথমে ধরিয়াছিল, সে 'মোর' হইয়া যায়। (৫) যদি সে লোককে সকলে মিলিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, সে এক'দমে' নিজের 'কোটে' যাইতে না পারিয়া 'চড়াই'এর উপর গিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে 'মোর' হয় না। সে উঠিয়া পুনরায় 'দম' লইয়া যায়; কিন্তু তিনবার উপর্য্যুপরি 'চড়াই' হইলে, সে 'মোর' হইয়া যায়।

প্রথম দলের লোক যাইয়া 'মোর' হইয়া আসিলে, 'মোর' করিয়া আসিলে কিম্বা অমনি ফিরিয়া আসিলে, দ্বিতীয় দলের একজন লোক পূর্ব্বোল্লিখিত মতে প্রথম দলের 'কোটে' দম লইয়া গমন করে। সে চলিয়া যাইলে, প্রথম দলের একজন লোক 'দম' লইয়া দ্বিতীয় দলের 'কোটে' যায়। এই-রূপ করিয়া খেলা চলিতে থাকে। যে দলের অগ্রে সকলেই 'মোর' হইয়া যায়, সেই দলই হারিয়া যায়। যখন একদলের এক-জনব্যতীত সকলেই 'মোর' হইয়া যায়, তখন সে 'দম' না লইয়া বিপক্ষের 'কো-টে' যাইতে পারে; কিন্তু তাহাকে জোর করিয়া তাহার মুখ টিপিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে বিপক্ষের দল তাহার দাঁত দেখিতে না পায়। যদি বিপ-ক্ষেরা মুখখোলা অবস্থায় তাহাকে ছুঁইয়া দিতে পারে কিম্বা ধরিয়া জোর করিয়া মুখ খুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সে 'মোর' হইয়া যায়।

হইলেই, সে উঠিয়া পড়ে এবং পুনরায় খেলা-আরম্ভ করে। এই-রূপ করাকে 'মরা কাঠে জল দেওয়া' বলে।

'মোর' অনেকপ্রকারে হইয়া থাকে। যেটি বলিলাম, তাহা একপ্রকার 'মোর'। (২) আবার 'দম' লইয়া কোন লোক বিপক্ষের কোন একজন খেলোয়াড়কে মারিয়া নিজের 'কোটে' পলাইয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে বিপক্ষের সেই লোকটি 'মোর' হইয়া যায়। কিন্তু (৩) যতক্ষণ না তাহার 'দম' বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ বিপক্ষের লোকেরা তাহাদের 'কোটে' তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে সে 'মোর' হইয়া যায়। (৪) আবার যদি, যে লোকটিকে সকলে মিলিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, সে তাহাদের কাছহইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কিম্বা

এই খেলা বেশ বলকারক। এই খেলা খেলিলে, গায়ে খুব জোর হয়। ক্রিকেট্, টেনিস্ প্রভৃতি খেলিলে যেমন গায়ে জোর হয়, এই খেলা খেলিলে তাহার চেয়ে কম জোর হয় না। অধিকন্তু ক্রিকেট্ প্রভৃতি খেলা ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু কপাটী খেলিতে গেলে, অর্থের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। খোলা মাঠে বিশুদ্ধ বাতাসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে এই খেলা খেলিতে বড়ই আমোদজনক ও তৃপ্তিকর। এই খেলা বহুদিন-পূর্ব্বহইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজকাল ক্রিকেট্ প্রভৃতি সভ্যজগতের

খেলার প্রচলন হওয়াতে এই খেলা অসভ্য ও ছোটলোকের খেলা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু বহুকালপূর্ব্বে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সুবিমল আলোকে এদেশের অজ্ঞতারূপ ঘনান্ধকার দূরীভূত হইবার বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক গ্রামে, কি ভদ্র, কি কৃষক সকলেই মহোৎসাহের সহিত এই খেলাই খেলিত। আর আজকালও বাঙ্গালাদেশের কোন কোন পল্লীতে এই খেলার সমধিক প্রচলন আছে। বেগবতী-নদী-পার্শ্বস্থিত বিশাল-বৃক্ষবেষ্টিত শ্যামল তৃণক্ষেত্রে ও অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণ-বর্ণ-কিরণে সমুদ্ভাসিত বনস্থলীতে অপরাহ্নে যখন পল্লীবালকগণ মহোৎসাহের সহিত এই খেলা খেলে, তখন সে দৃশ্য দেখিতে কেমন সুন্দর, মনোরম ও হৃদয়ানন্দদায়ক!

শ্রীসরোজকুমার বসু, —২য় শ্রেণী (ক-বিভাগ),
স্কটিশ চার্চ্চেস কলেজিয়েট স্কুল।

হাম্ বড়া।

সুরেন্ যা' নিজে করে, তা'ই বড় শক্ত,
তাইতেই হয় জল তা'র গা'র রক্ত!
আর যে করুক যা'ই, সব খুব সোজা,
তা'দের বাহোবা দিলে, যায় না'ক বোঝা!

ধর, ত্রৈরাশিক আঁক হইলে কষিতে,
সুরেন্ কেবলি থাকে পেন্সিল ঘষিতে;
অতএব ত্রৈরাশিক খুব শক্ত আঁক,
যে না তা' স্বীকার করে, তা'র বড় জাঁক!

কিন্তু চক্রবৃদ্ধি বেশ কষে অমরেশ,
সুতরাং ও আঁকে নাই কঠিনতা-লেশ!
প্রণালী শিখিলে আর কোন চিন্তা নাই,
সুরেন্ যা' জানে না'ক কেবলই তা'ই!

'কেশতৈল'-মাহাত্ম্য।

চিত্রকরের চিত্র আঁকিতে আঁকিতে রঙ ফুরাইল; কাছে ছিল 'কেশ-তৈল', তাহা-দিয়াই ছবিটি আঁকিয়া ফেলিল।

পরদিন সকালে আসিয়া দেখে, ছবির ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) বিলুপ্ত, গুম্ফশ্মশ্রুমুণ্ডিত মুখে একযুড়ি গোঁফ-দাড়ি!

ফুটবলে ফণি খেলে 'ফুলব্যাক্' ম্যাচে,
সুরেন্ ওড়ায় ঘুড়ী,— কাটে কত প্যাঁচে।
কি বলিব, ছোঁড়াগুলো একেবারে হাঁদা,
চেনে না'ক পায়রার নর কিম্বা মাদা,

তা'ই তা'রা ফণেকেই দেয় হাততালি,
আরে গাধা, ও খেলা ত সেদিনের—হালি!
ঘুড়ীর মাহাত্ম্য তোরা কি বুঝিস্ বল্?
হয় ত জানিস্নাক বাঁধিতেই 'কল'!

তা' না হ'লে সুরেন্‌কে বাহোবা না দিয়ে,
চেঁচিয়ে-মরিস্ কেন ফণেকেই নিয়ে?

ধাঁধার উত্তর—(১) কুণাল, (২) লাক, (৩) মলাট।

বালক

৩য় বর্ষ।]　　　মে, ১৯১৪।　　　[৫ম সংখ্যা।

কুড়ানী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১০

মণিরামের ভারী রাগ। ভাবিল, ঐ মোটা শিয়ালটাই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—আমার বার-বারটা রাজহাঁস খাইয়া ফেলিয়াছে। সে দিব্য করিয়া বলিল, এই শিয়ালের বাচ্ছাগুলিকে একবার পাইলে হয়; এক-একটা ধরিয়া জীয়ন্তই চামড়া তুলিয়া লইব।

কেমন করিয়া চামড়া তুলিবে, তাহা মনে ভাবিতেও তাহার যেন সুখবোধ হইল। সে ত কৃষ্ণসারের অনুসরণ করিয়া তাহার গর্ত্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই, কিন্তু আজি সে নিতান্তই সেই গর্ত্ত বাহির করিবে, তাই কোদাল, খন্তা, শাবল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

মণিরাম একটা মুরগী আনিয়াছিল। যেখানে কৃষ্ণসারকে দেখিতে পাইয়াছিল, সেইখানে লইয়া গিয়া সেটাকে ছোট একখণ্ড পাথরের সঙ্গে বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিল। পাথরখানা এত বড় যে, মুরগীটা টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না। এই করিয়া মণিরাম নিকটেই একটু উচ্চস্থানে একটা শিমুল-গাছের গোড়ার আড়ালে বসিয়া দেখিতে লাগিল। দড়ি যত লম্বা, তত দূর গিয়া মুরগীটা মাটীতেই ছটফট্‌ করিতে লাগিল। টানাটানি করাতে পাথরখানা ঘুরিয়া গেল, তাই মুরগীটা অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল, মণিরাম যেখানে বসিয়া চৌকি দিতেছিল, কম্বল পাতিয়া সেইখানে গড়াইতে লাগিল। এমন সময়ে কুড়ানী শিকারে বাহির হইয়া, যেখানে মুরগীটা বাঁধা ছিল, সেই স্থানের নিকটেই আসিল। কুড়ানীর গর্ত্ত এখানহইতে বড় বেশী দূর নয়, হয় ত সিকিক্রোশ। কুড়ানীর বেশ জানা ছিল, কান কিছু দেখিয়া লোভের বশে পড়িয়া অমনি কাছে যাইতে নাই। পূর্ব্বে শিয়ালেরা শিকারের অন্বেষণে বাহির হইলে টীকড়ের মাথায় উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিত। কিন্তু মানুষের ধরণধারণ দেখিয়া কুড়ানী বুঝিয়াছে যে, টীকড়ে উঠিলে, মানুষে দেখিতে পাইয়া গুলি করে। তাই সে টীকড়ের আশে পাশে বেড়াইত, আর মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখিত, কোথায় কি আছে না আছে।

বাচ্ছাদের আহারের অন্বেষণে শিকারে বাহির হইয়া আজ সন্ধ্যাকালেও কুড়ানী তাই করিল। তাহার তীক্ষ্ণ চক্ষু মণিরামের শাদা মুরগীর উপরেই পড়িল। আকাশে শাদা মেঘ, মুরগীটা যেই আকাশে একটা গগনভেলা-পাখী উড়িয়া যাইতে দেখে, অমনি সেইটার দিকে চাহিয়া থাকে, আর দড়ি-বাঁধা পাথরখানার চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুড়ানীর একটু ধাঁধা লাগিল। এখানে এমন সময়ে মুরগী! এ আবার কি? কুড়ানী বুঝিতে পারিল যে, ওটা শিকারের জিনিস বটে, কিন্তু গিয়া ধরিতে ভয় হইল। সে অলক্ষ্যে চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাল করিয়া দেখিতে পাইল। পরে মনে স্থির করিল, যাহাই হউক না কেন, কাছে যাওয়া হইবে না। চলিয়া যাইবার সময়ে অল্প অল্প ধূঁয়া তাহার চখে পড়িল। একটু অগ্রসর হইলে, একটা গাছতলায় মণিরামের আড্ডা দেখিতে পাইল। তাহার বিছানা, তাহার বাঁধা ঘোড়া দেখিল, আরও দেখিল, সে আগুনে হাঁড়ী বসাইয়া ভাত রাঁধিতেছে। মানুষের কাছে "মানুষ" হওয়াতে, ভাত কি, তা সে জানিত, আর ভাতের গন্ধও চিনিত। নিজের গর্ত্তের এত কাছে একটা মানুষ রহিয়াছে; কুড়ানীর ভাবনা হইল। কিন্তু সে চুপে চাপে শিকার খুঁজিতে চলিয়া গেল। মণিরাম বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানিতে পারিল না।

গোধূলি-সময়ে মণিরাম আসিয়া মুরগীটা লইয়া গেল।

১১

পরদিন আবার তেমনি করিয়া মুরগী বাঁধিয়া রাখা হইল। বৈকালবেলা কৃষ্ণসার বেড়াইতে বেড়াইতে সেই দিক্‌টায় আসিল। শাদা মুরগী দেখিবামাত্র সে দাঁড়াইল, এবং মাথা হেঁট করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। কৃষ্ণসার ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে আরও নিকটে গেল, একটু যেন থতমত খাইল—এমন সময়ে, যেখানে রাজহাঁস ছিল, সেইস্থানের গন্ধ তাহার মনে পড়িল। মুরগীটা চমকিয়া উঠিল, পলাইবার চেষ্টা দেখিল; কিন্তু কৃষ্ণসার তাড়া করিয়া গিয়া মুরগীটাকে ধরিয়া এমন জোরে হ্যাঁচ্‌কা টান মারিল যে, দড়ি ছিঁড়িয়া গেল, আর সে মুখে করিয়া নিজ গর্ত্তের দিকে সটান ছুট দিল!

এ সময়ে মণিরাম ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মুরগীর ক্যাঁও-ক্যাঁও-শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখে, মোটা শিয়ালটা তাহার মুরগী মুখে করিয়া ছুটিয়াছে।

কৃষ্ণসার মুরগী লইয়া গা-ঢাকা দিলেই, মণিরাম শাদা পালখ দেখিয়া দেখিয়া শিয়ালের তল্লাসে বাহির হইল। মুরগীটা যতক্ষণ জীয়ন্ত ছিল, ততক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করাতে বিস্তর পালখ পড়িয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণসারের করাল কবলে মুরগীটা পঞ্চত্ব পাইলে, আর পালখ পড়িল না—কেবল বেতের কাঁটায় বাধিয়া যা দুই-একটা পালখ পড়িল। কিন্তু মণিরাম ঠিক যাইতে লাগিল, কারণ কৃষ্ণসার বড় কষ্টে লব্ধ শিকার মুখে করিয়া প্রায় সোজা নিজ আড্ডার দিকে বাচ্ছাদের কাছে যাইতেছিল। যেখানে শিয়ালটা ডাহিনে বা বাঁয়ে ভাঙ্গিয়াছে, বা পরিষ্কার উলুবন দিয়া গিয়াছে, পালখ না দেখিয়া সেইখানে দুই-একবার মণিরামের ধাঁধা লাগিল। কিন্তু একটা শাদা পালখ দেখিতে পাইলেই, সে একশতহাত নির্ভাবনায় যাইতে পারিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে, মণিরাম যেখানে আসিল, সেখান-হইতে শিয়ালের গর্ত্ত বড় জোর তিন-চারি-শত-হাত দূর। এই সময়ে শিয়ালের নয়টা বাচ্ছা কৃষ্ণসারের আনীত মুরগী-ভোজনে ব্যস্ত; টানাটানি করিয়া মাংস ছিঁড়িতেছে, খাইতেছে; কাহারও নাকে পালখ ঢুকিয়াছে, সে হাঁচিতেছে; কাহারও গলায় পালখ আট্‌কাইয়াছে, সে কাশিতেছে।

এই সময়ে যদি এই গর্ত্তের দিক্‌হইতে মণিরামের দিকে দমকা বাতাস বহিত, তাহা হইলে কতকগুলি শাদা পালখ উড়িয়া মণিরামের দিকে গিয়া পড়িত। এমন কি, মুরগী-ভোজনে মত্ত বাচ্ছাগুলিরও কোলাহল হয় ত তাহার কাণে যাইত, আর শিয়ালের গর্ত্ত প্রকাশ পাইত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে দিবা-অবসান হইয়া আসাতে বাতাসের বেগ কমিয়া গিয়াছে, আর মণিরাম শেষটা এক ঝোপের কাছে আসিয়া শাদা পালখ আছে কি না, দেখিবার জন্য লাঠি-দিয়া জঙ্গল ঝাড়িতেছিল, কাজেই এখানকার কোন শব্দ সে শুনিতে পায় নাই।

এই সময়ে কুড়ানী একটা শকুনি মুখে করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। কি করিয়া শকুনি-শিকার করিয়াছিল, তাহা বলি। জঙ্গলের ধারে একটা মরা মহিষ পড়িয়াছিল, শকুনিটা মরা মহিষের পেটের ভিতরে মাথা গলাইয়া দিয়া নাড়ী-ভুঁড়ী খাইতেছিল, এমন সময়ে কুড়ানী হঠাৎ গিয়া সেটাকে ধরিয়া ফেলে। এই করিতে গিয়া মণিরাম যেখানে গিয়াছিল, কুড়ানী সেইখানে আসিয়া পড়িল। এ দেশে অকারণে মানুষ হাঁটিয়া জঙ্গলের ধারে আইসে না। কুড়ানীর মনে সন্দেহ হইল। মানুষটা কোন্ দিকে গেল, দেখিবার জন্য, মণিরাম যেখান দিয়া গিয়াছিল, গায়ের গন্ধ ধরিয়া সেইখান দিয়া খানিক দূর গেল। কেমন করিয়া সে মানুষের গন্ধ চিনিয়া ফেলিল, জানি না, কিন্তু শিকারীরা জানে যে, শিয়ালে গন্ধ চিনে। কুড়ানী বেশ বুঝিতে পারিল যে, লোকটা তাহারই বাড়ী-পানে বরাবর গিয়াছে। ভয়ে বেচারীর গা শিহরিয়া উঠিল, মুখের শকুনিটা একজায়গায় লুকাইয়া রাখিয়া, গন্ধ ধরিয়া মানুষটার পিছনে পিছনে চলিল। দুই-এক-মিনিট পরেই ঝোপের ভিতর মানুষটার গলা শুনিতে পাইল, পাইয়া কুড়ানী বেশ বুঝিতে পারিল যে, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। সে অমনি একটু ঘুরিয়া নিজ গর্ত্তের গহ্বরটার দিকে দ্রুত চলিল। গহ্বরের কাছে গিয়াই দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারে ব্যস্ত বাচ্ছাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য একপ্রকার শব্দ করিল। সে শব্দের অর্থ এই, চুপচাপ থাক, আমাকে দেখিয়া আনন্দে চেঁচাইয়া উঠিও না। কিন্তু গুহাতে ও গর্ত্তের কাছে বিস্তর শাদা পালখ পড়িয়া আছে দেখিয়া, কুড়ানী ভাবিল, এই খানে যে শিয়ালের আড্ডা, মানুষে দেখিলেই বুঝিয়া লইবে। বেচারীর আরও ভয় হইল। এই দেখিয়াই সে আর একপ্রকার শব্দ করিল, ইহার অর্থ, পালাও, ভারী বিপদ্ উপস্থিত।
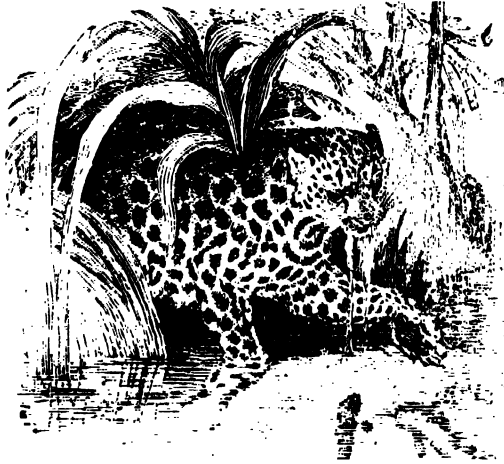
শাদা পালখ পথে দেখিয়াই যে, কেহ তাহার গর্ত্তের সন্ধান পাইয়াছে, বোধ হয়, কুড়ানীর এমন ধারণা হয় নাই, কারণ সে চিরকালই গন্ধ ধরিয়া সব টের পায়; কিন্তু এখন সে বুঝিতে পারিল যে, এ আর কেহ নয়, সেই লক্ষ্মীছাড়া, সেই নিষ্ঠুর, যে

আমাকে সদাই কষ্ট দিত, যে আমাকে পদে পদে জ্বালাতন করিয়াছে, যে আমার সকল বিপদের মূল, সেই লোকটা আমার আড্ডার কাছেই কোনখানে আছে। আমার বাচ্ছাদের লোভেই সে হতভাগা আসিয়াছে, খানিকক্ষণের মধ্যেই সে আসিয়া পড়িবে।

এই নিষ্ঠুর লোকটা বাচ্ছাদের হাতে পাইলে যে কি কাণ্ডটা করিবে, তাহা ভাবিয়া কুড়ানীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মাতৃস্নেহদ্বারা চালিত হইয়া মাতৃবুদ্ধি বাচ্ছাদের রক্ষার উপায় করিতে লাগিয়া গেল। বাচ্ছাগুলিকে গর্তের ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া, এবং একপ্রকার সঙ্কেতদ্বারা কৃষ্ণসারকে উপস্থিত বিপদের কথা জানাইয়া, লোকটাকে যেখানে দেখিয়া আসিয়াছিল, সেইখানে গেল। একবার একটু দূরে দূরে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। সে ভাবিল, সে নিজে যেমন গন্ধ ধরিয়া ধরিয়া যায়, এ লোকটাও তেমনি শিয়ালের গন্ধ ধরিয়া চলিবে; কিন্তু তাহার টাট্‌কা গন্ধ পাইলে তাই ধরিয়াই যাইবে। অনন্তর কুড়ানী একপাশে গেল, এবং কুকুরদিগকে ভুলাইয়া আনিবার জন্য যেমন বিকট চীৎকার করিত, এক্ষণে তেমনি বিকট চীৎকার করিয়া ভাবিল, এইবার লোকটা তাহার পিছন ধরিবেই ধরিবে। এই ভাবিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল; পরে আর একটু অগ্রসর হইয়া আবার, আর দুইপা গিয়া আবার, এইরূপে বারকতক তেমনি চীৎকার করিল। তাহার একান্ত ইচ্ছা, শিকারীকে ভুলাইয়া নিজের পিছন ধরায়।

মণিরাম ডাক শুনিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসাতে শিয়ালটাকে দেখিতে পাইল না। তাহাকে শিয়ালের গর্তের অনুসন্ধান রাত্রিকার মত স্থগিত রাখিতে হইল। কুড়ানী ও মণিরাম, ইহাদের কে কি অভিপ্রায়ে এ সব করিল, কেহ বুঝিল না; কিন্তু ফল একই হইল। মণিরাম ভাবিল, শিয়ালটা ভয় পাইয়া চেঁচাইয়াছে, ইচ্ছা, উহার ডাক শুনিয়া আমি সরিয়া যাই। মণিরাম বেশ টের পাইল যে, শিয়ালের বাচ্ছা নিকটেই কোন গর্তে আছে, তাই পরদিন প্রাতঃকালে আসিয়া বাচ্ছাগুলি হস্তগত করিবে ভাবিয়া, আবার আপন আড্ডায় গিয়া আগুন জ্বালিল।

১২

কৃষ্ণসার ভাবিল, আর ভাবনা নাই; লোকটা আমার যে গন্ধ ধরিয়া আসিতেছিল, রাত্রে শিশির পড়িলে, সে গন্ধ আর থাকিবে না—কাজেই শিকারী আমাদের আড্ডার সন্ধান পাইবে না; বাঁচা গেল। কুড়ানীর ভাবনা যায় নাই। সে ভাবিল, ঐ দ্বিপদ জানোয়ারটা আমার ও আমার বাচ্ছাদের কাছেই কোন স্থানে আছে; তাহাকে ত দূরে সরাইতে পারি নাই, আবার আসিলেও আসিতে পারে।

শিকারী ঘোড়াটাকে জল খাওয়াইয়া একধারে লম্বা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিল। অনন্তর হাত-পা ধুইয়া ভাত চড়াইয়া দিল। ভাত হইলে, পেট-ভরিয়া খাইয়া, বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। আর সকালবেলা কেমন করিয়া শিয়ালের বাচ্ছা ধরিবে, ধরিয়া কি করিবে, তাই ভাবিতে লাগিল।

তামাক-খাওয়া-শেষ হইলে, মণিরাম সেই কম্বল মুড়ি-দিয়া শুইল, অমনি দূরে শিয়ালেরা সন্ধ্যা-ডাক ডাকিয়া উঠিল। মণিরাম দাঁত কড়মড়াইয়া বলিল, বটে! আচ্ছা, ডাক; সকালবেলা দেখা যাবে!

শিয়ালেরা সচরাচর সন্ধ্যাকালে এইরূপে দুই-একবার ডাকিয়া থাকে। এক-বার ডাকিয়াই থামিয়া গেল। তন্দ্রা আসাতে মণিরাম এ কথা শীঘ্রই ভুলিয়া গেল।

কুড়ানী আর কৃষ্ণসার, এই দুইজনে মিলিয়া ডাকিয়াছিল। মিছামিছি ডাকে নাই। ডাকিবার বিশেষ অভিপ্রায় ছিল,—শিকারীর সঙ্গে কুকুর আছে কি না জানিতে চাহিয়াছিল। যখন উহাদের ডাক শুনিয়া কুকুর ডাকিয়া উঠিল না, তখন কুড়ানী বেশ বুঝিতে পারিল যে, শিকারীর সঙ্গে কুকুর নাই।

কুড়ানী ঘণ্টাখানিক চুপচাপ রহিল। ইতোমধ্যে মণিরামের আড্ডার আগুন নিবিয়া গেল। সকলই নীরব, কেবল দড়ি-দিয়া বাঁধা ঘোড়াটার ঘাস-খাওয়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। কুড়ানী নিঃশব্দে ঘোড়াটার দিকে অগ্রসর হইল। কুড়ানী যখন খুব নিকটে গেল, তখন হঠাৎ দেখিতে পাইয়া ঘোড়াটা এমন চমকিয়া লম্ফ দিয়া উঠিল যে, টান পাইয়া দড়ি ছিঁড়িয়া যায় যায় হইল। কুড়ানী নীরবে গিয়া সেই দড়ি কামড়াইয়া ধরিল, আর মাড়ির দাঁত দিয়া চিবাইতে লাগিল। দড়ি অনেকটা কাটিয়া গেল এমন সময়ে ভীত ঘোড়া আবার লম্ফ দিয়া উঠাতে, টান পাইয়া দড়ি একেবারে ছিঁড়িয়া গেল। ঘোড়াটা কিন্তু তেমন ভড়কিয়া উঠিল না; কারণ শিয়ালের গন্ধ তাহার জানা ছিল। তাই দুই-এক-লম্ফ দিয়া, এবং দুই-চারি-পা হাঁটিয়াই থামিল।

ঘোড়াটা ধুপ্‌ধাপ্ করিয়া মাটীতে পা ফেলাতে যে শব্দ হইল, সেই শব্দ কাণে যাওয়াতে মণিরামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিল, এবং ঘোড়াটাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, কোন ভয় নাই ভাবিয়া, আবার চক্ষু মুদিল।

কুড়ানী গা ঢাকা দিয়াছিল, কিন্তু আবার নীরবে, ছায়ার মত, আসিল। কিন্তু মণিরামের ত্রিসীমানায় না গিয়া, তাহার উনানশালে গেল। সরাঢাকা হাঁড়ীতে দু'টী ভাত ছিল, সরা খুলিয়া তা "বদনে দিল"। এদিকে কৃষ্ণসার আসিয়া, বেচারার লবণের মালা, তেলের চোঙ্গা, এসকল উল্টাইয়া ফেলিল। নিকটে একটা বেণা-ঝাড়ের উপর ঘোড়ার লাগাম ছিল; ওটা যে কি পদার্থ, শিয়ালেরা তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু কাটিয়া কুচিকুচি করিয়া ফেলিল। এইসকল করা হইয়া গেলে, যে ছালায় মণিরামের চাউল ও যে বুগলিতে ছাতু ছিল, সেই দুইটা থলি

টানাটানি করিয়া দুরে লইয়া গেল, এবং কতক চাউল ও ছাতু খাইল, বাকিটা বালিতে ছড়াইয়া ফেলিল।

এইরূপে মণিরামের নানা অনিষ্ট করিয়া, কুড়ানী বনের ভিতর দিয়া, জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ক্রোশাধিক দুরে এক স্থানে গেল, কৃষ্ণসার ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। এইখানে একটা গর্ত্ত ছিল। প্রথমে এটা গো-সাপের গর্ত্ত ছিল; কিন্তু গো-সাপেরা ছাড়িয়া গেলে পর, খরগোশেরা গর্ত্তটা দখল করত বড় করিয়া লইয়াছিল। সেই খরগোসের বাচ্ছার লোভে একটা খ্যাঁকশিয়ালী মাটী খুঁড়িয়া গর্ত্তটা আরও বড় করিয়া ফেলে। এইখানে আসিয়া কুড়ানী থামিল, এবং এদিক্-ওদিক্, এগর্ত্ত-ওগর্ত্ত দেখিয়া-শুনিয়া, অবশেষে এই গর্ত্তটা পছন্দ করিল। পছন্দ করিয়া, খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। কৃষ্ণসার "চিত্র-পুত্তলিকার" ন্যায় কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, কুড়ানীর অভিপ্রায় কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না। পরে কুড়ানী খুঁড়িতে খুঁড়িতে ক্লান্ত হইয়া যখন বাহিরে আসিল, তখন গর্ত্তের ভিতরে গিয়া খুঁড়িতে আরম্ভ করিল; সম্মুখের দুই-পা-দিয়া মাটী খুঁড়িতে, আর পিছনের দুই-পা-দিয়া মাটী বাহির করিয়া ফেলিতে লাগিল। পিছনদিকে অনেক মাটী জমিয়া গেলেই, বাহির হইয়া আসিয়া সেই মাটী ঐরূপে আরও দুরে ফেলিতে লাগিল।

এইরূপে ঘণ্টা-কতক দুই-জনে পরে পরে মাটী খুঁড়িল। মুখে কথা নাই, অথচ উদ্দেশ্যটী বেশ বুঝিয়া লইয়া, দুইজনে মিলিয়া পরিশ্রম করিল। সূর্য্যের পুনরায় উদয় হইলেই, উহাদের কার্য্যের শেষ হইল। যদি পুরাতন গর্ত্তহইতে চলিয়াই আসিতে হয়, তাহা হইলে, এই গর্ত্তে তাহাদের একপ্রকার সমাবেশ হইবে; সে গর্ত্ত ঘাস-ভরা গুহার ভিতরে, তাই অনেক বিষয়ে সুখের স্থানও বটে।

(ক্রমশঃ।)

কপি-কাহিনী

কপি ঠিক বানর নহে, ইহার লেজ নাই। চারিপ্রকারের কপি আছে—গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংউটাং এবং গিবন।

ইহাদের মধ্যে গরিলা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার। ইহাদের বাহু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পা লম্বা বলিয়া, ইহারা মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা সদৃশ। কেবল এইজাতীয় কপিই বিনা-শিক্ষায় মানুষের মত সোজা দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ায়, এবং ইহার জীবনের অধিকাংশ সময় ভূমিতেই অতিবাহিত করে। আকারে ইহা সাধারণ মনুষ্যের অপেক্ষা বৃহত্তর, ইহার বাহু ও বক্ষঃ খুব দীর্ঘ ও প্রশস্ত। ইহা পশ্চিম-আফ্রিকার অন্তর্গত গাবুন ও কঙ্গো-নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করে, ঐ স্থানটীর পরিমাণ একশত ক্রোশের অধিক নহে। গরিলা আদৌও আলাপ-প্রিয় নহে, এজন্য অতি অল্প মনুষ্যই ইহা-দিগকে ইহাদের বাসস্থানে দেখিতে পায়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফিট হয়, এবং ইহার ওজন কখন কখন প্রায় সাত মণপর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গরিলার বাহুতে ভয়ানক রোম জন্মে, বৃষ্টির সময়ে ঐ রোমশ বাহু-দিয়া ইহা ইহার বুক ঢাকিয়া রাখে। ইহার বুকে, মুখে, করতলে এবং পদতলে লোম নাই; এই সমস্ত অঙ্গের চর্ম্ম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

এই জীবটির মুখাকৃতি অতি কুৎসিত ও বিরাগোৎপাদক। চক্ষুর্দ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট, চোয়াল চৌড়া, তাহা-ছাড়া ইহার কপাল নাই বলিলেই হয়। ইহার করোটির সহিত নর-করোটির একটুও মিল নাই, ইহার মস্তিষ্ক দেখিলে, ইহার যে বুদ্ধি বড় কম, তাহা বুঝা যায়। মানুষের ঠোঁটের মত ইহাদের ঠোঁট লাল নহে। পুংজাতীয় গরিলাদের দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ গজদন্ত আছে, ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, ইহারা বন্য, হিংস্র জন্তু।

আফ্রিকার অরণ্যে যে সমস্ত প্রাণী আছে, সকলেই এই কুৎসিত প্রাণীটীকে ভয় করে। ইহা সিংহের সমকক্ষ, হস্তীকে তাড়াইতে ইতস্ততঃ করে না; ঐ অতিকায় জীবকে তাড়াইতে হইলে, ইহা চুপিসাড়ে তাহার নিকটস্থ হইয়া লাঠিদিয়া তাহার শুঁড়ে সজোরে মারে।

ক্রোধ হইলে, ইহা আপনার বুকে ঘুসি মারিতে ও প্রথমে কুকুরের মত তীক্ষ্ণ ঘেউ ঘেউ করিয়া শেষে মেঘগর্জ্জনের মত গর্জ্জন করিতে থাকে।

এই জীব স্বভাবতঃ বড় স্ফূর্ত্তিহীন। ইহাদিগকে পোষ মানান যায় না। বনহইতে গরিলার বাচ্ছা ধরিয়া আনিলে, বেশী দিন বাঁচে না; কিছু খায় না, খেলা-ধূলা করে না, তাই বদ্‌হজমীতে মারা পড়ে।

শিম্পাঞ্জী গরিলার অপেক্ষা আকারে তিনভাগের একভাগ ছোট, কিন্তু অনেক অধিক বুদ্ধিমান। দুইরকমের শিম্পাঞ্জী আছে; সাধারণ-শ্রেণীর শিম্পাঞ্জীদিগকে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর শিম্পাঞ্জীদিগকে দক্ষিণাফ্রিকার কেবল একটী সংকীর্ণ প্রদেশেই পরিলক্ষিত হয়। এই মহাদেশবাসীদিগের মতে এই শেষোক্ত শ্রেণীর শিম্পাঞ্জীরা একপ্রকার গান ও নৃত্য করিবার নিমিত্ত সকলে একত্র হইয়া থাকে। ইহারা একপ্রকার বৃত্তাকৃতি মৃন্ময় দামামা-নির্ম্মাণ করে, উহা উচ্চে প্রায় দুই ফিট হয়। তাহারা একটী নদীর তীরহইতে উক্ত মৃত্তিকা-সংগ্রহ করে। ঘাসের চাব্‌ড়া তুলিয়া লইলে, যে একটী গর্ত্ত হয়, এইরূপ গর্ত্ত তাহারা যে বনে বাস করে, সেই বনে বিস্তর আছে; এইরূপ গর্ত্তেই উহারা উহাদের দামামা-নির্ম্মাণ করে। কাদা শক্ত হইলে,

ফাটিয়া যায়, উহাতে আঘাত করিলে, দামামার নিনাদের মত এক-**প্রকার উচ্চ ও বহুক্ষণস্থায়ী নিনাদ নিঃসৃত হয়।** শিম্পাঞ্জীদের **এই নাচ-গান রাত্রিতেই হয়।** দুই-তিন-জন শিম্পাঞ্জী দামামা-**গুলির কাছে বসিয়া হাত-দিয়া বাজাইতে থাকে, অবশিষ্ট শিম্পাঞ্জীরা নাচিতে ও গায়িতে থাকে।** কোন দামামা-বাদক ক্লান্ত হইয়া **পড়িলে, আর একজন গিয়া তাহার স্থানাধিকার করে।** এই-**প্রকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচ-গান চলিতে থাকে।** অনেকদিন-**অবধি লোকে এই কথাটায় বিশ্বাস করিত না, কিন্তু পরিব্রাজকেরা এই কথার সত্যতার প্রমাণ দিয়াছেন।**

বন্য অবস্থায় শিম্পাঞ্জীরা কি করে, সে সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই জানিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু পোষমানা অবস্থায় দেখা গিয়াছে, একটী মাদী শিম্পাঞ্জী তালা-চাবি **খুলিতে শিখিয়াছিল,** ভিজা কাপড় নিঙড়াইতে পারিত, রুমাল দিয়া নাক ঝাড়িত! সে তাহার রক্ষকের বুট-জুতা খুলিয়া লইয়া, যেখানে তিনি নাগা'ল পাইতেন না এমন জায়গায় উঠিয়া পড়িত। তিনি জুতা চাহিলে, সে তাঁহার মস্তক-লক্ষ্যে বিনামা-বিক্ষেপ করিত! আর একটা শিম্পাঞ্জী বেশ শার্সি-পরিষ্কার করিতে পারিত। একটুক্‌রা ভিজা কাপড় লইয়া আঙুলে জড়াইয়া শার্সির কাচগুলি পর পর তাড়াতাড়ি সাফ করিয়া যাইত। লণ্ডনের রিজেণ্ট পার্কে 'স্যালি' বলিয়া একটী শিম্পাঞ্জী ছিল, সে নির্ভুলভাবে পাঁচপর্য্যন্ত গণিতে পারিত,—যত টুক্‌রা খড় চাওয়া হইত, তত টুক্‌রাই দিত।

বুফন-নামে এক পশুতত্ত্ববিদের একটী পোষা শিম্পাঞ্জী ছিল। সে মহিলাদের হাত ধরিয়া তাঁহাদিগকে আহার-কক্ষ্যায় লইয়া যাইত। মেজের কাছে ঐ কপি একটী কেদারার উপরে বসিত, তাহার হাঁটুর উপরে একটী ঝাড়ন বিছাইত, এবং ঐ ঝাড়ন দিয়া মুখ মুছিত। সে আহার-কালে কাঁটা-চামচ-ব্যবহার করিত; একটুও না ফেলিয়া একটী গেলাস মদিরায় পূর্ণ করিত। চায়ের পেয়ালা-পিরীচও আনিতে পারিত, তাহাতে চা ঢালিয়া, চিনি দিয়া, একটু ঠাণ্ডা হইলে, তাহা পান করিত। এক সাহেবের বাগানে একটী পোষা শিম্পাঞ্জী ছিল, সে সাইকেলে চড়িতে পারিত, অধিকাংশ সময়ে তাহার কাছে কেহ থাকিত না। সে যে ভাবে সাইকেলে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, একটুখানি জায়গার ভিতরে সাইকেল ঘুরাইত, তাহাতে বোধ হয়, সাইকেল চড়িতে তাহার আমোদ হইত।

গরিলার অপেক্ষা শিম্পাঞ্জীর হাত দেহানুপাতে বড়, ঝুলাইলে

হাঁটুর নীচে পড়ে। মনুষ্যাকৃতি অন্য সমস্ত কপির মত ইহা তত গাছে চড়ে না। ইহা ঠিক মানুষের মত করিয়া ঘুমায়, অর্থাৎ ইহা মানুষের মত চিৎ হইয়া বা পাশ ফিরিয়া ঘুমায়, প্রায়ই হাতে মাথা দিয়া শোয়। ইহা ইহার আঙুলের শিরা সোজা করিতে পারে না, তাই ইহার হাত মুঠা-করা থাকে। চলিবার সময়ে ইহার পায়ের পাতা প্রায় সমস্তটাই ফেলিয়া চলে, কিন্তু শরীরের তাল সাম্‌লাইবার জন্য ইহাদিগকে হাত-ব্যবহার করিতে হয়। প্রমাণাকার শিম্পাঞ্জী ৩ ফিট্ ৬ ইঞ্চিহইতে ৪ ফিটপর্য্যন্ত বড় হয়।

ওরাং-উটাং শিম্পাঞ্জীর অপেক্ষা একটু বড়। সর্ব্বাপেক্ষা বড় ওরাং-উটাংকে ৫ ফিট ৬ ইঞ্চিপর্য্যন্ত ঢেঙা হইতে দেখা গিয়াছে। সাধারণ লোকে অনেক সময়ে ওরাং-উটাং ও শিম্পাঞ্জীতে প্রভেদ করিয়া উঠিতে পারে না; কিন্তু এই দুইজাতীয় মর্কটকে সহজেই পৃথক্ করা যায়। শিম্পাঞ্জীর কাণ বড়, ওরাং-উটাঙের কাণ ছোট। প্রথমোক্তের গায়ের চামড়া ও চুল কাল, কিন্তু শেষোক্তের গাত্রবর্ণ মেটিয়া এবং ইহার রোমের বর্ণ ইষ্টকবর্ণ।

গরিলা ও শিম্পাঞ্জী কেবল আফ্রিকা-মহাদেশেই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ওরাং-উটাংকে বোর্ণিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে দেখিতে পাওয়া যায়। ওরাং-উটাং প্রায়ই গাছে চড়িয়া থাকে, কেবল জল-পানের নিমিত্ত ভূমিতে নামে। ইহারা একস্থানহইতে অন্যস্থানে যাইতে

হইলে, ইহাদের দীর্ঘপেশীবিশিষ্ট বাহুদ্বারা গাছের ডাল ধরিয়া দোল খাইতে খাইতে যাইতে থাকে; বড় ভারি বলিয়া ইহারা এক-গাছহইতে অন্যগাছে লাফাইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু ইহারা আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত ও অব্যর্থভাবে দোল খাইতে পারে। এই ভাবে ইহারা, মানুষ যত শীঘ্র বনের ভিতর হাঁটিয়া যাইতে পারে, তত শীঘ্রই দোল খাইতে খাইতে একস্থানহইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে। রাত্রিকালে ইহারা গাছের পল্লব ভাঙিয়া, যে স্থানহইতে দুইটি কি তিনটি ডাল বাহির হইয়াছে, সেইস্থানে বিছাইয়া শয়ন করে। এই শয্যায় ওরাং-উটাং চিৎ হইয়া শোয় এবং চতুর্হস্ত-দ্বারা এক-একটি গাছের ডাল ধরিয়া দোল খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়ে।

পুষিলে এই জীবটি ভারি পোষ মানে, মানুষের প্রিয় ও সঙ্গ-প্রিয় হয়। ইহারাও অনেক বিষয়ে সত্বরই মনুষ্যবৎ আচরণ করিতে অভ্যস্ত হয়।

বজ্রভীতি।

পাঠক, পাঠিকে, বুদ্ধিবলে মানুষ সমগ্র সৃষ্ট জীবহইতে শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য-মধ্যে আবার সকলের জ্ঞান সমান নহে; যাহারা যত তথ্য-সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানের বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহারাই মনুষ্য-সমাজে তত বরণীয় হয়। প্রাকৃতিক ব্যাপারের ধারণা করা আমাদিগের সাধ্যাতীত মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা স্বীকার করেন না। বর্ষাকালে প্রকৃতির যে বিপর্য্যয় বজ্রধ্বনি শুনিয়া আমরা ভীত ও স্তম্ভিত হই, তাহার বিষয় তোমরা কয়জনে আলোচনা করিয়াছ? আজ আমরা সে বিষয়ে কতকপরিমাণে আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।

কেহ কেহ বজ্রধ্বনি শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, এবং গৃহের কোন কোণে, গুপ্ত স্থানে, লুকাইয়া নিজেকে নিরাপদ্ মনে করে। কেহ ভয়ে চক্ষু বুজে, কেহ কর্ণে আঙ্গুল দেয়, কেহ বা চীৎকার করিয়া উঠে। কেহ বা, বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায়, ভীত ব্যক্তি-দিগকে উপহাস করে। প্রকৃত কথা ধরিতে গেলে, বজ্রধ্বনি শুনিয়া ভীত হইবার আমাদিগের কোন কারণ নাই। মেঘে মেঘে অথবা মেঘে পৃথিবীতে ঘর্ষণ হইয়া যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, ইহা তাহার শব্দমাত্র; কিন্তু যে বিদ্যুৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিপতিত হয়, তাহাই প্রকৃত ভয়ঙ্কর বস্তু।

বিদ্যুতের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, আমরা ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

(১) গ্রীষ্মকালে যে বিদ্যুৎবহ্নি সমস্ত মেঘমালাকে আলোকিত করিয়া আকাশ-পথে দৃষ্ট হয়, তাহাহইতে সামান্য-পরিমাণে তাড়িত-প্রবাহ ক্ষরিত হয়, অথবা তাহা সুদূরস্থিত ভীষণ-বিদ্যুৎ-বহ্নির প্রতিক্রিয়ামাত্র। এরূপ তাড়িৎ-প্রবাহ-দ্বারা ভয়ের কোন কারণ নাই এবং ইহা প্রায়ই গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাকালে দৃশ্যমান হইয়া থাকে।

(২) দুই-তিনটি শিখা-বিশিষ্ট তাড়িৎপ্রবাহ, যাহা মেঘ-পথ আলোকিত করে, তাহা অতিভীষণা প্রকৃতির এবং তাহার গতি সর্পের গতির ন্যায় বিসর্পিতা। সুদূর পঞ্চ-ক্রোশ-স্থিত মেঘমালাকে ইহা ভেদ করিয়া চলিয়া যায়।

(৩) তৃতীয়টী গোলার ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং তাহা কচিৎ নয়নপথে নিপতিত হয়। কামানের গোলার ন্যায় ইহা শূন্যপথে দৃশ্য হয় এবং ভূপতিত হইয়া বিদীর্ণ হইয়া যায়। ইহা ভীষণা প্রকৃতির, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ইহা অত্যন্ত বিরল। ইহাকে লোকে বজ্র-দণ্ড বলিয়া থাকে। পৃথিবীতে পতন-কালে যেরূপ অনুমিত হয়, ইহা সেরূপ কঠিন পদার্থ নহে।

বজ্র-পতন-কালে আমাদিগের কিরূপ সতর্কতা-অবলম্বন করা উচিত, সে বিষয়ের এখন আলোচনা করা যাউক; ইহাদ্বারা আমরা অশেষবিধ উপকার-লাভ করিতে পারিব। পুরাকালে লোকেরা বিশ্বাস করিত যে, গির্জ্জার ঘড়ীর শব্দে, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, বজ্র এবং বিদ্যুতের গতিরোধ হইত। সেই বিশ্বাসে তাহারা বিদ্যুৎ-পতন-কালে উচ্চশব্দে গির্জ্জার ঘড়ী বাজাইত। বিজ্ঞগণ এক্ষণে ঐ বিশ্বাসকে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

এক্ষণে আমাদিগকে প্রকৃত সাবধানতা-অবলম্বন করিতে হইবে। গৃহে অবস্থিতিকালে তত্রস্থিত বিদ্যুৎ-প্রবাহ-পরিচালক দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করা উচিত, তাহাতে আমাদের দেহে তাড়িৎপ্রবাহ পরিচালিত না হইতে পারে।

উষ্ণ বায়ু, ধূম ও ঝুল এবং ধাতুনির্ম্মিত চুল্লী, চুল্লী-অবরোধক দরজা ও লৌহ-দণ্ডসকল বিদ্যুৎ-পরিচালনশক্তিবিশিষ্ট, সুতরাং সেসকল স্থানহইতে আমাদের দূরে অবস্থান করা উচিত। লৌহ-দণ্ডবিশিষ্ট জানালা-দরজাহইতে আমাদের দূরে অবস্থান করা বিধেয়। দর্পণের পশ্চাৎভাগে পারদ লাগান থাকায় বিদ্যুৎ-পরিচালনের কার্য্য হয়, সুতরাং তাহাহইতেও পৃথক্ থাকা ভাল। গৃহের মধ্যস্থলই সকলের অপেক্ষা নিরাপদ্। প্রবল বজ্রপাত-সময়ে গৃহের মধ্যস্থলে একটী শুষ্ক মোটা পাপোষের উপর দাঁড়াইলে, ভাল হয়, যেহেতু তাড়িত-প্রবাহের অপরিচালক বলিয়া শুষ্ক পাপোষ আমাদের দেহে বিদ্যুতাগ্নি-প্রবেশ করিতে দেয় না। ভয়ে গৃহভিত্তি-সংলগ্ন বাসনাদি রাখিবার স্থানে লুকান নির্ব্বোধের কার্য্য। ত্রিতল-গৃহের মধ্যে মধ্যতল নিরাপদ্। উপরিতল সচরাচর বিপদ্সঙ্কুল, যেহেতু উচ্চ-স্থানেই বজ্রপতন হয়।

বহির্দ্দেশে অবস্থানকালে আমরা কতকগুলি সতর্কতা-অবলম্বন করিতে পারি। ট্রেণ, ট্রামগাড়ী প্রভৃতিতে ভ্রমণকালে সোজা হইয়া উপবেশন করা উচিত, ঝুঁকিয়া বসা কোনমতে বিধেয় নহে, যেহেতু গাড়ীর পার্শ্বে এবং পশ্চাৎভাগেই বজ্র-পতন সম্ভব।

হাঁটিয়া বাহিরে যাইবার সময়, বৃহৎ বৃক্ষের পার্শ্বে অবস্থান করা ভাল নহে, যেহেতু উচ্চদ্রব্যাদি বিদ্যুৎ-পরিচালন বিষয়ে পটু নহে; সুতরাং আমাদের দেহ বিদ্যুৎ-পরিচালন-বিষয়ে প্রকৃষ্ট সাহায্যকারী বলিয়া উক্ত তাড়িত-প্রবাহ সত্বর আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। বিদ্যুৎপরিবাহক দণ্ডের নিকট অবস্থান করা কোনমতে বিপজ্জনক নহে; কেননা বিদ্যুৎ-পরিবাহন-বিষয়ে মানবদেহ ঐ দণ্ডের অপেক্ষা অপটু। অনেকে বলেন, অন্যান্য দ্রব্যের অপেক্ষা তাড়িত-প্রবাহ উক্ত দণ্ডেই আকৃষ্ট এবং উহাতেই নিপতিত হয়।

বজ্র-পতন-কালে বৃক্ষের নিকট দাঁড়ানই বিশেষ অনিষ্টকারী। বৃক্ষে যত বজ্র নিপতিত হয়, এমন আর কিছুতেই পতিত হয় না, যদিও কোন কোন বৃক্ষে অন্য অন্য বৃক্ষের অপেক্ষা বেশী বজ্র পতিত হইতে দেখা যায়, তথাপি সম্ভবতঃ কোন বৃক্ষই নিরাপদ্ নহে। Sycamore, holly, elder, ও hornbeam এবং আমাদের দেশের কদলী-বৃক্ষ ও মনসা-গাছে বজ্রপাত হয় না, তথাপি তাহারা একবারে অব্যাহতি পায় না। Oak, ash, larch, ও elm, এবং আমাদের দেশে বট, অশ্বথ, নারিকেল ও তাল-বৃক্ষে সচরাচর বজ্রপাত হইতে দেখা যায়, oak-বৃক্ষ প্রায়ই ইহাদ্বারা বিদীর্ণ হয়। বজ্র-পতন-কালে কেহ কেহ, beech এবং poplar-বৃক্ষে বজ্র-পতন হয় না, এই ধারণার বশীভূত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের তলায় আশ্রয়-গ্রহণ করে, কিন্তু বস্তুতঃ অধিকাংশ সময়েই তাহারা

আহত হয়। যদি ঝঞ্ঝাবাতের সময়ে আমরা বাহিরে থাকি এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন সুযোগ না পাই, তাহা হইলে আমাদিগকে, যতদূর সম্ভব, বৃক্ষ এবং উচ্চ পদার্থহইতে দূরে থাকিতে হইবে। অনেক লোকের এবং জীব-জন্তুর সহিত একত্র থাকা উচিত নহে, কারণ উদ্ধগামী গরম প্রশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া তথায় বজ্রপতন হইতে পারে। উদাহরণ-স্থলে আমরা আমাদের দেশে ঘটিত একটা ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি। হুগলী-জেলার অন্তর্গত জিয়াড়া-নামক স্থানে একটী সামান্যরকমের হাট বসে। বৈশাখ-

মাসে একদিন হাট ভাঙ্গিয়া যাইবার পর প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিপাত-আরম্ভ হয়। মাঠের মধ্যে ক্ষেত-চৌকি দিবার জন্য একটী মাঝারি-রকমের চালাঘর ছিল, বলদিয়ারা গরু লইয়া এবং অন্যান্য হাটের অনেক লোক তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল। যখন ঝড় ও জল প্রবল হইয়া উঠিল, তখন একজন আগন্তুক আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু চালায় এখন আর স্থান না থাকায়, সকলে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে মনস্থ করিল। অনেকে বলিল, এরূপ বদলোকের সঙ্গে থাকিলে, আমরা সকলেই মারা যাইব; উহাকে বিদায় করিয়া দেও। অবশেষে সে বেচারী বিতাড়িত হইল; কিন্তু বিধাতা তাহার অন্য ব্যবস্থা করিলেন, বেচারী নিরাপদে বাড়ী পঁহুছিল; এখানে চালাঘরের উপর বজ্রপাত হইয়া সকলে মারা গেল। ইহার কারণ আর কিছু নহে, অনেকে একত্র থাকায় তাহাদের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে স্থানটী গরম হইয়া উঠে এবং মাঠের মধ্যে সেই স্থানটী উচ্চ বলিয়া উহাতেই বজ্রপাত ঘটিয়াছিল।

মাঠের মধ্যে অবস্থান-কালে যদি ঝঞ্ঝাবাত প্রবল হইয়া উঠে এবং আমরা উপযুক্ত আশ্রয়স্থান না পাই, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গের 'ওয়াটারপ্রুফ'-কাপড়ের শুষ্ক দিকের উপর দাঁড়াইয়া উহা পায়ের উপর জড়াইয়া বাঁধা উচিত। কাঁচকড়াতেও বিদ্যুৎ-পরিচালনশক্তি নাই, সুতরাং কাঁচকড়া ও ওয়াটারপ্রুফ গৃহস্থিত পাপোষের ন্যায় আমাদিগকে বিদ্যুৎহইতে রক্ষা করে। এ সময়ে বড় পুষ্করিণী অথবা অন্য জলাশয়ের নিকট অবস্থান করা ভাল নহে, যেহেতু জলের বিদ্যুৎপ্রবাহিণী শক্তি অধিক এবং জলের নিকটেই উর্দ্ধে অবস্থানহেতু বজ্র আমাদের দেহেও পতিত হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান সময়ের লৌহ-দণ্ড-বিশিষ্ট ছাতা খুলিয়া, মাথায় দিয়া, মাঠে অবস্থান করিতে নাই, কারণ ইহা বিদ্যুৎ-পরিচালন-দণ্ডের কার্য্য করিতে পারে। বজ্র-পতন-কালে ধাতু-নির্ম্মিত কোন দ্রব্য আমাদের সঙ্গে রাখা উচিত নহে। বাড়ীতে থাকিলে, ঘড়ী, চেন, টাকা, পয়সা প্রভৃতি দেহহইতে তফাৎ রাখা কর্ত্তব্য। যাহাদের ঘরে বজ্রপরিচালন-দণ্ড নাই, তাহাদের ছাদের উচ্চস্থানে একটী মনসা-গাছ রাখিয়া দেওয়া ভাল।

বৃক্ষারোহী ব্যাঘ্রমুখে

আর্চ্চি বলিয়া এক কিশোরবয়স্ক যুবক তাহার বন্ধু ডুগ্যাল্ডের সহিত শিকার করিতে যাইবে বলিয়া আর্জেন্টিনায় এক পুরাণো ভাঙা বাড়ীতে রাত কাটাইতেছে। তখন চারিদিক্ স্থির ও স্তব্ধ—জনমানবশূন্য। সূর্য্য সম্প্রতি অস্ত গিয়াছে; পশ্চিমাকাশে তাই মেঘগুলি প্রবালের প্রভা-ধারণ করিয়াছে—সেই রক্তকান্তি মেঘগুলির শোভা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; তাহাদের সেই শোভা দেখিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়। আর্চ্চির আর একা থাকিতে ভাল লাগিতেছে না, সে ডুগ্যাল্ডের আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে সে অনেক নিম্নে মনসা-বনে একটা অদ্ভুত ও তীব্র শব্দ শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শুনিয়া ভয়ে তাহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। উহা মনুষ্য-কণ্ঠ-স্বর নহে, উহা কোন ভয়াকুলিত অশ্বতরেরও চীৎকার নহে। পর-মুহূর্ত্তেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। ডুগ্যাল্ডের প্রিয় অশ্বতরটি ভগ্নগৃহের দিকে ছুটিয়া আসিল, তাহার পিছনে পিছনে একটা প্রকাণ্ড জ্যাগুয়ারও (আমেরিকার বৃক্ষারোহী ব্যাঘ্র) দেখা দিল।

ভগ্ন-গৃহটির নিকটে পঁহুছিবামাত্রই সেই ভয়ঙ্কর পশুট অশ্বতরের উপরে লাফ দিল। তাহার থাবার আঘাতে অশ্বতরের গা দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, পরমুহূর্ত্তেই ব্যাঘ্রটা কিন্তু ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, তাহার একটা চোকে, দেখিয়া বোধ হইল, আঘাত লাগিয়াছে। তাহার বিষদন্ত-পূর্ণ মুখের চারিপার্শ্ব-সংলগ্ন ফেণের সহিত রক্তের মিশ্রণ হইল। অশ্বতর পাহাড়ের পরপার্শ্বে পলাইয়া গিয়া বাঁচিয়া গেল। জ্যাগুয়ারটা তখন আর্চ্চির কম্বলের উপর যত রাগ ঝাড়িতে লাগিল, কারণ আর্চ্চি তাহার কম্বল ও বন্দুক সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

আর্চ্চি ভয়ে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহার সেই ভয়ভাব বেশিক্ষণ রহিল না; কোনরকমে কোন স্থানে গিয়া তাহাকে নিরাপদ্ হইতে হইবে। সেই ভগ্নগৃহটি ছাড়িয়া গেলে, মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু সেখানে থাকাও সম্ভবপর নহে। দেখ, জ্যাগুয়ারটা ইতোমধ্যেই তাহার গন্ধ পাইয়াছে, সে ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাহার পর সোজা জানালার দিকে ছুটিয়া আসিল। তখন কে যেন আর্চ্চির কাণে কাণে বলিতে লাগিল, গাছে উঠ, গাছে উঠ! আর্চ্চি খুলা জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িল। বাঘটা ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই আর্চ্চি অননুভূতপূর্ব্ব বলের সহিত একটা গাছের নীচের ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া তাহার উপর উঠিয়া পড়িল। সে বার বার বাঘের হাঁক শুনিতে পাইল,—প্রথমে ভাঙ্গা বাড়ীতে, তাহার পর গাছের তলায়, তাহার পর গাছের উপরেই! আর্চ্চি ক্রমশঃ গাছের উপরকার, তাহার উপরকার ডালে উঠিতে লাগিল। শেষে সে এমন ডালের কাছে পঁহুছিল, যে ডাল তাহার ভার সহিতে পারিবে না; তাহার পিছনে পিছনে তাহার যম, যতটা ভীষণতার কল্পনা করা যাইতে পারে, ততই ভয়ানক মূর্ত্তি ধরিয়া, যাইতেছে। ইহার মধ্যেই সেই

ভয়ঙ্কর জীবটা এত নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে যে, আর্চ্চি তাহার চক্‌চকে চোক দেখিতে আর নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছে। আর্চ্চি সে জ্যাগুয়ারটার মুখ দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িয়াছে; জানোয়ারটা তখন তাহার অতি নিকটে—সে যে ডালে আছে, সেই ডালেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর সে সেই ডালের ডগার কাছে কোন্‌খানটা ধরিবে, ধরিলে কি বড় যন্ত্রণা হইবে, আমাকে কি আমার নিজের হাড়ের মড়মড়ানি শুনিতে হইবে, তাহার পর কি আমি হতজ্ঞান হইয়া হত হইব? ওঃ জ্যাগুয়ারটার দাঁতগুলা কি ভয়ানক! বাঘটার মাথাটা কি চৌড়া, সে যখন দাঁত বাহির করিতেছে, তখন কি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে! কিন্তু তাহার মাথার ঘা-

বসিয়া আছে; কাজেই তাহার ভ্যাবাচাকা লাগিয়া গিয়াছে। সে যেন তখন একটা উৎকট স্বপ্ন দেখিতেছে। সময় বহিয়া যাইতেছে, জ্যাগুয়ারটা তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িতেছে না, কাজেই সে হতবুদ্ধি হইয়া, প্রায় প্রশান্তভাবে, তাহার অদৃষ্টে কি আছে, তাহাই ভাবিতেছে। সে তখন ভাবিতেছিল, বাঘটা প্রথমে আমার হইতে টপ টপ করিয়া কত রক্ত পড়িতেছে! সেই রক্ত ঝরিয়া গাছের তলায় শুষ্ক পত্রের উপর পড়ায় শব্দ সে শুনিতে পাইতেছে।

বাঘটা লাফাইয়া তাহার উপরে পড়িয়া তাহাকে নিকাশ করিয়া ফেলিতেছে না কেন? কেনই বা সে—কিন্তু, দেখ, দেখ, বাঘটা

ডাল ছাড়িয়া মড় মড়-শব্দে নীচে পড়িয়া গেল, মাটীতে ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহাও সে শুনিতে পাইল।

বাঘটা সত্য সত্যই অক্কা পাইল। অশ্বতরের পদাঘাতে তাহার মস্তিষ্ক চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

"আর্চ্চি, আর্চ্চি, কোথায় তুমি?" উহা ডুগ্যাল্ডের কণ্ঠস্বর। শেষ-কথাটা ডুগ্যাল্ড চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল

তখন আর্চ্চির হৃদয়হইতে ভয় দূর হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হইল।

সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"এই যে এখানে, ডুগ্যাল্ড, উপরে নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে আছি!"

পুষ্পের প্রভাব

শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের কিছু দেবত্র জমিজমা ও একটি টোল আছে; তিনি আবার অনেক পরিবারের কুলগুরুও বটেন। তর্কালঙ্কার-মহাশয় মুখ্য কুলীন, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি একাদিক্রমে নিরানব্বইটি বিবাহ করেন নাই; সম্প্রতি তিনি আটচল্লিশবৎসর-বয়সে গৃহশূন্য হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তাঁহার পাঁচটী সন্তান,—তিনটি কন্যা ও দুইটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ-সন্তান—কন্যা, নাম পুষ্পলতা; পুষ্পলতার ছোট—কুসুমেষু-কুমার, সে পিতার কাছে টোলে সংস্কৃত পড়ে, তদ্ভিন্ন সে এই বৎসর প্রবেশিকা-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, বোধ হয় বৃত্তিও পাইবে -বড় মেধাবী বালক। তৃতীয় সন্তান আবার একটি কন্যা—নাম প্রীতিলতা, বয়স সাতবৎসর; চতুর্থ সন্তানও কন্যা --নাম প্রেমলতা, বয়স ছয় বৎসর; পঞ্চম সন্তান আর একটী পুত্র—নাম কমলেশকুমার, বয়স তিন বৎসর।

তর্কালঙ্কার-গৃহিণীর মৃত্যু হওয়া-অবধি পুষ্পলতাই তাহার ছোট ভাই-ভগিনীগুলির মাতৃস্থানীয়া হইয়াছে,—সেই তাহাদিগকে লালন-পালন করিতেছে; তাহাকে বালিকা বলিলেও চলে, বয়স অষ্টাদশ-বৎসর। এখনও বিবাহ হয় নাই; কুলীনের ঘরে আঠার-বছরের মেয়ের আইবুড়া থাকা বিচিত্র নহে। কচি মেয়ের ঘাড়ে সংসার পড়িয়াছে, বালিকা কন্যা নিপুণভাবে সংসার চালাইতেছে, ইহাতে পিতা প্রশংসনার কিছুই দেখেন না, মা মরিলে সমর্থ কুমারী-কন্যার ঘাড়ে তো সংসার পড়িবেই, ইহাতে আর সুখ্যাতির কথা কি? তর্কালঙ্কার-মহাশয়ের মনের এই ভাব। কন্যা পুষ্পলতারও ইহার নিমিত্ত কোন মনোকষ্ট নাই। রান্নাবাড়া, ছোট ভাই-বহিনদের নাওয়ান-খাওয়ান, গোহাল-কাড়া, বাসন-মাজা, ঘর-নিকান, আলিপনা-কাটা, ধানভানা, পুকুর-ঘাটহইতে কাঁখে কলসী করিয়া জল-আনা সকলই তাহার একার কাজ; সকলই সে প্রফুল্লমুখে করিতে থাকে, বাড়ীতে আর দ্বিতীয় বয়স্কা স্ত্রীলোক নাই। ভোর ছয়টাহইতে রাত আটটাপর্য্যন্ত সে একটুকুও বিশ্রাম করিবার অবকাশ পায় না; সে বাঙ্গালা-লেখাপড়া বেশ জানে, একটু-আধটু সংস্কৃতও শিখিয়াছে; তাহা-ছাড়া সে বেশ কবিতা-রচনা করিতে পারে; কিন্তু তাহার মা মরিয়া যাওয়া-অবধি বেচারা তাহার কবিতা-রচনার সাধ আর পূর্ণ করিবার কোনই অবসর পাইতেছে না। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পর চারিটি শাকান্ন-ভোজন করিয়া যেই বিছানায় পড়ে, অমনিই নিদ্রাভিভূতা হয়। বেশী রাত জাগিতে সাহস করে না, পাছে ভোরে উঠিতে দেরী হয়।

কুসুমেষুও দিদী যাহা করিতেছে, তাহাতে যে প্রশংসনীয় কিছু আছে, তাহা মনে করে না; সে তাহার দিদীর অপেক্ষা চারবছরের ছোট, তবুও সে তাহার বড় বহিনকে তত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে না; বরং তাহার ভাব এই, দিদী মেয়েছেলে তাহাকে আবার খাতির করিব কি? পুষ্প যদি তাহাকে সৎপরামর্শ দেয়, সে তাহা কাণেই তুলে না, হাসিয়া উড়াইয়া দেয়! দিদী কি জানে? একটু-আধটু বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে পারে মাত্র; আমি যে এ বছর প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ইচ্ছা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যেন ভবিষ্যতে তাঁহার চতুষ্পাঠীর ভার-গ্রহণ করিবার যোগ্য হয় এবং সেজন্য তিনি তাহাকে আরও অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শিখাইতে যত্নবান্। কুসুমেষু কিন্তু চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হইতে চাহে না; তাহার ইচ্ছা সে কলিকাতায় গিয়া ডাক্তারী পড়িবে। সে ভয়ানক স্বার্থপর, প্রথমা কন্যার চারিবৎসর পরে পুত্র কুসুমেষু জন্মিয়াছিল; মাতা-পিতার অতিমাত্র আদরে সে ভয়ানক স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে, আপনার সুখছাড়া সে আর কিছুই খুঁজে না, আপনার বিষয়ে ছাড়া সে আর কাহারও বিষয়ে ভাবে না। অধ্যাপনা-কার্য্যকে সে অতীব ঘৃণার চোকে দেখে, অধ্যাপক-পণ্ডিতদিগকে সে অন্তরের সহিত ঘৃণাই করে।

পরীক্ষার ফল বাহির হওয়া-অবধি কুসুমেষু তাহার পিতাকে তাহার মনের ইচ্ছা জানাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছে; সুযোগ পাইতেছে না। পুষ্পলতা তাহার মনের কথা জানে। সে তাহাকে উৎসাহও দেয় নাই, নিরুৎসাহিতও করে নাই।

তিন-চারিদিন পরে একদিন কুসুমেষু পিতাকে বিরলে পাইয়া কহিল,—"বাবা আমি কল্‌কেতায় গিয়ে ডাক্তারী পড়বার ইচ্ছা ক'রেছি, পণ্ডিতি আমার ভাল লাগে না।"

শুনিয়া পিতা হতভম্ভ হইয়া রহিলেন। চতুর্দ্দশপুরুষযাবৎ এই বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তানেরা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও গুরুগিরি

করিয়া আসিতেছেন, আজ এই অর্ব্বাচীন বালক বলে কি? ইহাকে ইংরাজী-শিক্ষা দিয়া আমি বড় ভুল করিয়াছি; দোষ আমারই, এখন ইহাকে অনুযোগ করা বৃথা। তাহা-ছাড়া পুত্র বাল্য বয়স অতিক্রম করিয়াছে, এখন ইহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিলে, ইহার মন খারাব হইয়া যাইবে। কহিলেন,—"কুসুমেষু, এখন কি তোমার এসকল চিন্তার সময়? এ সময়ে তোমাকে আমি কি ক'র্‌তে বলেছি? স্মরণ আছে কি? সে পুঁথিটার কত-দূর কি হ'ল?"

শুনিয়া কুসুমেষু লজ্জিত হইয়া সেখানহইতে সরিয়া পড়িল। গিয়া পুঁথি নকল করিতে লাগিল। তাহার পর, যথাসময়ে পুঁথি-নকলকার্য্য শেষ করিয়া ঘুমাইতে গেল। পরদিন সকালেই কিন্তু সে আবার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, সে বিষয়ে কি ঠাও-রা'লেন?"

তর্কালঙ্কার। দেখ, আমার ইচ্ছে তুমি কৌলিক ব্যবসায় ধর; কিন্তু তা' যদি তোমার একান্তই মনঃপূত না হয়, তবে তোমার যা' ইচ্ছে হয়, তাই তুমি ক'র্‌তে পার, কিন্তু এখন তোমার বয়স বড় অল্প, কল্‌কেতা বড় কুস্থান, আর টোলেও একটী উপযুক্ত ছাত্রের অভাব আছে। শ্রীনিবাস আগামী বৎসরে তোমার স্থানে কাজ ক'র্‌বার উপযুক্ত হ'তে পারে, সুতরাং আগামী বৎসরে তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার।

কুসুমেষু। আজ্ঞে তা' হ'লে যদি আমি বৃত্তি পাই, তা' আর পা'ব না।

তর্কালঙ্কার। বাপু হে, ঘোড়া হ'লে, চাবুকের জন্যে আট্‌কা'বে না। বৃত্তিটা না পাও, তোমাদের মত নব্য ছোক্‌রারা আমাদের যাই ভাবুক, মা কমলা আমাদের ওপর অপ্রসন্না নন, তোমার কল্‌কেতায় থাকার ব্যয় আমিই বোধ হয় নির্ব্বাহ ক'রে উ'ঠ্‌তে পা'র্‌ব; কিন্তু তা' ব'লে এত অল্প বয়সে তোমাকে আমি ক'ল-কেতায় পাঠিয়ে কুপথে যেতে দিতে পারি না।

কুসুমেষু তাহার পিতার প্রকৃতি উত্তমরূপে অবগত ছিল, সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্ষুণ্ণ-মনে পিতার নিকটহইতে চলিয়া গেল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুষ্পলতাকে সে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত না, তথাপি তাহার এই ধারণা ছিল যে, পিতা তাহার কথা ঠেলিতে পারেন না, অতএব সে তাহাকেই 'মুরুব্বী' ধরিতে গেল। পুষ্প তখন গাভীগুলির দুধ দুহিয়া তাহাদিগকে মাঠে ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে পুষ্পেষু হঠাৎ গিয়া বলিল,—"দিদি, একটা কথা আছে, তোমার একটু ফুরসৎ হ'বে কি?"

পুষ্প। একটু সবুর কর, এই গাইগুলোকে মাঠ-বাগে দিয়ে আসি।

শুনিয়া স্বার্থপর কুসুমেষুর হাড় জ্বলিয়া গেল। দিদী কি করিয়া পথ্য দেখে? এর জীবনটা তো বেজায় গব্যময়! যতক্ষণ পুষ্প না ফিরিয়া আসিল, ততক্ষণ কুসুমেষু অধীরভাবে উঠানময় পরিক্রমণ করিতে লাগিল। পুষ্প ফিরিয়া আসিলে বলিল,—"চল, দিদি, আমবাগান-পানে যাই, একটা কথা আছে, ভারি গোপনীয়।"

এই বলিয়া সে তাহার দিদীর হাত ধরিয়া হিড়্‌হিড়্‌ করিয়া আমবাগানের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া পুষ্প বলিল,—"কি রে ছোঁড়া, আর কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিস? সক্কাল-বেলা, ঢের কাজ প'ড়ে রয়েছে; আয় ঐ নিচুগাছ-তলায় বসি, কি বল্‌বার আছে, ঝট্ করে ব'লে ফেল্।"

পুষ্পের সুন্দর, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, গৌরবর্ণ ললাটে ও ওষ্ঠের উপরে বিন্দু বিন্দু শ্রমনীর শোভা পাইতেছে। তাহার কৃষ্ণকুঞ্চিত অলক-রাজি তাহার মুখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে; তাহার পরণে একখানি কস্তাপেড়ে লাল সাড়ী, আঁচলের খানিকটা কোমরে জড়ান, তাহার প্রফুল্ল অরবিন্দতুল্য মুখে প্রভাতারুণের প্রবালালোক দেদীপ্যমান। কিন্তু ভাইএ বহিনের সৌন্দর্য্য-লক্ষ্য করে না, কুসুমেষুরও পুষ্পের সেই চারু মুখ-শোভার দিকে লক্ষ্য ছিল না।

কুসুমেষু তবু চুপ করিয়া রহিল।

"কি রে কিছুই বলিস্ না যে, চুপ্ ক'রে রইলি কেন? তোর সেই ডাক্তারী শেখবার কথা তো?"

"হ্যাঁ।"

"কি ব'ল্‌লেন বাবা?"

তখন কুসুমেষু সব কথা ভাঙিয়া বলিল, শেষে কহিল,—"দিদি তুমি একবার বাবাকে—"

"তা' আমি কক্‌খনো ব'লব না, তিনি যা' ভাল বুঝেচেন, বলেচেন, তাঁর চেয়ে কি আমি বেশী বুঝি?"

"লক্ষ্মী দিদি, তুমি যদি একথা না বল, তা' হ'লে আমি যাই কোথা?"

পুষ্প ঘৃণাপূর্ণ-নয়নে কুসুমেষুর দিকে তাকাইয়া দুই-হাত-দিয়া দুইটা গাছের শিকড় চাপিয়া ধরিল, কহিল,—"যা'বি কোথা? কেন হেথায়ই থা'ক্‌বি, মানুষের মত হ'বি। একটা বছর তর সইছে না? এ তো দে'খ্‌তে দে'খ্‌তে কেটে যা'বে।"

"তুমি বু'ঝ্‌তে পা'রছো না, দিদি! কত দিনথেকে আমি ডাক্তার হ'ব ব'লে আশা ক'রে আছি, এর জন্যে আমি কত কষ্ট সয়েছি—কত পরিশ্রম করেছি, কখনও একটা আমোদে আহ্লাদে মিশি নি—এখন যদি বা সুযোগ এল—তবুও একবছর এই উঞ্ছ-বৃত্তি ক'রে ম'র্‌তে হ'বে।"

পুষ্পলতা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল,—"উঞ্ছবৃত্তি, বটে? এই উঞ্ছবৃত্তিই আমাদের বংশের জ্যেষ্ঠপুত্রেরা চোদ্দপুরুষথেকে ক'রে আ'স্‌ছেন, তাঁ'দের পায়ের নখেরও যোগ্য তুই ন'স্। ইংরেজী পড়ার ফলে তোর যদি এই বোধ হ'য়ে থাকে যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদের শ্রদ্ধাযোগ্য ন'ন, তবে তোর ইংরেজী পড়ার মুখে ছাই! 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্', তা' জানিস্?"

কুসুমেষু দাঁড়াইয়া উঠিল,—"দিদি, আমি কি আমাদের পিতৃ-

পুরুষদের তাচ্ছিল্য কচ্চি? তুমি ওকথা ব'ল না।" দিদী বড়ই রাগিয়া গিয়াছিল, কয়েকটা কথা খুব কড়া কড়া তাহাকে শুনাইয়া দিল। ফলে সে 'ঢিট্' হইয়া গেল। বর্ষকাল সে বিনীতভাবে পিতৃ-আজ্ঞাপালন করিতে লাগিল। বর্ষশেষে সে কলিকাতায় ডাক্তারী পড়িতে গেল। তখন এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়াই মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হওয়া যাইত। পাঁচবৎসর বাদে সে সুখ্যাতির সহিত ডাক্তারী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বগ্রামে আসিয়া ডাক্তারী করিতে লাগিল। তাহার এক সমপাঠী, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রায়ই তাহার সহিত ছুটীর সময় তাহাদের বাড়ীতে আসিত। সেও ডাক্তারী-পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইল। অনবরত কুসুমেষুর সহিত তাহাদের বাড়ীতে আনাগোনা করিতে করিতে সে পুষ্পলতার রূপ ও গুণের পরিচয় পাইয়াছিল, সে কুসুমেষুর অপেক্ষা বয়সে ঢের বড় ছিল, ক্রমে তাহার হৃদয়ে পুষ্পলতার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। পুষ্পলতার অন্য বহিনেরা এখন বড় হইয়াছে,—গৃহকার্য্যে তাহাকে সাহায্য করিতে পারে; পুষ্পলতা তাই আবার কবিতা-রচনা করিবার অবসর পাইতেছে। মিহির-লালের উদ্যোগে তাহার অনেক কবিতা অনেক কাগজে "পুষ্প" এই সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার বেশ একটু যশও হইয়াছে।

মিহিরলাল সেই বিদুষী কুলীন-কন্যাকেই স্বীয় সহধর্ম্মিণী করিয়াছে। পুষ্প তাহার স্বামীর উপরও সৎপ্রভাব-বিস্তার করিয়া তাহার চরিত্রের অনেক দোষ দূর করিতে সমর্থা হইয়াছে।

স্কটীশ্ চার্চ্চেস কলেজের ক্রিকেট-টীম।

এইবার এই টীম ল্যান্সডাউন শিল্ড পাইয়াছে।

বামদিক্ হইতে দক্ষিণে

(পিছনের সারিতে) পি মুখার্জ্জি, বি রক্ষিত, অমরনাথ, জি ব্যানার্জ্জি, এ মল্লিক, আর মিত্র।
(মাঝের সারিতে) জে দত্ত, এস আইকাং, ডাক্তার জে ওয়াট্, পি স্যান্নাল, এস নাগ।
(সমুখের সারিতে) – এস ঘোষ, এস দত্ত।

দিবাস্বপ্ন।

আশা করা অনুচিত নয়, কিন্তু এত অধিক আশা-মদিরা-পান করা উচিত নয় যে, দিবা-স্বপ্ন দেখিতে হয়। দিবা-স্বপ্ন দেখা বড় দোষ। যে অনবরত দিবা-স্বপ্ন দেখিতেছে, সে কাজের লোক নয়, সে কোন কাজ করিতে পারে না। বিস্তর লোক দিবা-স্বপ্ন দেখিয়া মাটী হইয়া গিয়াছে। তাহারা যত বেশী কল্পনা করে, তত বেশী কাজ করে না। শেষে এমন হয় যে, দিবা-স্বপ্ন তাহা-দিগকে একেবারে জড়ীভূত করিয়া ফেলে।

আশা করিতেই হয়, কিন্তু কখন্ আশা করা উচিত? কাজের

আগে, না কাজের পরে? কাজ করিতে থাক, সঙ্গে সঙ্গে আশা করিতে থাক; আশা জীবনে মাধুর্য্য ঢালিয়া দিবে, কিন্তু মাতাইয়া তুলিতে পারিবে না। 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল'—বড় হাসির কথা।

দেখা যায়, অনেক লোক আগে ছিল ভাল, পরে কিন্তু, বিদ্যার অভাবে নয়, বুদ্ধির অভাবে নয়, কি জানি কিসের অভাবে, কেমন একরকম হইয়া যাইতেছে। কিসের অভাবে জানিতে চাও?—কর্ম্মে মনঃপ্রয়োগের অভাবে। যে দিবা-স্বপ্ন দেখে, তাহার মনের বৃত্তিগুলি কেমন শিথিল হইয়া পড়ে, সে কোন কাজই আর মন দিয়া করিতে পারে না।

অতএব যেদিনহইতে দেখিবে, দিবা-স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই দিনটি কাটিয়া গেল, কাজ কিছুই হইল না, সেই দিন-অবধি সাবধান হইও।

কুক্কুর-পালন।

কুকুর পুষিবার সখ অনেকেরই হয়, কিন্তু কুকুরকে যে কত যত্নের সহিত পুষিতে হয়, তাহা অনেকেরই জানা নাই। অনেকেই তাই, না জানিয়া, গৃহপালিত কুকুরগুলির প্রতি বড়ই নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে।

কুকুরের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে, সে তাহার পালকের একান্ত বাধ্য হইয়া উঠে। ছোট বা বড় প্রত্যেক কুকুরের প্রচুর-পরিমাণে শরীর-চালনার প্রয়োজন হয়; সুতরাং কোন কুকুরকে নিরবচ্ছিন্ন পাঁচ-ছয়-ঘণ্টা শিকল-দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, তাহার প্রতি বড়ই নির্ম্মম-ব্যবহার করা হয়; ইহাতে অতি শান্ত-স্বভাব কুকুরও রুদ্রপ্রকৃতি হইয়া উঠে এবং অনেক সময়ে এই কারণেই অনেক কুকুর বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কোন কুকুরকে যদি বাক্সের মধ্যে রাখা হয়, তবে সেই বাক্সটি শুষ্ক ও পরিষ্কৃত আছে কি না, তাহা দেখা উচিত। কুকুরকে নিয়মিত সময়ে আহার দেওয়া উচিত, উহাকে প্রচুর উদ্ভিদ ও অল্প মাংস খাইতে দিতে হয়। পরিষ্কৃত ও টাট্‌কা জলও উহাকে যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, ঐ জল এমন স্থানে রাখা চাই, যেন সে যখনই তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তখনই পান করিতে পায়।

কুকুরের বাক্সটি যদি বহিরঙ্গণে রাখা হয়, তাহা হইলে উহা এমন স্থানে রাখা চাই, যে স্থানটি শুষ্ক ও ছায়াযুক্ত এবং যে স্থানে তাহার গায়ে ঝড়-ঝাপ্‌টা লাগিবার সম্ভাবনা নাই। বাক্সটি এমন স্থানে রাখা কর্ত্তব্য, যে স্থানহইতে কুকুর, ইচ্ছা করিলে, রোদ পোহাইতে পারে, আবার, ইচ্ছা করিলে, ছায়ায় গিয়া বসিতে পারে। বাক্সের মাথায় যদি অনবরত রোদ লাগিতে থাকে, তাহা হইলে বাক্সের অভ্যন্তরস্থ বায়ু দূষিত হইয়া উঠে। এদিকে কুকুরের রৌদ্র-সেবনেরও আবশ্যকতা হয়। অন্যান্য জীবের ন্যায় কুকুরও রোদ-পোহাইতে ভাল বাসে; তাহাছাড়া আমাদের যেমন আলোকের প্রয়োজন হয়, উহারও তেমনই হয়। আবার কুকুরের বাক্সটি এমন আঙ্গিনায় রাখা উচিত, যেখানে জল-নিকাশের সুবন্দোবস্ত আছে। কুকুরকে যদি সুস্থ ও সুখী রাখিতে চাও, তবে তাহার বাক্সটি ভূমিহইতে ছয়-ইঞ্চি উচ্চে রাখিবে। বাক্সের মধ্যে খানিকটা পরিষ্কৃত ও শুষ্ক খড় বিছাইয়া দিবে, প্রয়োজনমত মধ্যে মধ্যে খড় বদ্‌লাইয়া দিবে। বাক্সটি সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত রাখা উচিত, উহা সময়ে সময়ে বায়ুশোধক রসায়নদ্বারা ধৌত করাও বিধেয়। ভালদিনে ঐ বাক্সটিতে কয়েকঘণ্টার নিমিত্ত রোদ-বাতাস লাগান কর্ত্তব্য। বাক্সটি যদি জল-দিয়া ধোয়া হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ উহা না শুকায়, ততক্ষণ কুকুরকে উহার মধ্যে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ তাহা করিলে, উহার বাত প্রভৃতি-ব্যাধি জন্মিতে পারে।

বাড়ীর মধ্যেই যদি কুকুরকে রাখা হয়, তবে তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট ঝুড়ি বা বাক্স থাকা চাই; বাক্সটি এমন জায়গায় রাখা উচিত, যেখানে ঝড়-ঝাপ্‌টা না লাগে; এবং তাহাকে তাহার নিজের বাক্স বা ঝুড়িটি চিনান কর্ত্তব্য। কুকুরের—বিশেষতঃ কুকুরের বাচ্ছার—বাত হইবার ভয় থাকে, এইজন্য উহাকে একটী গভীর ঝুড়ির মধ্যে রাখাই বিধেয়, তাহা হইলে উহা গরমে থাকিতে পায়। ঐ ঝুড়ির মধ্যে একটু ছেঁড়া মাদুর কিম্বা খড় বিছান থাকিলে, আরও ভাল হয়। দিনে একবার ঐ ঝুড়িটি পরিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। যে কুকুর বাড়ীর ভিতরে থাকে, তাহাকে মনুষ্যবৎ আচরণ করিতে শিখান যাইতে পারে; যদি তাহার সহিত সদয়-ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে সে মনুষ্যের উত্তম সঙ্গী হইয়া উঠে, যাহা আদেশ করা হয়, বুঝিতে পারে, যাহা করিতে বলা হয়, করিতে ছুটে; কিন্তু তাহার সহিত যদি নির্দ্দয়-ব্যবহার করা হয়,—তাহাকে যদি সর্ব্বদাই প্রহার ও চীৎকার করিয়া আদেশ-প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সে ভীরু হইয়া পড়ে, তাহাকে যে সমস্ত কাজ করিতে বলা হয়, ভয়ে সে সেসমস্ত কথা বুঝিতে পারে না। কুকুরের সহিত সদয়-ব্যবহার করিলে, কুকুর বড়ই বিশ্বস্ত হয়। ঘরে পুষিবার জন্য ছোট জাতির কুকুরই ভাল, বড় জাতির শিকারী কুকুরদিগকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে।

কুকুরের বাসস্থানের যেমন ব্যবস্থা করা উচিত, তেমনই তাহার আহার ও ব্যায়ামেরও ব্যবস্থা করা বিধেয়। কুকুরকে কখনই যখন-তখন যাহা-তাহা খাইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাকে নিয়মিত-রূপে পাক-করা খাদ্য একবারমাত্র এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাইতে দিলেই, ভাল হয়। খেলা করিবার নিমিত্ত তাহার নিকটে একটী বড় হাড় বা কাঠের দাণ্ডা রাখিয়া দেওয়া উচিত। উহা লইয়া

খেলা করিতে বা কামড়াইতে থাকিলে, তাহার দাঁত শক্ত হয়, তাহা বাড়ীর জুতা ইত্যাদি ছিঁড়িয়া নষ্ট করে না। উহার বাক্স বা ঝুড়ির কাছে একবাটি নির্ম্মল জল ও কয়েকটুক্‌রা কুকুরের ভক্ষ্য বিস্কুটও রাখিয়া দেওয়া উচিত। কুকুরের বাচ্ছাদিগকে দিনের মধ্যে কয়েকবার, ভাল করিয়া জ্বাল-দেওয়া নয়, 'বলক-দেওয়া' দুগ্ধ-পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। মাংস কুকুরের খাদ্য না হইলেই ভাল হয়, ইহাতে উহার চর্ম্মরোগ জন্মে, লোমগুলি কর্ক্কশ হইয়া উঠে, এবং মুখে বড় দুর্গন্ধ হয়। কুকুরের খাদ্য বিস্কুটমাত্রেই কিছু কিছু মাংসমিশ্রিত থাকে, সুতরাং উহা খাইলেই, কুকুরের যথেষ্ট মাংস খাওয়া হয়।

আহারের পর কুকুরকে ব্যায়াম করান কর্ত্তব্য নহে। ব্যায়ামও তাহাকে, যতদূর সম্ভব, নিয়মিতরূপে করান উচিত। ব্যায়াম কুকুরের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে বিশেষ আবশ্যক। কুকুর স্বভাবতঃ চঞ্চল জীব, কাজেই তাহাকে দিবারাত্র শিকলদিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, জীবন্মৃত করিয়া রাখা হয়। সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখিলেই, সে খিট্‌খিটে ও খেঁকী হইয়া উঠে, কখন কখন ক্ষেপিয়াও যায়।

কোন কুকুরকে গাড়ী, ঘোড়া বা বাইসিকলের সহিত ছুটিয়া যাইতে বাধ্য করা উচিত নহে। উহার পায়ের গঠন এমন নহে যে, উহা পাথুরিয়া রাস্তা-দিয়া ছুটিয়া যাইতে পারে।

কুকুরের বাচ্ছাকে কখন মারা বা তাহার কাণ মলিয়া দেওয়া উচিত নহে। তাহার প্রতি সদয়-ব্যবহার করিলেই, সে সব কথা বুঝিতে পারে; মারিলে, ভয়ে বোকা হইয়া যায়।

কুকুরদের ঘন ঘন স্নান করান উচিত নহে। দিনে একবার বুরুশ-দিয়া তাহাদের গা ঝাড়িয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। তাহাদের কুশুম কুশুম গরম জলে কুকুরের সাবান দিয়া স্নান করান উচিত। নাওয়াইবার সময়ে যাহাতে তাহাদের চোকে সাবান না লাগে বা কাণে জল না ঢুকে, সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। কাণের ভিতরটা ভিজা নেকড়া-দিয়া মুছিয়া পুনরায় শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা মুছা কর্ত্তব্য, নতুবা তাহাদের নালী-ঘা হইতে পারে। স্নান করাইয়া তাহাদের গা শুষ্ক কাপড়-দিয়া মুছিয়া তাহাদিগকে কিয়ৎকাল রৌদ্রে রাখা উচিত। পরে গাত্র-রোম শুষ্ক হইলে, তাহাদের দেহ বুরুশদিয়া ঝাড়িয়া দেওয়া উচিত।

কুকুরের মত প্রভুভক্ত জীব আর নাই। তাহার প্রকৃতি অতি উদার, প্রবঞ্চনা-প্রতারণায় ধার দিয়া সে চলে না। সে তাহার শত্রুর কথা যেমন মনে রাখে, তাহার মিত্রের কথাও তেমনই মনে রাখে। সে মনুষ্যের বুদ্ধিমত্তার অংশভাগী হইয়াছে, কিন্তু সে মনুষ্যের ন্যায় মিথ্যাচরণ করিতে জানে না। তুমি কোন লোককে হত্যা করিতে চাহিলে, কোন দুর্ব্বৃত্তকে ঘুষ দিয়া সেই হত্যাকার্য্যে লিপ্ত করাইতে পার, কিন্তু কুকুর কখন তাহার উপকারককে কামড়াইবে না।

কুকুর অল্পাহারী, অল্পক্ষণ ঘুমাইলেই, তাহার শ্রান্তি দূর হয়। সে তাহার প্রভুর বিশ্বস্ত প্রহরী, নিজ প্রাণ দিয়াও প্রভুর ধনপ্রাণ-রক্ষা করিয়া থাকে। এ হেন উদার-স্বভাব জীবের প্রতি মনুষ্যমাত্রেরই সদয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কেবল একটী ও একটু

কেবল একটী কথা তিক্ত কিম্বা কটু
'ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই' করিবারে পটু।
কেবল একটী বার—এই কথা ক'য়ে,
কত লোক একেবারে গিয়েছে গো 'ব'য়ে'!
কেবল আরেকবার ডুব দিতে গিয়া
কত ছেলে ডোবা, গাঙে গেছে তলাইয়া।
কেবল একটী করি' পয়সা ব্যয়িয়া
কত টাকা যায় ক্রমে কোথায় উড়িয়া!
কেবল একটী ফোঁটা মদ খেয়ে, শেষে
কত লোক ঘোরে পথে মাতালের বেশে।
কেবল একটু সর্দ্দি ব'লে হেলা ক'রে
কত লোক, হায়, হায়, যায় শেষে ম'রে!
কেবল একটী কিম্বা কেবল একটু
সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে অনেকটাই কু!

বাইসিক্লিং বা পা-গাড়ীতে বিচরণ।

শিক্ষানবীশদিগের প্রতি সঙ্কেত।

ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসরপূর্ব্বে যেপ্রকার বাইসিকল ব্যবহৃত হইত, সেইপ্রকার বাইসিকল, বোধ হয়, অধিকাংশ বাঙ্গালীর ছেলে কখনও দেখে নাই; দেখিলেই, আশ্চর্য্য হইত। তাহার আগেকার চাকা মস্ত বড় এবং পিছনকার চাকা খুব ছোট ছিল। তাহা এমন উঁচু ছিল যে, 'বালক'-পাঠকদের মধ্যে অনেকে, বোধ হয়, তাহাতে চড়িতে সাহস করিবে না। যাহাই হউক, ঐরকম বাইসিকল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সময়হইতে বাইসিকলের অনেক উন্নতি হইয়াছে; তাহার দরও অনেক সস্তা

হইয়াছে, তাই বিস্তর লোকের বাটীতে এই উপকারী জিনিস পাওয়া যায়। যে দিন ছেলেরা প্রথমে বাইসিকল পায়, সেই দিনটি তাহাদের পঞ্জিকার মধ্যে একটি অতি শুভদিন।

বাইসিকলে চড়িতে শিখিতে হইলে, যে বাইসিকল পাওয়া দরকার, তাহা বলা বাহুল্য। অধিকাংশ ছেলে তজ্জন্য কোন বন্ধুর বাইসিকল-ধার করে কিংবা দোকানহইতে একটী বাইসিকল
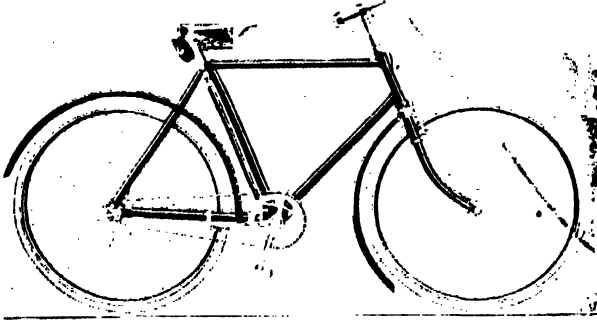
ভাড়া করিয়া লয়। শিখিবার সময়ে যদি এমন একজন বন্ধু সঙ্গে থাকেন, যিনি বাইসিকল-চালনা বেশ জানেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়, কেননা গোড়াহইতে এই কাজটী ঠিক করা চাই। এতদ্বিষয়ে আমাদের প্রথম কথা এই যে, আরোহীর অবস্থান সুবিধাজনক হওয়া দরকার; আসনের উপরে এমনভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে, যাহাতে গুল্‌ফ সহজে 'পেডালে'র উপর বসিতে পারে, নতুবা সে তেমন সহজে বাইসিকল চালাইতে পারিবে না, এমন কি তাহার শরীরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইবে। আরোহী যেন সুবিধামতে বসিতে পারে, তজ্জন্য জীনটা ঠিক করিতে হইবে।

হাতল-দণ্ড আরোহীর আসনের অপেক্ষা একটু উঁচু থাকা চাই; তাহা হইলে আরোহীর শরীরের অবস্থান সহজ, স্বাভাবিক ও সুবিধাজনক হইবে। আরোহীর আসন হাতলের খুব কাছে থাকিলে, তাহার সুবিধা হইবে না, কাজেই এ বিষয়েও মনোযোগ করা আবশ্যক।

বাইসিকলের সব অংশ ঠিকঠাক করা হইলে পর, আসল কাজ-আরম্ভ হইবে। বাইসিকলে চড়িতে শিখিতে হইলে, দুইটী গুণ—অর্থাৎ সাহস ও স্থিরতা আবশ্যক হইবে। বাইসিকলে চড়িবার সময়ে কেমন করিয়া স্থির থাকিতে হইবে, তাহা বুঝিতে ইচ্ছা করিলে, একটী কাজ করিতে পারা যায়। হাতল ধরিয়া ধাপের (আরোহণকারীর সুবিধার জন্য যে ছোট লৌহ-খণ্ড বাইসিকলের পিছনকার চাকাতে লাগান আছে, তাহারই কথা হইতেছে) উপরে বাঁ-পা দিয়া কএকটী লাফ দেও। তাহার পর ডাইন-পা উঠাইয়া ধাপের উপর ভর দিয়া বাইসিকলকে অমনই চলিতে দেও। গাড়ী বাঁ-দিক্ বা ডাইন-দিকে পতনোন্মুখ হইয়া গেলে, তাহা যেদিকে পড়িবার মত হইয়াছে, সেইদিকে হাতল ঈষৎ ফিরাইয়া দেও, তাহা হইলে গাড়ী আবার সোজা হইয়া চলিবে এবং তুমি রক্ষা পাইবে। এইরূপে কএকবার অভ্যাস করিলে পর, তুমি ক্রমশঃ অক্লেশে আসনের উপরে বসিয়া পেডাল-ব্যবহার করিতে শিখিতে পারিবে।

তোমার শিক্ষা এপর্য্যন্ত হইলে, একজন বন্ধুর সাহায্য তোমার অনেক উপকারে আসিতে পারে। সাহায্যকারী বন্ধু ডাইন-হাতে জীনের পিছন-ভাগ ধরিয়া বাঁ-হাত তোমার বাঁ-কনুইএর কাছে রাখিবেন, তাহা হইলে বাইসিকল এদিক্ বা ওদিকে হঠাৎ পড়িয়া গেলে, তিনি তোমার পতন-নিবারণ করিতে পারিবেন।

অনেক বাইসিকলের ধাপ নাই বলিয়া, শিক্ষানবীশকে হয় ত আরোহণ করিবার অন্য উপায় করিতে হইবে। এরূপস্থলে সে বাইসিকলটি একখান বড় পাথর বা অন্য সুবিধাজনক জিনিসের কাছে দাঁড় করাইয়া বাঁ-পা পাথরে ঠেকাইয়া আসনের উপরে সোজা হইয়া বসিবে। তাহার অবস্থান ঠিক হইলে পর, সে ডাইন-পা-দিয়া পেডাল নামাইয়া, বাঁ-পা উঠাইয়া অন্য পেডালের উপরে বসাইবে। ইহা প্রথমে কঠিন-বোধ হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু অভ্যাস করিলে পর, তুমি সহজে এইরূপে চড়িতে পারিবে।

বলা বাহুল্য, বাইসিকলে চড়িতে শিখিবার জন্য নির্জ্জন স্থানে যাওয়া ভাল; যেস্থানে যাত্রীরা অনবরত যাতায়াত করিতেছে কিংবা গাড়ীর ভীড় বেশী, সেস্থানে যাওয়া উচিত নহে। তাহাছাড়া জায়গাটী একটু প্রশস্ত হওয়া চাই। শিক্ষানবীশ আশা করিতে পারে না যে, সে কখন পড়িয়া যাইবে না, কিন্তু কএকবার পড়িলেও, সম্ভবতঃ কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে না, বিনা কষ্টে কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হয় না। বাইসিকলে একরকম ভাল করিয়া চড়িতে শিখিলে পর, একজন নিপুণ আরোহীর পরামর্শ লইলে, ভাল হয়। তিনি সম্ভবতঃ তোমাকে তোমার দোষসকল দেখাইতে পারিবেন, আর এমন পরামর্শ দিতে পারিবেন, যাহা তোমার অনেক উপকারে আসিতে পারে।
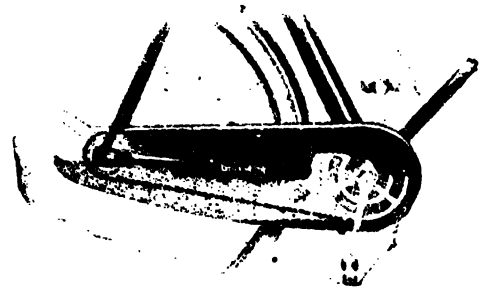
তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর, তুমি স্বভাবতঃ বন্ধুর গাড়ীতে না চড়িয়া নিজে একটি বাইসিকল পাইতে চাহিবে। যেপর্য্যন্ত না তোমার নিজ বাইসিকল হইবে, সেইপর্য্যন্ত তুমি সন্তুষ্ট হইবে না। বাইসিকল কেমন করিয়া নির্ব্বাচন করিতে হইবে, তাহা এখন বুঝাইয়া দিতেছি। তুমি ছেলে-মানুষ, তাই তোমার বাবা যে বাইসিকলে চড়িয়া বেড়ান, সেই বাইসিকল সম্ভবতঃ তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, কাজেই যদি তিনি দয়া করিয়া তোমাকে আপনার

পুরাতন বাইসিকল দেন, তাহা হইলে হয়ত তোমার সুবিধা হইবে না। পক্ষান্তরে তিনি যদি আরও একটু বেশী দয়া করিয়া তোমাকে কোন ভাল দোকানে লইয়া যান, তাহা হইলে তোমার বেশ সুবিধা হইতে পারে!

আজকাল বাইসিকল খুব সস্তা দরে পাওয়া যায়, কিন্তু সাবধান হইতে হইবে, যেন খারাব জিনিস-খরিদ না কর। অল্প দামে খারাব বা নিরেস জিনিস-খরিদ করার অপেক্ষা বরং কিছু বেশি টাকা-খরচ করিয়া ভাল জিনিস কেনা ভাল। Free-wheel থাকিলে, তোমার সুবিধা হইবে; তাহাছাড়া বাইসিকল থামাইবার জন্য দুইটী ভাল 'ব্রেক' থাকা চাই। Gearএর মাপ দেশের প্রকৃতির উপর অনেকটা নির্ভর করে; সেই বিষয়ে কোন নিপুণ আরোহী বা বিশ্বস্ত দোকানদারের পরামর্শ-জিজ্ঞাসা করিলে, ভাল হয়। তুমি ছেলেমানুষ বলিয়া, তোমার বাইসিকলের বড় উঁচু gear না থাকা ভাল। অনেক আরোহী gear-case (গিয়ারের ঢাকা) পছন্দ করেন; তাঁহারা মনে করেন যে, ঐপ্রকার আবরণ থাকিলে, বাইসিকল আরও ভাল করিয়া চলিবে ও বেশিদিন থাকিবে। পক্ষান্তরে, তোমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, উহা থাকিলে, বাইসিকল আরও ভারী এবং তাহার দর বেশী হইবে।

বালক শিক্ষা

এই বালকের রচনাটি সংশোধিত না করিয়া পত্রখানি-সমেত অবিকল মুদ্রিত করিলাম। রচক "এই ক্ষুদ্র পদ্যটি রচনা করিয়া যারপর-নাই সন্তুষ্ট" হইয়াছে; অতএব, আশা করি, পাঠকপাঠিকাগণও হইবেন। ইতি—"বালক"-সম্পাদক।

সম্পাদক মহাশয়! আমি এই ক্ষুদ্র পদ্যটি-রচনা করিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি; আর আশা করি, আপনিও সন্তুষ্ট হইবেন। যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে পদ্যটি "বালকে" দিবেন। নীচে পদ্যটি লিখিলাম।

আমি "বালক" পড়তে ভালবাসী ভাই। মাসে মাসে দুই পয়সা করে কিনি তাই॥
"বালকে" এমন মজা বলব কিরে ভাই। 'বালক" পড়লে অনেক শিক্ষাও পাই॥
এই খানেতে কত মজা পাবে দেখিতে। শিক্ষাও আছে ভাই তার সঙ্গে সঙ্গেতে॥
প্রত্যেক মাসে যদি ভাইরে কেন তুমি। কত মজা যে পাবে, যেমন পাচ্ছি আমি
লাল-মলাটে যে ছেলে ভুলাচ্ছে তা নয়। মাসে মাসে কিনে দেখ কত ভাল হয়
একখানা পড়ে কিছুই পাবে না টের। মাসে মাসে পড়ে যাও তবে পাবে টের
লাল-মলাট দেখে ভাই, কিন না তুমি। শিক্ষা পাবে ব'লে কেন রে, বল্‌ছি আমি॥
"বালকে" যে কত মজা, বলতে গেলে ভাই। হাসী লাগে, লজ্জাও লাগে বলি না তাই॥
যা হউক তুমি মাসে মাসে কিন ভাই। "বালকে"র নিন্দা যেন শুনিতে না পাই॥
জান না তুমি কত ফল "বালকে"তে। পাবে টের যাওরে মাসে মাসে কিনিতে॥
লাল মলাট যদিও রসগোল্লা নয়। তবু তাতে অনেক গুণ পাওয়া যায়॥
মাসে মাসে তুমি "বালক" কিন ভাই। এইটুকু অনুরোধ; তবে Good-by. ইতি

বালক বিনোনী অনিলকুমার শাহ।

গরমীর ছুটী।

এই চিত্রাবলম্বনে লঘু ত্রিপদীচ্ছন্দে একটি হাসির কবিতা-রচনা করিতে হইবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটি বালকে প্রকাশিত হইবে এবং রচক বা রচয়িত্রী পুস্তক-পারিতোষিক পাইবেন।

(১) রচনাটি ২০ পংক্তির অধিক হইবে না। (২) কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত রচনা পঠিত হইবে না। (৩) প্রত্যেক রচককে তাহার নাম, ঠিকানা ও বয়স রচনার নিম্নে লিখিয়া দিতে হইবে। (৪) রচনাটি মে-মাসের শেষ-তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই।

"বালক"-সম্পাদক—২৩ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

৩য় বর্ষ।] জুন, ১৯১৪। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কুড়ানী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

১৩

সকালবেলা সূর্য্য দেখা দিতে না দিতেই, শিকারী মণিরামের ঘুম ভাঙ্গিল। কথা আছে যে, এদেশের লোকেরা ছেলেপিলের অপেক্ষাও ঘোড়াকে বেশী ভালবাসে, তাই চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে মণিরাম সকলের আগে ঘোড়া দেখিতে গেল। ঘোড়া নাই।

পাখীর পক্ষে ডানা যেমন, এই লোকদের পক্ষে ঘোড়া তেমনি। নৌকা না হইলে বর্ষাকালে যেমন পূর্ব্ববাঙ্গালার লোকদের কোন কাজ চলে না, ঘোড়া না থাকিলে তেমনি এই লোকেরা অচল। মণিরাম ঘোড়ার বিরহে সাত-পাঁচ ভাবিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, দূরে মাঠে ঘোড়াটা ঘাস খাইতেছে। খাইতে খাইতে সরিয়া আরও দূরে গিয়া পড়িতেছে। ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিতে পাইল, ঘোড়া দড়ি টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দড়ি যদি খোঁটার সঙ্গে বাঁধা থাকিত, তাহা হইলে মণিরাম বুঝিতে পারিত যে, গলার বাঁধন কোনরকমে খুলিয়া যাওয়াতে ঘোড়া পলাইয়াছে, সুতরাং ধরা অসাধ্য; কাজেই ঘোড়া-ধরার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে শিয়ালের গর্ত্ত খুঁজিতে লাগিয়া যাইত, চেষ্টা করিলে নিকটেই গর্ত্ত পাইয়া শিয়ালের বাচ্ছাগুলিকে হাত করিতে পারিত। ঘোড়ার গলায় লম্বা দড়ি রহিয়াছে, কাজেই ধরা সহজ। তাই মণিরাম ঘোড়া ধরিতেই গেল।

এ সংসারে "প্রায়"-কথাটা বড় সর্ব্বনেশে। মণিরাম ঘোড়া ধরিবার চেষ্টায় গেল। যেই সে ঘোড়ার গলার দড়ি ধর ধর হয়, ঘোড়াটা অমনি দু'-দশ-পা চলিয়া যায়। এইরূপ করিতে করিতে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ গ্রামে যাইবার পথে আসিয়া পড়িল। এই অবস্থায়, পাছে "একূল-ওকূল" দুইকূলই যায়, ভাবিয়া, মণিরাম ঘোড়ার পিছনে পিছনে গ্রামের দিকে চলিল।

কিন্তু এইভাবে ক্রোশ-তিনেক পথ গেলে পর, মণিরাম ঘোড়াটাকে ধরিয়া ফেলিল। সে ঘোড়ার নীচেকার থুৎনিতে কসিয়া দড়ি বাঁধিয়া ঘোড়ার খালি পীঠে চড়িল। ক্রোশদেড়েক অন্তর এক চা-বাগান ছিল। সেইদিকে ঘোড়া ছুটাইল। যাইতে যাইতে ঘোড়ার বাপন্ত, চৌদ্দপুরুষান্ত করিতে লাগিল। কলিকাতার গাড়োয়ানদের ন্যায় ইহারাও ঘোড়াকে এইরূপে গালি দিয়া বাহাদুরি দেখায়।

এই বাগানে স্বজাতীয় এক সর্দ্দারের ঘরে গিয়া মণিরাম দু'টী গরম গরম ভাত খাইয়া লইল। সর্দ্দারের একটা ভাল শিকারী কুকুর ছিল, সেটা চাহিয়া লইল। আবার লাগাম ও জিন ধার করিয়া লইয়া শিয়ালের গর্ত্ত খুঁজিতে আবার সেইখানে চলিল। শাদা পালখ দেখিয়া দেখিয়া, আসিয়া মণিরাম যেখানে থামিয়াছিল,

সেই স্থানের নিকটেই কুড়ানীর গর্ত্ত ছিল। যদি জানিত মণিরাম শিকারী কুকুরের সাহায্য-বিনাই গর্ত্ত খুঁজিয়া পাইত। এইখান-হইতে একটু দূরে একটা টীকড় ছিল। মণিরাম সেইদিক্‌পানে গিয়া টিকড়ের মাথায় উঠিল। এইখানহইতে দেখিতে পাইল, প্রায় তাহার সম্মুখ দিক্ দিয়া এক শিয়াল বড় একটা খরগোশ মুখে করিয়া ছুটিয়াছে। যেই দেখিল, মণিরাম অমনি বন্দুক ছুড়িল। যেই বন্দুক ছুড়িল, শিয়ালটা অমনি লাফ দিয়া সরিয়া গেল; কুকুরটাও বিকট চীৎকার করিতে করিতে শিয়ালের দিকে ছুটিল। মণিরাম যতদূর পারিল, শিয়াল-লক্ষ্য করিয়া গেল, এবং যাইতে যাইতে সুযোগমতে গুলি করিল, কিন্তু শিয়ালকে লাগিল না। অবশেষে শিয়ালটাকে আর যখন দেখিতে পাইল না, তখন ফিরিয়া শিয়ালের গর্ত্তের দিকে চলিল। কুকুরকে ডাকিল না। ভাবিল, শিয়ালটাকে দেখিতে না পাইলে, কুকুর আপনি ফিরিয়া আসিবে। মণিরাম স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া বরাবর গর্ত্তের মুখেই গেল। সে জানিত, এই গর্ত্তে বিস্তর বাচ্ছা আছে, কারণ সে ধাড়িটাকে শিকার লইয়া এইদিকেই আসিতে দেখিয়াছিল।

তাই সে কোদাল ও শাবলদিয়া সমস্ত দিন শিয়ালের গর্ত্ত খুঁড়িল। নানা লক্ষণ দেখিয়া মণিরামের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এই গর্ত্তে নিশ্চয়ই বাচ্ছা আছে। এই বিশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া বেচারা খুঁড়িতেই থাকিল। সারাদিন খুঁড়িতে খুঁড়িতে হাত ধরিয়া গেল, অবশেষে গর্ত্তের তলা দেখিতে পাইল—দেখিল, তলায় কিছু নাই—তলা শূন্য। মণিরাম বড়ই নিরাশ হইল, আপন অদৃষ্টকে যত পারিল দূষিল। এমন সময়ে পায়ে শক্ত কি ঠেকিল, তুলিয়া আলোতে লইয়া দেখে, তাহারই বড় রাজহাঁসের গলা-সমেত মাথাটা। প্রাণান্ত পরিশ্রমের এই ফল হইল!

১৪

মণিরাম ঘোড়া ধরিবার জন্য বাহির হইলে, কুড়ানী নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিল না। কৃষ্ণসার বড় একটা ভাবিত ছিল না, কিন্তু কুড়ানী পাকা কাজ করিতে চাহিল। নূতন গর্ত্ত ঠিকঠাক করিয়া, সে পালথ-ছড়ান গুহায় বাচ্ছাদের কাছে গেল। গর্ত্তের মুখে গিয়া একপ্রকার শব্দ করাতেই, একটা বাচ্ছা লাফাইয়া মায়ের কাছে আসিল। এ বাচ্ছাটার মাথাও ঠিক মায়ের মত চোড়া। কুড়ানী ক্যাঁও-ক্যাঁও করিয়া কি যেন বলিয়া, ঘাড়ের চামড়া কামড়াইয়া ধরিয়া বাচ্ছাটাকে লইয়া নূতন গর্ত্তের দিকে মাঠ-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ছুটিল। নূতন গর্ত্ত নিতান্ত কাছে নয়, ক্রোশখানিক দূরে। খানিকদূর গিয়া বাচ্ছাটীকে এক-এক-বার ছাড়িয়া দেয়, এই অবসরে ধাড়ী-বাচ্ছা উভয়েই এক-এক-বার হাঁফ ছাড়িয়া লয়। ইহাতে একটু বিলম্ব হইল। আবার কৃষ্ণসারকে বাচ্ছা লইয়া যাইতে দিল না—সে শক্ত করিয়া কামড়াইয়া ধরিবে বলিয়া—কাজেই বাচ্ছা-গুলিকে নূতন "বাড়ীতে" লইয়া যাইতে সমস্ত দিন লাগিল। কুড়ানী প্রথমে যেটাকে নূতন "বাড়ীতে" লইয়া গিয়াছিল, সেটা তাহার "জ্যেষ্ঠ পুত্র"। পরে এক এক করিয়া আর সাতটাকে লইয়া গেল। যখন পাঁচটা বাজে বাজে, তখন কেবল সকলের ছোটটী বাকি ছিল। কুড়ানী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়াছে, তাহার পরে সমস্ত দিন আটটী বাচ্ছাকে বহিয়া নূতন "বাড়ীতে" লইয়া গিয়াছে। আসা-যাওয়াতে, কম হইলেও, চৌদ্দ-পনের ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইয়াছে। একটীবারও কিন্তু বিশ্রাম করে নাই। এক্ষণে বেচারী যেই বাচ্ছাটীকে মুখে করিয়া গুহার বাহির হইল, অমনি গুহার উপরে দেখে, শিকারী কুকুর; কুকুরটার পিছনে একটু দূরে মণিরাম ব্যস্তভাবে আসিতেছে।

বাচ্ছাটী মুখে করিয়া কুড়ানী ছুটিল, তাহার পিছনে পিছনে শিকারী কুকুরও বায়ুবেগে দৌড়িল। আবার মণিরাম কুড়ানীকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিল।

কিন্তু বন্দুকের গুলি কুড়ানীর গায়ে লাগিল না। কুড়ানী পাহাড়-তলি ভাঙ্গিয়া ছুটিল, বন্দুকের "পাল্লা" এড়াইল। এক্ষণে এক মাঠে পড়িল, কুড়ানী বাচ্ছাটী মুখে করিয়া প্রাণপণে দৌড়িল, পিছনে কুকুর, আর কুকুরের বিকট ঘেউ-ঘেউ-ডাক। বেচারী দিবারাত্র খাটিয়া ক্লান্ত, নহিলে এই যে কুকুরটা তাড়া করিয়া ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, কুড়ানী কোন্‌কালে এটার চক্ষুর অগোচর হইত। কিন্তু, আগেই ত বলিয়াছি, সে প্রাণপণে ছুটিয়াছে; এক্ষণে এক ঢালু জায়গায় আসাতে কুকুরটা একটু বেশী পিছনে পড়িল। কিন্তু আবার এক বেত-বনে আসিয়া পড়িল, বাচ্ছাকে বাঁচাইবার জন্য একটু সাবধানে দৌড়িতে হইল, তাই কুকুরটা একটু কাছে আসিয়া পড়িল। বেত-বন ছাড়াইয়া তাহারা আবার পরিষ্কার উলু-বনে আসিল। এইবার শিকারী মণিরাম কুড়ানীকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বারকতক বন্দুক ছুড়িল; বন্দুকের শব্দ শুনিয়া কুড়ানীকে আঁকা-বাঁকা হইয়া চলিতে হইল, কাজেই একটু কম অগ্রসর হইতে পারিল, এদিকে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া কুকুরের উৎসাহ বাড়িল। মণিরাম দেখিয়াই চিনিল—এ তাহারই লেজকাটা কুড়ানী, এখনও খরগোশের বাচ্ছা মুখে করিয়া আপন বাচ্ছাদের খাওয়াইতে যাইতেছে—মণিরাম জানিত না যে, কুড়ানী নিজের বাচ্ছা মুখে করিয়া নূতন বাড়ীতে যাইতেছিল। সে এবং কুড়ানীর অধ্যবসায় দেখিয়া চমৎকৃত হইল। সে ভাবিল, যখন প্রাণ লইয়া টানাটানি, তখন মুখের বোঝাটা ফেলিয়া দেয় না কেন? কিন্তু কুড়ানী মুখের বাচ্ছা মুখে করিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া বরাবর দৌড়িতে লাগিল। ঘোড়া সঙ্গে নাই বলিয়া, মণিরাম কত দুঃখ করিল। কুকুরটা আরও বেগে ছুটিল—হাত-কুড়িক অগ্রসর হইলেই, কুড়ানীকে ধরিয়া ফেলে। এমন সময়ে কুড়ানী দেখে, সম্মুখে এক ঝর্ণা—নিতান্ত খাড়া। বড় ক্লান্ত, মুখে বাচ্ছা, নহিলে এক-লাফে পার হইয়া যাইত, কাজেই একটু ঘুরিয়া চলিল; কিন্তু কুকুরটা অক্লান্ত, লাফ দিয়া ঝর্ণা পার হইল। এখন কুকুর-

হইতে' কুড়ানী হাত-দশেক অন্তর। কিন্তু বেচারী দৌড়িতেই লাগিল, উলু-ঘাস ও মাঝে মাঝে বেতের ঝোঁপ, পাছে বাচ্ছাকে কাঁটার খোঁচা লাগে, তাই নিজের মাথা খাড়া করিয়া দৌড়িতে হইতেছে; কিন্তু বেশী কশিয়া ধরাতে বাচ্ছাটার যেন শ্বাসবন্ধ হইয়া আসিতেছিল। এখন কোথাও না নামাইলে, দম-বন্ধ হইয়া বাচ্ছাটা মারা যাইবে। বাচ্ছাটা মুখে ছিল বলিয়াই, কুড়ানী কুকুরটাকে ছাড়াইয়া বেশী দূর যাইতে পারে নাই। এ সময়ে ডাকিয়া উঠিতে পারিলে, কৃষ্ণসার আসিয়া উপকার করিতে পারে, কিন্তু মুখে বাচ্ছা, ডাকিবে কেমন করিয়া? বাচ্ছাটা ভাল করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার জন্য ছট্-ফট্ করিতে লাগিল, এবং কুড়ানীও ডাকিবার চেষ্টা করাতে যেই একটু ঢিল দিল, বাচ্ছাটা অমনি মুখ-হইতে ঘাসের উপর পড়িয়া গেল। নির্দ্দয় শিকারী কুকুর বাচ্ছা-টাকে ধরে আর কি। কুড়ানী কুকুরের অপেক্ষা ঢের ছোট; ছোট হইলেও এপ্রকার কুকুরের সঙ্গে কুড়ানী "দুই-হাত লড়িতে" পারে। কিন্তু বাচ্ছাটাকে—"কোলের শিশুটাকে" রক্ষা করাই তাহার এক-মাত্র উদ্দেশ্য। এক্ষণে কুকুরটা লাফ দিয়া আসিয়া যেই বাচ্ছাটাকে কামড়াইয়া ধরিবে, কুড়ানী অমনি বিদ্যুৎবেগে গিয়া কুকুরের সম্মুখে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া দাঁড়াইল—সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত। সে যেন বলিল, প্রাণ থাকিতে বাচ্ছাটাকে তোকে স্পর্শ করিতে দিব না। কুকুরটা যে খুব সাহসী, তা নয়; শিয়ালটা তাহাহইতে অনেক ছোট, আর শিকারী পিছনে আসিতেছে, এই তাহার ভরসা; নহিলে কোন্ কালে "রণে ভঙ্গ" দিয়া পলাইত; কিন্তু লোকটা এখন অনেক দূরে। আর কুড়ানীর সাহস দেখিয়া বাধা পাওয়াতে কুকুরটা একটু থমকিয়া গেল। বাচ্ছাটাও উলু-ঘাসের মধ্যে গিয়া লুকাইল। ইতোমধ্যে কুড়ানী প্রাণপণে জোরে ডাকিয়া, কৃষ্ণসারকে বিপদ্ জানাইল। চারিদিকে বড় বড় টিলা ও টীকড়, চারিদিকে এই ডাকের প্রতিধ্বনি হইল। কাজেই ডাক শুনিতে পাইলেও, কোন্ দিকে যে শিয়াল ডাকিল, মণিরাম তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু যাহার উদ্দেশে ডাকা হইল, সে নিকটেই ছিল, এবং শুনিতে পাইল, ও কোন্‌দিকে শিয়াল ডাকিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিল। কিন্তু দূরে শিকারীর গলা শুনিতে পাইয়া কুকুরের সাহস বাড়িল, সে আবার বাচ্ছাটাকে মুখ হাঁ করিয়া ধরিতে গেল। কিন্তু কুড়ানী আবার [illegible] করিয়া কামড়াইতে যাওয়াতে, শিয়ালে কুকুরে তুমুল সংগ্রাম-আরম্ভ হইল। কুড়ানী মনে মনে বলিল, যদি কৃষ্ণসার আসিয়া পড়ে, তবে রক্ষা; কিন্তু কেহ আসিল না—আর এ যুদ্ধে মুখই ব্রহ্মাস্ত্র, সেই অস্ত্রের যখন অবিরাম চালনা হইতেছে, তখন আর ডাকিবারও উপায় নাই। মল্লযুদ্ধে যে বড় ও ভারী, তাহারই জয়; কুড়ানীকে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া কুকুরটা তাহার উপরে উঠিয়া কামড়াইতে লাগিল। কিন্তু কুড়ানী শেষ-পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুঝিয়াছে। জয় হইল দেখিয়া কুকুরের সাহস দ্বিগুণ হইল।

কুকুর ভাবিল, আগে এটাকে মারিয়া ফেলিয়া, পরে বাচ্ছাটাকে মারিবে। তাই সে প্রাণপণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। আর কোনদিকে তাহার কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করিবার অবসর রহিল না। এমন সময়ে এই কুকুরেরই মত হৃষ্টপুষ্ট ও প্রকাণ্ড এক শিয়াল নিকটবর্ত্তী বেতবনহইতে তড়িৎবেগে আসিয়া কুকুরের ঘাড়ে এমন জোরে কামড়াইল যে, কুকুরটাকে ক্যাঁও-ক্যাঁও করিয়া পিছাইয়া পড়িতে হইল। কৃষ্ণসার আবার সেটাকে ধরিয়া কামড়াইতে ও আঁচড়াইতে লাগিল। দেখিতে না দেখিতে কুড়ানীও উঠিয়া কুকুরকে গিয়া ধরিল। দুইটা শিয়ালকে দেখিয়া কুকুরের প্রাণ-পাখী উড়্ উড়্ করিতে লাগিল। সে এখন প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে। দুই-দুইটা শিয়ালের হাত ছাড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব। কুড়ানী আর কৃষ্ণসার বেচারাকে এমন করিয়া ধরিল যে, ঘেউ-ঘেউ করিয়া শিকারীকে এই বিপদের কথা শোনাইতেও পারিল না। শিকারী নিকটস্থ পাহাড়েই ছিল, এসকল ব্যাপার কিছুই জানে না। কুকুর যে বাচ্ছাটাকে মারিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছিল, সেইটার চক্ষের উপরই কুড়ানী ও কৃষ্ণসার কুকুরটাকে কামড়াইয়া, আঁচড়াইয়া শতখণ্ড করিয়া ফেলিল।

অনন্তর কুড়ানী আদরের ধন বাচ্ছাটাকে মুখে করিয়া ধীরে ধীরে নূতন গর্ত্তে লইয়া গেল। সকলে মিলিয়া এখন নির্ব্বিঘ্নে রহিল। মণিরাম ও আর সকল শিকারীর এলাকাহইতে এস্থান ঢের দূর।

এই গর্ত্তে থাকিয়াই বাচ্ছাগুলি বড় হইয়া উঠিল। সেকালে মাঠে, জঙ্গলে থাকিলে, যাহা যাহা জানা আবশ্যক, মায়ের কাছে সে সকল শিখিল। আবার শিকারীরা শেষে যে সকল ফিকির খাটাইয়া শিয়াল মারিত, সে সকলহইতে রক্ষা পাইবার উপায়ও কুড়ানী আপন বাচ্ছাদিগকে বেশ করিয়া শিখাইল। আবার এই সকল বাচ্ছা ধাড়ী হইয়া আপন আপন সন্তানদিগকে সে সকল শিখাইল। এইপ্রকার শিক্ষা পুরুষানুক্রমে চলিতে লাগিল।

আসামের যে যে অঞ্চলে চাএর বাগান হইয়াছে, সেসকল অঞ্চলে আর বন্য মহিষ নাই; বন্দুকের গুলিতে বিস্তর মারা পড়িয়াছে, বাকিগুলি বেশী জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছে। চিতাবাঘ, গণ্ডার, ভাল্লুক আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বন্য কুকুর ত নাই; বন্য ছাগও উচ্চ পাহাড়-অঞ্চলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু শিয়াল-বংশ নির্ব্বংশ হয় নাই। "দেবি সিং"-সাহেবের

"বাঙ্গলা"-হইতে সকাল-সন্ধ্যায় শিয়ালের "সংকীর্ত্তন" এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। শীতকালে ধান পাকিলে, দলে দলে হরিণ আসে, হরিণের লোভে বিস্তর শিয়ালও নানাদিক্‌হইতে আইসে; কিন্তু এখন তাহারা চালাক। শিকারীদের সমস্ত ফিকির তাহারা জানে, সুতরাং প্রায় মারা পড়ে না। অনেক সময়ে শিকারীকে শিয়ালে বিলক্ষণ ঠকায়। চা-বাগানে কাজ করিয়া লক্ষাধিক লোক অন্ন পাইতেছে। বন্য পশু না থাকাতে কৃষকদিগের যথেষ্ট শস্য হইতেছে। মানুষের চালাকী শিখিয়া এক্ষণে শিয়ালেরাও চা-বাগানের ও গ্রামের আশে পাশে থাকিয়া "অন্ন" পাইতেছে। আমাদের কুড়ানী শিয়ালজাতির বর্ত্তমান সৌভাগ্যের মূল।

সমাপ্ত।

তাতারের কথা

তাতারেরা মধ্য-এসিয়ায় বাস করে। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই—ইহারা আমাদের দেশের বেদিয়াদিগের মত যাযাবর জাতি। তাতারেরা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মোঘল-তাতার, কিরঘিস-তাতার, কালমাক্‌-তাতার ইত্যাদি। ইহাদের স্বভাব বড়ই রুদ্র। এক সময়ে মোঘল-তাতারেরা এক মহাজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ভয়ে চীন-সম্রাটকে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক প্রাচীর-নির্ম্মাণ করিতে হয়। ঐ প্রাচীর জগতের আশ্চর্য্য বস্তু-সমূহের অন্যতম। উহা দৈর্ঘ্যে সাড়ে আটশত ক্রোশ, এক-এক-স্থানে উহা এত চৌড়া যে, ছয়জন অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারে। চীনদেশের নগরসমূহের নিকটে উহা নিরেট প্রস্তরের প্রস্তুত, কিন্তু অন্যান্য স্থানে ঐ প্রাচীর মাটী ও রাবিশ-দিয়া গাঁথা। উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

চীন-সম্রাট কিন্তু ঐ প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াও তাতারাক্রমণহইতে অব্যাহতি পান নাই। এখন যিনি চীনের সম্রাট, তিনি তাতার।

এক সময়ে তাতারদের বড় বড় অনেক নগর ছিল, এখন কিন্তু সে সমস্ত নগর আর নাই। এখন আর তাতারদিগের কোন সম্প্রদায়ই বড় জাতি নহে। এখন তাহারা বর্ব্বরজাতি, বড়ই দরিদ্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা যাযাবর জাতি, তাম্বুতে বাস করে। যেস্থানে ইহারা বাস করে, সেই স্থানের আবহাওয়া বড়ই ঠাণ্ডা। সমতলভূমিগুলির উপর দিয়া তুষারার্দ্র বায়ু বহিয়া যায়, তাহাতে লোকে মৃতপ্রায় হইয়া উঠে। শীতকালে যে উত্তরিয়া হাওয়া বয়, তাহা ঐ তাতার-মুলুক হইতেই বহিয়া আসে।

ঐ দেশে বাস করাও যা', আর মেরুপ্রদেশে বাস করাও তা'।

বৃষ্টি ঐ দেশে বহুকাল পরে পরে হয়। দেশ তাই "ধূলায় ধূলাকার" হইয়া থাকে, তাহার উপরে ঝ'ড়ো হাওয়া বহিতে সুরু হয়; ফলে, ধূলার জন্য লোকের চোক-কাণ বাঁচান দায় হইয়া উঠে। দিনের বেলাতেই তখন রাত্রির মত অন্ধকার হইয়া উঠে।

ধূলা আর ঝড় উঠিয়া পরে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হয় না, হয় না, যখন হয়, তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে, লোকে ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবার শিলাবর্ষণ হইতে থাকে, তাহাতে বিস্তর প্রাণহানি হয়।

তাতারেরা দেখিতে অনেকটা চীনাদের মত। তাহাদের হনু বড় উঁচু, চোক বড় ছোট, চুল মিশমিশে কালো; কিন্তু তাহাদের ধরণ-ধারণ চীনাদের মত নয়। ইহাদের প্রকৃতি বড়ই ভীষণ, ইহারা বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। ইহারা কোনপ্রকার বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে চায় না, দেশের মুক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল বায়ুর মত, ইহারাও মুক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল থাকিতে চায়।

চীনারা কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ভালবাসে না। তাহাদের প্রকৃতি আদৌ রুক্ষ নহে। তাহারা গৃহমধ্যে আরামে থাকিতে চায়। তাতারদের মত চীনাদের যদি টো টো করিয়া বেড়াইতে হইত, তাহা হইলে তাহাদের অসুখের সীমা থাকিত না।

তাতারেরা খায় কি? ইহারা মেষ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি পালন করিতে ভালবাসে। তাহাদের চরাণ তাতারদের প্রধান কার্য্য। একস্থানের তৃণলতাদি নির্ম্মূল হইলে, উহারা তাহাদিগকে লইয়া আর একস্থানে গিয়া তাম্বু গাড়ে।

তাতারেরা সিদ্ধ মেষমাংস খাইতে বড়ই ভালবাসে। মেষকে চারিটুক্‌রা করিয়া লৌহ-কটাহে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইলে, এক-এক-টুক্‌রা মাংস কোলে রাখিয়া ছুরী-দিয়া কাটিয়া কাটিয়া খায়। যে জলে মেষমাংস সিদ্ধ করা হয়, তাহাকে উহারা মাংসের ঝোল বলে। সেই জল উপাদেয় বিবেচনায় উহারা বাটি বাটি পান করিতে থাকে।

উহারা প্রচুর দুগ্ধ ও চাও পান করিয়া থাকে। গাইএর দুধ নয়, ঘুড়ীর দুধই তাতারেরা পান করিতে ভালবাসে। তাহারা ভেড়ী ও ছাগীর দুধও পান করে। তাতার-সর্দ্দারের স্ত্রীকে জীবনের প্রতিদিন দুগ্ধ-দোহন-কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতে হয়।

স্ত্রীলোকেরা দুধ জমাইয়া পিঠা করে। দুধ জমাইবার সময়ে মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া তাহাতে কড়া চাপাইয়া দেয়, কড়ার নীচে আগুণ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। একটি ছেলে সেই গর্ত্তের কাছে থাকিয়া আগুণে কেবল কাঠ ও ঘুঁটে যোগাইতে থাকে। অনেক সময়ে তাতারেরা কেবল ঘুঁটে-দিয়াই আগুণ ধরায়।

দুধ টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকে, তাতার-গৃহিনী তখন তাহা কাঠি-দিয়া নাড়িতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে, তোমরা জান, দুধ

জমিয়া যায়। তাহার পর সেই জমাট দুধ চৌকা চৌকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। তাতারেরা এই জমাট দুধের পিঠা খাইতে বড় ভালবাসে।

তাহাছাড়া ইষ্টকাকৃতি চা-ও ইহাদের পেয় পদার্থ। এই চা তত ভাল নয়, শেষ-কুড়ান চা-পাতায় এই চা-এর ইষ্টক প্রস্তুত হয়। এই চা-পাতা অন্য চা-পাতার মত শুকান হয় না, বরং ভিজাইয়া গো-রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া তাল পাকান হয়। তাহার পর, ইটের সাঁচায় ফেলিয়া উহা ইষ্টকাকৃতি করা হয়, পরে শুকাইয়া কঠিন করিয়া ফেলে। কেহ এই চা-পান করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে কুড়ালি-দিয়া কিয়দংশ কাটিয়া লইতে হয়।

কি করিয়া এই চা-পান করা হয়? প্রথমে খানিকটা চা পিষিয়া ফেলা হয়। তাহার পর উহা একটি কড়ায় চড়াইয়া তাহার সহিত খানিকটা ঘোল, খানিকটা ছাতু, একটু লবণ মিশান হয়। উহা আধঘণ্টা-টাক জ্বাল দিয়া নামাইয়া ফেলা হয়, পরে গরম গরমই পান করা হয়।

তাতার-প্রদেশে কি কি জীবজন্তু আছে? অনেকরকম জন্তু আছে। প্রথমে ধর, উট আছে। তাতার-প্রদেশের উটের পিঠে, দুইটি করিয়া কুঁজ থাকে। উটেরা বড় শান্ত-প্রকৃতি। লোক দেখিলে, তাহারা ছুটিয়া তাহার কাছে যায়। খানিকক্ষণ বেশ করিয়া লোকটীকে দেখিয়া তাহারা আবার ঘাস খাইতে আরম্ভ করে। উটই তাতার-জাতির সম্পত্তি। তাতারেরা উটের মাংস খায়। তাহাদের মতে উটের মাংস বড় উপাদেয় খাদ্য। মাদী উটেরা প্রচুর দুগ্ধ দেয়। উহা গাভী-দুগ্ধের ন্যায়ই সুস্বাদু। উটের চামড়া অনেক কাজে লাগে, উহাতে তাম্বু, বস্ত্রাদি ও ঘোড়ার সাজ প্রস্তুত হয়। উটের চামড়ার 'পাট' করিলে, অতি উৎকৃষ্ট চর্ম্ম প্রস্তুত হয়। উট অনেকক্ষণ অনাহারে থাকিতে পারে। ইহার কারণ এই, উহাদের পিঠের উপর যে দুইটি কুঁজ আছে, ঐ দুইটী উহাদের খাদ্যভাণ্ডার-স্বরূপ, উহার মধ্যে প্রকৃতি উহাদের নিমিত্ত খাদ্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ কুঁজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, তাহার প্রত্যেকটি চর্ব্বিতে পূর্ণ। যখন উটের খাদ্য দ্রব্যের অভাব ঘটে, তখন কুঁজের চর্ব্বি উটের উদরে যায়, তাহাতে সে জীবিত থাকে। বেশি দিন অনাহারে থাকিলে, উটের কুঁজ ছোট হইয়া যায়। তখন উহার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত চর্ব্বিই নিঃশেষিত হয়।

উট খাইতে পাইলেও, অল্পাহারেই তুষ্ট; এইজন্য তাতারদের উট পুষিতে বিশেষ ব্যয় হয় না; কিন্তু উট জলপান না করিয়া কেমন করিয়া থাকে? ইহার উদরের দুইপার্শ্বে ছোট ছোট থলিয়া আছে, সেগুলি নির্ম্মল জলে পুর্ণ থাকে। ঐ জল উট উদরে আকর্ষণ করিতে পারে।

মরুভূমির মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত হইলে, কখন কখন কোন কোন পথিককে তাহার প্রিয় উটটীকে মারিয়া তাহার উদর-পার্শ্বস্থ থলিয়াগুলির জলপান করিতে হয়। উট অনেক পথ অক্লান্তভাবে হাঁটিয়া যাইতে পারে। ইহার যেপ্রকার চরণতলের প্রয়োজন, সেইপ্রকারই চরণতল আছে। ইহার চরণ দ্বিখণ্ডিত, অথবা ইহার

চরণে দুইটি অঙ্গুলি আছে। অঙ্গুলি-দুইটি খুব লম্বা ও দৃঢ়, উহাদের আগায় দুইটি ছোট ছোট নখ আছে। আঙুল-দুইটি আবার একটি পাতলা চামড়া-দিয়া যোড়া। ঐ চামড়ার নীচে চরণতল, উহা স্থূল চর্ম্মময় ও কণ্টকিত।

কখন কখন এ হেন সহিষ্ণু জীবকে সহিষ্ণুতার অতিরিক্ত শ্রম করান হয়, ফলে তাহার পদতল ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, তখন তাহার পদতলে মেষচর্ম্মের একপ্রকার বিনামা পরাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু সে খোঁড়া হইয়া পড়িলে, তাহাকে বিশ্রাম না করিতে দিলে, সে মাটি আঁকড়াইয়া পড়ে, তখন কাহারই সাধ্য নাই যে, তাহাকে আর উঠায়।

'আহাম্মক'

গাথা

কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে শীত-ঋত বায়ু,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে জরা-ধরা স্নায়ু;
যষ্টি-'পরে ভর দিয়া যেতে যেতে পথে
বকে বুড়া বিড় বিড়,—
পথেতে লোকের ভীড়,
বাবুরা বিহারে যান বৈদ্যুতিক রথে;
'বিষাণ' গরজে তা'য়
নিশান শিহরে বায়।
চোকে বুড়া দেখে সব যেন ধূঁয়া ধূঁয়া,
কালদোষে কালা ও সে, মাথাটিও নুয়া।
ঘাড় গুঁজে যায় বুড়া যেই যানবর্ম্মে,
হায় রে, সেক্ষণে ঠিক
কোথাহ'তে বৈদ্যুতিক
যান এক ভোঁ-ভোঁ-রবে নামে যেন মর্ত্তে!
ছেকড়া-গাড়ীর রোল,
ফেরীওয়ালার গোল,
পথ ধূলিময়, বুড়া অক্ষিশ্রুতিহীন,
নাহি শক্তি—তনু তা'র ক্ষীণ।

কি হ'বে গো, কি হ'বে গো? হায়, হায়, হায়,
চাপা বুঝি পড়ে বুড়া,
হয় বুঝি হাড় গুঁড়া,
হ'ল বুঝি আজি তা'র ইহলীলা সায়!
যুবা এক এল ছুটে,
বুড়ারে ঠেলিল 'ফুটে';
বেঁচে গেল বুড়া! কিন্তু—কিন্তু সে যুবক?
পড়ি' যান-তলে ম'ল—বড় আহাম্মক!
কি বলিলে—'আহাম্মক'? হাঁ, তা' হ'তে পারে,
তবু সে গেল যে ধামে
খ্যাত যা'রা ধূর্ত্ত-নামে,
কভু তা'রা যাইবে না সে ধামের ধারে!
পরহিতে আত্মদান
যে করে, সে সুমহান্;
তাঁ'র মত নির্ব্বোধেই নিত্যধাম ভরা,
তাঁহারা আছেন ভবে তাই আছে ধরা।

সমালোচনা

মানুষের স্বভাব, অন্যে ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করা। যে লোক কেবলই পরের সমালোচনা করিতেছে, তাহাকে কেহ দেখিতে পারে না। তথাপি সমালোচন-শক্তি মানুষের থাকিলে, ক্ষতি কিছু নাই, বরং লাভ আছে; কিন্তু সমালোচনা করিবার সময়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে—

মাছি সুধু ব্রণ খুঁজে, মধু খুঁজে ভ্রমরে,
সাধু সুধু গুণ খুঁজে দোষ খুঁজে পামরে।

লোকের দোষ দেখাই ঠিক সমালোচনা নহে। গুণীই গুণ বুঝে, নির্গুণে বুঝে না। গুণ দেখাই গুণজ্ঞের গুণপণা। সমালোচনা করিয়া কাহাকেও সংশোধন করিতে চাও, তাহার গুণের বিশ্লেষণ কর, তাহার দোষ আপনাহইতে সারিয়া যাইবে। গুণের বিশ্লেষণের ফলে এই হয় যে, মানুষ আপনার দোষ আপনিই দেখিতে অভ্যস্ত হয়। প্রশংসা শুনিলে খুশি হয় না কে? কাহারও কিছুর যদি তুমি প্রশংসা কর, তবে সে সেই বস্তুটিকে উজ্জ্বল রাখিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে। ফলে কি হইবে? তাহার বিপরীত যদি কিছু কণিকা-পরিমাণ তাহাতে থাকে, তাহা আর বাড়িতে পাইবে না, বরং পোষণাভাবে কালে লয় পাইবে। প্রশংসামূলা সমালোচনা কাহাকে হৃদয়-বেদনা না দিয়া তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিয়া তুলে; অতএব প্রশংসামূলা সমালোচনাই বাঞ্ছনীয়।

মোলায়েম ও চোঁচ।

নক্সা।

মোলায়েমেরা অনেকদিনকার খ্রীষ্টিয়ান। — ষ্ট্রীটে একটী 'মিসন কম্পাউণ্ড্' আছে, মোলায়েম এখন সেখানে একটি কুঠরী ভাড়া করিয়া থাকে। মোলায়েমের শেমুষীটুকু চিরকালই বিলক্ষণ সূক্ষ্ম—অতি আণুবীক্ষণিক; ফলে তাহার পড়া-শুনা কলিকাতাস্থ একটি স্কুলের চতুর্থ-শ্রেণীর ওদিকে আর যায় নাই। এখন তাহার বয়স ৩৩।৩৪ বৎসর হইবে, ইষ্টারন্ বেংগল্ ষ্টেট্ রেলওয়ে আফিসের ১৫৲ টাকা বেতনের এক 'পেঁচা' কেরাণী। কোনও মিশনরী সাহেবের সনির্ব্বন্ধ সুপারিসে তাহার ঐ চাকরীটুকু হইয়াছে। সে লম্বে প্রায় সাড়ে চার ফুট কিন্তু প্রস্থে সিকি ফুট। এত বয়স হইলেও তাহার একগাছি দাড়ি গজায় নাই, আজন্ম-দ্বিখণ্ডিত ওষ্ঠে বিড়ালের মত কেবল কএকগাছি গোঁফ উঠিয়াছে,—গুম্ফরোমগুলি উৎপন্ন হইবার সময়ে, বোধ করি, পরস্পরে বিরোধ বাধাইয়া দিয়াছিল! মুখমণ্ডল ব্রণবাহুল্যে 'বুটিকাটা'। রঙ্ কটা, চোকের চাহনী ঘোলা, মাথায় নিগ্রো-নন্দনদের মত কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া চুল আছে। মোলায়েমের এখনও বিবাহ হয় নাই, খ্রীষ্টিয়ানদের একটু বেশী বয়সেই বিবাহ হয়; কিন্তু সেকারণে নহে, নিম্নলিখিত তিনটী কারণে মোলায়েমের বিবাহ-সম্ভাবনা বড় নাই—(১) তাহার বেতন বড় অল্প, (২) তাহার চেহারা তত 'খুবসুরত' নহে, (৩) সে রাজযক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত।

দেখা গিয়াছে, যাহার বিবাহ-সম্ভাবনা যত অল্প, সে বিবাহ করিবার জন্য তত ব্যাকুল। মোলায়েমই কি তবে ঐ নিয়মের বহির্ভূত হইবে? ফলে, সে যে 'বিয়ে-পাগ্‌লা', তাহা —ষ্ট্রীটের পাঁচবছরের ছেলেটি পর্য্যন্ত জানে, এবং ইহার জন্য বালক-হইতে বুড়াপর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে ক্ষেপায়। 'নেই কাজ তো খই ভাজ'; ঐ স্থানের যাহার যখন হাতে কোনও কাজ থাকে না, সে একবার আসিয়া মোলায়েমকে মোলায়েমভাবে দুই-এক-কথা শুনাইয়া যায়। মোলায়েম ইহাদের জ্বালায় ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া বহুকালহইতে গৃহকোণ সার করিয়াছে; তবুও তাহাকে প্রায়ই নাস্তানাবুদ্ হইতে হয়।

আজ শনিবার; বেলা আড়াইটা-তিনটার সময় কএকজন অজাতশ্মশ্রু যুবকে মিলিয়া মোলায়েমের কুঠরীর পার্শ্বস্থিত কুঠরীতে বসিয়া ফুস্ ফুস্ করিয়া কি বলাবলি করিতেছে। এমন সময়, আর একটী যুবক, তাহার বাড়ী তালতলায়, নাম রসিক মল্লিক, সেইখানে আসিয়া দেখা দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, রসিক সহসা মোলায়েমের ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ম'শয়ের নাম?"

মোলায়েম কখনও ধুতি-চাদর পরিত না। টুইল সার্ট (তাহার একটী কাঁধ ছেঁড়া) গ্যালীস্, ড্রিলের প্যাণ্ট (তাহার পিছনে তালী) ও ক্যাম্বিসের বুটে (তাহাতেও কমবেশ আধ-ডজন তালী) শোভিত হইয়া সে একটী ক্যাওড়াকাঠের তক্তাপোষের উপর অধিষ্ঠিত ছিল, তাহার সম্মুখে একখানি হাত-আয়না ছিল, সে মুখ বিকৃত করিয়া দুই-আঙুলে ব্রণ টিপিতে টিপিতে, কেন জানি না, দুর্গেশ-নন্দিনীর আয়েষার কথা ভাবিতেছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসিত হইয়া সে বলিয়া ফেলিল,—"আমার নাম?—আয়ে—না, মোলায়েম দফাদার।"

"ম'শয়ের নিবাস?"

"উপস্থিত এইখানেই থাকি, আদ্‌বাড়ী ঠিক্‌রেপুর ঠন্‌ঠনে।"

রসিক বিনাঅনুরোধে একটি ত্রিপাদ-কেদারায় সতর্কভাবে উপবেশনপূর্ব্বক বলিল,—"তবে আমি ঠিকই এসেছি; ম'শয়ের—"

মোলায়েমের তখন হঠাৎ মনে হইল, ভদ্রতার অনুরোধে আগন্তুকের নাম-ধাম প্রতিজিজ্ঞাসা করা উচিত। অতএব সে রসিককে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ম'শয়ের নাম?"

"চোঁচ তরফদার।"

মোলায়েম সর্ব্বদাই যুবকদিগের দ্বারায় উপহসিত হইত, তাই সে মনে করিল এ যুবকটিও তাহাকে উপহাস করিতেছে। সে মনে মনে রাগিয়া একটু চড়া আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিল,—

"ম'শয়ের নিবাস?"

"ঢ্যাবঢেবে। আগে ঠন্‌ঠনেই ছিল, আজকাল গাঙের জল লেগে লেগে ঢ্যাব্‌ঢেবে হ'য়ে গেছে।"

এটি একটি পুরাতন রসিকতা, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মোলায়েম লোকের সঙ্গে বড় আলাপ-মিলাপ করিত না; কাজেই এ রসিকতাটি তাহার জানা ছিল না। তথাপি সে অনুভব করিল, লোকটার বাড়ী সত্যই ঢ্যাবঢেবে নহে। এবার আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, বলিল,—"ম'শয়ের সঙ্গে আমার জানা-শুনা নাই। ম'শয় হঠাৎ এসে আমার সঙ্গে মস্করা জুড়ে দিলেন—আপনি কিরকম ভদ্দর-লোক? ম'শয়ের কি মনে ক'রে আসা হ'য়েছে?"

রসিক কৃত্রিম কোপপ্রকাশপূর্ব্বক বলিল,—"ম'শয়ের সঙ্গে কি মস্করা করা হ'য়েছে? মস্করা আমার চোদ্দপুরুষে জানে না। ম'শয় দে'খ্‌ছি—"

"আপনার নাম কি সত্যি চোঁচ?"

"ম'শয়, বাপ-মা যদি আমাদের চেহারা-টেহারার দিকে নজর রেখে আমাদের নাম রা'খ্‌তেন, তা' হ'লে আপনার নাম মোলায়েম,

আর আমার নাম চোঁচ হ'ত না। এটা জানবেন, বাবা-মা চিরকালই কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন রেখে থাকেন। (কথাটা মোলায়েমের হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। কেননা সে বাস্তবিকই কদাকার এবং রসিক বাস্তবিকই সুপুরুষ।) যা' হো'ক, আমাকে তিনটে কথা জিজ্ঞেস্ ক'র্‌তে ম'শয়ের গলা যখন উদারা থেকে তারায় উঠেছে, তখন বু'ঝ্‌তে পারা যাচ্ছে যে, ম'শয় একটি বর্ণচোরা আম; নামের সঙ্গে আপ্‌নার না চেহারার মিল আছে, না মেজাজের মিল আছে। আপ্‌নার কাছে আমি যে জন্যে এসেছি, তা' আর আমি আপ্‌নাকে বলার কোনও 'নেসেসিটি ফিল্' ক'র্‌ছিনে। ম'শয়, কিছু মনে ক'র্‌বেন না, আপ্‌নাকে আমি মিছে কষ্ট দিলুম। 'আই য়্যাম অফ্, স্যার, গুড্ বাই'।"

রসিক এই বলিয়া চলিয়া যায়, মোলায়েম বলিল,—"ম'শয়, শুনুন, শুনুন, শুনুন! ম'শয়, এখানে আমাকে সবাই 'দিক্' করে, তাই আমার মনে হ'য়েছিল যে, আপ্‌নিও বুঝি আমাকে 'দিক্' ক'র্‌তে এসেছেন। ম'শয়, আমার ভুল হ'য়েচে, কিছু মনে ক'র্‌বেন না—বসুন, বসুন।"

৩

রসিক তো তাহাই চাহে। সে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া আবার সেই ত্রিপাদ-চৌকীটিতে সাবধানে আসন-গ্রহণ করিল। তাহার পর বলিল,—"ম'শয়ের সঙ্গে আমার একটা খুব 'প্রাইভেট্' কথা আছে; কিন্তু সে কথাটি ব'ল্‌বার আগে আমি আপ্‌নাকে আরও দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস্ ক'র্‌তে চাই। আপ্‌নি কোথায় কি কাজ করেন?"

"ই, বি, এস্ রেলের ট্রাফিক্ সুপ্ট্ আফিসের ক্লার্ক।"

"কত ক'রে দিচ্ছে?"

এইবার মোলায়েম ঢোঁক গিলিয়া একটা মিথ্যাকথা বলিল,—"তি—তিরিশ টাকা।"

"কুল্যে?"—তাহার পর রসিক কৃত্রিম নিরাশার সহিত বলিল,—"তবে-ই হ'য়েছে! তবে আর আপ্‌নাকে সে কথা ব'লে লাভ কি?"

"কি—কি কথা ম'শয়?"

"তবে শোন, দাদা!"—এই বলিয়া রসিক একবার এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া চুপি চুপি বলিতে লাগিল,—"আমার একটি শালী আছে, বয়স চোদ্দ কি পনর—বেশ দেখ্‌তে।"—এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মোলায়েম রসিকের মুখের খুব কাছে মুখ আনিয়া বলিল,—"অ্যাঁ!" তাহাতে মোলায়েমের মুখহইতে ভক্ করিয়া একটা উৎকট দুর্গন্ধ বাহির হইয়া পড়িল এবং তাহার সে সময়কার মুখভঙ্গী দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করাও দায় হইল। রসিক অতি কষ্টে ঘৃণা ও হাস্য-দমন করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমার শালী ব'লে আমি ব'ল্‌ছি না, হিরণ্ময়ী বাস্তবিকই দে'খ্‌তে খুবই ভাল। এই টানা টানা চোক—এই ধনুকের মত ভ্রূ—মাথার চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া। না খুব রোগা—না খুব মোটা,—দোহারা। আবার এদিকে বেশী ঢেঙাও নয়, বেশী বেঁটেও নয়,—মানানসই; আর গা'এর রঙ তো নয়, যেন গোলাপফুল! কিন্তু, দাদা, রাগ ক'র না; তোমার কাছে আমার আসাই 'মিষ্টেক্' হ'য়েছে। তোমার না আছে রূপ, না আছে রূপেয়া! মেয়েমানুষে বেটাছেলের রূপের তত তোয়াক্কা করে না, রূপেয়াই মরদের রূপ। আমার 'মাদার-ইন্-ল' কা'র মুখে শুনেছিলেন যে, তুমি খুব ভাল ছোক্‌রা; তাই আমাকে তোমার কাছে হিরণ্ময়ীর কথা ব'ল্‌তে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তোমার তো অবস্থা দেখ্‌চি 'অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ'; তোমার সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিয়ে দেওয়া যা', আর তা'কে হাত-পা বেঁধে পুকুরের জলে ফেলে দেওয়াও তা'!"

তখন মোলায়েম বড়ই বিষণ্ণ হইয়া অতি কাতরভাবে বলিল,—"হেঁই চোঁচ বাবু! এটি আপনাকে ক'রে দিতেই হ'চ্চে। আমার বড় কষ্ট। আমায় রোজ হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়। আর এমন একটা লোক নেই যে, তা'র সঙ্গে দু'টো মনের কথা কই। কম্পাউণ্ডের হতভাগারা তো আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। দো'ই চোঁচ বাবু, এটি আপনাকে অনুগ্‌গর ক'রে ক'রে দিতেই হ'বে। আমি না খেয়ে-দেয়ে অনেক টাকা জমিয়েচি, আমি আমার বউকে গা'-ভরা গয়না দেব।"

"কত টাকা আছে।"

মোলায়েম তাড়াতাড়ি সেভিংস ব্যাংকের খাতাটি বাহির করিয়া রসিককে দেখিতে দিল,—"এই দেখুন।"

রসিক দেখিল, মোলায়েমের হ্যারিসন রোড্ পোষ্টাফিসে ৩৪৫৮।১৫ জমা আছে। বলিল,—"হুঁ, গয়না-পত্র তা' হ'লে তুমি দিতে পা'র্‌বে। কিন্তু বিয়ে ক'রে বউকে খাওয়া'বে কি? আর আমার শালীকে দিয়ে যে রাঁধা'বে, ঘর ঝাঁট দেওয়া'বে, তা'ত হ'বে না, তোমাকে ঝি-চাকর রা'খ্‌তে হ'বে। তোমার সে 'মিন্স্' কই?"

"বিয়ের পর আমি এ হতচ্ছাড়া চাক্‌রী ছেড়ে দেব। 'টাপি ক্লার্কের' কাজ ক'র্‌ব, তা'তে মাসে ৫০।৬০ টাকা উপায় হয়। তা'-ছাড়া উপরি আছে।"

"হ্যাঁ, তা' যদি ক'র্‌তে পার, তা' হ'লে মন্দ হ'বে না। কিন্তু তোমাকে ত একদিন তোমার হবু-বউকে দে'খ্‌তে যেতে হ'বে? শাশুড়ী ও তাঁ'র হবু-জামাইকে দে'খ্‌তে চা'বেন। তা'র কি উপায় ক'র্‌ছ বল? তাঁ'রা যদি দেখেন, তোমার এই চেহারা, তা'র ওপর যদি শোনেন যে, তুমি কুল্যে তিরিশটি টাকা তন্‌খা পাও, তা' হ'লে তোমার সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিয়ে দিতে চা'বেন কি? আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি, হিরণ্ময়ী তোমার এই চেহারা দেখে একেবারে বেঁকে ব'স্‌বে।"

মোলায়েম একটা অতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তবে উপায়? তবে কি হ'বে না, চোঁচ বাবু?"

লণ্ডনের সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রেল।

রসিক বলিল,—"দাঁড়াও, একটা উপায় আছে। তুমি সোমবার-দিন আফিসের ছুটী ক'রে নিতে পার?"

"হ্যাঁ, তা' পারি।"

"আচ্ছা, তা' হ'লে তুমি সোমবার-দিনই সকালের ট্রেণে —পুরে আমার শ্বশুর-বাড়ীতে চল। কাপড়-চোপড় একটু ভাল ক'রে প'র। আর দেখ, হিরণ্ময়ীর মন যদি তুমি নিতে চাও, তা' হ'লে আর যা' যা' তোমার ইচ্ছা হয় তা'র জন্যে নিও, কিন্তু তার সঙ্গে সেরখানিক খুব টাট্‌কা কুলিচা বিস্কুট নিতে ভুল না—সে পাগলের মত ভালবাসে (একথাগুলি রসিকের নিজের সম্বন্ধে খুব সত্য)। তা'র পরে আমার হাত-যশঃ আর তোমার কপাল।"

"আচ্ছা, তা' একসের কেন, আমি দু'সের কুলিচা নেব। ক'টার সময়ে ট্রেণ?"

"আটটা ক' মিনিটের সময়। তুমি আন্দাজ ৭॥০ টার সময় বেলেঘাটা-ষ্টেশনে যেও। আর দে'খ, যা' তা' সেজে যেও না।"

"না, আমি আজই গিয়ে চাঁদ্নিথেকে একটা ভাল সুট্ কিনে আ'নব। সে আর আপনাকে ব'লতে হ'বে না।—আপ্‌নি একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আ'স্‌ছি।" এই বলিয়া মোলায়েম একটী কাঠের বাক্সহইতে কএক-গণ্ডা পয়সা বাহির করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

রসিক তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া মনে মনে একচোট্ খুব হাসিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, মোলায়েম কিছু মিঠাই, বরফ, লিমনেড্, খিলি-পান প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার পর, সেগুলি রসিকের সম্মুখে বেশ পরিপাটী করিয়া একটী রেকাবীতে সাজাইয়া রাখিয়া দিয়া বলিল,—"চোঁচবাবু, একটু জলযোগ ক'র্‌তে হ'বে।"

রসিক বলিল,—"এঃ! তুমি আবার এসব কেন আ'ন্‌লে হে? আমি এই খেয়ে আস্‌ছি সাফ্ ক্ষিধে নাই। এখনথেকেই বুঝি ভায়রাকে খাতির ক'র্‌ছ?"

এ কথায় মোলায়েম বড় আনন্দিত হইল। রসিককে কিছু খাই-বার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। চোঁচ-মহাশয় শেষে যাহা করিলেন, তাহার সহিত তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মন্দাগ্নির কোনই সামঞ্জস্য রহিল না। তবে তাঁহার সপক্ষে এই একটী কথা বলা যাইতে পারে যে, তিনি মোলায়েমের দ্বারায় বারম্বার উপরুদ্ধ হইয়াই রেকাবীটি মিষ্টান্নশূন্য করিয়াছিলেন!

যাহা হউক, তাহার পর দুই-একটী কথার পর পান-তামাক খাইয়া চোঁচ বাবু বিদায় হইলেন।

(ক্রমশঃ)

"স্বর্গের পাখী

এসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপ-গুলির মধ্যে একটী দ্বীপের নাম "নবগিনি।" ঐ দ্বীপে ও উহার পাশাপাশি কয়েকটি দ্বীপে "স্বর্গের পাখীরা" থাকে। পৃথিবীর আর কোন জায়গায় এই পাখীদের দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই দ্বীপবাসিদিগের ধারণা, এই পাখীই বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এবং ইহারা আকাশের শিশির-ছাড়া আর কিছুই খায় না, তাই তাহারা বলে, এ পাখী "স্বর্গের পাখী"।

আজপর্য্যন্ত এই পাখীর চৌত্রিশটী শ্রেণিবিভাগ দেখা গিয়াছে। একরকমের স্বর্গের পাখীর সঙ্গে আর একরকমের স্বর্গের পাখীর চেহারায় ও রঙে কিছু কিছু তফাৎ দেখা যায়; কিন্তু আসল স্বর্গের পাখীর রঙ ও চেহারা একেবারে আলা-হিদা। এই পাখার গায়ে ও ডানায় যত রকম রঙ দেখা যায়, ততরকম রঙ আর অতি অল্প পাখীরই গায়ে দেখা যায়। ইহাদের মাথা ও গলা মখ্‌মলের মত নরম ও রঙীন। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে, ঐ রঙে ধূপছায়ার মত হরেক-রকম রঙের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই স্বর্গের পাখীকে সত্যই স্বর্গের পাখী বলিয়া মনে হয়।

শরীরের অনুপাতে ইহার ডানা-দুটি ঢের বড়। তবে ডানা-দু'টি বেশ মানান-সই—সে দু'টিতে সাদা ও হল্‌দে-রঙ মাখামাখি হইয়া আছে। ইহাদের ডানা-দুইটি খুব বড় বলিয়া ইহাদিগকে খুব বড় দেখায়, কিন্তু আসলে উহারা পায়রার

চেয়ে বড় নয়। এই পাখীর চেহারা বেশ, কিন্তু গলার আওয়াজ তেমন মিষ্ট নয়।

ইহারা যখন উড়ে, তখন দলের একজনের ইঙ্গিতে উড়িতে থাকে, তখন ইহাদের অতি চমৎকার দেখায়। উড়িতে উড়িতে যদি ঝড়-বৃষ্টি আসে, তাহা হইলে ইহারা দলপতির ইঙ্গিতে আকাশের এত উচুতে উড়িয়া যায়, যেখানে ঝড়-ঝাপ্টা কিছুই নাই। অনেকক্ষণ উড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে গাছের ডালে বসিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন শিকারীরা ইহাদের তীর মারিয়া মারিয়া ফেলে। বিলাসীদের বিলাস-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এই পক্ষিবংশ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। এই পাখী ইউরোপে অনেক দামে বিক্রী হয়।

ইহারা সত্য সত্যই শিশির-পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে না। অন্য সমস্ত পাখার মত মিষ্ট ফল ও ফড়িঙ্ খাইয়াই জীবন-ধারণ করে।

আলোক-কার্ম্মুক

(অরোরা বোরিয়ালিস।)

উত্তর-মেরুতে ধনুকাকার এক আলোকরশ্মি দেখা যায়, তাহাকেই আমরা আলোক-কার্ম্মুক নাম দিয়াছি। কেহ কেহ ইহাকে মেরুপ্রভাও বলিয়া থাকেন। উত্তর-মেরুতে, তোমরা জান, বছরে একবার রাত হয় আর একবার দিবা হয়। সেখানে ছয়মাস সূর্য্য অস্ত যায় না, আবার ছয়মাস সূর্য্যের উদয় হয় না। তখন এই আলোক-কার্ম্মুকের আলোকে দেখিয়া লোকে কাজ-কর্ম্ম করে। এই আলো প্রথমে যখন ফুটে, তখন অস্পষ্ট থাকে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া ধনুকাকার-ধারণ করে। তখন ইহাতে নানারকম রঙ্ দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, তড়িৎই এই আলোকের উপাদান। কেননা যখন এই আলোক ফুটিয়া উঠে, তখন দিগ্‌দর্শনের কাঁটা নড়ে, তড়িৎ-ঘণ্টিকাগুলির আপনাআপনি আওয়াজ হইতে থাকে। দক্ষিণ-মেরুতেও এই আশ্চর্য্য আলোক দেখা যায়। এই আলো উত্তর-মেরুতে ১১।১২ ক্রোশ উর্দ্ধে ও দক্ষিণ-মেরুতে ২।৩ ক্রোশ উর্দ্ধে প্রকাশ পায়। আলোক-কার্ম্মুকের আলোক স্থির নহে, ভাল করিয়া দেখিলে, চঞ্চলতা প্রত্যক্ষ হয়। ইহা পৃথিবীর ঐ প্রদেশে প্রায়ই প্রত্যক্ষ হয়।

রাসভের রস-কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তোমরা মানুষ, আমি শ্রীরাসভেন্দ্র রসশেখর, আমার মত জ্ঞানবান্ নও, সুতরাং আমি যে গ্রামে থাকি, সে গ্রামে যে প্রতি বুধবারে একটা করিয়া হাট বসে, তাহা তোমাদের জানা থাকিতেই পারে না। সেই হাটে নানারকম তরি-তরকারী, ফল-পাকড়, জীব-জন্তু, কাপড়-চোপড় ও জামা-জুতা বেচা-কেনা হয়।

অতএব ঐ দিনটি রাসভকুলের পক্ষে মোটেই শুভদিন নয়—আমার পক্ষে তো একেবারেই নয়। আমি তখন ছিলাম, এক চাষার বাড়ীতে। সে বুড়া চাষাটার হৃদয় নিশ্চয়ই লোহার ছিল, সে আমাকে বড়ই দগ্ধাইত। বুধবার আসিলেই, সে আমার পীঠে রাজ্যের শাক, চাউল, দাইল, ডিম, তরি-তরকারী চাপাইয়া শেষে সেই ভোঁদারাম স্বয়ং ভর করিত। অতটা বোঝা লইয়া যদি আমি একটু আস্তে আস্তে চলিতাম, তখনই, তাহার হাতে থাকিত একটা তাহারই মত ভোঁদা, কেঁদো, গেঁঠে লাঠি, তাহার বাড়ি মারিয়া আমাকে 'সর্ষে ফুল' দেখাইত। আমি তখন বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে সুরু করিতাম, কখন কখন চোঁশ্‌কোঁশ্‌ করিয়া—কি করিব—ছুটিয়াও যাইতাম, তবুও সে হতভাগার হাতহইতে নিষ্কৃতি পাইতাম না, আমাকে সে পিটিতেই থাকিত। ঐরকম নিষ্ঠুরতা ও অবিচার রক্তমাংসের শরীর লইয়া কাহারই সহ্য হইবার কথা নয়, আমারও সহ্য হইত না। রাগিয়া আমি তাহাকে লাথি মারিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম; কিন্তু পীঠের উপর থাকিত, ভারি বোঝা, পারিতাম না, কেবল মাতালের মত টলিয়া টলিয়া পড়িতাম। তবে আমার মনে এই একটু সুখ হইত যে, তাহাতে সেই হতভাগা চাষাটার বেশ একটু ঝাঁকড়ানি লাগিত। সে আরও রাগিয়া উঠিয়া আমাকে আরও "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" করিত, তখন আমার পা থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিত।
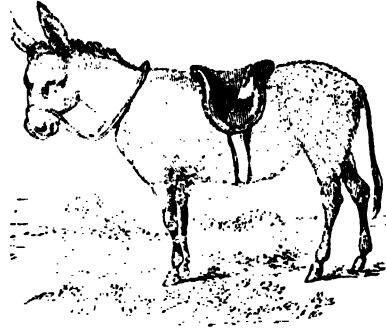
একদিন সে বেটা তো বড় একথলে শাক-সবজী আমার পীঠে চাপাইয়া আর নিজেও সওয়ার হইয়া ঐরকমে 'উত্তম-মধ্যম' দিতে দিতে আমাকে লইয়া হাটে আসিয়া পঁহুছিল। পঁহুছিয়া আমার পীঠের বোঝাটী মাটীতে নামাইল। বাবা! মরিয়া যাইবার যো হইয়াছিলাম, বোঝাটা নামাইলে, একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কর্ত্তা তখন আমাকে এক খোঁটায় বাঁধিয়া নিজে ফলা'রের যোগাড়ে চলিল। আমার যে, দু'চারগাছা ঘাস বা একটু জলের প্রয়োজন আছে, তাহা সেই চোয়াড়ের খেয়ালের মধ্যেই আসিল না। কি করি আমি? দাঁত-দিয়া ছালার দড়ি কাটিলাম, তাহার পর ছালার মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া তাহার মধ্যে ছিল রাঙা-আলু, তোফা খাইতে লাগিলাম। ছালাটা প্রায় উজাড় করিয়া আনিয়াছি, এমন সময়ে কর্ত্তা হেলিতে দুলিতে আসিয়া দেখা দিলেন। বস্তাখানি দেখিয়া গলাবাজি জুড়িয়া দিলেন। আমি তখন আহারান্তে পরম-তৃপ্তভাবে তাহার দিকে তাকাইতে লাগিলাম। দেখিয়া সে ধরিয়া ফেলিল যে, আমিই রাঙা-আলুগুলি আত্মসাৎ করিয়াছি। তখন সে এমন কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, আমি গাধা, আমারও লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া গেল। সে যতক্ষণ গালি দিতেছিল, আমি ততক্ষণ আমার ঠোঁট চাটিতেছিলাম, শেষে তাহার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অত গালি দিয়াও তাহার মন ভরিল না, তখন সে আমাকে তাহার সেই কেঁদোটা দিয়া বেজায় মারিতে আরম্ভ করিল। তখন আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না। একে একে তিন লাথি মারিলাম। প্রথম লাথি খাইয়া তাহার নাক আর দু'টা দাঁত ভাঙিয়া গেল। দ্বিতীয় লাথি খাইয়া তাহার হাতের কব্জি ভাঙিল; তৃতীয় লাথিতে কর্ত্তা জমি লইলেন।

তখন জনদশবারো লোক আমাকে 'গো বেড়ন' দিতে লাগিল। তাহার পরে কর্ত্তাকে ধরাধরি করিয়া কোথায় লইয়া গেল। আমি সেই খোঁটাতেই বাঁধা রহিলাম। আমার কাছে সেই লাল-আলুর বস্তাটাও পড়িয়া রহিল। আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর যখন দেখিলাম, কেহ আর আমার উপর বড় "নেক-নজর" করিতেছে না, তখন বাকী রাঙা-আলুগুলিরও সদ্গতি করিলাম। আলুগুলি তোফা ছিল কিন্তু! তাহার পর আস্তে আস্তে দড়িটা দাঁত-দিয়া কাটিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া চলিলাম। তখনও আমার সে বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা ছিল না। আমি তখন ভাবিয়াছিলাম, কর্ত্তার নাকের দফা রফা করিয়াছি, একটা হাতের কব্জিও মটকিয়া দিয়াছি,—যথেষ্ট প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে, আর বেশি কিছু করিব না। চাষা আমাকে পথে কুড়াইয়া পায় নাই, টাকা-দিয়া কিনিয়াছে, পালানটা তাই কিছুতেই উচিত হইবে না।

পুঁটু আমাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"হাদে দেখ্‌, গাধাডা ইয়ার মধ্যে কুহানথিয়ে আলো? ভাই, ঝাট্ কইরে আইসো, ইয়ারে বান্ধো।"

"পুঁটুর ভাই কাদের বলিল,—"আঃ দেক্ কইরে মারে গাধাডা। খাটতি খাটতি জান গ্যালো। বাহজ্ঞান কোহানে? এ বিটা একা কোহানথিকে আলো? পাইলে আইছুস্ হারামজাদ্!" এই বলিয়া আমাকে এক লাথি কশাইয়া দিল।

আমার রাস-টাস সব খুলিয়া লইল। তখন আমি তিন লাফে মাঠে গিয়া হাজির হইলাম। চরিয়া চরিয়া ঘাস খাইতে লাগিলাম।

হঠাৎ একটা চীৎকার শুনিতে পাইলাম। দেখি, কয়েকজন লোকে আমার মনিবকে বহিয়া আনিতেছে। তাহার ঐ দুর্দ্দশা দেখিয়া কাদের রাগে অধীর হইয়া পড়িল। সে তখন যে কথা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, আমাকে সে গাছে বাঁধিয়া এমন প্রহার দিবে যে, আমি শেষে যন্ত্রণায় ভূতলশায়ী হইব।

শুনিয়া আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। আর এক-মুহূর্ত্তও নষ্ট করিলে চলিবে না। এখন তাহাদের অর্থহানি হইবে বা কি হইবে, তাহা আর আমি মনেই রাখিলাম না। বেড়া ডিঙাইয়া, পগার লাফাইয়া চোঁচা দৌড় দিলাম। দৌড়িয়া, দৌড়িয়া দৌড়িয়া শেষে এক বনের মধ্যে ঢুকিলাম। সেখানে কচিকচি ঘাস প্রচুর, আর নির্ম্মল-তোয়া নদীরও অভাব নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই বনের মধ্যে আমি প্রায় মাসখানিক রহিলাম। বেশ সুখেই রহিলাম। যে গ্রামে সেই চাষাটা থাকিত, প্রতিদিন সেই গ্রামহইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিলাম।

অবশেষে শীতকাল উপস্থিত হইল। তখন আর বনে থাকা চলিল না, কাজেই আবার একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে বনহইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কয়েকদিন হাঁটিয়া এক গ্রামে পঁহুছিলাম, পূর্ব্বে আমি কখন এই গ্রামে আসি নাই, ইহার কথাও কাহারও মুখে শুনি নাই। ভাবিলাম, এখানে সেই চাষাটা কখন আমাকে ধরিতে আসিবে না।

এই গ্রামটির একধারে নিরালায় একটী ফলের বাগানের মধ্যে একটী কুটীর ছিল। কুটীরটি বেশ পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন। এক বুড়া স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়া দাইল বাছিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যে, তাঁহার হৃদয়ে দয়া-মমতা আছে, কিন্তু মনে একটু দুঃখও আছে, তাই আমি ভরসা করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার কাঁধের উপর মুখ রাখিলাম।

বুড়ী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি নড়িলাম না, মায়া-মাখা মুখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

তখন তাঁহার ভয় গেল। তিনি আমার উদ্দেশে কহিলেন,—"আহা বেচারা! তোমাকে দেখে নষ্ট-দুষ্ট ব'লে বোধ হ'চ্চে না। তোমার মালিক যদি কেউ না থাকে তো আমি তোমাকে পুষতে রাজি আছি, কেননা আমার বুড়ো 'ভোলা' ম'রে যাওয়া-অবধি বড় কষ্টে আছি, আনাজ-পাতি নিয়ে আর হাটে বে'চ্তে যেতে পারি নে। কিন্তু তোমার মালিক অবিশ্যি কেউ আছে, কাজেই আমার লোভ ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না।"

"নানী, কা'র সঙ্গে কথা ক'চ্চ?—ঘরের ভিতরহইতে কে একজন মিঠা গলায় এই প্রশ্ন করিল। তাহার পর দিব্য একটী সুন্দর ছেলে ঘরহইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার বয়স ছয় কি সাতবৎসর হইবে, তাহার কাপড়-চোপড় দামী না হউক, পরিষ্কার বটে। সে আমার দিকে প্রশংসমান অথচ সভয়-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

তাহার পর তাহার ঠাকুর-মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"নানী, এর গায়ে হাত দেব? কামড়া'বে না তো?"

"না, না, কামড়া'বে না। তবে, মুখের কাছে হাত নিয়ে যেও না—কাজ কি?"

ছেলেটি আসিয়া আমার গায়ে হাত দিল। পাছে সে ভয় পায়, তাই আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কেবল পিছন ফিরিয়া একবার তাহার হাত চাটিয়া দিলাম।

"নানী, গাধাটা বড় ভাল, দেখ, আমার হাত চা'ট্'ছে!"

"কিন্তু এ এখানে একলা এল কি ক'রে? করিম, গাঁয়ে গিয়ে সবাইকে দেখাও দেখি, কেউ এই গাধাটা নতুন কিনেছে কি না। এতক্ষণে হয়ত এর মালিক এর জন্যে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।"

করিম ছুটিতে লাগিল, আমিও তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া চলিলাম। একটা ঢিবির কাছে গিয়া আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম, করিম তখন সেই ঢিবির উপরহইতে আমার পীঠের উপর উঠিয়া জিহ্বা দিয়া টক্‌টক্ আওয়াজ করিতে লাগিল। আমি তাহাকে পীঠে করিয়া ছুটিয়া চলিলাম। করিমের তখন আহ্লাদ দেখে কে? একটা মুদীখানার সামনে দাঁড়াইয়া সে চু চু করিয়া আওয়াজ করিয়া আমাকে থামাইল।

বুড়া গোবর্দ্ধন-মুদী জিজ্ঞাসা করিল,—"খবর কি, করিম? গাধায় চেপে কেন?"

"এটা কা'র গাধা জান, দাদা?"

"না, তা তো জানি নে। আগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।"

এইরকম করিয়া করিম আমাকে বাড়ী বাড়ী দেখাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তাহার ঠাকুরমাকে জানাইল যে, আমার মালিক কেহ নাই।

তখন বুড়ী আমাকে তাহার মরা গাধার আস্তাবলে রাখিবার কথা বলিল। করিম আমাকে সেখানে রাখিয়া চারিটি টাট্‌কা ঘাস ও গামলায় করিয়া খানিকটা পরিষ্কার জল দিল। ঘরের মেঝ্যায় বিচালি বিছাইয়া দিল। আমি ঘাস-জল খাইয়া আরামে সেই খড়ের বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে করিম আমাকে আস্তাবলহইতে বাহির করিয়া

আবার খাইতে দিল। তাহার পর আমার মুখে লাগাম ও পীঠে জিন দিয়া বুড়ীর কাছে লইয়া গেল। বোঝা খুব হাল্কা ছিল, আমি খুসী হইয়া হাটে চলিলাম। এদিকে কেউ আমাকে চেনে না, হাটে শাক সবজী বিক্রী করিয়া বুড়ী আমাকে লইয়া বাড়ী ফিরিল

এই বাড়ীতে আমি চার-বছর ছিলাম, বড় সুখেই ছিলাম। বুড়ীকে আর করিমকে আমি বড় ভালবাসিতাম। তাহারা আমায় কখন কষ্ট দিত না, কখন মারিত না। পেট ভরিয়া খাইতে দিত—আদর করিত; কিন্তু আমার সুখের দিন শেষ হইয়া আসিল। করিমের বাবা কলিকাতাহইতে অনেক টাকা রোজগার করিয়া বাড়ী ফিরিল। তখন বুড়ীকে আর হাটে শাক বেচিতে যাইতে হইত না, কাজেই আমাকে এক চাষার কাছে বিক্রয় করিল

(ক্রমশঃ।)

বালকদের মর্য্যাদা-রক্ষণ।

বালকমাত্রেরই, বোধ হয়, এই ইচ্ছা আছে, যেন তাহার সুনাম হয়। তাহারা সহজে এমন কোন কার্য্য করিতে চাহে না, যদ্দ্বারা তাহাদের বদনাম হইতে পারে। এইপ্রকার ভাব যে বড়ই উপকারী, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কোন বালক যদি কেবল অপর লোকদের সামনে নয়, কিন্তু আপনার নিকট আপন সুনাম-রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার চমৎকার উপকার হইতে পারে, সন্দেহ নাই। অপর লোকে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, ঐপ্রকার বালক এমন কোনও কার্য্য করিবে না, যদ্দ্বারা তাহার সুনাম কলুষিত বা বিবেক আঘাতপ্রাপ্ত হইতে পারে। কোন বালক যদি এইরূপে নিজ মর্য্যাদা-রক্ষণে যথার্থ মনোযোগ করে, তাহা হইলে তাহার চরিত্র ক্রমশঃ প্রচুর-পরিমাণে সংশোধিত ও পরিণত হইয়া উঠিতে পারে।

বালকদের কিন্তু কেবল নিজেদের মর্য্যাদা-রক্ষণে নয়—তাহাদের বিদ্যালয়ের মর্য্যাদা-রক্ষণেও মনোযোগ করা উচিত। তুমি যে স্কুলে পড়িতেছ, সেই স্কুলের সুনাম যাহাতে নিরাপদে থাকে, তজ্জন্য তুমি দায়ী। এই একটী কথা মনে রাখিও যে, তোমার স্কুলের সুনাম তোমার আচার-ব্যবহারের উপর অনেকটা নির্ভর করে, কাজেই তোমার এমন কাজ করা উচিত নয়, যদ্দ্বারা তাহার সুনাম নষ্ট হইতে পারে।

তোমার মর্য্যাদা কিরূপে রাখিতে হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা ঋণ-পরিশোধসম্বন্ধে আপনাদের মর্য্যাদা-রক্ষা করে না—করিতে চেষ্টাও করে না। ঋণগ্রস্ত হইলে, ঐ লোকেরা ঋণ-পরিশোধ করিতে যথোচিত চেষ্টা করে না। তাহারা দোকানদারের হিসাব পরিষ্কার করিতে চাহে না; এইরূপে তাহারা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া আপনাদের মর্য্যাদার হানি করে। ঋণ-পরিশোধ করা ভদ্রতার লক্ষণ; তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ঋণ-পরিশোধের কথা বলিলে, টাকাকড়ির কথা সচরাচর আমাদের মনে উদিত হয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার ঋণও আছে, যাহার পরিশোধ না করিলে, নয়। আমরা সকলেই কোন-না-কোনপ্রকারে অপরের কাছে ঋণী রহিয়াছি। আমরা আমাদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকটহইতে অনেক উপকার পাইয়াছি; তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের কাছে ঋণী। আমা-দিগকে মানুষের মত আচরণ করিয়া ঐ ঋণ-পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, অনেক বালক, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর, ঐ সকল উপকারের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়; তাহারা তজ্জন্য কোনপ্রকারে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ না করিয়া কেবল স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। যে বালক স্বীয় মর্য্যাদা-রক্ষণে উদ্যোগী, সে প্রাপ্ত-উপকারের নিমিত্ত মাতাপিতা ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আবশ্যকমত সাহায্য ও তাঁহাদের যথাসাধ্য পরিচর্য্যা করিবে। তুমি যাহাতে উচিতমতে ঐ ঋণ-পরিশোধ করিতে সমর্থ হও, তজ্জন্য এখন তোমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। তুমি যদি লেখা-পড়াসম্বন্ধে শিথিল ভাব দেখাও কিংবা দুষ্টামি করিয়া কু-অভ্যাস কর, তাহা হইলে উক্ত ঋণের উচিতমত পরি-শোধ করিতে পারিবে না।

ঋণ-পরিশোধসম্বন্ধে আর একটী কথা মনে রাখা দরকার; তোমরা কেবল অপর মনুষ্যদের নয়—ঈশ্বরেরও নিকট ঋণী। আমরা সকলে তাঁহার নিকটহইতে সর্ব্বপ্রকার উত্তম বর পাইয়াছি; আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বাটী, বন্ধু-বান্ধব, আশা-ভরসা প্রভৃতি তাঁহারই দান, কাজেই আমরা তজ্জন্য তাঁহার কাছে ঋণী হইয়াছি। আমরা যদি ঐ সমস্ত বর পাইয়া তজ্জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ না করি, তাহা হইলে আমাদের মর্য্যাদা-রক্ষা করা বড় কঠিন হইয়া উঠে, কেননা অকৃতজ্ঞতা বড়ই ঘৃণার্হ পাপ। আমরা যদি ঐ সমস্ত উত্তম বরপ্রাপ্ত হইয়া উহার অপব্যবহার করি, তাহা হইলে আমরা অধমতার পরিচয় দিই, সন্দেহ নাই। এ জগতে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা দিতে চাহে না—কেবল পাইতে চাহে; তাহারা অপরের মঙ্গলের প্রতি একবার দৃষ্টি না করিয়া কেবল নিজেদের স্বার্থের চেষ্টা করিতে থাকে। এইরূপে আচরণ করিলে, আমাদের মর্য্যাদা-রক্ষা করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কেননা আমাদের সেই আচরণের

বিষয় একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমরা সহজে বুঝিতে পারিব যে, আমরা ভদ্রতার নয়—অভদ্রতা ও অধমতার পরিচয় দিতেছি। আমরা সকলেই ঈশ্বরের কাছে ঋণী; আমাদের সেই ঋণ-পরিশোধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে নয়।

মানব-জীবন যে সামান্য বিষয় নহে, তাহা প্রত্যেক বালকের মনে রাখা দরকার, নহিলে তোমাদের জীবনের যথোচিত উন্নতি হইবে না। সম্প্রতি তোমরা লেখা-পড়া শিখিতেছ; উহা এমনভাবে শিখিতে হইবে, যেন তোমরা উচিতমত কৃতকার্য্য হইতে পার। তোমরা যাহাতে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর, উত্তমরূপে ঈশ্বরের সেবা ও অপরের মঙ্গল-সাধন করিতে পার, তজ্জন্য তোমাদের আপনাদিগকে প্রস্তুত করা চাই। তোমাদের ইচ্ছা হইলে, *তোমরা মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ঐরূপে অনেকটা সফল* করিতে পারিবে। তোমরা সকলেই, সম্ভবতঃ, স্বদেশানুরাগী; তাহা হইলে কি করিতে হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। তোমাদিগকে এমনভাবে আচরণ করিতে হইবে, যেন তোমাদের মাতৃ-ভূমির সুনাম কোনমতে কলঙ্কিত না হয়; তোমাদের চরিত্র এমনভাবে গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে তোমরা স্বজাতীয়দের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিয়া তাহাদের মঙ্গলসাধন করিতে পার। তোমরা এইরূপে, তোমাদের স্বজাতির কাছে যাহার জন্য ঋণী, তাহা পরিশোধ করিতে পারিবে। সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করিতে হইবে। সমস্ত বৃত্তি বা ব্যবসায়ে এমন সব লোককে পাওয়া দরকার, যাহারা উক্তপ্রকারে ঈশ্বরের কাছে ঋণ-পরিশোধ করিবে—যাহারা ঈশ্বরের ও অপর মনুষ্যদের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিয়া নিজেদের মর্য্যাদা-রক্ষা করিবে। কাজটী সামান্য নহে; ঐ ঋণ-পরিশোধ করিবার *নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে হইবে।*

বাইসিক্লিং বা পা-গাড়ীতে বিচরণ

টায়ার ও টিউবের ছেঁদা-মেরামত।

যাহারা বাইসিকলে চড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের একটী বিষয় জানা অত্যাবশ্যক, নহিলে তাহারা অনেক সময়ে বড় মুশকিলে পড়িবে। টিউবে ছিদ্র হইলে, তাহা কিরূপে মেরামত করিতে হইবে, তাহা না জানিলে, অনেক সময়ে বড় কষ্ট পাইতে হয়। যাহারা কলিকাতার মত বড় সহরে থাকে, তাহাদের এ বিষয়ে তত ভাবনা নাই, কেননা তাহাদের চারিদিকে বাইসিকলের দোকান আছে; কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদেরও মনে রাখা উচিত যে, সব স্থানে ভাল দোকান পাওয়া যায় না এবং এমন অনেক স্থান আছে, যেস্থানে বাইসিকলের দোকান আদৌ নাই। তাহাছাড়া সামান্য ছেঁদা হইলেই, যদি বাইসিকল দোকানে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে অনেক সময়ে অসুবিধা হয়—খরচও পড়ে।

যাহারা বাইসিকলে চড়িয়া বেড়ায়, তাহারা যেন আবশ্যকমত গাড়ীর প্রত্যেক অঙ্গ ঠিক করিয়া লইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপূর্ণ ছোট থলিটি গাড়ীতে লাগাইয়া রাখা উচিত; কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদের সাবধান হওয়া দরকার, তাহারা যেন বাইসিকলের কোন অঙ্গে অকারণে হাত দিয়া নষ্ট না করিয়া ফেলে। বাইসিকল বেশী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেলে, তাহা দোকানে লইয়া যাওয়াই ভাল। বাইসিকল রীতিমত পরিষ্কার করিয়া তাহাতে তৈল দিলে, তাহা সম্ভবতঃ অনেক দিন বেশ চলিবে। শিকলটি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা দরকার।

পক্ষান্তরে টিউবে ছেঁদা হইলে, তাহা কি করিয়া মেরামত করিতে হইবে, ইহা প্রত্যেক বালকের জানা চাই। তিনরকম টায়ার ও টিউব আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে; প্রথমরকম টায়ারে তার লাগান আছে। ইহার প্রান্তদেশে এমনভাবে তার লাগান হইয়াছে যে, ইহা চক্রের ধারে লাগিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। ভিতরে অন্য একটী টিউব বা নল আছে। টিউবে ছেঁদা হইলে, বাইসিকল উল্টাইয়া দিতে হইবে; নীচে একখান গামছা বা নেকড়া রাখিলে, ভাল হয়, নহিলে হাতল-দণ্ড ভূমির সংস্পর্শে খারাব হইয়া যাইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, টায়ার-পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ছেঁদাটী সহজে ধরিতে পারা যায়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটী প্রেক বা কাঁটা বা অন্য কোন জিনিস টায়ারে লাগিয়া আছে। ছেঁদাটী যে কোথায়, তাহা যদি উক্তপ্রকারে না জানা যায়, তাহা হইলে টিউব স্ফীত করিয়া কাণ দিয়া শুন। এইরূপ করিলে, তুমি হয় ত ছেঁদাটী কোথায়, তাহা জানিতে পারিবে, কেননা বায়ু বাহির হইবার সময়ে ফোঁস্-ফোঁস্-শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। এইপ্রকারে ছেঁদাটীর অবস্থান-নির্ণয় করিতে পারিলে, টায়ারের উপরে দাগ দিও। তাহার পর টায়ার ঈষৎ খুলিয়া, ভিতরে যে টিউব বা নল আছে, তাহা দরকারমত বাহির করিতে পারিবে। পিছনকার চাকার টিউবে ছেঁদা হইলে, তাহা শৃঙ্খলের দিক্‌হইতে খুলিলে, অসুবিধা হইতে পারে, কাজেই অপর দিক্‌হইতে খুলা ভাল।

টিউব মেরামত করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে সমস্ত বায়ু বাহির করিতে হইবে। তাহার পর, টিউবের ধার যেন চাকার প্রান্তদেশের অভ্যন্তরে ভাল করিয়া বসে, তজ্জন্য অঙ্গুলিদিয়া চাপ দিতে হইবে। এই কাজটী করা হইলে পর, টিউবের যে স্থানে ছেঁদা হইয়াছে, সেখানকার সামান্য অংশ ধরিয়া তুলিয়া চাকার প্রান্তদেশের উপর দিয়া টানিতে হইবে। এই কাজটী যাহাতে সহজে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য পুরাতন বিলাতি দাঁতন-কুঁচি-ব্যবহার

করিলে, ভাল হয়। তুমি যদি কোনপ্রকার যন্ত্র-ব্যবহার না কর, তাহা হইলে তোমার হাতে আঘাত লাগিতে পারে; পক্ষান্তরে ধাতুময় অস্ত্র-ব্যবহার করিলে, তুমি সম্ভবতঃ ভিতরের টিউব ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

উক্তপ্রকার উপায়-অবলম্বন করিয়া ছেঁদাটীর অবস্থান জানিতে না পারিলে, রন্ধ্রচ্ছদের (valve) গুটিকাসকল খুলিয়া দিয়া বাহিরের আবরণের এক প্রান্তদেশ একেবারে খুলিয়া ফেলিও। তাহার পর ভিতরের টিউবের মধ্যে সামান্য বায়ু ঢুকাইয়া তাহা জলপাত্রে ডুবাইয়া দিবে এবং টিউব টিপিয়া দেখিতে থাকিবে, কোন্ স্থান টিপিলে, জলে বুজকুড়ি কাটিতেছে। জল যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, যেস্থানে তোমার ছেঁদা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইস্থানে অঙ্গুলির অগ্রভাগে থুথু দিয়া ঈষৎ আর্দ্র করিয়া টিউব-পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

ছেঁদাটীর অবস্থান-নির্ণয় করিলে পর, শিরীষ-কাগজ-দিয়া সেই স্থান ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। তাহাছাড়া যে স্থানটী মেরামত করা যাইবে, তাহা একেবারে শুষ্ক হওয়া চাই। যে রবার-তালি দেওয়া যাইবে, তাহাও সেইরকমে প্রস্তুত করা দরকার। তাহার পর উক্ত স্থান ও তালি দুইএতেই একটু রবার-দ্রব মাখাইয়া, যেপর্য্যন্ত না তাহা ঈষৎ শুকাইয়া যাইবে, সেইপর্য্যন্ত অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। দুইটিই ঠিক চট্‌চটে হইয়া উঠিলে, তালি ছেঁদাটীর উপরে বসাইয়া দিবে। একটু পরে ভিতরের টিউবের মধ্যে কিঞ্চিৎ বায়ু ঢুকাইয়া তাহা যথাস্থানে লাগাইয়া দেও। টায়ার লাগাইবার আগে তাহা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার, কেননা তন্মধ্যে প্রেক প্রভৃতি থাকিলে, নূতন ছেঁদা হইবার সম্ভাবনা হইবে। ঐপ্রকার জিনিস পাওয়া গেলে, তাহা বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। টায়ারেও ছেঁদা থাকিলে, তাহাও পরিস্কৃত করিয়া ক্যাম্বিস্-দিয়া মেরামত করিতে হইবে। এই কাজ-শেষ হইলে পর, যে স্থানে তালি দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানে কিঞ্চিৎ খড়িমাটি ছড়াইয়া টায়ার ও টিউব যথাস্থানে বসাইয়া তন্মধ্যে বায়ু ঢুকাইয়া দেও।

দ্বিতীয়প্রকার টায়ার তারযুক্ত নহে, কিন্তু তাহার প্রান্তদেশ একটু মোটা। টায়ারের কোন্ ধার খুলিয়া দিতে হইবে, তাহা প্রায়ই টায়ারে নির্দ্দেশ করা থাকে। তৃতীয়প্রকার টিউব সম্বন্ধে এস্থানে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা সাধারণ বাইসিকলে লাগান হয় না। ইহার টায়ার নলাকার।

তুমি যখন দেখিবে যে, তোমার টিউবে ভিতরহইতে বায়ু আস্তে আস্তে বাহির হইতেছে, তখন রন্ধ্রচ্ছদের অবস্থা কিরকম, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা অনেক সময়ে মনে করি যে, টিউবে ছেঁদা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রন্ধ্রচ্ছদের গুটিকা একটু শিথিল হইয়াছে কিংবা রবার হয়ত খারাব হইয়া গিয়াছে। যেমন টিউবের অন্যান্য স্থান, তেমনই রন্ধ্রচ্ছদ-দেশেরও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ভিতরের টিউব মেরামত করিবার জন্য পুরাতন টিউব আমাদের অনেক উপকারে আসিবে, কিন্তু মেটে-তৈলের দ্বারা তাহা প্রথমে পরিষ্কার করিতে হইবে। তোমার ভিতরের টিউব সচ্ছিদ্র হইয়া গেলে, তাহা বদল করা ভাল। বাই-সিকল-টিউব রীতিমত পরীক্ষা করিয়া বাহ্য আবরণের মধ্যহইতে পাথরের টুক্‌রাসকল নিষ্কাশিত করিলে, ভাল হয়। যে সকল ছোট ছেঁদা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমুদয় বুরুষ ও মেটে-তৈল-দিয়া পরিস্কৃত করিলে পর, তন্মধ্যে কোনরকম লগ্নদ্রব্য লাগাইয়া দেও। তুলাতে রবার-দ্রব মাখাইলে, সুবিধাজনক জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে টিউব পরিস্কৃত ও মেরামত করিলে, তাহা অনেক দিন টিকিবে।

এই মাসের প্রতিযোগিতা।

ঘুড়ী।

কি করিয়া ঘুড়ী তৈয়ার করিতে, উড়াইতে ও ঘুড়ীর প্যাঁচ খেলিতে হয়, তদ্বিষয়ে "বালকের" একপৃষ্ঠা-পরিমিত একটী প্রবন্ধ-রচনা করিতে হইবে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি পুরস্কৃত ও "বালকে" প্রকাশিত হইবে। কাগজের দুই-পীঠে লেখা প্রবন্ধ, ভাল হইলেও, পুরস্কার-যোগ্য হইবে না। প্রবন্ধটি এই মাসের শেষ-তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই। প্রত্যেক প্রবন্ধের নিম্নে লেখকের নাম, ধাম ও বয়স লিখিয়া দিতে হইবে। প্রবন্ধটি নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য—

"বালক"-সম্পাদক।
২৩ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। জুলাই-মাসের বালকে একটী সুরঞ্জিত চিত্র প্রকাশিত হইবে।

৩য় বর্ষ।]   জুলাই, ১৯১৪   [৭ম সংখ্যা।

জেনেরল গর্ডন।

প্রথম অধ্যায়।

'চার্লি' গর্ডন।

ইংলণ্ডের টেমস্-নদীর তটে সুবিখ্যাত উল্‌ইচ্-নগর। ঐ নগরে ইংরাজ-সেনা-বিভাগের গোলন্দাজ-সৈনিকেরা শিক্ষিত হয়। প্রায় সত্তরবৎসর আগে ঐ স্থানে একটী দুরন্ত, কুঞ্চিতকেশ, নীল-নেত্রতার বালক বাস করিত, তাহার নাম ছিল—চার্লি গর্ডন।

গর্ডনদিগের আদিবাড়ী স্কট্‌ল্যাণ্ডে; চার্লি যে বংশে জন্মিয়াছিল, সে বংশের সমর্থ পুরুষমাত্রেই যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন। তাহার প্রপিতামহ (ঠাকুরদাদার বাবা) রাজা জর্জ্জের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং 'প্রেষ্টনপ্যান্সে'র যুদ্ধে বন্দী হন, তখন গর্ডনবংশীয়ের অনেকেই প্রিন্স চার্লির অধীনে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাহার পিতামহ বহুপল্টনে ও বহুদেশে সাহসের সহিত সৈনিকের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার পিতাও একজন বীর সৈনিক ছিলেন; তাঁহার এই ধারণা ছিল, সৈনিক-বৃত্তির তুল্য আর বৃত্তি নাই এবং ইংরাজ-সৈন্যবিভাগে কাজ করার মত সুখের কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। তাঁহার সম্বন্ধে, আমরা দেখিতে পাই, লিখিত আছে যে, তিনি দয়ালু, উদার-হৃদয়, প্রফুল্ল-প্রকৃতি, রঙ্গপ্রিয়, ন্যায়নিষ্ঠ ও আত্ম-সম্ভ্রমজ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। তাঁহার স্ত্রী যে বংশের কন্যা ছিলেন, সেই বংশের অনেকে বড় বড় সওদাগর ও দেশাবিষ্কারক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

চার্লির মায়ের গোষ্ঠীর কেহ কখন রাগ করিতেন না, সকলেই অবস্থানুযায়ী সকল বিষয়ের সুধারা করিতে পারিতেন, কি করিয়া অপরের মঙ্গল করিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল, আপনাদের সুখ-সুবিধা তাঁহারা খুঁজিতেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, চার্লি পিতৃপক্ষে বীর এবং মাতৃপক্ষে সাধুবংশ-সম্ভূত ছিল। যখন সে খুব ছোট ছেলে ছিল, তখন সে অবশ্যই তাহার সৈনিক খুড়া, খুড়তুত ভাই ও সহোদরদের বীরত্বের কথা অনেক শুনিয়াছিল, গর্ডন-হাইল্যাণ্ডার সৈনিকেরা যেপ্রকার বিচিত্র উর্দ্দি পরে এবং ঐ সৈন্যদলে যেপ্রকার বংশী বাদিত হয়, তাহাও দেখিয়া ও শুনিয়াছিল।

চার্লস জর্জ্জ গর্ডন উল্‌ইচে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী-তারিখে জন্মগ্রহণ করে। তখনও সে শিশু, এমন সময়ে তাহার পিতা, জেনেরল গর্ডন, তুরস্কদেশের উপকূলস্থিত কর্ফু-নামক এক দ্বীপে এক ব্রিটিস-বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত হইয়া গমন করেন। কেম্ব্রিজের ডিউক ঐ স্থানে সেই সময়ে যে একটি স্ফূর্ত্তিযুক্ত বালককে দেখিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে উত্তরকালে কোন কোন কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু যতদিন না চার্লস গর্ডন দশবৎসর-বয়স্ক হইয়াছিল, ততদিন তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা শুনা যায় নাই। এই সময়ে তাহার পিতা উল্‌ইচে একটী দায়িত্ব-পূর্ণ পদলাভ করেন, তাই তিনি সপরিবারে তথায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তখন চার্লির জীবনের দিনগুলি বড় আমোদে আহ্লাদে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

বহুকাল পরে তিনি তাহার ভাইঝিদিগকে যে বাড়ীতে ইংরাজ-সেনা-বিভাগের আগ্নেয় অস্ত্রগুলি নির্ম্মিত ও ভাণ্ডারজাত হয়, সেই বাড়ীর সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন, "তোমরা কেহ কখন আমরা যেমন ইংরাজ-অস্ত্রাগারের কারিকরদিগকে খাটাইয়া লইতে পারিয়াছিলাম, তেমন পার নাই। আমাদের হুকুম তামিল করিবার জন্য তাহারা নিজেদের কাজ ফেলিয়া রাখিত। আমাদের জন্য ভাল ভাল পিচ্‌কারী করিয়া দিত, সে সব পিচ্‌কারী-দিয়া এক মুহূর্ত্তে

লোকদের ভিজাইয়া দেওয়া যাইত। তাহারা আবার আমাদের প্যাঁচওয়ালা এমন চমৎকার আড়ি-ধনু প্রস্তুত করিয়া দিত যে, কি বলিব!"

চার্লসেরা ভাই-বহিনে এগারজন ছিল। চার্লি ন-ছেলে ছিল। যখন সে ছোট ছেলে, তখনই তাহার দুই বড়-ভাই সৈনিকের কর্ম্ম-গ্রহণ করেন।

ছুটির সময়ই চার্লি বাড়ী আসিয়া অস্ত্রাগারের কারিকরদিগের দ্বারায় উল্লিখিত ক্রীড়নায় প্রস্তুত করাইত। অন্য সময়ে তাহাকে টন্‌টনের একটি বোর্ডিং স্কুলে থাকিতে হইত। এখনও সেই স্কুলের যে মেজের নিকটে বসিয়া চার্লি পড়িত, সেই মেজে তাহার নামের আদ্যাক্ষরগুলি ক্ষোদিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এই বিদ্যালয়ে চার্লি তাহার মেধার সবিশেষ পরিচয় দিতে পারে নাই। সে পাঠাভ্যাস করিতে ভালবাসিত না, কিন্তু সে বেশ চিত্রাঙ্কণ করিতে পারিত, চমৎকার চমৎকার মানচিত্র আঁকিত। সে সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ থাকিত এবং নানাপ্রকার দুষ্টামি করিয়া বেড়াইত—সকলরকম খেলাধূলাতেই সে তরিবৎ ছিল। তাই সে যখন ছুটীতে বাড়ী আসিত, তখন বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয়ই চার্লি গেলে বাঁচি, চার্লির ছুটি ফুরাইলে বাঁচি, বলিত।

একবার সে বাড়ী আসিয়া দেখিল যে, ইঁদুরে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। দেখিয়া তাহার মাথায় একটা কু-মতলব জন্মিল। সে ও তাহার ভাই, যত পারিল, ইন্দুর ধরিল। তাহার পর সেই ইঁদুরগুলাকে তত্রত্য সৈন্যদলের নায়কের বাড়ীর মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া আসিল!

আর একবার তাহারা কয় ভাইএ আড়ি-ধনুর স্ক্রুগুলি-দিয়া অস্ত্রাগারের একাংশের সাতাইশটী সার্সি ভাঙিয়াছিল। একজন সেনা-নায়ক সে সময়ে সেই গুলি-বিদ্ধ হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন! একটা স্ক্রু-গুলি তাঁহারমাথা ঘেঁসিয়া গিয়া দেওয়ালে ঠেকিয়া বিদ্ধ হয়, কে যেন একটা স্ক্রু সেই দেওয়ালে বসাইয়া দিয়াছে!

ফ্রেডি, চার্লির সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাই, তাহার বড়-ভাইরা স্কুলহইতে আসিলে, যদিও আনন্দিত হইত, তবু বড়ই উদ্বেগে দিন কাটাইত। তাহারা কয় ভাইএ গিয়া উল্‌ইচের যত বাড়ীর নাচ-দরোজার*ঘণ্টা বাজাইয়া বাজাইয়া চাকরদের উদ্বাস্ত করিয়া তুলিত।

কিন্তু তাহারা গোলন্দাজ-ছাত্রদিগকে ঠকাইবার জন্য যে কু-কৌশল করিত, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ছিল। ঐ গোলন্দাজ-ছাত্রেরা "বিল্লি" এই উপনামে অভিহিত হইত, ঐ ছাত্রদের মধ্যে যাহারা উচ্চ-শ্রেণীস্থ ছিল, তাহাদিগকেই গর্ডন-ভ্রাতৃগণ সকলের অপেক্ষা বেশী জ্বালাতন করিত। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীটি তখন রাজকীয় অস্ত্রাগারে ছিল। ঐ অস্ত্রাগারের সম্মুখে মৃণ্ময় প্রাকারাদি ছিল, যুদ্ধের সময় কি করিয়া আত্মরক্ষা ও কোন স্থান দুর্গ-রক্ষিত করিতে হয়, তাহা তাহারা তথায় শিখিত। চার্লি ও তাহার ভাইরা ঐ মৃন্ময় প্রাকারাদির অন্ধি-সন্ধির কথা জানিত। এক অন্ধকারময়ী রাত্রিতে, যখন একজন কর্ণেল ঐ গোলন্দাজ-ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন সহসা কামান-গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। গোলন্দাজ-ছাত্রেরা ভাবিল, বক্তৃতা-আয়তনের প্রত্যেক সার্সিই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে, তাই মৌমাছির চাকহইতে যেমন মৌমাছি বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি তাহারা ছট্‌কাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অনুসন্ধান করিয়া তাহারা জানিতে পারিল যে, এক বর্ত্তুলাকার গোলা জানালাগুলি লক্ষ্য করিয়া প্রক্ষেপ করাতেই ঐ ভীম নিনাদ উত্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা অনুমান করিয়া লইল যে, এই কুকাণ্ডের মূলে নিশ্চয়ই চার্লি আছে; কিন্তু রাত্রি অন্ধকারময়ী, তাহাছাড়া চার্লি ঐ মৃন্ময় প্রাকারাদির গলি-ঘুঁজি সকলই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত ছিল, তাই সেই গোলন্দাজ-ছাত্রেরা ডাল-কুত্তার এবং চার্লিরা দুই-ভাই খরগোশের মত হইলেও, ক্রোধান্ধ গোলন্দাজছাত্রেরা চার্লি-ভ্রাতৃদিগকে ধরিতে পারিল না। তাহার পর কিছুদিন চার্লিরা অস্ত্রাগারের ত্রিসীমানায় যাইত না, কারণ তাহারা জানিত যে, ক্রোধোন্মত্ত "বিল্লিরা" তাহাদের ধরিতে পারিলে, আর রক্ষা থাকিবে না।

টন্‌টন্‌হইতে চার্লি শুটার্স হিল-নামে একটি স্থানে সৈনিকের কর্ম্ম-শিক্ষার্থে প্রেরিত হয়। তথায় সে একবৎসরকাল ছিল, তাহার পর তাহার বয়স ষোলবৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই সে উল্‌ইচের রাজকীয় সৈনিকবিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়।

* বিলাতে প্রত্যেক বাড়ীর নাচ-দরোজায় চাকরদের ডাকিবার নিমিত্ত ঘণ্টা থাকে।

সাধারণ বিদ্যালয়ে যখন পড়িত, তখন চার্লি যেমন গ্রন্থপ্রিয় ছিল না, গোলন্দাজ-ছাত্র হইয়াও তেমনই গ্রন্থপাঠে অনাবিষ্ট রহিয়া গেল। সেখানেও এমন কোন দুষ্টামি ছিল না, যাহাতে সেই চারু কুঞ্চিতকেশ ও নীল-চক্ষু-তার 'শান্ত' বালকটি লিপ্ত থাকিত না; কিন্তু তাহার এক গুণ ছিল, দোষটা সে বেশির ভাগ নিজের ঘাড়েই লইত, দণ্ডও সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহ্য করিত। সে কখন দোষ-স্বীকার করিতে ভয় পাইত না। বন্ধুদের দোষও নিজের ঘাড়ে লইয়া তাহাদের হইয়া দণ্ড-ভোগ করিত। বিপদে অবশ্য সে প্রায়ই পড়িত, তাহার মত দুষ্ট ছেলেরা বিপদে না পড়িয়া থাকিতেই পারে না; চার্লি গর্ডনও রাতদিনই লোকের অনিষ্ট ও দুষ্টামি করিয়া প্রায়ই নিজের বিপদ্ ডাকিয়া আনিত সত্য, কিন্তু সে কখন কোন হীন কার্য্য করে নাই। সে কখনই এমন কোন কাজ করে নাই, যাহাতে প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, মিথ্যাবাদিতা প্রভৃতি পাপের স্পর্শ ছিল বা যাহা অভদ্রোচিত।

এই বিদ্যালয়ে কিছু দিন থাকিয়া সদাচরণ করার নিমিত্ত সে অনেক পুরস্কার পায়, পরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নামে এই এক নালিশ উপস্থিত হইল যে, ইহারা আহার-কক্ষ্যাহইতে সরু সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইবার সময়ে বড়ই গোলমাল ও উৎপাত করে, তাই একজন সর্দ্দার-পড়ুয়ার উপর এই আদেশ হইল যে, ছেলেরা যখন সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইবে, তখন তুমি, কেহ যাহাতে দড়বড় করিয়া নামিয়া না যাইতে পারে, তজ্জন্য দুই বাহু-প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইবে। ঐ সর্দ্দার-পড়ুয়াকে ঐপ্রকারে দাঁড়াইতে দেখিয়াই, চার্লি কিছুতেই একটা দুষ্টামি করার লোভ সাম্‌লাইতে পারিল না। সে ষাঁড়ের মত ঘাড় গুঁজিয়া সেই সর্দ্দার-পড়ুয়াকে গুঁতাইতে গুঁতাইতে সিঁড়ি-দিয়া নামাইয়া কাচ-সংযুক্ত দ্বার-ভেদ করিয়া গৃহের বাহির করিয়া দিল! সেই সর্দ্দার-পড়ুয়ার সৌভাগ্য-ক্রমে তাহার অঙ্গে কোনপ্রকার আঘাত লাগে নাই, কিন্তু সে বড় মনঃপীড়া পাইয়াছিল, সেইজন্য সেবার চার্লির নাম-কাটা যাইতে যাইতে রহিয়া গেল।

উল্‌উইচের বিদ্যালয় চার্লি ছাড় ছাড় হইয়াছে, এমন সময়ে প্রকাশ পাইল যে, চার্লি ছোট ছেলেদের বড় উৎপীড়ন করে। সেই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারীর দ্বারায় জিজ্ঞাসিত হইয়া এক নবাগত বালক বলিয়া ফেলিল যে, চার্লি তাহাকে জামা-ঝাড়া বুরুষ-দিয়া প্রহার করিয়াছে। আঘাত তত গুরুতর না হইলেও, চার্লি এবার গুরুতর দণ্ডপ্রাপ্ত হইল। আদেশ হইল যে, সে ছয়মাসের পূর্ব্বে শেষ-পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

এতাবৎ কাল চার্লির গোলন্দাজসৈন্য হইবার বাসনা ছিল, কিন্তু এখন সে জানিল যে, তাহার সহপাঠীদিগের অপেক্ষা সে ছয়-মাস পিছাইয়া পড়িল, তাই সে গোলন্দাজ-সৈনিক হইবার বাসনা-ত্যাগ করিয়া ইঞ্জিনিয়ার হইবার ইচ্ছা করিল। কি সাধারণ বিদ্যালয়ে কি সামরিক বিদ্যালয়ে চার্লি মানচিত্রাঙ্কণের নিমিত্ত প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল, এ কারণ তাহার জননী বড়ই গর্ব্বানুভব করিতেন। একদিন সে দেখিল, তাহার মা একজন আগন্তুককে তাহার একখানি মানচিত্র দেখাইতেছেন। যে কারণে চার্লির মনে হইত যে, তাহার প্রশংসা-লাভ করা অনুচিত, সে কারণে কেহ তাহাকে প্রশংসা করিলে, বিরক্ত হইত, সেই বিরক্তি ও কোপন-স্বভাবহেতু চার্লি মানচিত্রটি লইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল! পরে কিন্তু সে এই আচরণের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইয়াছিল এবং মানচিত্রের টুক্‌রাগুলি আঠা-দিয়া যুড়িয়া মাতার সন্তোষবিধান করিয়াছিল।

বহুকাল পরে সে একজনকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিল, "আমার মা আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন!" সময়ে সময়ে সে তাহার শিক্ষকদিগের উপরও চটিয়া উঠিত। দোষ করিলে, সে দোষাতিরিক্ত দণ্ড লইত, কিন্তু বিনা দোষে কেহ তাহাকে কোন কথা বলিলে, তাহার ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত।

একবার উল্‌উইচস্থিত তাহার এক শিক্ষক তাহাকে বলেন,—"তুমি কখন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী হইতে পারিবে না।"

ইহাতে চার্লির আত্মমর্য্যাদার হানি হয়। সে ক্রোধে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া তাহার পদের নিদর্শন-চিহ্নগুলি ছিঁড়িয়া ঐ সামরিক কর্ম্মচারীর পদপ্রান্তে ফেলিয়া দেয়।

পরীক্ষা দিতে সে আদৌ ভাল বাসিত না, তথাপি সে কখন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয় নাই।

যখন তাহার বয়স পঞ্চাশবৎসর, তখন সে একবার তাহার এক ভগিনীকে লিখিয়াছিল, "আমি কাল একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন আমি আবার সামরিক-বিদ্যালয়ে ফিরিয়া গিয়াছি, আর পরীক্ষা দিতেছি! আমার ঘুম তখন এতটা ভাঙিয়াছিল যে, আমি জানিতে পারিতেছিলাম, আমি যাহা শিখিয়াছিলাম, সব ভুলিয়া গিয়াছি। আমি যে এখন সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছি, ইহা স্মরণ করিতে বাস্তবিকই আমার অনেকটা সময় লাগিয়াছিল, আমি তখন এতই আত্মবিস্মৃত হইয়া মনে করিতেছিলাম যে, আমি আবার গোলন্দাজ-ছাত্র হইয়াছি। ঐ পরীক্ষাগুলি কি দুঃখজনকই না ছিল!"

উনিশবৎসর-বয়ঃক্রমে চার্লি রাজকীয় ইঞ্জিনিয়ারদিগের একজন সব-লেফ্‌টেন্যাণ্ট হয়।

রাজকীয় ইঞ্জিনিয়ারদিগের শিক্ষণীয় কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত উল্‌উইচহইতে চার্লি উক্ত ইঞ্জিনিয়ার-দিগের সদর-স্থান চ্যাথামে যায়।

সেখানে তাহার মানচিত্রাঙ্কণ-কুশলতা বড়ই কাজে লাগে। প্রায় দুইবৎসর সে সেখানে ইঞ্জিনিয়ারদিগের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সবিশেষ শ্রম করে, এবং শীঘ্রই সে একজন উদীয়মান সামরিক পূর্ত্তবিদ্যাবিদ্ বলিয়া খ্যাতিলাভ করে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মাসে সে পাকা লেফ্‌টেন্যান্টের পদ পায়, এবং পেমব্রোকে একটি কার্য্যে প্রেরিত হয়।

চার্লস গর্ডনসকল কার্য্যেই সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করিয়া করিবার চেষ্টা করিতেন, বাল্যকালে তিনি যেমন কায়মনোবাক্যে দুষ্টামির মতলবগুলি আঁটিতেন, এখন তিনি তেমনি কায়মনোবাক্যে নক্সা আঁকিতে ও দুর্গাদি সুদৃঢ়করণে ব্যাপৃত হইলেন।

ত্রিশবৎসর পরে যখন তিনি একবার পেমব্রোকে যান, তখন এক বৃদ্ধ পারাণি মাঝি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আপনিই কি সেই ভদ্রলোক, যিনি জলে হাঁটিয়া সোজা নদী পার হইয়া যাইতেন ?"

মৃত্যুকালপর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন-নদী পার হওয়াই চার্লস গর্ডনের পক্ষে কষ্টসাধ্য-বোধ হইত না।

পেমব্রোকে চার্লস অতি অল্পদিন আছেন, এমন সময়ে ইউরোপে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও তুর্কির সহিত রুষিয়ার এক মহাসমর বাধিয়া গেল। ঐ যুদ্ধ রুষিয়ার একাংশে ক্রিমিয়া-নামক একটী স্থানে সংঘটিত হয়, এইজন্য ইতিহাসে ঐ যুদ্ধ ক্রিমিয়ান সমর-নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে।

চার্লসের দুই বড়-ভাই হেন্‌রি ও এণ্ডার্বি গোলন্দাজ সামরিক কর্ম্মচারী হইয়া ঐ যুদ্ধে গিয়াছিলেন। চার্লসও, প্রত্যেক তরুণ সামরিক কর্ম্মচারী যেমন হয়, ঐ যুদ্ধে যাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন।

কয়েক মাস পেমব্রোকে আসিবার পর আদেশ আসিল যে, চার্লসকে কর্ফুতে যাইতে হইবে। তাঁহার সন্দেহ হইল, তাঁহার পিতাই কল-কৌশল করিয়া তাঁহাকে বিপত্তিসঙ্কুল স্থানহইতে তফাতে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"এই কাজটি আপনার পক্ষে বড়ই অন্যায় হইয়াছে।" কিন্তু শীঘ্রই তিনি একটী অভিনব আদেশ পাইলেন, তাহাতে তাঁহাকে অবিলম্বে ক্রিমিয়ায় যাইতে আদেশ করা হইয়াছিল।

একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে তিনি ক্রিমিয়া যাইতে কত উৎসুক তাহা জানান, সেই সৈন্যাধ্যক্ষ পূর্ব্বাদেশ-প্রত্যাহার করান।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁহার নিকটে দ্বিতীয়াদেশ আসে। দুই দিন পরেই তিনি লণ্ডনের সর্ব্বপ্রধান সামরিক কার্য্যালয়ে তাঁহার তথায় উপস্থিতির কথা-জ্ঞাপন করেন, আর সেই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি পোর্টস্‌মাউথে গমন করেন। প্রথমে স্থির হয় যে, তিনি এক কয়লা-বাহী পোতে যাত্রা করিবেন; কিন্তু সে বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন করা হয়। তিনি পুনরায় লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া তথাহইতে ফ্রান্সে যান।

মার্সেলস্‌হইতে তিনি ইস্তাম্বুল-যাত্রী এক জাহাজে চড়েন। ছেলেবেলা চার্লি গর্ডন যেমন নির্ভয় ও প্রফুল্ল অন্তঃকরণে কোন দুষ্টামি করিতে যাইতেন, এখন তেমনই ভাবে তিনি দুঃখ-কষ্ট, বিপদ্ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে এবং প্রকৃত রণাঙ্গনে হাতে-খড়ি পাইতে চলিলেন।

মোলায়েম ও চোঁচ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মোলায়েম তখন কএকটী টাকা লইয়া চাঁদনী-বাজারের অভিমুখে ছুটিল। সেখানহইতে সে স্বীয় আপাদমস্তক সজ্জার ব্যবস্থা করিয়া ফিরিল। আর কি কি কিনিয়াছিল ? একখানি বোম্বাই শিল্কের শাটী, একখানি রেশমী রুমাল, একশিশি "ক্যাশমিয়ার বোকে" ও এক প্যাকেট "ক্যাডবরীর চক্‌লেট্।" তাহার পর বাড়ী আসিয়া জিনিসগুলি গুছাইয়া রাখিয়া সে আফিসের বড়সাহেবকে এক চিঠি লিখিল যে, তাহার কলেরার মত হইয়াছে, সে সোমবার-দিন আফিসে যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ—পরে কি হয় জানাইবে।—এপ্রকার অসুখের কথায় কোন্ বড়সাহেব ছুটী না দিয়া থাকিতে পারিবেন ?

৪

পরদিন রবিবার। মোলায়েম নাপিত ডাকিয়া চুল কাটিল। তিনবার সাবান মাখিয়া স্নান করিল। আর চাঁদনীহইতে নূতন যে পোষাক আনিয়াছিল, তাহা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দুই-তিন-বার পরিয়া দেখিল, গায়ে "ফিট্" হইয়াছে কি না। তাহাতেও তাহার মনস্তুষ্টি হইল না। অবশেষে একটী পয়সা লইয়া গিয়া যে পাণের দোকানে বড় একটী আয়না ছিল, সেইখানে পাণ কিনিবার ছলে আয়নায় আপনার আপাদমস্তক দেখিয়া আসিল। দেখিয়া সে সন্তুষ্টই হইল, কেননা সে একটু ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল; কিন্তু আমরা জানি, সে পোষাকে তাহাকে বড়ই কিম্ভূতকিমাকার দেখাইতেছিল। দোকানদারেরা সেপ্রকার ফরমায়েসী চেহারা আর কোথায় পাইবে ? যাহা হউক, সে দিন ও রাতটা মোলায়েমের "হিয়-হিয়-হিয়ণ" আওড়াইয়াই কাটিল। পরদিবস প্রত্যুষে উঠিয়াই সে বেশ করিয়া সুগন্ধি সাবান ঘষিয়া স্নান করিল। তাহার পরে, চা-পান করিয়া বেশবিন্যাস করিতে বসিল। আধঘণ্টা ধরিয়া টেড়ি কাটিল। তাহার পর সেই নূতন

সুট ও বুট পরিয়া তাহার সেই ঘোলা চক্ষু-দুইটির সাহায্যে, যতদূর পারিল, আপনাকে একবার দেখিয়া লইল। তাহার পর, সাতটা না বাজিতেই তাহার ভবিষ্য প্রিয়তমাকে উপহার দিবার জন্য যে সমস্তসামগ্রী সে কিনিয়াছিল, সেগুলি একখানি বড় তোয়ালেতে যত্নপূর্ব্বক বাঁধিয়া লইয়া বেলেঘাটা-অভিমুখে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। পথে সে এক রুটী-বিস্কুটের দোকানহইতে দুই-সের কুলিচা-বিস্কুট কিনিয়া লইতে ভুলিল না। রসিক পার্শ্বের ঘরেই লুকাইয়া ছিল, সে তাহাকে বাহির হইতে দেখিয়া একটু পরে তাহার পিছু হইল।

৫

বেলেঘাটা-ষ্টেশনে পঁহুছিয়া মোলায়েম প্ল্যাটফর্ম্মে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া চোঁচ্‌বাবুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মোলায়েমের তথায় পঁহুছিবার প্রায় তিন-কোয়া-টার পরে রসিক সেখানে দেখা দিল। বলিল,—"এই যে মোলা-য়েম-ভায়া! টিকিট কেনা হ'য়েছে?

"না, আমি বলি ম'শয় বুঝি আমাকে নিরাশ ক'র্‌লেন। ট্রেণের আর দেরী নাই।"

"আরে দূর পাগল! ট্রেণের এখনও ঢের দেরী আছে। আমরা বরং অনেক আগেই এসেছি। দাও দেখি, তুমি আমাদের দু'জনের জন্যে দুখানা ইণ্টারমিডি-য়েট্‌-ক্লাসের টিকিট কিনে নিয়ে এস। পুঁটলীটা আর হাতে ক'রে নিয়ে যেও না—ভীড়ে চেপ্টে যাবে। কুলিচা কিনেচ তো?"

"হাঁ তা'কি ভুলি?"

"তবে যাও টিকিট-দুখানা নিয়ে এস।"

মোলায়েম পুঁটলীটা রসিকের হাতে দিয়া টিকিট কিনিতে চলিয়া গেল। সে দৃষ্টি-বহির্ভূত হইলে, রসিক তাড়াতাড়ি তাহার পুঁটলীটা খুলিয়া দেখিল। দেখিয়া সে আপন মনে না হাঁসিয়া থাকিতে পারিল না। কুলিচাগুলি, যত পারিল, তাহার কোটের দুই পকেটে পুরিয়া লইয়া তাহার রেশমী চাদরখানি খুলিয়া গায়ে দিল—চকলেটের প্যাকেটটীও লইতে ছাড়িল না। তখনও ট্রেণ-ছাড়িবার ঢের দেরী। মোলায়েমের টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল, রসিক কতকগুলি রাস্তার পাথর ও খানিকটা গোময়-সংগ্রহপূর্ব্বক কুলিচার কাগজের থলিয়ায় পূর্ণ করিয়া মোলায়েমের পুঁটলীটি যেমন ছিল, আবার তেমনই করিয়া বাঁধিল। তাহার পর মোলায়েমের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনেক পরে মোলায়েম ফিরিল, তাহার হস্তে দুইখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট।

রসিক বলিল,—"ভায়া, বিয়ের সময় কারুরই মাথার ঠিক থাকে না। তুমি টিকিট-দু'খানি আমাকে দাও, আমি রাখি। তোমার কাছে থা'ক্‌লে, তুমি নিশ্চয়ই হারিয়ে ফে'ল্‌বে।"
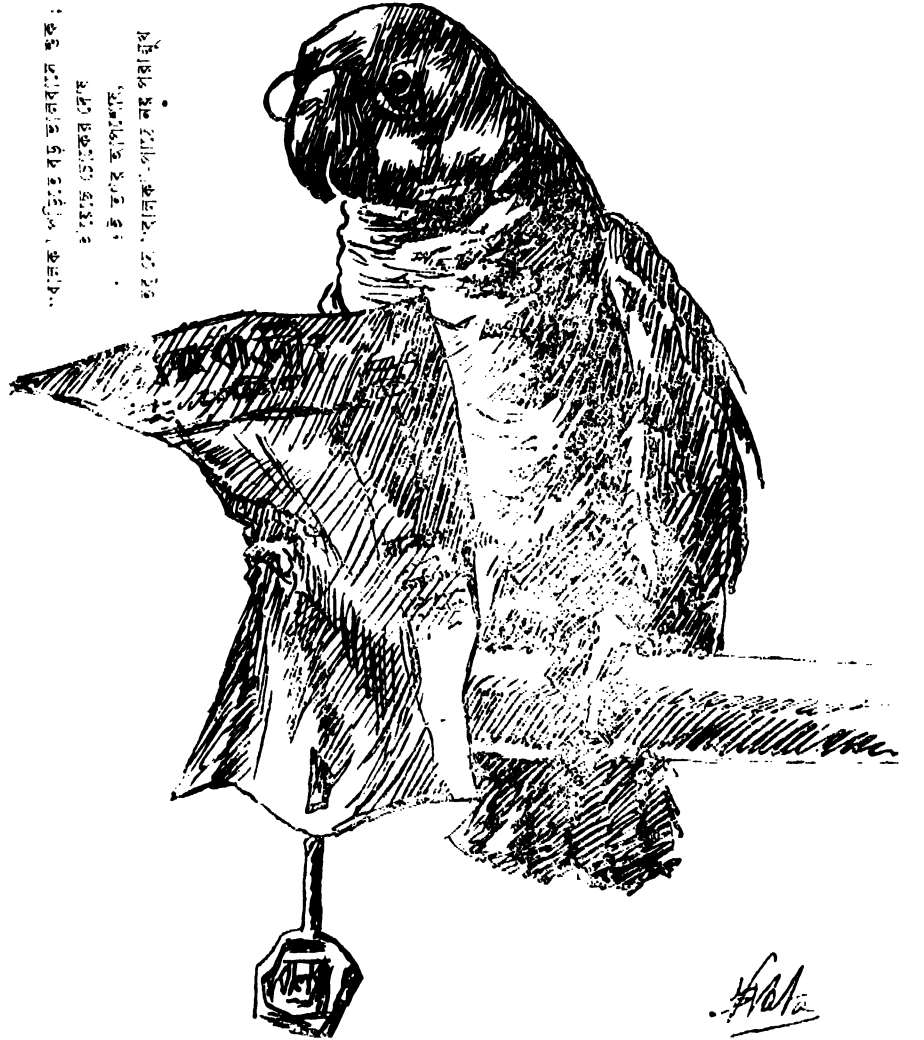
মোলায়েম একটু হাসিয়া টিকিট-দুইখানি রসিকের হাতে দিল। অনন্তর, দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; মোলায়েম সুখস্বপ্নে ভোর হইয়া রহিল, রসিক বসিয়া বসিয়া আপন মনে ফিক্‌ ফিক্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল,—"ওহোঃ, বড্ড ভুল হয়েছে। ভায়া, তোমার কাছে একটা টাকা হ'বে?"

"কেন বলুন দিকি?"

"আমার শালাটীর ভারি অসুখ। তার জন্যে আমি আপেল, বেদানা, আঙুর এইরকম ক'টা ফল কিনে নিয়ে যা'ব মনে

করেছিলুম, কিন্তু বাড়ীথেকে টাকা আ'ন্‌তে ভুলে গিয়েছি। তোমার যদি একটা টাকা থাকে ত দিতে পার, আমি সেখানে পঁহুছিয়েই তোমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দেব।"

"তা'র জন্যে আর কি হয়েছে? যান আপনি দৌড়ে গিয়ে ফলগুলো কিনে আনুন। দে'খ্‌বেন, দেরী করবেন না—আর সময় নেই। এই নিন টাকা।"

রসিক তাহার হস্তে পুঁটলীটি দিয়া, টাকাটি হস্তগত করিয়া দ্রুতপদে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মহইতে বাহির হইয়া গেল। টিকিটঘরে গিয়া টিকিট্‌-দুইখানি ফিরাইয়া দিয়া দাম-আদায় করিল। তাহার পর ট্রামে চড়িয়া একেবারে 'কম্পাউণ্ডে' উপস্থিত হইল।

এদিকে মোলায়েম, চোঁচ্‌বাবু এই আসে, এই আসে করিয়া প্রায় তিনঘণ্টা কাটাইল। চোঁচ্‌বাবু আর ফিরেন না। বেলা এগারটার সময় তাহার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। ভাবিল,—"চোঁচ্‌বাবুর, কি জানি কি হ'য়েছে, আ'স্‌তে, বোধ করি, দেরী হ'বে। দু'সের কুলিচা আছে, কিছু খেয়ে জল খাওয়া যাক।" পুঁটলী খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির! ক্রোধে, ক্ষোভে সে পাগলের মত হইল। তখন সে সকলই বুঝিল। চোঁচ্‌বাবুকে ইংরাজী-বাঙলায় মিশাইয়া নানাপ্রকার অকথ্য গালি দিতে দিতে "কম্পাউণ্ডে" প্রত্যাগত হইল। নিজ কুঠরীর কাছে আসিয়া দেখে, কে তাহার ঘরে আর একটা তালা লাগাইয়া দিয়াছে, এবং তাহার দরজায় কে খড়ি-দিয়া গোময়-শব্দটির প্রচলিত বাংলা-প্রতিশব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া দিয়া গিয়াছে—

গো + বর = গোবর!

সম্পূর্ণ।

সারমেয়-যান।

উত্তরকেন্দ্রে এস্কিমো-নামে একজাতীয় মনুষ্য বাস করে। শীতের আতিশয্যবশতঃ তাহারা কখন দীর্ঘাকার হয় না। শীতের ভয়ে তাহারা সর্ব্বদা পশম ও পশুচর্ম্মে আপনাদের দেহ আবৃত করিয়া রাখে, তাহা না করিলে, তাহারা শীতে জমিয়া মরিয়া যাইত; কিন্তু তাহারা কোন্ কোন্ পশুর নিকটহইতে চর্ম্ম ও পশম পায়? করুণাময় পরমেশ্বর এস্কিমো-দিগের শীতবারণার্থে তথায় এমন কয়েকটি জীবকে সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহাদিগের চর্ম্ম বা পশম তাহাদের সবিশেষ প্রয়োজনে আইসে।

ভল্লুকের নিকটহইতে এস্কিমোরা উৎকৃষ্ট পশম পায়। তদ্ভিন্ন তথায় সিলনামে একপ্রকার বর্ত্তুল-মস্তক ও মৎস্যের ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট জীব দৃষ্ট হয়, উহার গাত্রচর্ম্ম খুব গরম। এস্কিমোরা ঐ চর্ম্মের জামা, জুতা ও টুপি প্রস্তুত করে।

কিন্তু এস্কিমোদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জীব তাহাদের কুকুরেরা। কুকুরেরা এস্কিমোদের অশ্বের কার্য্য করে। ঐ দেশে অশ্ব পাওয়া যায় না, তথায় অশ্ব বাঁচে না। ঐ চির-তুষারাবৃত-প্রদেশে অশ্বের খাদ্য লতাতৃণাদি একান্ত দুর্লভ; বিস্তীর্ণ পথাদিও প্রস্তুত হইতে পারে না।

একারণে এস্কিমোকে সারমেয়-যানে ভ্রমণ করিতে হয়। যে যান ঐ কুকুরদিগের দ্বারায় বাহিত হয়, তাহাকে স্লেজ বলে। ঐ স্লেজ কোন দেশে অশ্বের দ্বারা কোনও দেশে বা বল্গা-হরিণের দ্বারা বাহিত হয়। এস্কিমোরা ঐ যান তিমি-মৎস্যের অস্থিদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া সিলের চর্ম্মদ্বারা আবৃত করে। ১২।১৩টি কুকুর ঐ স্লেজে যোতা হয়। যে কুকুরটিকে সাম্‌নে যোতা হয়, সে অন্য কুকুর-দিগের পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করে, চালক তাহাকেই পথ-নির্দ্দেশ করিতে থাকে।

"নান্নুক" বলিয়া চীৎকার করিলেই, কুকুরেরা খুব দ্রুতভাবে ছুটিতে থাকে।

ঐ দেশের হিংস্রস্বভাব শ্বেত-ভল্লুকের নাম—"নান্নুক।" কুকুরেরা তাহাদিগের প্রভুদের সহিত শিকারে যায়। উহারা ঐ শ্বেত-ভল্লুকের মহাশত্রু। বেজী যেমন সাপ দেখিলেই, তাড়া করে, ঐ দেশের কুকুরেরা তেমনই শ্বেত-ভল্লুক দেখিলেই, ঘেউ-ঘেউ-শব্দে তাহাকে তাড়া করিয়া যায়।

এস্কিমোরা তত্রত্য কুকুরদের এই ঘৃণার কথা জানে, তাই তাহারা কুকুরদের প্রায়ই ঠকাইয়া থাকে। ভল্লুক না দেখিলেও

তাহারা "নাম্ুক" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, কুকুরেরা অমনই দ্রুতবেগে ছুটিতে আরম্ভ করে!

সর্দ্দার-কুকুরটা বড় চালাক হয়। সে ভুল প্রায় করে না। রাত্রি অন্ধকারময়ী হইলে এবং মেরুপ্রদেশীয় তুষারঝটিকা বহিতে আরম্ভ করিলে, সে নাসিকা ভূমিসন্নিহিত করিয়া গন্তব্য স্থানের দিকে ছুটিতে থাকে। চালক কুকুরদের প্রতি সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করে না। শীতকালে তাহাদিগকে বেশী খাইতে দেয় না; কারণ তখন তাহার নিজেরই খাদ্য দ্রব্যের অসদ্ভাব ঘটে; কিন্তু এস্কিমো-গৃহিণীরা কুকুরদিগকে ভাল বাসে এবং সুবিধা পাইলেই, তাহাদের কিছু না কিছু খাইতে দেয়। কুকুরদের অসুখ হইলে, তাহাদের কুটীরের মধ্যে শোওয়াইয়া রাখে, শুশ্রূষা করে, তাই কুকুরেরা বাড়ীর গৃহিণীকে বড় ভাল বাসে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বত্রই যায়। খুব ক্ষুধিত থাকিলেও, কুকুরেরা গৃহিণীর আহ্বানে কুটীরের মধ্যহইতে বাহির হইয়া আসে এবং স্লেজে যোজিত হইতে আপত্তি করে না।

কিন্তু পথে যাইতে যাইতে যদি তাহারা কোথাও কিছু খাদ্য দ্রব্য দেখিতে পায়, অমনই সেই দিকে ছুটিয়া যায়, তখন চালক তাহাদের অন্য পথে লইয়া যাইবার জন্য ধমক দিলে বা মারিলেও তাহারা খাদ্য দ্রব্য-নিঃশেষ না করিয়া এক-পাও অগ্রসর হয় না।

শরতের সাধ

——পুর একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশন। ঐ ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার-বাবুর বেতনও বড় অল্প, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম নহে,—প্রায় এক ডজন! আয় কম, সন্তান বেশী হইলে, যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। তাঁহার সন্তানগুলি কষ্টে দু'বেলা দু'মুঠা খাইতে পায় বটে, কিন্তু তাহাদের উচিতমত শিক্ষা প্রভৃতি দেওয়া যাইতেছে না। তাঁহার বড়ছেলে, শরৎ, অনেক-দিন হইল, মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের শেষ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, অর্থের অভাবে তাহার পিতা তাহাকে আর পড়াইতে পারিতেছেন না। একারণ শরৎ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া আছে। তাহার উপর সম্প্রতি সে একটী বীরত্ব-কাহিনী-পূর্ণ বহি পড়িয়াছে—তাহাতে অনেক আত্মত্যাগপরায়ণ বীরের কাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত আছে। পড়িয়া শরতের নিজ জীবনের প্রতি বড়ই বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে—অমনি যদি বীরত্ব না দেখাইতে পারিলাম, তবে এ জীবন-ধারণে সুখ কি? ইহাই এখন তাহার মনের ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশে দুই-একটী তারা ফুটিয়াছে। শরতের পিতা দূরে একটা হাটে গিয়াছেন, তখন তাঁহার ছুটী। শরৎ রেলের লাইনের উপর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রোশেক-খানিক দূরে গিয়া দেখিল—এ কি! এখানে লাইন ভাঙা কেন? কে ভাঙিল? শরৎ জানে, মেল আসিবার আর বড় দেরী নাই। তখন তাহার হৃদয় এক বিচিত্র আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই তো বীরত্ব-প্রকাশের সময়। ক্রমে রজনী নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন হইল। আকাশ নিযুত নক্ষত্রে বিখচিত হইয়া হীরক-মণ্ডিত নীলচন্দ্রাতপতুল্য বোধ হইতে লাগিল। গাছে গাছে জোনাকীরা ঝিকিমিকি করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অদূরে এক জলায় আলেয়ায় আলো নাচিয়া বেড়াইতেছিল। ভেকেরা তারস্বরে কেবলই "সা" ভাঁজিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া শিয়ালেরা "ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া" হাঁকিয়া আত্মীয়দের খোঁজ-খবর লইতেছে। শরতের পিতা ষ্টেশনে আসিয়া আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি শরতের গৃহহইতে অনুপস্থিতির কথা অবগত নহেন। যেখানে রেলবর্ত্ম ভাঙিয়াছে, তাহা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ ষ্টেশনহইতে প্রায় ক্রোশখানিক দূরে, অতদূরে তাঁহার নজর চলিতে পারে না।

শরৎ সেখানে এখন কি করিতেছে? তাহার পকেটে দিয়া-শলাই ছিল। সে যত পারিয়াছে শুষ্ক কাষ্ঠ কুড়াইয়া সেই ভগ্ন রেলবর্ত্মের কাছে আনিয়া জড় করিয়াছে, তাহার পর তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। আগুন হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, শরৎ বসিয়া বসিয়া সেই অগ্নিতে ইন্ধন-প্রয়োগ করিতেছে, আর মাঝে মাঝে, মেল আসিতেছে কি না, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে। যদি মেল শরৎকর্ত্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নি লক্ষ্য না করে? যদি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়? তাহা হইলে শরতের তো জীবন যাইবেই, ঐ ট্রেণের আরও কত যাত্রীর যে প্রাণনাশ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? সে কথা ভাবিতেও শরতের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। তাই শরৎ প্রাণ-পণে অগ্নিটিকে প্রবল করিবার চেষ্টা করিতেছে। দূরে এঞ্জিনের বৃষচক্ষু-বর্ত্তিকালোক প্রত্যক্ষ হইল। দেখিয়া শরতের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।

ঐ ট্রেণের চালক বড় সাবধান লোক; সে সম্মুখে আলোক

নব প্রতিযোগিতা

এই লকের একপৃষ্ঠাব একটি প্রবন্ধ-রচনা করি হইবে রচনাটি রেকৃত ও বালকে প্রকাশিত হইবে। কাগজের দুইপী লেখা প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না। প্রত্যেক প্রবন্ধে রচক বা রচয়িত্রীর নাম, মি ও বাস লিখিয়া দিতে হইবে। প্রবন্ধটি এইমাসের শেষ-তারিখের মধ্যে "বালক-নং যো রঙ্গী রোড, কলিক।— এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রতিযোগিতার ফল আগষ্ট লিকে" প্রব শিত হইবে লক-সম্পাদক।

দেখিয়া ট্রেণের গতি শ্লথ করিয়া দিল। ট্রেণ ধীরে ধীরে অগ্নির অদূরে আসিয়া একেবারে থামিয়া গেল। চালক ও গার্ড ছুটিয়া অগ্নির সমীপবর্ত্তী হইল। দেখে, এক বালক আগুনে কাঠ ঠেলিয়া দিতেছে। উভয়েই রূঢ়স্বরে তাহাকে এইরূপ করিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। বালক দুই রক্তমূর্ত্তি সাহেবকে ক্রুদ্ধাবস্থায় দেখিয়া ভয়ে নির্ব্বাক হইল, কেবল সভয়ে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া লৌহবর্ত্মের ভগ্ন স্থানটি দেখাইয়া দিল। চালক ও গার্ড বৃষচক্ষু-আলোকের সাহায্যে ভগ্ন স্থানটি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। তখন তাহারা উভয়েই স্নিগ্ধনয়নে শরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে সেই ট্রেণের অনেক যাত্রী তথায় আসিয়া পড়িল। তাহারা ব্যাপার বুঝিয়া বালক শরতের কাছে বড়ই কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই ট্রেণে একজন পাদ্রী সাহেব ছিলেন। তিনি আসিয়া শরৎকে কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, -"তোমার নাম কি?

শরৎ নাম বলিল।

পাদ্রী-সাহেব। শরৎ, তুমি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। আমরা তোমার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম। এই উত্তম কার্য্য করার জন্য আমরা তোমাকে কিছু পুরস্কার আনন্দের সহিত দিতে চাই। তুমি কি চাও?

শরৎ বলিল,—"আমি আরও প'ড়্‌তে চাই।"

পাদ্রী-সাহেব। কেন, তোমার পিতা কি তোমাকে পড়ান না?

শরৎ তখন সব কথা বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া পাদ্রী-সাহেব প্রথমে যাত্রীদিগকে জড় করিয়া ঈশ্বরের কাছে বিপন্মুক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিলেন। তাহার পর, তিনি তাহার টুপি পাতিয়া সকলের কাছে শরতের জন্য ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাই সেই ট্রেণে বেশী ছিলেন। তাহা-ছাড়া সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীও কয়েকজন ছিলেন। সাহেবের টুপি সিকি, দু-আনি, আধুলি, টাকা, নোট ও চেকে ভরিয়া গেল। কয়েকজন বাঙ্গালী মহিলা তাঁহাদের গায়ের গহনা খুলিয়া দিলেন। আরদালী, চাপরাসীরাও মুক্তহস্ত হইল।

ইতোমধ্যে শরতের পিতা সেই স্থানে পঁহুছিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ও গৌরব-প্রদীপ্ত আননে তাঁহার পুত্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া সুখ্যাতি করিতেছেন।

শরৎ বীর হইতে চাহিয়াছিল, তাহা তো সে হইলই, তাহা-ছাড়া তাহার আরও লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা ছিল—সে ইচ্ছাও পূর্ণ হইতে চলিল।

ঈশ্বর মনুষ্যের সদিচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না।

রাসভের রস-কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার নূতন মনিব লোকটা মন্দ ছিল না, কিন্তু আমাকে ভয়ানক খাটান তাহার এক মহৎ দোষ ছিল। সে আমাকে ছোট একটী মালবাহী শকটে যুতিত, আর সেই গাড়ীতে করিয়া সে আমাকে দিয়া মাটা, সার, কাঠ আরও কত কি বহাইত। ফলে আমি কুড়ে হইয়া পড়িলাম। গাড়ীতে যোতা থাকিতে আমার ভাল লাগিত না, হাট-বারটা তো আমার দু'চোকের বালাই ছিল। সে যে আমাকে দিয়া বেশী ভারি জিনিস বহাইত বা মারিত, তাহা নয়, কিন্তু ভোরহইতে বেলা চারিটাপর্য্যন্ত আমাকে অনাহারে থাকিতে হইত। গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত, তবুও যতক্ষণ না সমস্ত মাল বিক্রয় হইয়া যাইত, কর্ত্তার হাটের লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, আলাপচারি, ইয়ার্কী-শেষ হইত, ততক্ষণ আমাকে যোতা অবস্থায় ঠায় দাড়াইয়া থাকিতে হইত।

সুতরাং এ সময়ে আমার সময়টা তত ভাল যাইতেছিল না। আমি চাহিতাম যে, আমার মনিব তা'র চেয়ে আমার উপরে একটু বেশী সদয় হয়, কিন্তু তা' সে হইত না, তাই আমার তাহার উপরে প্রতিশোধ লইতে বাসনা জন্মিল। তোমরা আমাদের যত বোকা ঠাওরাও, দেখিতেই পাইতেছ, আমরা তত বোকা নই। তা'-ছাড়া, তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, এ সময়ে আমি একটু বিগড়িয়া যাইতেছিলাম।

হাটের দিন আসিলে, কর্ত্তা ভোরে উঠিয়াই ক্ষেতহইতে তরি-তরকারী কাটিতে ও হাঁস-মুরগীর ডিম জড় করিতে আরম্ভ করিত।

আমি মাঠে শুইয়া শুইয়া সব দেখিতাম। রোদ উঠিলেই, সে আসিয়া আমাকে গাড়ীতে যুতিত।

আমি তোমাদের আগেই বলিয়াছি, এসব আমার ভাল লাগিত না। তাই একদিন আমি আমার মনিবকে ফাঁকি দিবার মতলব আঁটিলাম।

মাঠের চারিধারে কাঁটাগাছে ভরা খানা ছিল। আমি স্থির করিলাম, এবার হাটবারে ঐ খানায় নামিয়া লুকাইয়া থাকিব। কর্ত্তা আমাকে গাড়ীতে যুতিতে আসিয়া খুঁজিয়া না পাইলে চেঁচাইবে, "আরে গাধাটা কোথা গেল?" আমি তখন কাঁটাবনের মধ্যে লুকাইয়া লুকাইয়া মন খুলিয়া হাসিব!

হাটবারে আমি সত্যই তাহাই করিলাম। যখন বুঝিলাম গাড়ী-বোঝাই হইয়াছে, তখন খানার মধ্যে আস্তে আস্তে নামিয়া লুকাইয়া রহিলাম। খানিকক্ষণ বাদে শুনিলাম, আমাকে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি হইতেছে। শুনিলাম, কর্ত্তা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ওরে ফোক্‌রে, (তাহার বড়ছেলের নাম) দেখ্ তো, পগার ডিঙিয়ে ক্ষেতে গেছে কি না।" ফকীর-বেচারা আমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া আসিল, কোথাও পাইল না।

সেদিন ভারি গরম, কর্ত্তার মেজাজ ভারি খাপ্পা হইল। কে তাহার গাধা-চুরী করিয়াছে, সে এই সাব্যস্ত করিয়া তাহার উদ্দেশে গালি দিতে দিতে একটা বলদ গাড়ীতে যুতিয়া অবেলায় হাটে উপস্থিত হইল। সেদিন তাহার বেচা-কেনা কেমন হইয়াছিল, বলিতে পারি না।

যখন আমি বুঝিলাম, মাঠের দিকে লোকজন বড় নাই, তখন আস্তে আস্তে খানাহইতে উঠিয়া মাঠের আর এক ধারে গিয়া "হিঁও, হিঁও" করিয়া চেঁচাইতে লাগিলাম। আমার ডাক শুনিয়া ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী দেখা দিল, আমাকে পাইয়া তাহারা মহাখুসী। চোরের বাড়ীহইতে পলাইয়া আসিতে পারিয়াছি বলিয়া, তাহারা আমার বুদ্ধির কত প্রশংসা করিল। আদর করিয়া আমার পীঠে থাবড়া মারিতে লাগিল, আমার মনে অবশ্য একটু আঘাত লাগিল, আমাকে আদর করা উচিত ছিল না, তাহার বদলে ঘা-কতক লগুড়ের বাড়ী দেওয়াই উচিত ছিল।

চাষা ঘরে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া ভারি আশ্চর্য্য হইল। তাহার পর দিন সে মাঠের ধারের সমস্ত বেড়া মেরামত করিতে লাগিল। তখন আর একটা বিড়ালেরও গলিয়া যাইবার যো রহিল না।

সমস্ত সপ্তাহটা চুপচাপ করিয়া কাটিল। তাহার পর আবার হাটবার আসিল। তখন আবার আমি সেই খানায় গিয়া লুকাইলাম। চাষা আমাকে খুঁজিয়া পাইল না, ভাবিল, যে চোরটা আমাকে চুরী করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে বড় চালাক। আমি শুনিলাম, কর্ত্তা বলিল, "যা! এবার আর তা'কে পাওয়া যা'বে না!" তাহার পর সেদিনও সে একটা বলদকে গাড়ীতে যুতিয়া হাটে গেল। গোলমাল চুকিয়া গেলে, আমি আস্তে আস্তে খানাথেকে উঠিয়া আসিলাম। আজ আর "হিঁও, হিঁও" করিয়া ডাকিলাম না। বাড়ীর লোকেরাও আজ আমাকে আদর করিল না। বোধ হয় আমার উপর তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল।

আমি মনে মনে বলিলাম, "তোমরা যদি আমাকে ধ'র্‌তে পার ভারি বাহাদুরি কর্‌বে, কিন্তু তা' আর পা'র্‌ছ না।"

তাই আবার হাটবারে আমি খানায় গিয়া লুকাইলাম, কিন্তু বেশীক্ষণ গেল না, বাড়ীর "কেলো"-কুকুরটা কর্ত্তার সঙ্গে আসিয়া আমি যেখানে লুকাইয়াছিলাম, সেইখানে মাঠের উপরে দেখা দিল। কর্ত্তা বলিল, "কেলো, খোঁজ্, খুঁজে বা'র্ কর বেটাকে। এইখেনেই কোথাও হ'বে। যাহা দে'খ্‌তে পা'বি, অমনি পা কা'ম্‌ড়ে ধর্‌বি।" কেলো শুঁকিতে শুঁকিতে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া, আমার পা কামড়াইয়া ধরিল। যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে করিতে আমি বেড়া ফুঁড়িয়া ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না, কর্ত্তা আমার গলায় ফাঁস গলাইয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহারপর হিঁচ্‌ড়াইতে হিঁচ্‌ড়াইতে টানিয়া লইয়া গিয়া একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল—'বেধড়ক' মার দিল।
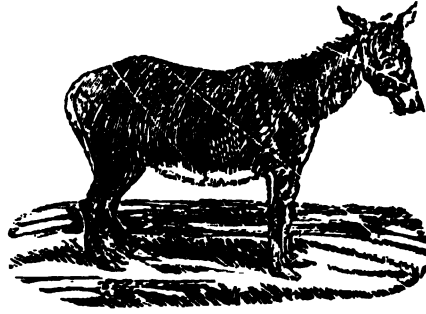
তাহার পরদিনহইতে বাড়ীশুদ্ধ লোক আমার উপর বড় দুর্ব্যবহার করিতে লাগিল। যে ঘরে আমাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইত, তাহার খিল আমি মুখ দিয়া খুলিয়া ফেলিয়া এক-এক-সময় বাহির হইয়া পড়িতাম। তখন বাড়ীর কেহ-না-কেহ আমাকে মা'র দিতে দিতে আবার ঘরে বন্ধ করিত। আমি সেদিন ধরা পড়িতাম না, কিন্তু শেষ-হাটবারে কর্ত্তা তাহার ছোট ছেলেকে, আমি কোথায় যাই, কি করি, তাহা দেখিবার জন্য মাঠের একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আমি তাহা জানিতে পারি নাই, তাই ধরা পড়িয়াছিলাম। সেই দিন-অবধি সেই চুক্‌লী-খোর ছেলেটার উপর আমার জাত-ক্রোধ জন্মিয়াছে।

দোষ আমার, তাই সাজা পাইয়াছি; কিন্তু সে কথা আমার এ সময়ে মনে রহিল না, আমি আরও দুষ্টামি করিতে লাগিলাম। একদিন আমি এক ক্ষেতে ঢুকিয়া অনেক ফসল খাইয়া ফেলিলাম, আর একদিন সেই চুক্‌লী-খোর ছেলেটাকে এক লাথি দিলাম, আর একদিন একবাল্‌তী গরুর দুধ চোঁ চোঁ করিয়া চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিলাম। এইরকম রোজ একটা না একটা বদমাইসি

করিতে লাগিলাম। শেষে গৃহিণী ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া আমাকে বেচিয়া ফেলিতে কর্ত্তাকে অনুরোধ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যাহার কাছে আমাকে বিক্রয় করা হইল, সেও আমাকে বেশি দিন তাহার বাড়ীতে রাখিল না; কাহারও কাছে বিক্রয় না করিয়া একদিন বাড়ীহইতে তাড়াইয়া দিল। তখন শীতের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি বনে গিয়া রহিলাম। বনে আমার বড় খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হইতে লাগিল। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম, যতদিন ভাল ছিলাম, বেশ ছিলাম, কোন কষ্ট ছিল না। দুষ্ট হওয়া-অবধি নানারকম কষ্ট পাইতেছি। বুঝিয়া দেখিলাম, কুড়ে, প্রতিহিংসা পরায়ণ হইলে, জীবনে কোন সুখ পাওয়া যায় না। তাই সেই-অবধি ভাবিলাম, আর দুষ্টামি করিব না, আবার ভাল হইব।

বসন্তকালে একদা আমি বনপ্রান্তবর্ত্তী এক গ্রামের ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, এক ময়দানে ভারি লোকের ভীড় হইয়াছে। লোকেরা সব পর্ব্বদিনে যেমন বাবু সাজে, তেমনই বাবু সাজিয়া দলে দলে সেই মাঠে আসিয়া জমা হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই গ্রামের, বোধ করি, সমস্ত গাধাই সেদিন সেই মাঠে হাজির হইয়াছে। তাহাদের বেশ তেল-চুকচুকে, মোটাসোটা চেহারা, তাহাদের মাথায় ফুলের ও পাতার মালা পরান, কাহারও গায়ে সাজ বা পীঠে সওয়ার নাই।

আমি ব্যাপারখানা কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত ছুটিয়া সেই মাঠে উপস্থিত হইলাম। তখন সেখানে যে ছোক্‌রারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন হঠাৎ ঠাট্টা করিয়া বলিয়া উঠিল, "বা! চমৎকার একটা গাধা এয়েচে তো! মরি রে মরি, কি সুন্দর চেহারা!"

আর এক ছোক্‌রা বলিল,—"ঠিক ব'লেছ, খাসা চেহারা! দে'খ্‌ছ না, কেমন দলাই-মলাই করা! কেমন হৃষ্ট-পুষ্ট! —যা'কে বলে ঘীয়ে ভাজা! বেটা ক'যুগ খেতে পায়নি, তা' খোদাই জানে!"

আর এক ছোক্‌রা বলিল,—"ওরে, এটাও বুঝি গাধার দৌড়ে পাল্লা দিতে এয়েছে! হ্যাঁ, তা' তুমিই প্রথম হ'বে বটে! হাওয়ার ধাক্কায় হুমড়ী খেয়ে প'ড়ে না গেলে বাঁচি!"

ছোক্‌রাদের রসিকতা যেন আমার গালে চড় মারিতে লাগিল, কিন্তু আমার বাস্তবিকই দৌড়ে পাল্লা দিবার ইচ্ছা হইল, তাই তাহারা আর কি কথা বলে, তাহা কাণ খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

একটা বুড়া চাষা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ মাঠে দৌড় হ'বে?"

মফীজ বলিল,—"বোয়ালমারির মাঠে।"

বুড়া। কতগুলো গাধা দৌড়'বে?

মফীজ। ষোলটা, যে গাধাটা পহেলা হ'বে, সে দু'মোণ বীজ-ধান পা'বে।

বুড়া। আমার যদি একটা গাধা থাক্'ত তো বেশ হ'ত। এবার আমি বীজ-ধান-সুদ্ধ খেয়ে ফেলেছি, চাষের সময়ে যে, ধান কোথায় পা'ব, তা' জানি না।

লোকটাকে দেখিয়া আমার বড় ভাল লাগিল। আমি এতদিন বনে ছিলাম, বেশী মোটা হই নাই, বেশ হাল্‌কা হইয়া আছি, সুতরাং আমি যদি এই দৌড়ে প্রথম না হই, তবে কি এই ভোঁদা গাধাগুলো হইবে? আমি দৌড়িয়া গিয়া অন্য গাধাদের সঙ্গে মিশিলাম, তাহার পর যাহাতে লোকদের আমার উপরে নজর পড়ে, তাহার জন্য উচ্চস্বরে "হিঁহোঁ, হিঁহোঁ" করিয়া ডাকিতে লাগিলাম।

কেরামৎ বলিয়া একজন লোক বলিয়া উঠিল, "চোপরাও—গান থামা। আরে ম'ল! কোথাকার একটা ঘীয়ে ভাজা গাধা এসে গলাবাজি জুড়ে দিলে। তুই কা'র গাধা যে, দৌড়ে পাল্লা দিবি? দূর হ, লক্ষ্মীছাড়া!"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু একপাও নড়িলাম না। তাহা দেখিয়া কেহ কেহ হাসিল, কেহ রাগ করিতে লাগিল। তখন সেই ভালমানুষ বুড়া বলিল,—"এই গাধাটার যদি কোন মালিক না থাকে তো আমিই মালিক হ'তে রাজি আছি। আমি আজথেকে ওকে নিলেম, ও আমার গাধা হ'য়ে দৌড়ে পাল্লা দেবে।"

কেরামৎ। চাচা, তুমি যদি চাও তো তা'ই ক'র্‌তে পার। কেবল তোমাকে মোড়লের কাছে এই দৌড়ে পাল্লা দেবার জন্য একপয়সা সেলামী দাখিল ক'র্‌তে হ'বে।

বুড়া। বেশ, বাবা, তাই ক'র্‌ছি।

এই বলিয়া বুড়া থপথপ করিয়া গিয়া মোড়লের হাতে এক পয়সা দিল।

তাহার পর আমাদের মাঠের একধারে একসারি করিয়া দাঁড় করান হইল। মোড়ল হাঁকিল, "এক—দুই—তিন—যাও!" ছোক্‌রারা চাবুকের শব্দ করিল, আমরা অমনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। পাশের লোকেরা আমাদের 'দিলাশা' দিতে লাগিল। আর ষোলটা গাধা একশ-গজ যাইতে না যাইতে, আমি তাহাদের পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া চলিলাম। আমি মাঝে মাঝে পিছনে ফিরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম, তাহারা আমাকে হারাইবার জন্য দাঁত খিঁচাইয়া ছুটিতেছে! আমার মত একটা রোগা-পট্‌কা গাধা তাহাদের হারাইয়া দিতেছে দেখিয়া তাহারা রাগে অন্ধ হইয়া পথ দেখিয়া চলিতেছে না, তাই কে কাহার ঘাড়ে পড়িতেছে, তাহার ঠিকানাই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

কেরামতের গাধাটা মাঝে মাঝে আমার নাগা'ল ধরিতে পারিতেছিল, কিন্তু আবার আমি তাহাকে পিছনে ফেলিয়া যাইতেছিলাম। শেষে সে আমার লেজটা কামড়াইয়া ধরিল! তাহাতে আমার

এমনই লাগিতে লাগিল যে, আমি পড়িয়া যাইবার যো হইলাম; কিন্তু আমি সাহসে ভর করিয়া এক হেঁচ্‌কা মারিয়া লেজটা তাহার মুখহইতে ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া চলিলাম। তখন আমার মনে হইল যে, আমি তাহাদের হারাইতে পারিব। তাহার পর আমি যেন পাখীর মত উড়িয়া চলিলাম। শেষে যে খোঁটার কাছে পঁহুছিলে আমার জিত হইবে, সেই খোঁটার কাছে সগর্ব্বে পঁহুছিলাম। আমি যে কেবল প্রথম হইলাম, তাহা নহে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেক পিছনে ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম। যাহাদের গাধা ছিল না, তাহারা তাহাতে হাততালি ও শিশ দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

বুড়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া মূলার মত বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া আমার পীঠ চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে আমাকে মোড়লের কাছে লইয়া গেল—উদ্দেশ্য প্রথম পুরস্কার লইবে।

মোড়ল বুড়াকে বলিল,—"দফাদার-ছাএব, তোমার নসীব ভাল। ঐ তোমার ধানের বস্তা।"

এমন সময়ে কেরামৎ হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল, "মোড়ল-ছাএব, একটা আরজী আছে। দফাদার-ছাএবকে ও ইনাম দিলে, ইনছাপ হ'বে না। গাধাটা ওঁর নয়, কারুরই নয়, কাজেই ও গাধাটাকে ধ'র্‌বেন না। আমার গাধাই পহেলা হ'য়েছে।"

"দফাদার-ছায়েব সেলামী দেয় নি কি।"

"জি, তা তেনার দেওয়া হ'য়েছে।"

"তখন কি তোমরা কেউ 'আপত্য' করেছিলে?"

"জি, না তা' করি নি, কিন্তু—"

"গাধাগুলোকে যখন সার দিয়ে দাঁড় করান হ'য়েছিল, তখনও কি তোমরা কেউ 'আপত্য' করেছিলে?"

"জি, না তা' করি নি।"

"তবে দফাদার-ছায়েবের কসুর কি? ছায়েব, ধান তোমার, ছালা তুলিয়ে নে যাও।"

"মোড়ল-ছায়েব বে-ইনছাপি কাম ক'র্‌বেন না, ক'র্‌বেন না—আমাদের আরজ—"

আমি তখন দাঁতে করিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া ধানের ছালা দফাদার-সাহেবের পায়ের কাছে টানিয়া আনিলাম। তাহা দেখিয়া যত লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মোড়ল বলিল,—"এই দেখ, গাধা ঠিক ইনছাপ করেছে! এখানে আজ অনেক গাধা আছে, কিন্তু ঐ কেরামৎটার মত গাধা আর একটাও নেই।"

শুনিয়া রাগে আমার আপাদমস্তক জলিয়া গেল। মোড়লটা অসভ্যের ধাড়ি—হাজার লোক চাষা কি না, কত ভাল হ'বে? এই দু'পেয়ে জানোয়ারগুলো, আমরা গাধা, আমাদের সমান? দেৎ! এখানে আবার গাধা থাকে? আমি ছুটিয়া সে জায়গাহইতে চলিয়া গেলাম। (ক্রমশঃ)

রকমারি

চিঠী লিখে দাও

"বাবা, তুমি না আজ সকালে ব'লেছিলে যে, যে আমার চেয়ে বয়সে ছোট, তা'কে মারা ভীরুতা?"

"হাঁ, বাবা।"

"বাবা, তবে তুমি ইস্কুলের আঁকের মাষ্টারকে একখানা চিঠী লিখে দাও না—আমি তাঁ'র চেয়ে বয়সে কত ছোট, তবু তিনি আমাকে মারেন।

ভূগোল-শিক্ষক।

এক পাড়াগাঁয়ের স্কুলের দুই-একটী শিক্ষক ছেলেদের কাছ-হইতে সর্ব্বদাই কিছু না-কিছু আদায় করিত। স্কুলের ইন্‌স্পেক্‌টর তাহা জানিতে পারিয়া সেইপ্রকারে দক্ষিণা লওয়া বন্ধ করিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবামাত্রই ভূগোল-শিক্ষক একটী শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বলিলেন, "দেখ, তোমরা সকলে কাল একটী করিয়া 'পাকা গোল্লা' আনিবে, আমি তোমাদের পৃথিবীর আকার বুঝাইব!"

"কাট্, মেরা গলা কাট্!"

এক ক্ষৌরকার এক সিপাহীকে কামাইতে কামাইতে একস্থানে বাধাইয়া ফেলিল, রক্তপাত হইতে লাগিল। দেখিয়া ক্ষৌরকারের ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। তখন সে বুদ্ধি করিয়া সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেপাই-ছাএব! তোমরা কি ক'রে লড়াই কর, তোমাদের ভয় করে না?"

সিপাহী গর্ব্বের সহিত হাসিয়া বলিল, "ডর ক্যা? মরণা তো এক রোজ আলবৎ হ্যায়।"

"তবু চারিদিকে রক্তারক্তি হ'তে থাকে, রক্ত দে'খ্‌লে লোকে ভয়ে ভিরমি যায়, আর তোমরা ভয় কর না? তোমরা সেপাইরা বুঝি আসল লড়িয়ে নও?"

"ক্যা, হমলোক লড়তা নেই তো কৌন্ লড়তা? খুন দেখ্‌নেসে ডরেঙ্গে? তু কাট্, মেরা গলা কাট্!"

ক্ষৌরকার দেখিল, ঔষধ ধরিয়াছে, তখন বলিল,—"সেপাই-ছায়েব তোমার একজায়গায় দাড়ি চুপিয়ে ফেলেছি, একটু রক্ত প'ড়ছে।"

সিপাহী গর্ব্বিতভাবে কহিল,—"কুছ পরোয়া নেহি—গিরনে দো খুন!"

ক্ষৌরকার বাঁচিল!

জলৌকা-সূদন।

জলৌকা মানে জোঁক, সূদন মানে বধ করা, তবে যাহা জোঁকের পক্ষে বিষের মত, তাহাই জলৌকা-সূদন। সে আবার কি?

একটী লোক দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল, তাহার চোক বসিয়া গিয়াছিল, গায়ের রঙ হলুদ, চোক হলুদ হইয়া গিয়াছিল। ক্ষুধা একেবারেই হইত না, কণ্ঠতালু সর্ব্বদাই শুকাইয়া থাকিত। জীবনে তাহার কোন তেজঃ বা স্ফূর্ত্তি ছিল না। প্রথমে সে ও কিছু নয় ভাবিয়া কোন চিকিৎসা-পত্র করায় নাই; শেষে সে যখন দেখিল, বড় বাড়াবাড়ি, তখন এক ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার তাহার রোগের নিদান ধরিলেন। একটী জোঁক লইয়া তাহার গায়ের এক জায়গায় বসাইয়া দিলেন। জোঁকটা তাহার শরীরের রক্ত চুষিবামাত্রই মরিয়া পড়িয়া গেল! ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জোঁকটা মরিল কেন, বলিতে পারেন?"

"না, কেন?"

"আপনি অতিরিক্ত-পরিমাণে সিগারেট খান, আপনার শরীরের সমস্ত রক্ত দূষিত হইয়া গিয়াছে, তাই ঐ বিষাক্ত রক্ত-পান করিয়া জোঁকটা মরিয়া গেল।"

"কি বলেন আপনি, ও জোঁকটা নিশ্চয়ই ব্যারামী ছিল, তাই মরিয়া গেল।"

"বটে, তবে আর একবার দেখুন।"

এই বলিয়া ডাক্তার একটা হৃষ্টপুষ্ট জোঁক শিশিহইতে বাহির করিয়া রোগীর গায়ে বসাইলেন। সে জোঁকটাও মিনিট-দুই-তিন বাদে মরিয়া পড়িয়া গেল।

তখন সিগারেট-খোর আতঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"কি সর্ব্বনাশ!"

পাঠক, জলৌকা-সূদন কি বুঝিলে ত?

অধ্যাপক অজ।

মার্কিণমুলুকের একটী কলেজের কোন শ্রেণীর ছাত্রেরা বড় দুরন্ত ও গোঁয়ার ছিল। একদিন, সেই শ্রেণার একজন অধ্যাপক সেই শ্রেণাতে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, ছাত্রেরা সেদিন সকলেই ঠিক সময়ে শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া বসিয়াছে এবং সকলেরই মুখ স্ফূর্ত্তিতে উজ্জ্বল! ছেলেদের এইরূপ অবস্থায় দেখিলে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শিক্ষক বা অধ্যাপকমাত্রেই 'প্রমাদ গণিয়া' থাকেন, এই অধ্যাপক-মহাশয়ও তাহাই করিলেন।

তিনি নিজের আসনে [illegible]িতে গিয়া দেখেন, এক বুড়া পাঁঠা তাঁহার আসনটি-অধিকার করিয়া বসিয়া আছে! রঙ্গপ্রিয় ছাত্রেরা বেচারাকে মানুষের মত ভঙ্গীতে বসাইয়া দড়ি-দিয়া চেয়ারের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছে।

সেই অধ্যাপক-মহাশয় বড় ঠাণ্ডা মেজাজের লোক ছিলেন। অন্য কেহ হইলে, নিশ্চয়ই চটিয়া উঠিয়া ছেলেদের ধমক-ধামক করিত, তিনি সে সব কিছুই না করিয়া বেশ প্রশান্তভাবে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলিলেন,—

"ভদ্রগণ, আমি দেখিতেছি, আপনারা প্রজাতন্ত্র-শাসনের পক্ষপাতী। আপনাদেরই একজনের অধীনে থাকিতে চান, তাই আজ আপনারা আপনাদেরই এক অতি নিকট আত্মীয়কে অধ্যাপকের আসনে বসাইয়াছেন। ভাল, ভাল! বেশ করিয়াছেন! আমি আশা করি, আপনাদের এই বন্ধুটি আপনাদেরই মত এই আসনটির মর্য্যাদা-রক্ষা করিতে পারেন। তবে আপনারা আজ এই অজ-অধ্যাপকেরই অধ্যাপনা শুনুন; লজ্জা করিবেন না!"

এই বলিয়া অধ্যাপক-মহাশয় বিদায় হইলেন।

ধাঁধা।

কাট যদি পা,
রয়ে যা'ব তা';
কাট যদি পেট, র'ব তব মুখে।
কাটিলে মাথা,
হ'ব না যা'-তা'—
মোরে বেঁধে ঘুড়ী উড়াইবে সুখে।

গড়িতে যা' যাও,
তা' ভাল ক'রেই গড়;
গড় সত্য কিছু, ক'রে সিধে, ক'রে দড়।
গড় উচ্চ সৌধ, প্রশস্ত ও পরিষ্কার,
গড় তাহা ক'রে দৃষ্টিযোগ্য বিধাতার।

ইতর প্রাণীরা গণিতে পারে কি ?

ইতর প্রাণীরা যে, খানিক দূর-পর্য্যন্ত গণিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুপ্রসিদ্ধ পশু-শিক্ষক বিসেট্ শূকরের মত একগুঁয়ে জীবকেও কিছু গণনা শিখাইতে পারিয়াছিলেন।

লণ্ডনের জীবশালার সুবিখ্যাত "স্যালী"-নামক শিম্পাঞ্জী বারো-পর্য্যন্ত গণিতে পারিত। "জ্যাক"-নামে ঐ জীবশালার এক উরাং-উটাং আরও উন্নতি-লাভ করিতেছিল, কিন্তু সে হৃদরোগে মারা পড়ে।

কুকুরেরাও গণিতে পারে। একটী কুকুরকে তিনটী মুদ্রা দিয়া সেই দামের রোটিকা কিনিয়া আনিতে দেওয়া হইত, সে সেই মুদ্রায় যতগুলি রুটী পাওয়া যায়, ঠিক ততগুলি রুটীই কিনিয়া আনিত, কখন কম লইতে চাহিত না।

বিড়ালেও গণিতে পারে। এক বিড়ালীর তিনটি ছানা পুকুরের জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বিড়াল সহজে জলে নামিতে চায় না, তবু সেই সন্তান-হারা বিড়ালী সন্তানের মায়ায় জলে নামিয়া এক এক করিয়া দুইটি ছানা ডাঙ্গায় তুলিল। তৃতীয় ছানাটি তখন ডুবিয়া গিয়াছিল, সে কিন্তু সেই ছানাটিকেও পুকুরের চারিধারে খুঁজিতে লাগিল!

কোন কোন জাতীয় কাঠ-বিড়ালী, বীবর প্রভৃতি জীবও যে গণন-ক্ষম, তাহা সপ্রমাণ করা দুরূহ নহে।

পাখীরাও কি গণিতে পারে? হাঁ, তাহারাও যে গণিতে পারে, তাহার প্রমাণ আছে। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া যায়, সে কি গণিতে জানে না? একজাতীয় কাকে (Rook) যে গণিতে পারে, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটি পড়িলে জানা যাইবে। বড় একটী ক্ষেতে যব-বপন করা হইয়াছিল। অনেক ঐ জাতীয় কাক সেই ক্ষেতে আসিয়া ভীড় করিত। একজন লোক তাহার ক্ষেতে কয়েকটী মরা ঐ জাতীয় কাক টাঙ্গাইয়া রাখিবে বলিয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যস্থিত একটী ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে এক বালকের সহিত প্রবেশ করিল। কাকেরা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিল না। লোকটী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে বালকটীকে কুটীরহইতে বিদায় করিল, তবুও কাকেরা ক্ষেতে আসিল না। লোকটী চলিয়া গেলে, তবে কাকেরা আবার ক্ষেতে নামিয়া যব-ধ্বংস করিতে লাগিল। লোকটী আবার দুইটী লোকের সহিত আসিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছু-ক্ষণ পরে সে একটী লোককে বিদায় করিয়া দিল, আবার কিছুক্ষণ পরে সে দ্বিতীয় লোকটিকেও বিদায় করিয়া দিল, তবুও কাকেরা ক্ষেতে নামিল না। কাকের সর্দ্দার "কা কা" করিয়া সঙ্গীদিগকে বলিল—"সাবধান"; তাহারা কেহই ক্ষেতে নামিল না; কিন্তু সেই লোকটি আবার চলিয়া গিয়া তিনটি লোক সঙ্গে করিয়া ফিরিল। একে একে তিনটি লোককে বিদায় করার পর, কাকেরা নির্ভয়ে ক্ষেতে নামিল। সেই কাকের সর্দ্দার তিনের বেশী গণিতে পারে নাই।

এক ফরাসী লেখকের একটী কুকুরকে প্রতি শুক্রবারে মাংসের পরিবর্ত্তে মাছ খাইতে দেওয়া হইত, সে মাছ খাইতে ভাল বাসিত না, তাই প্রতি বৃহস্পতিবারে শুক্রবারের জন্য এক-আধটা হাড় যোগাড় করিয়া রাখিত। আর একটা কুকুরকে আর এক পরিবারে ঐরূপ শুক্রবারে মাংস খাইতে দেওয়া হইত না। সেইদিন তাহাকে মাংস খাওয়াইবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইত। এক শুক্রবারে তাহাকে সমস্ত দিন কেবল মাংস দিয়া একটী ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সে মাংস খায় নাই, অনাহারে ছিল!

তড়িৎশক্তি কখন্ বিপজ্জনক হয় ?

তোমরা সকলেই, বোধ হয়, তড়িৎ-শক্তির দ্বারা যে সমস্ত বস্তুর ক্রিয়া হয়—যথা, বৈদ্যুতিক বাতি, ট্রামগাড়ী, ঘণ্টা, টেলিফোণ, টেলিগ্রাম প্রভৃতির কোন একটী বা দুইটী বা কয়েকটি দেখিয়াছ। এগুলি আশ্চর্য্য বস্তু, কিন্তু তোমরা বহুবার দেখিয়াছ বলিয়া, তোমাদের হয়ত আর তত আশ্চর্য্য-বোধ হয় না।

তোমরা হয়ত ইহাও শুনিয়াছ যে, তড়িৎশক্তি বড়ই বিপজ্জনক, অনেকে উহা ছুঁইয়া মারা পড়িয়াছে, তাই তোমরা স্বভাবতঃ বৈদ্যুতিক কোন জিনিস ভয়ে ছুঁইতে চাও না; কিন্তু বৈদ্যুতিক সব জিনিসই বিপজ্জনক নয়।

তড়িৎ-শক্তি বা তাড়িতের 'তরল বস্তু' (fluid) অন্য অন্য অনেক জিনিসের চেয়ে অনেক বস্তু বাহিয়া বেশ সহজে বহিয়া যায়, আবার অনেক বস্তু বাহিয়া মোটেই বহিয়া যায় না। যে তার বাহিয়া সচরাচর ইহাকে বহান হয়, তাহা ফাঁপা নয়, নিরেট, কিন্তু ইহা, একটা লোহার শিকের একমুখ আগুনে পোড়াইতে থাকিলে যেমন তাপ ক্রমশঃ সমস্ত শিকটায় সঞ্চারিত হয়, তেমনই করিয়া তাহা-দিয়া অনায়াসে বহিয়া যায়। সমস্ত ধাতুই তাড়িতের পরিবাহক, ভিজা জিনিসও কিছু কিছু তাড়িৎ-বাহক, কিন্তু চীনামাটীর জিনিস, স্লেট, রবার, এবং আরও কয়েকটি জিনিস তাড়িতের পরিবাহক নহে। ইহাদিগকে তাড়িৎ-রোধক (Insulator) বলা যাইতে পারে।

যদি তাড়িতের চাপ খুব অল্প হয়, তাহা হইলে সেই তাড়িতের ধাক্কায় কাহারও মারা পড়িবার ভয় নাই। যখন তাড়িতের চাপ তাড়িৎ-গতির মানের শততমের অধিক, তখনই তাড়িতের ধাক্কায় মানুষের জীবন-সংশয় হইতে পারে।

বজ্র তাড়িৎ-গতির মানের বিপুলতম ভাঁজ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বজ্রের তাড়িৎ-গতির মান সহজে নির্ণয় করা যায় না, তাই আমরা একটা লৌহের শিক-দিয়া উহাকে আকর্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ও টেলিফোণ তাড়িৎ-গতির মানের চতুর্থতম বা ষষ্ঠতমের দ্বারা পরিচালন করা হয়, কাজেই ঐ সকল বস্তু যতই নাড়া-চাড়া করা হউক না, উহার তাড়িতের ধাক্কায় বিপদ্ ঘটে না; কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের ঐ সমস্ত যন্ত্রের তার বা রাসায়ণিক দ্রব-স্পর্শ করা নিরাপদ্ নয়।

পকেটে করিয়া যে বৈদ্যুতিক বাতি লইয়া যাওয়া যায়, তাহাও তাড়িৎ-শক্তির মানের অতি লঘুতমের দ্বারা পরিচালিত হয়, সুতরাং কি করিয়া ঐ যন্ত্রটির কার্য্য হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য কেহ যদি যন্ত্রটি ভাঙ্গিয়াও দেখে, তাহা হইলে কিছুই ক্ষতি হয় না।

কিন্তু বড় বড় বৈদ্যুতিক বর্ত্তিকার কথা স্বতন্ত্র। সেগুলি প্রায় তাড়িৎ-গতির মানের শততম বা দ্বিশততমদ্বারা পরিচালিত হয়, সুতরাং সেগুলি ঘাঁটা-ঘাঁটি না করিলেই ভাল হয়। এই বাতিগুলির তার রবার ও অন্যান্য বস্তুর দ্বারা আবৃত থাকে, তাই তাহা-হইতে তাড়িত অন্যত্র বাহিত হইতে পায় না। তোমরা জান বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিতে বা নিবাইতে হইলে, একটী ধাতব মুণ্ডিকা (switch) উঠাইতে নামাইতে হয়, উহা ধাতুনির্ম্মিত হইলেও, সেই ধাতুকে কোন তাড়িত-রোধক পদার্থের দ্বারা তারের তাড়িত-প্রবাহহইতে পৃথক্ করিয়া রাখা হয়, তাই উহা স্পর্শ করিলেও কাহারও তাড়িতপ্রবাহের ধাক্কা লাগে না; কিন্তু ঐ মুণ্ডিকার আবরণ-উন্মোচন করা, কিম্বা তারের রবার ছাড়াইয়া ফেলা নিরাপদ্ নহে।

যে তাড়িৎ-প্রবাহের দ্বারা ট্রাম-গাড়ী চালিত হয়, তাহা সর্ব্বদাই বিপজ্জনক। উহা তড়িৎ-শক্তির মানের চতুঃশততম অথবা ষষ্ঠ-শততম অথবা ততোধিক ভাঁজের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। তড়িৎ-শক্তি ট্রামের উপরিস্থিত তার দিয়া বা ভূগর্ভস্থ নলের মধ্য দিয়া বাহিত করা হয়, তাই কাহারও উহা স্পর্শ করিবার ভয় থাকে না।

কৰ্ম্ম

গাথা

বাবুর বাড়ীর পাশে কামারের কারখানা।
বাবুর অলস মনে পাপ-প্রেত দেয় হানা,
তাই তা'র মনোমাঝে দুঃখ-কষ্ট রয় নানা,—
বিছানায় কাঁটা ফুটে, হজম হয় না 'খানা'!

২

এদিকে কামার বেশ খাটে-খুটে, খায়-দায়,
করিতে করিতে কাজ তালে তালে গান গায়;
ঘুমের ভাবনা নাই পড়িলেই বিছানায়,
দা'ল-ভাত গপ্‌গপ্ যেন রে পোলাও খায়!

৩

ভোরে বাবুটির চোকে একটুকু আসে ঘুম,
ঘুমা'তে পারে না শুনি' কামারের দুম্ দুম্,
রাঙা চোকে উঠে' বসে শয্যা ছেড়ে' হ'য়ে গুম্,
হুঁকা-হাতে উগারিতে থাকে তামাকের ধূম!

৪

সহিতে না পারি' আর যায় বাবু একদিন,
যথা রহে কর্ম্মকার চীরাবৃত, চিরদীন।

"ওরে বেটা! তোর মত আর কা'র বুদ্ধি ক্ষীণ?"
"কেন, বাবু, হেন কও, কিসে আমি বুদ্ধিহীন?"

"আমি বড়লোক, টাকা নিয়ে খেলি ছিনিমিনি,
জোটেনাক কখনই তোর জ'লোদুধে চিনি,
তুই কিনা গান গা'স তাল দিয়ে ধিনি ধিনি,
আমি বাবু, চিরকাবু, খেয়ে সাবু গুণি গিনি?"

৬

কামার কহিল,—"বাবু, বিনা গানে রৈতে নারি,
গান গাই যাই, তাই হাতুড়ী তুলিতে পারি,
গান গাই যাই, তাই 'দরদ' ভুলিতে পারি,
গান গাই যাই, তাই খাটুনি লাগে না ভারি।"

৭

"খাটিস তো, বছরেতে হয় কত রোজগার?"
"তোমরা, বাবুরা, ধারো, বাবু, বছরের ধার!
মোরা মুখ্যসুখ্যু লোক জানিনাক ফেরফার,
দিন আনি দিন খাই; দিতে পারি খোঁজ তা'র'

"আচ্ছা, আচ্ছা তাই বল্, দিন তোর কত হয়?"
"কত আর হ'বে, বাবু? হয় গণ্ডা পাঁচ-ছয়।"
বাবু তবে হাসি' কয়,—"এই বই আর নয়?
এরি জন্যে লোহা পিটে' সাড়া দিস পাড়াময়?

৯

কালথেকে বন্ধ কর্ তোর এই কারখানা,
মোর কাছে রোজ তুই পা'বি ঠিক বার-আনা।"
কামার অবাক্ হ'য়ে ভাবে,—"একি বাবুয়ানা!
যা'ক, এত দিন পরে খুলিল বরাতখানা।"

১০

তদবধি কর্ম্মকার কর্ম্ম তা'র করে বন্ধ,
গান গায় গলা ছেড়ে আহ্লাদে হইয়ে অন্ধ!
দিন যায়, দিন আসে, ক্রমে সবি লাগে মন্দ,
একদিন গান বন্ধ—ঘুচে গেল সর্ব্বানন্দ!

১১

কি করে সে? হাই তোলে, গণে বা গঞ্জের লোক,
হাসিতে সে চেষ্টা করে, স্যাঁতস্যাঁতে হয় চোক!
হজম হয় না ভাত, ঘুচে গেছে সব রোক,
কহিতে একটা কথা, সাতবার গেলে ঢোঁক!

১২

সহিতে না পারি আর, গেল সে বাবুর বাড়ী,
বলে,—"বাবু, ভাল নাহি লাগে মোর কর্ম্ম ছাড়ি'!"
বাবু বলে,—"বেটা বোকা—হাঁদা—আনাড়ীর ধাড়ী,
খেটে খেটে একদিন তোর ছেড়ে যা'বে নাড়ী!"

১৩

কামার কহিল,—"বাবু, নিলে আর দিন কত
'তোমার সে বার-আনা সদ্যি অক্কা পেতে হ'ত;
খাটুনির ছ'গণ্ডাই মজার—মণ্ডার মত,
কুড়েমির বারোগণ্ডা খেয়ে যণ্ডা হয় হত!"

* * *

অকর্ম্মার সুখ কোথা? যায় আঁখি জলে ভেসে',
ফাঁকা তো থাকে না মন,—যত দুঃখ জমে এসে'!

"লোভ পাপস্য কারণং!"

পূর্ব্বে আমরা "বালক" ভি পি ডাকে আদৌ পাঠাইতাম না; কিন্তু পরে দেখি, সকলেই ভি পি ডাকেই "বালক" পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন, তাই আমরা কয়েকজন ভবিষ্য গ্রাহককে ভি পি ডাকেই বালক পাঠাইয়া কি ফল পাই, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলাম। কি সুন্দর আক্কেল-সেলামী-লাভ হইয়াছে, দেখুন—

"রিকাবি বাজার, ঢাকা।
১৪—৫—১৪।

মহাশয়,

কি জানি কেণ কোণ অজানিত কারণে বহুদিন পরে আপনার প্রেরিত 'বালক' ভি পি ডাকে প্রাপ্ত হইলাম, কি আশ্চর্য্য বিজ্ঞাপনীতে উহার মূল্য ।৵০ ও মাশুল ৶০ ধার্য্য আছে, কিন্তু আপনি একেবারে ৸০ আনা চার্জ্জ করিয়া পাঠাইয়াছেন, কি জানেন মহাশয় লোভ পাপস্য কারণং কাজেই আমি আপনার প্রেরিত পার্শেল রাখিতে অক্ষম। অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজগুণে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

বিনীত—শ্রীমহম্মদ মস্তফা।

মহাশয় আরও জানিবেন আমি ভি পি খানা পাই নাই সংবাদ শুনিবামাত্র আর পিয়নপ্রত চার্জ্জের ভয়েই ফেরত দিতে বাধ্য হইলাম।"

লোভ তো পাপস্য কারণং, কিন্তু এইপ্রকার ভদ্রতা যে কিসের কারণং, তাহা আমরা অনুমান করিতে অক্ষমং!

বালকের বার্ষিক মূল্য	।৵০
,, ,, ডাক-মাশুল	৶০
রেজিষ্ট্রেষণ ফিঃ	৵০
ভি পি কমিসন	৴০
	৸০

এই তো ৸০ আনাই ব্যয় পড়ে, তবে লোভ কিসে করিলাম? বলা বাহুল্য, এই ভদ্রলোক বালকের প্যাকেট ফেরত দিয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। এই দুঃখেই আমরা বালক ভি পি ডাকে পাঠাই না। উহাতে অর্থহানি তো হয়ই, তদ্ভিন্ন লোভ পাপস্য কারণং প্রভৃতি রুচিকর চাটুনিগুলি সম্পাদক-মহাশয়ের ও আমার 'উপরি'-লাভ হইয়া থাকে।

"বালকের" কার্য্যাধ্যক্ষ।

৩য় বর্ষ।] আগষ্ট, ১৯১৪ [৮ম সংখ্যা।

জেনেরল্‌ গর্ডন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গর্ডনের প্রথম যুদ্ধযাত্রা।

কয়েক মাস ক্রিমিয়ান সমর চলিবার পর, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষদিনে গর্ডন ব্যালাক্লাভায় পঁহুছিলেন।

গত কয়েক মাস ইংরাজ সৈনিকগণ বড়ই কষ্টে অতিবাহিত করিতেছিল, কারণ বিলাতের বেবন্দোবস্তের দরুণ রুষিয়ার দারুণ শীতকালটা তাহাদিগকে সূতার কাপড় পরিয়া কাটাইতে হইয়াছিল; তাহাছাড়া যুদ্ধ অনবরত চলিতেছিল, তবু তাহারা প্রচুরপরিমাণে খাদ্য পাইতেছিল না, উপযুক্ত আশ্রয়েরও অভাব ঘটিয়াছিল।

প্রতিরাত্র, প্রতিদিন নিদারুণ তুষার বা বৃষ্টি-বর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইংরাজ সৈনিকদিগকে সিবাষ্টোপোলের সম্মুখস্থিত পরিখা-রক্ষা করিতে হইতেছিল। তাহাদের উর্দ্দিগুলি তখন ছেঁড়া নেকড়া হইয়া পড়িয়াছে, তদুপরি শীতে ও ক্ষুধায় তাহারা তখন একান্ত কাতর, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ প্রায় সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, ক্লান্তিতে শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে।

উক্ত পরিখাগুলি গভীর খানা ছিল, খানা কাটাতে যে মাটী উঠিয়াছিল, তাহা সৈনিকদিগের সম্মুখে ঢিবি করা ছিল, তাহারা ঐ ঢিবিগুলির পশ্চাতে আত্মরক্ষা করিয়া বন্দুক ছুড়িতেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সৈনিকেরা ঐ ঢিবির আড়ালে একহাঁটু কাদায় দাঁড়াইয়া পরিখা-রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছিল। সেখানে এত শীত যে, তাহাদের শরীরের রক্তপর্য্যন্ত যেন জমিয়া যাইতেছিল।

ফলে সৈনিকদিগের শিবিরে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হইল। অনেক সৈনিকই ঐ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। বহু সৈনিকই পাথরের উপর গাছের পাতা বিছাইয়া ছাড়া আর কোনপ্রকার শয্যায় শয়ন করিতে পাইতেছিল না।

যে সমস্ত সৈনিকেরা তাঁবুর মধ্যে একটু মাথা গুঁজিতে ও একটু কাঠ-কয়লার আগুন পোহাইতে পাইয়াছিল, তাহারাও কয়লার ধোঁয়ায় মারা পড়িতে লাগিল।

সৈনিকেরা ঐ শীতের নাম দিয়াছিল—"কেলে শীত"। যে সময়ে গর্ডন পঁহুছিলেন, সে সময়েও ঐ "কেলে শীত" ছিল। গর্ডন ৩২০টি কুটীরের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ক্রিমিয়ায় গিয়াছিলেন; ঐ কুটীরগুলি পোর্টস্মাউথহইতে একটী কয়লাবাহী জাহাজে গর্ডনের জাহাজের পিছনে পিছনে আসিতেছিল; সুতরাং গর্ডন ব্যালাক্লাভায় পঁহুছিলে, অনেক সৈনিকের আশ্রয়ের কষ্ট দূর হইল। কিন্তু তাহারা তখনও অর্দ্ধাশনে, ভগ্নমনে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। সামরিক কর্ম্মচারী ও সাধারণ সৈনিকদিগকে প্রায়ই খাদ্য দ্রব্য-লুণ্ঠনার্থে যাত্রা করিতে হইত, নতুবা তাহারা অনশনে থাকিতে বাধ্য হইত। এদিকে রুষিয়ানদিগের কামান-হইতে গোলা অনবরত ছুটিতেছে, শীতও দারুণ; ফলে বিস্তর সৈন্য ইহলোক-ত্যাগ করিতে লাগিল।

যে তরুণ সামরিক কর্ম্মচারী প্রথমবার রণস্থলে গিয়াছে, তাহার পক্ষে এ দৃশ্য আদৌ স্ফূর্ত্তিজনক নহে, কিন্তু গর্ডন, তাঁহার মায়ের মত, অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এত শীত পড়িয়াছিল যে, কালিপর্য্যন্ত জমিয়া যাইতেছিল, লিখিতে গিয়া তিনি কলমের মোচ ভাঙিয়া ফেলিতেছিলেন, তবুও তিনি এই সময়ে বাড়ীতে যে পত্র লিখেন, তাহাতে লিখিত ছিল, "সামরিক

কর্ম্মচারীদিগের বাস্তবিক কোন কষ্ট সহিতে হইতেছে না, সাধারণ সৈনিকেরাই কষ্ট পাইতেছে।"

ক্রিমিয়ায় মাসেক-খানিক থাকিতে না থাকিতেই, গর্ডন সিবাষ্টোপোলের সম্মুখস্থিত পরিখা-রক্ষার ভার পাইলেন। সিবাষ্টোপোল সমুদ্র-তীরস্থিত একটি দুর্গবেষ্টিত বড় সহর।

১৪ই ফেব্রুয়ারীর রাত্রিতে আটজন সৈন্য ও পাঁচযোড়া সান্ত্রীকে লইয়া ফরাসী ও ইংরাজ ফাঁড়ীগুলির মধ্যে যোগাযোগ করিবার জন্য গর্ডন প্রেরিত হইলেন। ঘুটঘুটে আঁধার রাত, গর্ডন এতাবৎ পরিখার সব জায়গা, উলইচ-অস্ত্রাগারের পরিখার মত, ভাল করিয়া জানেন না। তিনি তাঁহার লোকদের লইয়া পথ হারাইয়া রুষিয়ার লোকে ভরা এক সহরের মধ্যে গিয়া পড়িবার মত হইলেন। ফিরিয়া তাঁহারা পরিখার মধ্য দিয়া গুঁড়ি মারিয়া কতিপয় গুহার মধ্যে আসিলেন। ঐ গুহাগুলি ইংরাজদিগের দখলে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু গর্ডন তথায় কোন সান্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন না। একজনমাত্র সৈনিককে সঙ্গে লইয়া গর্ডন গুহাগুলি আবিষ্কৃত করিলেন। তিনি ভয় করিয়াছিলেন যে, গুহাগুলিকে অরক্ষিত অবস্থায় পাইয়া, অন্ধকার হইলে, রুষিয়ার লোকেরা আসিয়া দখল করিয়াছে, গিয়া দেখিলেন, তাহা নহে, সেগুলি জনশূন্য। তখন তিনি দুইজন সান্ত্রীকে গুহার উপরিস্থিত পাহাড়ের উপর পাহারায় রাখিয়া, আর দুইজন সান্ত্রীকে নীচে পাহারায় রাখিবার জন্য নামিয়া গেলেন। তিনি এবং তাঁহার সেই দুইজন সান্ত্রী নীচে দেখা দিবামাত্র, দুম্ দুম্ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং বন্দুকের গুলী লাগিয়া গর্ডনের পায়ের নিকটস্থ মৃত্তিকা উৎক্ষিপ্ত হইল। সান্ত্রী-দুইজন ভয়ে পলাইল, আটজন দুর্গসংস্কারক সৈনিকও পীঠটান দিল, তাহারা ভাবিল, বুঝি রাজ্যের রুষিয়ান সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে! আসলে কিন্তু ঐরূপ কিছুই হয় নাই। পাহাড়ের উপরে যে সান্ত্রী-দুইজনকে গর্ডন খাড়া করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা গর্ডন ও তাঁহার লোকদিগকে নীচে দিয়া চোরের মত যাইতে দেখিয়া রুষিয়ান মনে করিয়া গুলী করিয়াছিল। কিন্তু শুধু উহাতেই হাঙ্গাম মিটিল না। ঐ স্থানহইতে মাত্র ১৫০ গজ দূরে শত্রুপক্ষীয় একদল লোককে ইংরাজদিগের কার্য্যকলাপ-পরিদর্শনের জন্য লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহারা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। একটা গুলী একটা লোকের বক্ষ-লক্ষ্যে আসিয়া তাহার জামা ফুঁড়িয়া পাঁজরা ঘষড়াইয়া চলিয়া গেল, লোকটি অনাহত রহিল; ফলে কোন গুরুতর ক্ষতি হইল না। সমস্ত রাত কাজ করিয়া গর্ডন ও তাঁহার লোকেরা কর্ত্তব্যপালন করিলেন।

"কি পড়িছ ল'য়ে করে, ওহে খগবর ?"
"বাঁধান 'বালক' পড়ি, ত্যক্ত কেন কর ?"

অল্পদিনের মধ্যেই গর্ডন পরিখাগুলির অন্ধিসন্ধি, গলিঘুঁজি এত ভাল করিয়া চিনিয়া ফেলিলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকারময়ী রাত্রিতেও পরিখাগুলির কোন স্থানে যাইতে তাঁহার কোন কষ্ট হইত না। তাঁহার একজন বন্ধু অসুখে পড়িয়া ছুটী লইয়াছিলেন, পরে কর্ম্ম করিতে আসিয়া বলেন,—"আমি পরিখার পথ খুঁজিয়া পাই না।" গর্ডন তাঁহাকে বলেন,—"অন্ধকার হইলে, তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে পরিখাগুলি দেখাইব।" তাঁহার বন্ধু সার চার্লস্ স্টেভলী পরে লিখিয়াছিলেন,—"সে (গর্ডন) আমাকে পরিখার সমস্ত পথের সুস্পষ্ট নক্সা আঁকিয়া এবং সব গলিঘুঁজি বুঝাইয়া দিয়াছিল। যে পরিখাটি সবচেয়ে আগে, তাহার বাহিরে লইয়া গিয়াছিল, তখন গুলীগোলা ছুটিতেছিল, তাহাতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সে আশ্চর্য্য প্রশান্তির সহিত সেই ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিতেছিল।"

বহু সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্ব্বেই গর্ডন কেবল যে, পরিখাগুলি অন্যান্য কর্ম্মচারী ও সাধারণ সৈনিকের মত চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি শত্রুদিগের গতিবিধির কথা প্রবীণ বা নবীন অন্য তাবৎ কর্ম্মচারীর অপেক্ষা ভাল করিয়া জানিতেন। একজন সেনানী বলিয়াছেন, "যুদ্ধবিষয়ে গর্ডনের বিশেষ যোগ্যতা ছিল। রুষিয়ানেরা নূতন কি ফন্দী খেলিতেছে, তাহা জানিবার জন্য আমরা তাহাকে পাঠাইতাম।"

গুহামধ্যে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহার অল্পদিন পরেই গর্ডন আর একবার মারা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যান। ১৮০গজ দূরে রুষিয়ানেরা একটা বন্দুকধারী সৈনিকের আড্ডা গাড়িয়াছিল, সেখানহইতে গর্ডনকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক-ছোড়া হয়, গুলী গর্ডনের মাথাহইতে এক-ইঞ্চি তফাৎ দিয়া চলিয়া যায়। এই ঘটনার কথা

বাড়ীতে লিখিবার সময়ে গর্ডন রুষিয়ানদিগের লক্ষ্যের ও গুলীর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

তিনমাস পরে, গর্ডনের এক ভাই বাড়ীতে চিঠি লিখিয়াছিলেন, "চার্লি বড় বাঁচিয়া গিয়াছে, গত পরশ্ব সে দেখিল যে, তাহার বামে কামান চালাইবার একটী গর্ত্তহইতে ধূঁয়া বাহির হইতেছে, কামানের গোলা ছুটিবার শব্দও সে শুনিতে পাইল, কিন্তু গোলা দেখিতে পাইল না; গোলাটা তাহার সম্মুখে দশহাত তফাতে পড়িয়া ফাটিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে চার্লিকে আঘাত লাগে নাই। যদি উহা ফাটিয়া না যাইত, তাহা হইলে চার্লির অবশ্য মুণ্ড উড়িয়া যাইত।"

সিবাষ্টোপোলের সৈনিকেরা শীঘ্রই জানিতে পারিল যে, তাহাদিগের সামরিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে একজন কৃশকায়, কষ্ট-সহিষ্ণু, তরুণ দুর্গসংস্কারকারী সৈনিকদিগের লেফ্‌টেন্যান্ট আছেন; তাঁহার মস্তকের কেশ কুঞ্চিত, চক্ষুর তারকা নীলবর্ণ এবং দৃষ্টি প্রখরা, তিনি পরীর গল্পের মানুষের মত মানুষ, ভয় কাহাকে বলে জানেন না।

একদিন গর্ডন পরিখাগুলির মধ্য দিয়া 'রোঁদে' যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন, একজায়গায় এক হাওলদার ও একজন দুর্গসংস্কারকারী সৈনিকে ঝগড়া হইতেছে। তাহা শুনিয়া তিনি যাইতে যাইতে থামিয়া তাহারা কেন ঝগড়া করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর-শ্রবণে জানিতে পারিলেন যে, সৈনিকেরা পরিখা-পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা-স্তূপে নূতন মাটী দিতেছে, হাওলদার নীচে নিরাপদে দাঁড়াইয়া এই দুর্গসংস্কারক সৈনিককে মাটীর ঝুড়ি তুলিয়া দিতে চাহে, আর তাহাকে স্তূপের উপরে গোলাগুলীর মুখে দাঁড়াইতে বলিতেছে। মুহূর্ত্তেকে গর্ডন প্রাচীরের উপরে গিয়া দাঁড়াইয়া হাওলদারকে তাঁহার পাশে দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন, আর সেই সৈনিককে মাটীর ঝুড়ি তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিতে বলিলেন। চারিদিকে শক্রদিগের বন্দুকের গুলী পট্ পট্ করিয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু তাঁহারা সেই অগ্নিবর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্যসাধনপূর্ব্বক নিরাপদে নীচে নামিয়া আসিলেন। কাজ-শেষ হইলে গর্ডন সেই হাওলদারকে বলিলেন,—"যে কাজ করিতে তুমি নিজে ভয় পাও, তাহা অপরকে করিতে আদেশ করিও না।"

৬ই জুন রুষিয়া ও উহার অবরোধকারীদের মধ্যে কামানে কামানে দ্বৈরথ-যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে একটা পাথর গর্ডনের গায়ে আসিয়া লাগে, তাহাতে গর্ডন কিছুক্ষণের নিমিত্ত হতচেতন হইয়া পড়েন; ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে "আহত" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ইহাতে গর্ডন অতিমাত্র বিরক্ত হন। সমস্ত দিন, সমস্ত রাত, তাহার পরদিন বেলা চারিটাপর্য্যন্ত দুইপক্ষে অগ্নিবর্ষণ চলিতে থাকিল। দ্বিতীয় দিনের বেলা চারিটাহইতে ইংরাজ ও তাঁহাদের সহকারিগণ নূতন নির্ম্মিত কামান-প্রাচীরহইতে অগ্নিবর্ষণ-আরম্ভ করিলেন। সহস্র কামানহইতে অবিরাম, সমভাবে ভয়ানক গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, ঐ গোলাবর্ষণের জোরে, ফরাসীরা সম্মুখে ছুটিয়া গিয়া রুষিয়ানদিগের একটী প্রধান স্থান-অধিকার করিয়া লইল। কখন আক্রমণ করিয়া, কখন বা পশ্চাত্তাড়িত হইয়া, পুনরাক্রমণ করিয়া কিছু স্থানাধিকারপূর্ব্বক, তৃতীয়াক্রমণের ফলে লব্ধ অধিকার হারাইয়া, মৃতলোকদিগকে ফেলিয়া রাখিয়া, যে স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়াছে, সে স্থানে জীবন হারাইয়া, ক্লান্ত হইয়া সৈনিকদিগের দীর্ঘ দিবারাত্র অতিবাহিত হইতে থাকিল।

গর্ডনের ভাই এই সময়ে বাড়ীতে চিঠি লিখিলেন, "চার্লি বেশ আছে, নানাপ্রকার গোলাগুলী-বর্ষণের মধ্যে থাকিয়াও সে অক্ষত আছে। এখন সে তাহার তাম্বুতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ইহার পূর্ব্বে সে গতকল্য বেলা দুইটাহইতে রাত সাতটাপর্য্যন্ত, ভয়ানক গোলাবর্ষণের সময়, পরিখায় ছিল। আজ আবার বেলা সাড়ে-বারোটাহইতে মধ্যাহ্নের শেষপর্য্যন্ত ছিল।"

উহার পরে দুই দলের সম্মতিক্রমে কয়েক দিবসের নিমিত্ত মৃতদিগের সৎকার করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ স্থগিত থাকে।

গর্ডন এই সময়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল, "সিবাষ্টোপোলের সম্মুখস্থিত সমস্ত ভূখণ্ড গোরস্থানে পরিণত হইয়াছিল। ইংরাজ, ফরাসী ও রুষিয়ান সৈনিকদিগের কৃষ্ণ-মৃত্তিকাময় কবরের ঢিবিতে স্থানটি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ঐ সময়হইতে সেপ্টেম্বর-মাসপর্য্যন্ত যুদ্ধ টিকাইয়া টিকাইয়া চলিতেই থাকিল। এই সময়টা বড়ই অবসাদজনক ও বিষাদপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেপ্টেম্বর-মাস পড়িলে, গর্ডন ইংলণ্ডের কথা ভাবিতে লাগিলেন, শরতের শুষ্কপাতার সৌরভ ও পক্ষীদিগের পক্ষ-বিধুনন-ধ্বনি তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল; তিনি পাখী-শিকার করিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ক্রিমিয়াতে তাঁহারা পাখী-গুলী না করিয়া মানুষ-গুলী করিতে থাকিলেন। এই সময়ে তিনি পত্রে লিখিলেন,—"রুষিয়ানেরা খুব সাহসী, কোন জাতিরই অপেক্ষা হীন-বীর্য্য নহে, তাহাদের সমরায়োজন সুবিরাট্, তাহাদের গোলন্দাজদিগের লক্ষ্য-ভেদ করার অভ্যাস চমৎকার।" গর্ডন শক্রদিগের সুখ্যাতি করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

প্রতিদিন সৈনিকেরা রোগে বা আহত হইয়া মারা পড়িতে লাগিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট গর্ডন লিখিলেন, "কাপ্তেন উল্‌সিলী, এঞ্জিনীয়ারের সহকারী, প্রস্তরাঘাতে আহত হইয়াছেন।" কাপ্তেন উল্‌সিলী প্রস্তর বা গোলা-ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বহু যুদ্ধে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং বহু বৎসর পরে লর্ড উল্‌সিলী ও ইংরাজ সামরিক বিভাগের সেনানী-শ্রেষ্ঠ হন।

৮ই সেপ্টেম্বর রুষিয়ানদিগের একটী প্রধান দুর্গ ফরাসীরা গোলাদ্বারা উড়াইয়া দেন, এই কারণে তাঁহাদিগকে সুভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়; পরে সেই দুর্গে তাঁহাদের জাতীয় পতাকা উড়ান হয়। এই কার্য্যটির দ্বারা ফরাসীরা রেডানের মহাদুর্গটিকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ইংরাজদিগকে ইঙ্গিত করেন। ইংরাজেরা

তাই ছুটিয়া ঐ দুর্গ ও তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী খানায় নামিয়া সিঁড়ি লাগাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। আধঘণ্টাটাক তাঁহারা দুর্গটিকে অধিকার করিয়া রহিলেন। তাহার পর প্রভূতসংখ্যক নূতন রুষিয়ান সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করাতে তাঁহারা তাড়িত হন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্তর লোকক্ষয় হয়। ঐ সময়ে আর একস্থানে ফরাসীরাও বিতাড়িত হন। মিত্র-সৈন্যবর্গ প্রভাত-পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা-ছাড়া আর কোন উপায় দেখিলেন না। তাহার পর স্থির হয়, প্রভাত হইলে, হাইল্যাণ্ড-সৈনিকেরা তোপে উড়াইয়া রেডান দখল করিবে; কিন্তু রুষিয়ানেরা তাহাদিগকে তাহার সুযোগ দেন নাই।

গর্ডন সেই রাত্রিতে যে সময়ে পরিখায় স্বীয় কর্ত্তব্য করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে অগ্ন্যুৎপাতসহ ভয়ানক নির্ঘোষ শুনিতে পান।

তিনি তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—"পরদিন ভোর চারিটার সময় আমি একটী চমৎকার দৃশ্য দেখিলাম। সিবাষ্টো-পোলের সর্ব্বত্র আগুন লাগিয়াছে, ঘন ঘন অগ্ন্যুৎপাতসহ নির্ঘোষ উঠিতেছে, সেই সময়ে আবার সূর্য্যোদয় হইতেছে, তাই তথায় একটী মনোলোভা শোভা ফুটিয়াছে। রুষিয়ানেরা সেতু দিয়া সহর ছাড়িয়া পলাইতেছে, তিনডেকওয়ালা বড় বড় জাহাজগুলা ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কেবল ষ্টীমারগুলি আছে। হাজার হাজার মোণ বারুদ অগ্ন্যুৎপাতে ভস্মীভূত হইয়াছে। বেলা আটটার সময় কার্য্যোপলক্ষে আমাকে রেডানে যাইতে হয়, গিয়া সেখানে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখিলাম। মড়াগুলিকে খানায় মাটী দেওয়া হইতেছে, ইংরাজদিগের সহিত রুষিয়ানেরা প্রোথিত হইতেছে, মিঃ রাইট-নামে একজন ইংরাজ পাদ্রী অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-কালে পঠ্য শাস্ত্রাংশ-পাঠ করিতেছেন।

সমস্ত দিনই অগ্নিবর্ষণ হইতে থাকিল। তখনও সহরে রুষি-য়ানেরা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, সুতরাং নগর-প্রবেশ তখন নিরাপদ্ ছিল না।

তাহার পর মিত্র-সৈনিকেরা নগরে প্রবেশ করিলে, অনেক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিল। একদিন, একরাত্রি তিন-হাজার আহত সৈনিকের শুশ্রূষা হয় নাই, তাহাদের এক-চতুর্থাংশ লোক মরিয়া গিয়াছে। সমস্ত সহরটাময় কেবল গোলা আর গুলী ছড়ান রহিয়াছে। অনেক ইমারত ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ভস্মীভূত হইয়াছে।

গর্ডন লিখিয়াছিলেন,—"সহরে লুট করিবার মত কিছুই ছিল না। ছিল কেবল রাবিশ আর মাছি। রুষিয়ানেরা আর সমস্ত জিনিষই লইয়া গিয়াছিল।"

সিবাষ্টোপোল-নগরের উৎসাদের পর, গর্ডন ও তাঁহার সৈনি-কেরা রাস্তা-পরিস্কার করিতে, জঞ্জাল পোড়াইতে, কামান গণিতে ও সহরটিকে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর করিতে ব্যস্ত রহিলেন।

তাহার পর তিনি যে সৈন্যদল কিনবার্ণ-আক্রমণ করিতে যায়, তাহাদের সঙ্গে যান। ঐ সহরটি সিবাষ্টোপোলহইতে বহুদূরে কিন্তু কৃষ্ণসাগরের তীরেই ছিল।

গর্ডন চারিমাস ঐ স্থানে থাকিয়া দুর্গ, জেটি, মালখানা, সেনা-নিবাস ও পোতাশ্রয়াদি-ধ্বংশ করিতে থাকেন। প্রতিপক্ষেরাও কখন কখন তাঁহার সৈন্যদিগের উপর বন্দরের ওপারহইতে গোলা-বর্ষণ করিতেছিলেন। এ সময়ে তিনি একটুও অলস হন নাই। যখনই যে কাজ করিতেছিলেন, সমস্ত মনঃপ্রাণ-সংযোগে করিতে-ছিলেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মাসে তাঁহার কার্য্য-শেষ হইল। ঐ বৎসরের মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ড ও রুষিয়ার মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয়।

সৈন্যাধ্যক্ষ-মহাশয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যাঁহারা যাঁহারা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকায় লেফ্‌টেন্যাণ্ট গর্ডনেরও নাম ভুক্ত করিলেন।

ফরাসী-গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃকও তিনি Legion of Honour উপাধি-ভূষিত হইলেন। অত তরুণবয়স্ক সামরিক কর্ম্মচারীকে সচরাচর ঐ উপাধি দেওয়া হয় না।

একবৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল হাতে কলমে শ্রমসাধ্য শিক্ষা-গ্রহণের ফলে বালক চার্লি গর্ডন সৈনিক হইয়া উঠিলেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মে-মাসে রুষিয়া, তুর্কি ও রুমানিয়ার মধ্যে রাজ্যসীমা লইয়া যে গোল বাধে, তাহার মীমাংসার্থে গর্ডনকে পাঠান হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ একই কার্য্যে আর্ম্মেনিয়ায় প্রেরিত হন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একজন অভিজ্ঞ সৈনিক হইয়া বিলাতে ফিরিয়া আসেন। কয়েকমাস পরে তিনি কাপ্তেনের পদে উন্নীত হন।

সিকন্দর।

খ্রীষ্ট জন্মিবার তিনশত-বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসের অন্তর্গত মাসিদন-নামক স্থানে সিকন্দরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা, ফিলিপ, মাসিদনের রাজা ছিলেন।

রাজা ফিলিপ একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন, বহু যুদ্ধে জয়-লাভ করেন। তিনি বহু দেশ-অধিকার করেন এবং বহু ধন-রত্নের অধিকারী হন। সেই ধন-রত্ন তিনি যে তাহার পুত্রকে দিয়া যাইতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া অতিশয় প্রীত হইতেন।

বালক সিকন্দর ক্রমে ক্রমে খুব বলবান্ ও বীর হইয়া উঠিলেন।

যদিও তিনি বড় গর্ব্বিত ও একগুঁয়ে ছিলেন, তথাপি তিনি সত্যবাদী, সদয় ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি খেলা-ধূলা খুব ভালবাসিতেন, শিকারেও তাঁহার আসক্তি ছিল, কিন্তু তিনি অধ্যয়নপ্রিয়ও ছিলেন, কারণ জানিতেন, একদিন তিনিই মাসিদনের অধিপতি হইবেন, তখন তাঁহার বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে।

গ্রীকেরা প্রতিবৎসর এক সময়ে একটী ক্রীড়োৎসব করিত। সিকন্দরকে সেই ক্রীড়ায় প্রতিযোগিতা করিতে আমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু তিনি বলিলেন, "না, এই ক্রীড়ায় আমি যোগ দিব না, প্রতিযোগিমাত্রেই যদি রাজপুত্র হইত, তাহা হইলে আমিও প্রতিযোগী হইতাম।" এই উক্তিটি গর্ব্বোক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আসলে তাহা নহে। তিনি জানিতেন, তিনি রাজপুত্র বলিয়া খেলায় জিতিতে না পারিলেও, পুরস্কার তাঁহাকেই দেওয়া হইবে, ইহা তিনি ন্যায্য মনে করিতেন না।

সিকন্দর শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে জ্ঞানী হইতে হইলে, সুধু বই পড়িলে চলিবে না; অনেক জিনিস নিজের চোকে দেখিতে হইবে, সে সকলের অর্থ বুঝিবারও চেষ্টা করিতে হইবে।

গামলায় ডাইওজেনিস।

একদা কেহ রাজা ফিলিপকে একটী সুন্দর যুদ্ধাশ্ব-উপহার পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ঘোড়াটি সুন্দর হইলে কি হইবে? বড় অশান্ত। ঘোড়াটীর নাম ছিল—"বুকেফেলাস" (Bucephalus); চতুর্দ্দিকে বসিবার স্থানবিশিষ্ট একটী বড় মাঠে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল। এই স্থানে রাজা ও তাঁহার পারিষদবর্গ ঘোড়াটি কেমন চলে ও ছুটে তাহা দেখিতে আসিলেন। সিকন্দরও তাঁহার পিতার সহিত সেই ঘোড়াটী দেখিতে গিয়াছিলেন, কারণ তিনি জীবজন্তুদিগকে ভাল বাসিতেন।

কিন্তু এই ঘোড়াটি এত "আড়িয়াল" ছিল যে, যে তাহার পীঠে চড়িতেছিল, তাহাকেই সে ফেলিয়া দিতেছিল। সে তাহার পিছনকার পা-দুইটির উপর ভর দিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে, পা-ছুড়িতে, কামড়াইতে লাগিল, তাই ভয়ে আর কোন লোকই তাহার কাছে যাইতে সম্মত হইল না। ইহা দেখিয়া রাজা বড়ই বিরক্ত হইলেন, কারণ ঘোড়াটি সুন্দর, তাঁহার রাখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কেহ যদি তাহার কাছেই না ঘেঁসিতে পারিবে, তবে তাহাকে রাখিয়া লাভ কি? তাই রাজা কহিলেন,—"তবে ও যেখানথেকে এসেছে, ওকে সেখেনেই পাঠিয়ে দেওয়া হোক।"

এই কথা শুনিয়া সিকন্দর কহিলেন,—"না, না, একে ফেরৎ পাঠা'বেন না। বাবা, আমাকে এই ঘোড়াটাকে বশীভূত ক'র্‌বার অনুমতি দিন। আমি নিশ্চয়ই একে বশীভূত ক'র্‌তে পা'র্‌ব। যে লোকেরা চেষ্টা ক'র্‌লে, ওরা কি ক'র্‌তে হ'বে জানে না, ওরা একে বু'ঝ্‌তেই পা'রছে না।"

রাজা ভাবিলেন, তাঁহার পুত্রের আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস বড়ই বেশী হইয়াছে; তবুও তিনি পুত্রের অনুরোধ রাখিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন, যদি সিকন্দর অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার শিক্ষা হইবে। অতএব সিকন্দর ঘোড়াটার কাছে গেলেন। তিনি তাহার লাগাম ধরিয়া বেচারাকে দুই-চারিটি মিষ্ট কথা বলিলেন, তাহার পর তাহাকে এমন দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড় করাইলেন, যেন তাহার চোকে রোদ লাগে।

তোমরা জান, আলো যদি কিছুর পিছনে থাকে, তাহা হইলে তাহার ছায়া তাহার আগে গিয়া পড়ে, আর সেই বস্তুটি নড়িতে থাকিলে, ছায়াটাও নড়িতে থাকে। ঘোড়ার তাহাই হইয়াছিল, সে সূর্য্যকে পিছনে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই তাহার প্রকাণ্ড শরীরের ছায়াটা তাহার সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল, আর সে যত ছটফট্ করিতেছিল, ছায়াটাও তত ছটফট্ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া সে আতঙ্কিত হইতেছিল। সিকন্দর ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বুকেফেলাস এখন রোদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাই তাহার আতঙ্কের কারণ, তাহার নিজ দেহের ছায়া, অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং সে শীঘ্রই শান্তভাব-ধারণ করিল। বালক সিকন্দর তাহাকে মিষ্ট কথা বলিতে—আদর করিতে লাগিলেন, ফলে সে তাঁহাকে তাহার পীঠে চড়িতে দিল। তাহার পর সিকন্দর তাহাকে যেদিকে চালাইতে লাগিলেন, সে সেই দিকেই চলিতে লাগিল। রাজা তাঁহার পুত্রের এই নৈপুণ্য দেখিয়া গর্ব্বানুভব করিলেন। তাঁহার পারিষদবর্গও সিকন্দরের সুখ্যাতি করিতে ও হাততালি দিতে লাগিলেন।

সিকন্দর আরও অনেক সৎ ও বীরোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যখন বালকমাত্র, তখনও তিনি এত চতুর ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন যে, তাঁহার পিতা রাজ্য ছাড়িয়া কোন স্থানে গমন করিলে, তাঁহারই হস্তে রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া যাইতেন। তাই তাঁহার পিতার এক শত্রু এক সময়ে যখন জানিতে পারেন যে, রাজ্যে বালক সিকন্দরমাত্র আছেন, ফিলিপ নাই, অমনি রাজ্যাক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে আসেন। সিকন্দর ভীত হইলেন না। তিনি রাজ্যের সৈন্য-সামন্তদের জড় করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন, তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে হারাইয়া দিয়া তাহার রাজ্য-অধিকার করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

তখনও সিকন্দর ছোট, এমন সময়ে তাঁহার পিতা ইহলোক-ত্যাগ করিয়া গেলেন। সিকন্দর স্বয়ং রাজা হইলেন। তাহার পর তিনি অনবরত যুদ্ধে, দেশাধিকারে এবং যোদ্ধার অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। তিনি অনেক দয়ার কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অনেক নিষ্ঠুর কাজও করিয়াছিলেন। তিনি যথাই যাইতেন, তথায় লোকেরা তাঁহাকে যত না ভালবাসিত তত ভয় করিত।

কিন্তু একটী নগরে একজন লোক ছিলেন, তিনি তাঁহাকে মোটেই ভয় করিতেন না। তাঁহার নাম ছিল—ডাইওজেনিস (Diogenes)। পরে তোমরা হয়ত ইঁহার কথা অনেকবার শুনিবে, তাই এই প্রবন্ধে আমি ইঁহার সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাহি! ডাইওজেনিস খুব ধনী ও নামজাদা লোক ছিলেন, কিন্তু বালাখানা, খোশ-পোষাক, আর আর সমস্ত জিনিস না থাকিলেও, তিনি যে সুখী হইতে পারেন, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি একটী গাম্‌লায় থাকিতেন!

তিনি যে নগরে বাস করিতেন, সেই নগরটি যখন সিকন্দর অধিকৃত করিলেন, তখন লোকে ডাইওজেনিসকে গিয়া কহিল, "আপনিও যান, সম্রাট্‌ সিকন্দরকে নমস্কার করিয়া আসুন।" ডাইওজেনিস উত্তর করিলেন,—"সেই পরাক্রান্ত বীর যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান তো আমাকে ঘরেতেই পাইবেন।"

দাম্ভিক সিকন্দর যে এই বৃদ্ধকে ধরিয়া আনিবার জন্য সৈন্য-প্রেরণ করিলেন না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য, কিন্তু তিনি বাস্তবিকই তাহা করেন নাই। তাঁহার মনটা তখন ভাল ছিল, তাহাছাড়া বৃদ্ধ গাম্‌লার মধ্যে কি করিয়া বাস করে, তাহাও তাঁহার দেখিবার কৌতূহল হইয়াছিল, তাই তিনি স্বয়ংই বৃদ্ধকে দেখিতে চলিলেন।

বৃদ্ধের নিকটে আসিয়া তাঁহার মত ধনী ও মনস্বী ব্যক্তিকে সেইপ্রকারে জীবন-যাপন করিতে দেখিয়া তাঁহার দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিয়া সিকন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি আপনার জন্য কি করিতে পারি?"

"রোদথেকে সরে দাঁড়াও, তুমি যা' আমাকে দিতে পার না, তা'-থেকে বঞ্চিত ক'র না।" সিকন্দরের বন্ধুবান্ধবেরা বৃদ্ধের মুখে ঐ কটূক্তি শুনিয়া তাঁহার উপরে ভারি চটিয়া উঠিল, কিন্তু সিকন্দর স্বয়ং ক্রুদ্ধ হইলেন না, তিনি কেবল হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু সিকন্দর সর্ব্বদা যে, এইরূপ ধীর-ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে।

একদিন সিকন্দর এক যুদ্ধ-জয় করিয়া আসিয়া তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে এক ভোজ দিতেছিলেন। সেই ভোজে বসিয়া তিনি কি কি বড় বড় ব্যাপার করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করিয়া আত্ম-প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই ভোজে ক্লিতস্‌-নামে তাঁহার এক চিরসুহৃদ্‌ ও পিতৃসুহৃদ্‌ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিকন্দরকে অত আত্মপ্রশংসা করিতে শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন, তাই তিনি সিকন্দরের পিতা ফিলিপ কি কি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, কি কি বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সিকন্দর পরপ্রশংসা শুনিতে চাহেন না, এইজন্য তিনি তাঁহার পুরাণো বন্ধুর উপর বড় চটিয়া উঠিয়া ক্রোধবশে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া ফেলিলেন।

ক্লিতস্‌ অবশ্যই সেই কটূক্তি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সৈনিক ছিলেন, আমরণ বীরত্ব-প্রকাশ করিয়াছিলেন, সিকন্দরের জন্মিবার পূর্ব্বে বহু যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"কাপুরুষ হই, আর যাই হই, আমি একবার একযুদ্ধে সম্রাটের জীবন-রক্ষা করিয়াছি।"

তাহাতে সিকন্দর আরও চটিয়া উঠিয়া তাঁহার ক্ষেপণাস্ত্র-হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চীৎকারপূর্ব্বক কহিলেন,—"যাও, ব'লছি!" তৎসঙ্গে তিনি বৃদ্ধকে তাগ্‌ করিয়া এমন অব্যর্থ-লক্ষ্যে ক্ষেপণাস্ত্র বিক্ষেপ করিলেন যে, বৃদ্ধ সেই অস্ত্রাঘাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন

পরে তাঁহার কৃতকার্য্যের ফল দেখিয়া সিকন্দর দুঃখে, ক্ষোভে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। হতভাগ্য ক্লিতসের দেহের উপরে পড়িয়া ক্ষেপণাস্ত্রটি টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, উদ্দেশ্য তাহার আঘাতে আত্মহত্যা করিবেন; কিন্তু তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে সেই সংকল্প-সাধনে বাধা দিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

দিগ্বিজয়ী সিকন্দর আত্মজয় করিতে পারেন নাই। তিনি স্তাবকদিগের তোষামোদে আত্মহারা হইয়া নির্ব্বোধ ও অসৎ লোকের কার্য্য করিয়া বসিতেন।

আফ্রিকার প্রবাদ-বাক্য।

১। যাহারা ছাই বুনে, ছাই তাহাদেরই মুখে উড়িয়া ফিরিয়া যায়।

২। যে লোক জাগিয়া আছে, তাহার দুইবার ভোর হয় না।

৩। যে ষাঁড় আগে আসে, সে-ই সবচেয়ে পরিষ্কার জল খাইতে পায়

৪। আশাই জগতের থাম।

৫। যে মাফ করে, সেই ঝগড়া থামায়।

৬। বোকাই সেয়ানার সিঁড়ি।

৭। বিপন্নকে যদি তুমি সাহায্য না কর, তবে তুমি তাহাকে তোমার হৃদয়ের মধ্যে খুন কর।

৮। উটের এক মত, চালকের অন্য মত

বোম্বেটের ছেলে

বোম্বেটের ছেলে, কর্ম্মাক, ক্রীড়াক্ষেত্রে তাহার চেয়ে বয়সে বড় একটী ছেলেকে হারাইয়া দিয়া নিকটস্থিত বনের দিকে ছুটিয়া গেল। দর্শকেরা তাহাকে দেখিতেছিল, সে হঠাৎ ছুটিয়া চলিয়া গেল দেখিয়া, তাহারা বড় আমোদিত হইতেছিল। বনের মধ্যে গিয়া আবার কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল যে, বালক তাঁহার বামহস্তে কিছু একটা লইয়া দক্ষিণ হস্ত-দিয়া গাছের ডাল ধরিয়া খুব সাবধানে নীচে নামিতেছে। সে ভূমিতে পদার্পণ করিতে না করিতেই দৃষ্ট হইল যে, দুইটী সামুদ্রিক ঈগল-পক্ষী ক্রোধে ভয়ানক চীৎকার

সে একটা বড় গাছে উঠিল, পরে তাহার উচ্চতম শাখা-পল্লবের মধ্যে অদৃশ্য হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সে গাছের এমন উচ্চ স্থানে উঠিতেছে, যেখানে লোকের চোক ঠিকরিয়া যায়; কারণ সেই বনটী সমুদ্রহইতে অনেক উচ্চ এক উচ্চস্থলীতে অবস্থিত ছিল। করিতে করিতে শূন্যে পাক খাইতেছে। তাহারা প্রথমে গাছের আগায় উড়িয়া গেল, তাহার পর ধোঁৎ করিয়া বালকের উপরে আসিয়া ছোঁ মারিল। তখন বালক তাহার লব্ধ বস্তুটি মাটিতে রাখিয়া মুহূর্ত্তেকে একটী পাথর কুড়াইয়া লইয়া অব্যর্থ-লক্ষ্যে নিকট-

তর পক্ষীটীকে প্রহার করিল। পাখীটা ঝপ্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষী তখন উন্মত্তের ন্যায় কর্ম্মাককে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। কর্ম্মাক তখন তাহার বক্র ছোরা বাহির করিয়া সেই পক্ষীর আক্রমণহইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণ দ্বন্দ্ব চলিল, অবশেষে সেই প্রকাণ্ড ঈগলটা বালকের ছোরার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভূতলশায়ী হইল।

কিন্তু বালকও অক্ষতাঙ্গে ঘরে ফিরিল না। সে যখন 'ঘরে ফিরিল, তখন তাহার সমস্ত মুখখানি রক্তে প্লাবিত, ঈগলের নখর-প্রহারে তাহার অঙ্গাবরণ শতধা ছিন্ন। স্ক্যাণ্ডানেভিয়ার বালকগণ স্বভাবতঃ নির্ভীক, কিন্তু তাহারাও ঈগল-পক্ষীর নীড়হরণ একটা অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য্য মনে করিয়া থাকে; কাজেই কর্ম্মাকের সেই বীরত্ব অন্য সমস্ত বালকের হৃদয়ে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করিল।

রাসভের রস-কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ছুটিতেছিলাম, এক মাঠে পঁহুছিয়া থামিলাম। আমি তখন ক্লান্তি-বোধ করিতে লাগিলাম, মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল, লেজটাও টন্ টন্ করিতেছিল। আমি তখন ভাবিতেছিলাম, আমরা, গাধারা, মানুষের চেয়ে ভাল কি না, এমন সময়ে কে আমাকে নরম-তুলতুলে হাত-দিয়া ছুঁইল, এবং কোমল-কণ্ঠে কহিল,—"আহা, বেচারা, কি রোগা হ'য়ে গেছে! বোধ হয়, কেউ তোমার সঙ্গে খুব খারাব ব্যবহার ক'রেছে। চল, আমাদের বাড়ীতে চল, সেখানে ঠাকুর-মা যেমন 'বুধী'র (গাইএর) যত্ন ক'রে, তেমনি তোমারও যত্ন ক'র্‌বে।"

আমি ফিরিয়া দেখিলাম,—৬।৭ বৎসরের একটী দিব্য টুকটুকে ছেলে, তাহার ৩।৪ বছরের বহিনের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ঐ কথা বলিতেছে। খুকী বলিল,—"দাদা, 'তলিয়ে' দাও, 'দাধার' 'পীথে' 'তলিয়ে' দাও।"

ছেলেটি তাহাই করিল। খুকীকে আমার পীঠে বসাইয়া আমাকে আদর করিয়া বলিল,—"আস্তে আস্তে চল, গাধু-ভাই, খুকী যেন প'ড়ে না যায়, লক্ষীটি, কেমন?

এই ছোট ছেলেটির আমার উপর বিশ্বাস দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর চলিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে আমার নাক-দিয়া তাহার হাতে সুড়সুড়ি দিতে লাগিলাম, সে তাই হাসিতে হাসিতে চলিল। এদিকে খুকী আমার পীঠে বসিয়া অনবরত বকিতেছে,—"হেই, হাট্, হাট্!"

তাহাদের বাড়ী পঁহুছিলে, তাহারা আমাকে দরোজার কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই এক সদয়-দৃষ্টি, "পাকা আঁবের" মত বুড়ীর হাত ধরিয়া টানিয়া আমার কাছে আনিল।

"দেখ, ঠাকুমা, গাধাটা বেশ, না? একে বাড়ীতে রাখ্‌বে?"—ছেলেটি ওকথা বলিল।

বৃদ্ধা বলিলেন,—"আগে দেখি, দাদা, কেমন গাধা।" এই বলিয়া তিনি আমার কাছে আসিয়া আমার পীঠে চাপড় দিলেন। আমার কাণ ছুঁইলেন, আমার মুখে হাত দিলেন। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, ভুলিয়াও তাঁহাকে যাহাতে কামড়াইয়া না ফেলি, তজ্জন্য সাবধান হইলাম। তখন তিনি বলিলেন,—"গাধাটা ঠাণ্ডা আছে বটে। কিন্তু এটা কা'র গাধা? দাদা, যাও তো, শ্যাম-গাড়োয়ানকে বল খোঁজ ক'র্‌তে। যদি কেউ দাবী না করে, তা' হ'লে আমরা একে রা'খ্‌ব। আহা বেচারা! কেউ যে এর যত্নটত্ন ক'র্‌ত, তা' ব'লে তো বোধ হচ্ছে না। পুঁটী, গোপালকে ডেকে আন্'ত, একে গোয়ালে নেগে রাখুক, আর ঘাস জল খেতে দিক্।"

গোপাল আসিয়া আমাকে গোহালে লইয়া গেল। পোনা ও পুঁটী (খোকা-খুকী) আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেখানে একটা সাদা ধবধবে গাই, তাহার বাছুর আর একটা ছাগল ছিল। গোপাল আমার শুইবার জন্য খানিকটা খড় বিছাইয়া দিল, তাহার পর এক-কুনকী ছোলা আনিয়া আমাকে খাইতে দিল।

তাহা দেখিয়া পোনা বলিল,—"গোপাল-দা! ঐ ক'টি ছোলাতে কি ওর পেট ভ'র্‌বে? আর চারটি দাও, আর চারটি দাও। বেচারা দৌড়ে পাল্লা দিয়েচে, নিশ্চয়ই খুব ক্ষিধে পেয়েছে।"

গোপাল বলিল,—"খোকা-বাবু, বেশী ছোলা খেলে, গাধাটা ভারি 'চুলবুলে' হ'বে, তখন আর তোমরা কেউ এর ওপর চ'ড়্‌তে পা'র্‌বে না।"

"না না, ও বড্ড ভাল গাধা। আমরা পীঠে চ'ড়্‌লে, ও আস্তে আস্তে যা'বে। গোপাল-দা, ওরে আর চাড্ডি ছোলা দেও।"

গোপাল আমাকে আর এক-কুনকী ছোলা দিল, বড় এক বাল্‌তী ভরিয়া একবাল্‌তী পরিষ্কার জল ও একবোঝা ঘাস আনিয়া

দিল। আমি পেট ভরিয়া খাইয়া, নবাব সিরাজুদ্দৌলার নাতির মত সেই খড়ের বিছানায় আড় হইলাম।

পরদিন ছেলেদের ঘণ্টাখানিকের জন্য বেড়াইয়া আনিলাম, আর আমায় কিছু করিতে হইল না। সেদিন পোনা নিজে আমার জন্য ছোলা আনিল, আর গোপাল মানা করা সত্ত্বেও আমাকে তিনটা গাধার খোরাক হইতে পারে, এত ছোলা খাইতে দিল। আমি মহাস্ফূর্ত্তিতে সব কচরমচর করিয়া চিবাইয়া সাবাড় করিলাম!

কিন্তু তিনদিনের দিন আমার বড় অসুখ-বোধ হইতে লাগিল। মাথা-ব্যথা করিতে লাগিল। বদহজমী ও জ্বরভাব হইল। সেদিন আমি একগাছা ঘাসও মুখে করিতে পারিলাম না। তাই পোনা যখন আমাকে দেখিতে আসিল, তখনও আমি বিছানায় পড়িয়াছিলাম।

পোনা আসিয়া বলিল,—"সে কি, গাধু-ভাই, এখনও শুয়ে যে? ওঠ, ওঠ, আমি তোমার জন্যে ছোলা এনেছি।" আমি মাথা তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না, মাথাটা আপনিই খড়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

পোনা চীৎকার করিয়া বলিল, —"গোপাল-দা, ঝট্ ক'রে এস, গাধুর কি অসুখ করেছে— শীগ্‌গির, শীগ্‌গির।"

গোপাল আসিয়া কহিল,— "কি, কি হয়েছে? আজ ভোরে আমি ওর গাম্‌লা ভ'রে জাবনা দিয়ে গেছি, আ! কিছু খায় নি যে, তবে কিছু হ'য়েছে।"

সে আমার কাণে হাত দিল, কাণ ভারি গরম ছিল, আমার পাঁজর-দু'টি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। দেখিয়া গোপাল গম্ভীর হইল।

পোনা কাঁদ কাঁদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'য়েছে, গোপাল-দা?"

"বদহজমীর দরুণ জ্বর হ'য়েছে। আমি তোমাকে অত ক'রে ছোলা দিতে মানা করেছিলুম, তুমি আমার কথা শোননি তো, খোকা-বাবু, এখন একে জানোয়ারের বিদ্যির কাছে নে যেতে হবে।"

শুনিয়া পোনের মুখ শুকাইয়া গেল। সে কাঁদিয়া ফেলিল!

গোপাল বলিল,—"খোকাবাবু, আমি তোমাকে অত ছোলা খেতে দিতে মানা করেছিলুম, তুমি তো শোন নি। সমস্ত শীতকালটা এই গাধাটা যে, তেমন কিছু খেতে যে পায় নি, তা' এই গাধাটার চেহারা আর গায়ের লোম দেখে সবাই ব'লতে পারে। তাহার উপর গাধার দৌড়ে এ বড় গরম হয়ে ওঠে। এইজন্যে একে সুধু ঠাণ্ডা ঘাস আর চাট্টি ক'রে দানা খেতে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তুমি একে পেট ভ'রে দানা খেতে দিলে।"

"আহা বেচারা গাধু মরে যা'বে, আমিই মেরে ফেল্লেম"— এই বলিয়া পোনা খুব কাঁদিতে লাগিল।

গোপাল বলিল,—"খোকাবাবু, কেঁদ না, এ যাত্রা ও রক্ষে পা'বে। তবে আমাদের ওর রক্ত বা'র ক'রে দিয়ে ওকে মাঠে ছেড়ে দিতে হ'বে।"

গোপাল এক জানোয়ারের বৈদ্য ডাকিয়া আনিল। সে ছুরী দিয়া আমার গলার শিরার একজায়গায় ফুটা করিয়া খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিল। তখন আমি কতকটা ভাল-বোধ করিতে লাগিলাম, আগের চেয়ে সহজে নিশ্বাস টানিতে লাগিলাম, দাঁড়াইতেও পারিলাম। তাহার পর গোপাল আমার রক্ত বন্ধ করিয়া দিল। আর ঘণ্টাখানিকের মধ্যে আমাকে একটা বেশ ঠাণ্ডা মাঠে ছাড়িয়া দিয়া আসিল।
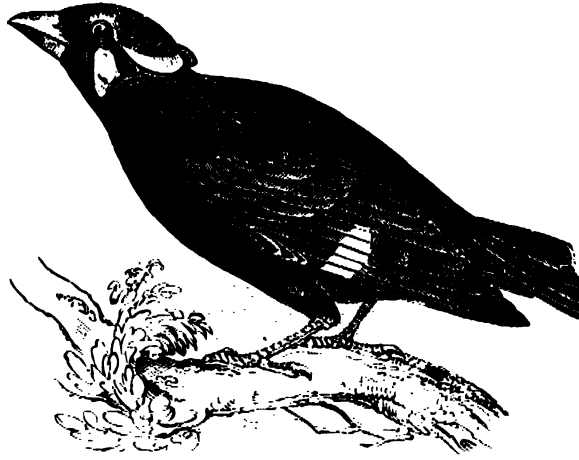
আমি এখন আগেকার চেয়ে ভাল-বোধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু একেবারে ভাল হইলাম না, সপ্তাহ-খানিক মাঠে বিশ্রাম করা আর ঘাস খাওয়া-ছাড়া আমি আর কিছুই করিতে পারিলাম না। পোনা ও পুঁটি সর্ব্বদাই আমার খোঁজ-খবর লইত, বড় যত্ন করিত। তাহারা দিনের মধ্যে অনেকবার আমাকে দেখিতে আসিত। ঘাস ছিঁড়িয়া খাওয়াইত। অনেকরকম ঠাণ্ডা ফল-পাকড় ও আনাজ খাইতে দিত। পোনা একদিন তাহার মাথার বালিশ আমার মাথায় দিতে চাহিয়াছিল, পুঁটী একদিন তাহার একখানি সাড়ী আমার গায়ে মুড়ি দিতে আনিয়াছিল। রোজ সন্ধ্যাবেলায় তাহারা আমাকে গোহালে লইয়া যাইত এবং পোনা আমাকে তখন, আমি যাহা খাইতে বড় ভালবাসি, সেই, আলুর খোসা ও লবণ খাইতে দিত। তাহাদের এত দয়ার জন্য আমি যে কি করিয়া তাহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিব, তাহা বুঝিতে পারিতাম না।

অবশেষে আমি আবার ভাল হইয়া উঠিলাম, তখন পোনা, পুঁটী, আর তাহাদের খুড়তুত ভাইদের লইয়া গ্রীষ্মকালটা আমি বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কাটাইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল-শেষ হয় হয় হইয়াছে, এমন সময়ে একদিন গৃহিণীর অনেক কুটুম্ব ছেলে-পিলে লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিল।

তাহার পরদিন পুরুষেরা সকলে পাখী-শিকার করিতে চলিল। দুইটি বড় ছেলে—একজনের বয়স ১৪ আর একজনের বয়স ১৩—এই প্রথমবার তাহাদের পিতার সহিত শিকার করিতে যাইবার অনুমতি পাইল। তাহাদের একজনের নাম নফর আর একজনের নাম নেপাল। পাড়ার একটী লোকও তাহার পনরবছরের ছেলে নন্দদুলালকে লইয়া এই শিকারে চলিল। সকালেই নফর আর নেপাল সকলের আগে তাহাদের বন্দুক কাঁধে করিয়া ও থলিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া গর্ব্বিতভাবে শিকার করিতে বাহির হইল, পথে যাইতে যাইতে তাহারা কেবলই পাখী-শিকারের কথা বলিতে লাগিল। নেপাল বলিল,—"নফর, শুন্‌ছিস্‌, যখন আমাদের থ'লে-দু'টো পাখাতে ভ'রে যা'বে, তখন কিসে ক'রে পাখী আ'নব?"

নফর বলিল,—"আমিও তাই ভা'ব্‌ছি। আচ্ছা, গাধাটার পীঠে একটা খালি-বস্তা বেঁধে নিয়ে গেলে কেমন হয়?

নেপাল বলিল,—"বেশ হয়, বেশ হয়।"

শুনিয়া আমার হাড় জ্বলিয়া গেল! আমি জানি, এই আনাড়ী ছোকরা-শিকারী-দুইটা যাহা দেখিবে, তাহাই গুলী করিয়া মারিতে যাইবে। হয় তো আমাকেই পাখী মনে করিয়া গুলী করিয়া বসিবে। কিন্তু আমার এ ছেলে-দুইটার হাত এড়াইবার উপায় কি? কাজেই সকলে যখন শিকারে বাহির হইল, তখন আমাকেও ছোঁড়ারা পীঠে ছালা বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

আমরা ক্রোশখানিক পথ চলিয়া গেলে, নন্দদুলালের বাপ নন্দকে লইয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল। আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"আরে, এ কি, আবার গাধাটাকে কেন?" আমার চালক একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল,—"খোকাবাবুদের পাখী বইবের জন্যে!"

বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া চারিদিকে অনেক পাখী উড়িতে লাগিল। আমি বুদ্ধি করিয়া সকলের পিছনে রহিলাম। ছেলেরা একদিকে শিকার করিতে গেল। বুড়ারা আর একদিকে গেল। চারিদিকে বন্দুকের দুম-দুম-আওয়াজ হইতে লাগিল, কুকুরেরা কাণ-খাড়া করিয়া কোথায় পাখী মরিয়া পড়িতেছে, তাহা দেখিতে লাগিল, পাখী পড়িলে, কুড়াইয়া আনিতে লাগিল। আমি ছোকরা-দের দিকে নজর রাখিয়াছিলাম, তাহারা দুম্‌দুম্ করিয়া চারিদিকে গুলী করিতেছে, কিন্তু একটীও পাখী মারিতে পারিতেছে না, তিন-জনে মিলিয়া একটা পাখীর দিকে তাগ্ করিয়াও সে পাখীটাকে মারিতে পারিতেছে না! ঘণ্টাদুই বাদে বুড়াদের থলিয়াগুলি পাখীতে ভরিয়া গেল, তখনও কিন্তু ছেলেরা একটীও পাখী মারিতে পারিল না।

একজন ছেলের বাপ ছেলেদের পাশদিয়া যাইতে যাইতে বলিল,—"এ কি! এখনও যে গাধার পীঠের ছালা খালি, কি হে, তোমরা সব পাখীগুলোকে থ'লেতেই ভ'র'ছ না কি? থ'লে ফেটে যা'বে যে!" এই বলিয়া সেই লোকটি অন্য সব বুড়াদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

শুনিয়া নফর, নেপাল ও নন্দদুলালের মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহারা কিছুই বলিল না। একটা গাছের তলায় বসিয়া গৃহহইতে আনীত খাবার খাইতে লাগিল। বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, হাম হাম করিয়া লুচি, তরকারী ইত্যাদির গ্রাসগুলি নিমেষের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিতে লাগিল। দেখিয়া তাহাদের পাশ দিয়া যাহারা যাইতেছিল, তাহাদের ভয় হইতে লাগিল।

নন্দদুলালের বাবা আসিয়া বলিল,—"আজ, দে'খ্‌ছি, তোমাদের বরাত নেহাৎ মন্দ, গাধাটাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না যে, এ পাখীর ভারে ঝুঁকে প'ড়্‌ছে।

নন্দদুলাল বলিল,—"বাবা, তোমরাই সব কুকুরগুলোকে নিয়ে গেলে, তাই আমরা যে পাখীগুলোকে শিকার ক'রেছিলেম, সে-গুলো আর কুড়োন হয় নি।"

"ও, তা' হ'লে তোমরা কতকগুলো পাখী-শিকার ক'রেছ বটে? তা' তোমরা নিজেই সে পাখীগুলোকে কুড়িয়ে আন নি কেন?"

"আমরা যে তা'দের প'ড়্‌তে দেখি নি।"

এই কথায় সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছেলেরা রাগিয়া মুখ লাল করিয়া রহিল।

নফর ও নেপালের বাবা বলিল,—"আমরা এখেনে ব'সে ঘণ্টাখানিক জিরোব, তোমরা রাখালের (আমার চালক) সঙ্গে সব কুকুর নিয়ে আবার শিকারে যাও। দেখ, এবার যে পাখীগুলোকে গুলী ক'র্‌বে, অথচ দে'খ্‌তে পাবে না, যদি আ'ন্‌তে পার!"

নফর বলিল,—"বেশ, বাবা, বেশ! আয় নেপাল, এস নন্দ, আমরা যাই, এঁদের মত থ'লে পাখী বে'ঝাই ক'রে নিয়ে আসি।" বড়লোকেরা রাখালকে ছেলেদের উপর বিশেষ নজর রাখিতে বলি-লেন, যেন তাহারা গোঁয়ারতমী করিয়া কিছু না করিয়া বসে।

ছেলেরা কুকুরদের লইয়া চলিল। আমি আগেকার মত সকলের পিছনে রহিলাম। সকালের মত অনেক পাখী উড়িল, কুকুরেরা নজর রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহারা একটীও পাখী কুড়াইয়া আনিল না, কারণ ছেলেরা একটীও পাখী মারিতে পারিল না।

অবশেষে নন্দদুলাল অধৈর্য্য হইয়া দেখিল, যেন একটী পাখী ভূমিহইতে উড়িবার উপক্রম করিতেছে। আসলে সেটি কিন্তু একটী কুকুর কাণ-খাড়া করিতেছিল, নন্দ তাহাকেই পাখী ভাবিয়া গুলী করিয়া বসিল। ভয়ানক চীৎকার করিয়া কুকুরটা শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইল!

তখন রাখাল চীৎকার করিয়া বলিল,—"কিরকম ছোকরা, হে তুমি? চোকে দে'খ্‌তে পাও না? দেখে শুনে আমাদের ভাল কুকুরটাকে মেরে ফেল্লে? খুব শিকার খেল্লে তো?"

নন্দদুলাল ভয়ে বাক্যশূন্য হইয়া রহিল। রাখাল গায়ের রাগ গায়ে মারিয়া নীরবে বেচারা কুকুরটাকে দেখিতে লাগিল।

তাহার পর আমরা সকলে বিষন্নমনে বাড়ীমুখো হইলাম। রাখাল আপন মনে বক্‌বক্ করিতে করিতে চলিল। ছেলেরা সব মাথা নীচু করিয়া চলিল। তাহারা কর্ত্তাদের কাছে বকুনি খাইবে, এই আনন্দে আমি বিভোর হইয়া চলিলাম। তাহারা যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, তেমনই ফল পাইবে।

বাবুরা তখনও গাছতলায় বসিয়া ছিল, আমাদের ফিরিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিছু একটা অঘটন ঘটিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহারা আমাদের কাছে আগাইয়া আসিল। এদিকে রাখালও আগাইয়া গেল।

একজন বাবু জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রে, কি মেরেছিস্ তোরা?"

"বাবু, হা'সবের কথা নয়। নন্দ আমাদের ভাল শিকারী-কুকুর 'ভূতি'কে গুলী ক'রে মেরেছে।"

"ভূতিকে? কেন? সে কি ক'রেছিল? আর আমি ছোঁড়াদের কখন শিকারে আ'নব না।"

নন্দের বাবা বলিল, "নন্দা, এদিকে আয়। গুমোরে ফেটে প'ড়্‌ছিলি, না? মহাশিকারী, না? গুমোরের ফল দে'খ্‌লি তো? যা, দূর হ'য়ে যা, এখনই বাড়ী চ'লে যা। হতভাগা, জানোয়ার কোথাকার! আর তোর হাতে আমি বন্দুক দেব? বন্দুক নিয়ে গে আমার ঘরে টাঙিয়ে রা'খ্‌বি; আর কখনও আঙুল দিয়েও ছুঁবি নি!"

নন্দ বলিল,—"আমি কি ইচ্ছে ক'রে ভূতিকে মেরেছি? মহা মহা শিকারীরও কখন কখন এমন ভুল হয়।"

তাহার বাবা ভারি রাগিয়া উঠিল,—"কি বল্লি? আবার বল্! আর যদি একটি কথা শুনি, তবে দে'খ্‌বি! যা, সোজা বাড়ী চ'লে যা।"

নন্দ এতটুকু হইয়া গিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

নফর ও নেপালের বাবা বলিলেন,—"কি গো, গুমোর করার ফল তো সব দে'খ্‌লে? তোমরা ভাব, তোমরা ভারি চালাক। তোমরাও এরকম ক'রে ক্ষতি ক'র্‌তে পা'র্‌তে। তোমরা ভেবেছিলে শিকার করা ভারি সোজা কাজ। আমাদের পরামর্শ তোমরা কাণেও তোল নি। তোমাদের মত আহাম্মক ছোকরাদের হাতে বন্দুক দেওয়া ঠিক হয় নি। যাও, শিকার করা তোমাদের কাজ নয়, ঘরে গিয়ে হাডুডুডু খেল গে!"

নফর ও নেপাল কিছুই বলিল না। মাথা নীচু করিয়া রহিল। সব লোক বিষন্ন মনে ঘরে ফিরিয়া চলিল! (ক্রমশঃ।)

আদর্শ-পাইলট

বহুবৎসর অতীত হইল জন-নামক একব্যক্তি উত্তর-আমেরিকার ঈরী-হ্রদে একখানি জাহাজে পাইলটের কাজ করিতেন। তোমরা জান, নৌকার যেমন মাঝি, জাহাজে সেইরূপ পাইলট। পাইলট জাহাজ কোন্ দিকে যাইবে, তাহা ঠিক করিয়া দেয়। ঈরী হ্রদ বিখ্যাত নায়েগ্রা-জল-প্রপাতের নিকটে অবস্থিত। ঈরীর একদিকে বাফেলো-বন্দর, আর একদিকে ডিট্রয়। একদা এক গ্রীষ্মের অপরাহ্নে জন তাহার আরোহিপূর্ণ জাহাজখানি ডিট্রয়হইতে বাফেলোতে লইয়া যাইতেছিলেন। নিস্তল, স্থির জল কাটিয়া জাহাজখানি চলিতেছিল। তখন সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে সমগ্র হ্রদ পূর্ণ। কেবল জাহাজের চক্রের অবিরাম আবর্ত্তন ধ্বনি সেই নিস্তব্ধ, নির্জীব প্রকৃতিকে সজীব করিয়া তুলিতেছিল। সেই সময়ে তরল ধূমরাশি জাহাজের নিম্নদেশহইতে উপরের দিকে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, কাপ্তেন একজন নাবিককে ডাকিয়া বলিলেন "সিমসন, নীচে যাইয়া দেখ তো, এই ধূম কোথাহইতে আসিতেছে।"

সিম্‌সন কাপ্তেনের আদেশে নীচে গেল এবং মেঘের মত কাল মুখ করিয়া আসিয়া বলিল, "কাপ্তেন, জাহাজে আগুন ধরিয়াছে!"

এই সংবাদ শুনিবামাত্র জাহাজের সকল আরোহী "আগুন! আগুন!" এই বিকট চীৎকার-ধ্বনি তুলিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে অনেক জাহাজেই নৌকা রাখা হইত না, তাই সকলে নিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল!

জাহাজের সকল নাবিককেই সাহায্যের জন্য ডাকা হইল। বাল্‌তি বাল্‌তি জল আগুনের উপর ঢালা হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিল! জাহাজখানিতে বহুল-পরিমাণে ধূনা এবং আল্‌কাৎরা-বোঝাই ছিল। এই দুইটী দাহ্য পদার্থ থাকায় জাহাজ-রক্ষা করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল! আরোহিগণ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া বাফেলো-বন্দর এখনও কত দূরে আছে, পাইলটকে তাহা জিজ্ঞাসা করিল।

আঁ-আঁ-আঁ। আমার "বালক"-খানা কোথায় গেল?

জন উত্তর দিলেন, "সাত মাইল।"

"কতক্ষণে আমরা তথায় পঁহুছিতে পারিব?"

পাইলট শান্তভাবে বলিলেন, "আমরা যেরূপভাবে যাইতেছি, তাহাতে পঁয়তাল্লিশ-মিনিট লাগিবে।"

"কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কি?"

"বিপদ্?" এই কথা বলিয়াই তিনি অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। "ঐ ধূমরাশির দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর! বিপদ্ ত যথেষ্ট! যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও!"

এই কথা শুনিয়া আরোহী এবং নাবিকগণ স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলে জাহাজের অগ্রভাগে যাইয়া জড় হইল। কেবল জন একা হা'লের কাছে রহিলেন। আগুনের শিখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ধূমে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

কাপ্তেন অতি উচ্চে ডাকিলেন, "জন!"

"আজ্ঞে!"

"তুমি কি হা'লের কাছে আছ?"

"আজ্ঞে, হাঁ!"

"জাহাজ এখন কোন্‌দিকে চলিতেছে?"

"দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে।"

"দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকের পূর্ব্বে চালাইয়া জাহাজ তীরে লাগাও।"

ক্রমে ক্রমে তীরের নিকটে, অতি নিকটে জাহাজ অগ্রসর হইতে লাগিল। আবার কাপ্তেন ডাকিলেন, "জন!"

"আজ্ঞে, মহাশয়!" কিন্তু এবার তাঁহার স্বর অতি ক্ষীণ, প্রায় !

"জন, তুমি কি আর পাঁচ-মিনিট সহিয়া থাকিতে পারিবে না?"

লোক-হিতৈষণার প্রবল প্রেরণায় সেই ক্ষীণ স্বরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল! মৃতকল্প জন হৃদয়ের উল্লাসে বলিলেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহে নিশ্চয়ই পারিব।"

বৃদ্ধের মস্তকের চুলগুলি ত্বক্‌পর্য্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার একটা হাত একেবারে পুড়িয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া এবং দন্তে দন্ত চাপিয়া, অপর হস্তে অটলভাবে হা'ল ধরিয়া রহিলেন!

জাহাজ তীরে লাগিল। আরোহী ও নাবিকগণ ছুটিয়া জাহাজহইতে নামিল। ওদিকে জাহাজের নিম্নতল পুড়িয়া উপরিতল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আর একটু বিলম্ব হইলে, সকল লোক পুড়িয়া মরিত। সকলের প্রাণ-রক্ষা হইল। কিন্তু জন? জাহাজ তীরে লাগিবামাত্র কাপ্তেন তাড়াতাড়ি জনকে আনাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহাকে মুক্ত বাতাসে আনা হইল, কিন্তু বৃদ্ধের প্রাণবায়ু তখন বাহির হয় হয় হইয়াছে। আর যাতনা সহ্য হয় না। অসীম ধৈর্য্যগুণে তিনি এতক্ষণ সেই আগুনের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাই জাহাজের আরোহিগণ বাঁচিল। এতগুলি লোকের জীবন-রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, এই আনন্দে বৃদ্ধ প্রফুল্ল-মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

তাঁহার আত্মা অমরধামে চলিয়া গেল! বৃদ্ধের হয়ত স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলই ছিল, কিন্তু তিনি তখন তাহাদের কথা ভাবিতে ও বুঝিতে অবসর পান নাই। কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তিনি আপনার সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীঅমৃতলাল সিংহ।

কুকুর-গোয়েন্দা।

স্পিট্‌জ।

স্পিট্‌জ ছোট একটী কুকুর, তাহার গায়ের লোম তামাটে-রঙের, কাণ-দু'টি খাড়া। সে রুষিয়ার পুলিশ-বিভাগের একটী উপযুক্ত কর্ম্মচারী। কোন আসামী ফেরার হইলে, স্পিট্‌জকে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। স্পিট্‌জ রুষিয়ার পুলিশ-বিভাগের এক দক্ষ গুপ্তচর বা গোয়েন্দা। গুপ্তচরের কার্য্যে স্পিট্‌জ এরূপ পরিপক্বতা-লাভ করিয়াছে যে, সে কচিৎ বিফল হয়। প্রায় দুইবৎসর আগে তিনজন লোক দুইজন লোককে খুন করে, যে স্থানে ঐ হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়, তাহা ওদেশহইতে ৬ক্রোশ দূরবর্ত্তী। স্পিট্‌জকে তথায় লইয়া যাওয়া হইল। কয়েকমুহূর্ত্ত সেই স্থানের চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘ্রাণ লইয়া স্পিট্‌জ একটী গ্রামে গিয়া দুইজন আসামীকে তাহাদের গুপ্ত স্থানহইতে বাহির করিয়া ফেলিল, পরে তৃতীয় আসামীকেও সে ৩ক্রোশ দূরবর্ত্তী আর একটী গ্রামে গিয়া পাক্‌ড়াও করিল। তাহার পর সে পুলিশকে একটী নদীর ধারে লইয়া গিয়া যে অস্ত্রদ্বারা হত্যাকার্য্য সাধিত হইয়াছিল, সেই অস্ত্রটিও দেখাইয়া দিল; আসামীরা পলাইবার সময়ে উহা ঐ নদী-তীরে ফেলিয়া গিয়াছিল। এইরূপে ধৃত হইয়া আসামীরা তাহাদের দোষ-স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, এবং যথোপযুক্ত শাস্তিও পাইল।

ঐ ঘটনার অল্পদিন পরেই এক ভদ্রলোক তাঁহার সেক্রেটারীর সঙ্গে অনেক টাকা লইয়া এক নির্জ্জন পল্লীপথ দিয়া গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, কয়েকজন গুণ্ডা পথে তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহারপূর্ব্বক পথের ধারে ফেলিয়া রাখিয়া টাকাকড়ি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া চম্পট্ দেয়। ভদ্রলোকের সেই দুর্দ্দশা লোকের চক্ষুগোচর হইবার পূর্ব্বেই ডাকাইতেরা বহুদূরে পলাইয়া যায়। তখন রুষিয়ার পুলিশ স্পিট্‌জের সাহায্য না লইয়া থাকিতে পারিল না। অকুস্থলে স্পিট্‌জকে লইয়া যাওয়া হইলে, সে নাক নীচু করিয়া সেই স্থানটিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে পুলিশ ইনিস-

পেক্টরের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু-দুইটি তুলিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। ভাব এই, "প্রভু, এখন আমায় শৃঙ্খলমুক্ত করুন, আমি আসামীদের ধরিয়া আনিতেছি।"

যেই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, অমনই সে যাত্রা করিল। পথে কোন স্থানে না থামিয়া সে কয়েকমাইল দূরবর্ত্তী ম—নামক গ্রামে পহুঁছিল। পহুঁছিয়া সে একটি ক্ষুদ্র কুটীরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সে কুটীরের দ্বার তখন ঈষৎ মুক্ত ছিল। তাহা দেখিয়া সে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু শীঘ্রই আবার বাহির হইয়া আসিয়া কুটীরের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া এদিকে ওদিকে তাকাইতে তাকাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, যেন সে তখন, কি করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমন সময় তিনজন যুবক সেই গ্রামের পথ দিয়া আসিতেছিল,. তাহারা কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইলে, স্পিট্‌জ তাহাদের একজনের কোমরবন্ধ কামড়াইয়া ধরিল! পুলিশ লোকটাকে ধরিবামাত্রই স্পিট্‌জ আর একটী লোকের পায়জামা কামড়াইয়া ধরিল। পুলিশ তখন তাহাকেও ধরিল। তৃতীয় লোকটিকে স্পিট্‌জ স্পর্শও করিল না, সুতরাং পুলিশও তাহাকে অব্যাহতি দিল। তাহার পর স্পিট্‌জ আবার কোথায় চলিল। এইবার সে পুলিশকে একটী নির্জ্জন কুটীরের মধ্যে লইয়া গেল। সেখানে পুলিশ আর একটী লোককে লুকাইয়া থাকিতে দেখিল। তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্রই স্পিট্‌জ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং যেপর্য্যন্ত না পুলিশ তাহার হাতে হাতকড়া লাগাইল, সেপর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িল না। তাহার পর পুলিশ সেই তিনজন লোককে যে হাঁসপাতালে ভদ্রলোকটি ও তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন, সেই হাঁসপাতালে তাঁহাদের কাছে লইয়া গেলেন। তাঁহারা তিনজনকেই চিনিতে পারিলেন। ফলে স্পিট্‌জের কৃতিত্বে আরও তিনজন অপরাধী ধরা পড়িয়া অপরাধানুযায়ী দণ্ড পাইল।

স্পিট্‌জের কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। তোমরা যদি কেহ কুকুর পোষ, তবে তাহার নাম "স্পিট্‌জ" রাখিবে কি? কিন্তু নামটার উচ্চারণ করা একটু শক্ত। তবে থাক!

"নামে কি করে?
গোলাপে যে নামে ডাক, সৌরভ বিতরে!"

শ্বেতহস্তীর দেশ।

১৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্যামরাজ চূড়ালঙ্করণ ইউরোপ-দর্শনের ইচ্ছা-প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিবার জন্য ইংলণ্ডহইতে দুইজন নৌ-কর্ম্মচারীকে পাঠান হইয়াছিল। বিলাতে পঁহুছিয়া তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অতিথি হইয়া থাকেন। চূড়ালঙ্করণ তৎপূর্ব্বে দেশহইতে অতদূরে আর কোথাও যান নাই, সেবার কেবল প্রজাব্রজের কল্যাণার্থেই সুদূরগামী হন। বিলাতে গিয়া তিনি তথাকার আইন-কানুন ও বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা-দানের পদ্ধতি-শিক্ষা করিয়া আসেন। তিনি বড় বিচক্ষণ লোক ছিলেন, দেশে ফিরিয়া তিনি অনেক বিষয়ে দেশের সংস্কার-সাধন করেন, তাঁহার রাজত্বকালে শ্যামদেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা চূড়ালঙ্করণের মৃত্যু হয়। এখন মহা-বজ্রায়ুধ তথাকার রাজা হইয়াছেন। বজ্রায়ুধের শিক্ষা ইংলণ্ডে লব্ধ হইয়াছে। প্রথমে তিনি সাণ্ডহর্ষ্টে গিয়া সৈনিক-বৃত্তি-শিক্ষা এবং পরে অক্সফোর্ডে গিয়া ইতিহাস-অধ্যয়ন করেন। ওয়েষ্ট-মিনিষ্টরে যখন সপ্তম এডোয়ার্ড রাজপদে অভিষিক্ত হন, তখন বজ্রায়ুধ শ্যামের যুবরাজ-স্বরূপে শ্যামের পক্ষে সেই অভিষেকের শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি ইংলণ্ডের বালক-চরদিগের কার্য্যপ্রণালী-লক্ষ্য করেন। শ্যামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাবজ্রায়ুধ নিজের রাজ্যে বালক-চর-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা এবং এই বালক-চরদিগকে "বন্য ব্যাঘ্র" এই অভিধা-প্রদান করেন। এখন মহাবজ্রায়ুধই রাজা হইয়াছেন, তথাপি এখনও তিনি ঐ বালক-চর-সম্প্রদায়ের দলপতি আছেন। তাঁহার ইংরাজ বালক-চরদিগের উপর এতই অনুরাগ যে, তিনি "সারের" বালক-চর-সম্প্রদায়ের অভিভাবক হইয়াছেন, ঐ সম্প্রদায়ের নিকটে বর্ত্তমান শ্যামরাজের হস্তলিপিযুক্ত ফোটোগ্রাফ্ আছে।

শ্যামদেশকে অনেক সময়ে শ্বেতহস্তীর দেশ বলা হইয়া থাকে। ঐ দেশের রাষ্ট্রীয়-পতাকায় একটী শ্বেতহস্তী অঙ্কিত আছে। বাণিজ্য-পোতেও শ্বেতহস্তী-চিত্রিত পতাকা উড়ে, তবে জাতীয় পতাকার জমীর রং লাল এবং বাণিজ্য-পতাকার জমীর রং নীল। দেশের তাবৎ প্রাসাদ ও মন্দিরের শীর্ষদেশে এই শ্বেতহস্তীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আসল শ্বেতহস্তীর গাত্রবর্ণ "ফিকা হল্‌দে," সাধারণ হস্তীর অপেক্ষা ইহার গায়ের রং একটু সাদাটে, তাহাছাড়া ইহার গায়ে কয়েকগাছি সাদা লোমও আছে, এবং ইহার লেজ লম্বা।

কেহ শ্বেতহস্তী ধরিতে পারিলে, রাজা সেই ব্যক্তিকে প্রচুররূপে পুরস্কৃত করিয়া হস্তীটিকে ব্যাংককের রাজকীয় হস্তী-শালায় রাখিয়া আজীবন পালন করেন। শ্যামবাসীদিগের বিশ্বাস এই, শ্বেতহস্তীর দেহে কোন মহাপুরুষের আত্মা বসবাস করিতেছেন, তিনি কোন ভবিষ্যযুগে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়া এই পাপময় জগৎকে পুণ্যময় করিয়া তুলিবেন; এই কারণেই শ্বেতহস্তী শ্যামদেশে সম্পূজিত হইয়া থাকে।

শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাংককে অনেক সময়ে "পূর্ব্বাঞ্চলের ভেনিস" বলা হইয়া থাকে, কারণ ঐ নগরীটিতে বিস্তর খাল আছে। অল্পদিন পূর্ব্বপর্য্যন্ত ঐ খালগুলি ব্যাংককের রাজপথ ছিল, কিন্তু

সম্প্রতি অনেক রাস্তা এবং খালগুলির উপর অনেক পুল তৈয়ারী করা হইয়াছে, এবং বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী সহরটির চারিদিকে গতায়াত করিতেছে।

ব্যাংকক-সহরটি মেনাম-নদীর তীরবর্ত্তী। ঐ মেনাম-নদী সুবিস্তৃত এবং উহার উভয় তীরের নিকটে ভাসমান গৃহসকল ভাসিতেছে। নদীর মধ্যস্থলে সমুদ্রগামী পোতসমূহ লঙ্গর করা আছে, ঐ সকল পোতের সাহায্যে চাউল ও সেগুণ-কাঠ চীনদেশে ও ইউরোপে রপ্তানী করা হয়। জোয়ারের সময় ঐ নদী দিয়া বড় চাউলের ভাউলিয়া ভাসিয়া আসে, তাহাছাড়া যাজকদিগের নৌকাগুলি তাহাদের ছাত্র-দিগের দ্বারা বাহিত হইতে থাকে, ছোট ছোট ডিঙ্গীতে ডাক-হরকরারা কিম্বা পক্বান্নব্যবসায়ীরা আনাগোনা করে। পক্বান্ন-ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় ঐ নদীতে খুব চলে; ঐ নদীর দুই পার্শ্ববাসী লোকেরা ও মাঝিরা তাহাদের নিকটহইতে পক্বান্ন কিনিয়া খায়। এই নদীবাসীরা নদীতেই সব পায়। দোকান নদীতেই আছে। ভাড়াটে নৌকা তো আছেই, তাহাছাড়া পুলিস আছে, বাজার আছে। বাজার বসে রাত দুপুরে, ভাঙে বেলা সাতটার সময়। ক্রেতা নাই, সব ক্রেত্রী। বিক্রেতা নাই, সব বিক্রেত্রী। বিক্রেত্রীরা নৌকায় করিয়া পণ্যদ্রব্য লইয়া আসে—মৎস্য, ফল ও ফুল। প্রত্যেক নৌকায় এক-একটী বাতি থাকে। ভোর হইলেই, নদী খালি হইতে আরম্ভ হয়। তখন নারীসমাকুলা নদী শূন্যা হয়। ক্রেত্রী ও বিক্রেত্রীরা বিশ্রাম করিতে যায়; কিন্তু ডাঙ্গায় সে ভাব নাই। সেখানে উষার ক্ষীণালোক ফুটিতে আরম্ভ করিলেই, দৈনন্দিন কার্য্য আরব্ধ হয়। তখন রাজপ্রাসাদহইতে সুবৃহৎ কাংস্য-ঘণ্টা বাজাইয়া দিবালোকের সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এই ঘণ্টাবাদকের নাম—"উষা-সম্বর্দ্ধক।"

শ্যামবাসীদিগের জীবন কার্য্যতঃ প্রায় সমস্তক্ষণ বাহিরে বাহিরেই কাটে। তাহারা স্নান নদীতে করে, নিকটবর্ত্তী গাছতলায় প্রসাধনে ব্যাপৃত হয়, পথের ধারে আহার করিতে বসে। বাড়ীর প্রত্যেক লোকই রাঁধিতে জানে, মায়ের অভাবে বাপ রাঁধে; ছেলে-মেয়েরাও রাঁধিতে পারে।

শ্যামবাসীরা পানের বড় ভক্ত। তাহার ফলে তাহাদের অধ-রোষ্ঠ ও জিহ্বা সর্ব্বদাই রক্তাভ এবং দন্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। শ্যামদেশের দন্তচিকিৎসকের কাছে পাটীকে পাটী কৃষ্ণবর্ণ নকল দাঁত পাওয়া যায়; সুতরাং কাহারও দন্তচ্যুতি ঘটিলে, চ্যুতদন্তের অনুরূপ দাঁত দাঁতের রোজার কাছে পাওয়া যায়।

শ্যামদেশে ডাক্তারেরও অভাব নাই। রোগী মরিয়া গেলে, শ্যামদেশের "ধন্বন্তরী" কিন্তু পারশ্রমিক পায় না। সেই দেশীয় লোকের এই বিশ্বাস যে, অনেক বৎসর আগে একজন বড় বুদ্ধিমান

লোক ছিলেন, তিনি "ভেষজ-জনক" ছিলেন। কি করিয়া লতা-গুল্মাদিয়া রোগ আরাম করিতে হয়, বনের গাছ-পালা ও ফুল তাহা তাঁহাকে শিখাইয়াছিল। "ভেষজ-জনক" সেই ঔষধগুলির কথা একটী পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার শিষ্যেরাও রোগীকে কি করিয়া অরোগ করিতে হয়, তাহা জানিতে পারে। প্রত্যেক শ্যামবাসী চিকিৎসকের গৃহে একটী করিয়া "ভেষজ-জনকের" মূর্ত্তি আছে। কোন রোগীকে দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে যে যে ঔষধ-সেবন করাইতে চায়, সেই সেই ঔষধ সেই "ভেষজ-জনকের" হাতে ছোঁওয়াইয়া লয়, তাহাতে সেই ঔষধগুলি আশীর্পূত হইয়া উঠে!

খুব ছেলেবেলায় শ্যামদেশবাসী ছেলেমেয়েরা দিগম্বর থাকে। তখন তাহাদের মাতারা তাহাদিগকে মশকদংশনহইতে রক্ষা করিবার জন্য গায়ে একপ্রকার হরিদ্রাবর্ণ পদার্থ মলিয়া দেয়। তখন তাহারা তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় কিম্বা খালে গিয়া জল-খেলা করে। তাহারা তখন মহিষে চড়িয়া বেড়ায়, নারিকেল-গাছে উঠে, নৌকার দাঁড় টানে, আর মাছের মত জলে সাঁতার দেয়। বড় হইলে, তাহারা কিন্তু ভিক্ষুদের কাছে গিয়া পড়িতে শিখে। রাজধানীর ছেলেরা রাজা চূড়ালঙ্করণের দ্বারা স্থাপিত সরকারী বিদ্যালয়ে গিয়া শ্যাম ও ইংরাজী ভাষা শিখে। প্রত্যেক শ্যামবাসীকে অন্ততঃ ছয়মাসকাল ভিক্ষু হইতে হয়। রাজা স্বয়ং এক-সময়ে ভিক্ষু হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়াছিলেন।

খুব ছেলেবেলাহইতে ছেলেমেয়েদের মাথা কামান থাকে, কেবল মাথার একস্থানে একগুচ্ছ চুল রাখা হয়। ঐ কেশগুচ্ছ ১১বৎসর বয়সপর্য্যন্ত কামান হয় না। ১১বছরে পা দিলে, ঐ টীকি-কর্ত্তন-সংস্কার হয়। তখন গণকেরা শুভদিন-নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, বাড়ী পরিস্কৃত করা হয়। ঐ সংস্কারে বালক বা বালিকার সমস্ত আত্মীয়-আত্মীয়াকেই নিমন্ত্রণ করা হয়। তাহারা প্রত্যেকেই ছেলে বা মেয়ের জন্য কিছু একটা উপহার লইয়া আসে। তখন টীকিটিকে তিনটী ভাগে বিভক্ত করা হয়। ভিক্ষুরা তখন গান গাহিতে এবং অন্য লোকে ঘণ্টা বাজাইতে থাকে। সেই সময়ে উপস্থিত আত্মীয়দের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোষ্ঠীর, সে একটী সোণার কাঁচি লইয়া টীকির একটী গুচ্ছ কাটিয়া দেয়। বাকী দুইটি গুচ্ছ বয়োবৃদ্ধ বা বৃদ্ধা আত্মীয়েরা কাটিয়া থাকে।

ছোট ছোট চুলগুলি একটি কদলীপত্রের পাত্রে করিয়া নদীতে বা খালে ভাসাইয়া দেওয়া হয়—তাহাতে নাকি ছেলের বা মেয়ের যত আপদ্ বালাই ঘুচিয়া যায়! বড় বড় চুলগুলি কিন্তু ছেলেটি বা মেয়েটি বড় হইয়া যতদিন না "বুদ্ধের পূত পদচিহ্ন"-নামক তীর্থে যাইতে সমর্থ হয়, ততদিন রক্ষিত হয়। ঐ তীর্থের ভিক্ষু ঐ কেশদ্বারা সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত করিয়া "বুদ্ধের পদচিহ্ন" ঝাঁটি দেয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

গরম কাচে ঠাণ্ডা জল লাগিলে, কাচ ফাটিয়া যায় কেন? যে কারণে ঠাণ্ডা জল লাগিলে, গরম কাচ ফাটিয়া যায়, সেই কারণেই ঠাণ্ডা কাচে গরম জল লাগিলে, কাচ ফাটিয়া যায়; কিন্তু সর্ব্বদাই যে, তাহা হয়, তাহা নয়। যদি তুমি খুব পাৎলা কাচ-ব্যবহার কর, তাহা হইলে গরম বা ঠাণ্ডা জলে ঐ কাচ ভাঙিবে না। রসায়নবিদেরা অনেক সময়ে খুব পাৎলা কাচের চোঙ-ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহার নাম পরীক্ষা-চোঙ (test tube)। এই চোঙে জল ভরিয়া আগুনে গরম করিলেও, কাচ ফাটিয়া যায় না।

তুমি হয় ত মনে করিতে পার যে, কাচ যত পাৎলা হইবে, তত শীঘ্র আগুনের তাপে ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু ঠিক উল্টাটি হয়। একটি সাধারণ কাচের গেলাস গরম জলে পূর্ণ করিলে, তাপ জলহইতে কাচে পরিবাহিত হয়, তাহাতে কাচে টান ধরে, কিন্তু তাপ গেলাসের কাচের বহির্ভাগে যায় না, বাহিরের দিক্ যেমন, তেমনই থাকে; তাই ঐ গেলাসের কাচের ভিতরের দিক্ তাপে বৃদ্ধি পাইয়া ঠাণ্ডা বহির্ভাগকে ফাটাইয়া দেয়। যখন একটি উত্তপ্ত গেলাসে ঠাণ্ডা জল ভরা হয়, তখন আবার ঠিক উল্টা হয়, তখন বহির্ভাগ কোঁকড়াইয়া যাইবার আগে গেলাসের ভিতরের ভাগ কোঁকড়াইয়া যায়, তাই গেলাস ফাটিয়া যায়; কিন্তু যদি খুব পাৎলা কাচ-ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তাপ এত শীঘ্র কাচ-ভেদ করে যে, উহার দুই দিক্ একসঙ্গেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, এই জন্যই পাৎলা কাচের গেলাস ভাঙে না।

টেনিসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

টেনিস অনেক দিনকার পুরাণো খেলা, এ খেলার যখন সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন ক্রিকেট-খেলার কেহ কল্পনাও করে নাই। বোধ হয় Tenez-শব্দহইতে বিকৃত হইয়া Tennis-শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ মূলশব্দের অর্থ বর্ত্তমানে ব্যবহৃত ইংরাজী ready-শব্দের মত। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে এই খেলার প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। তখন এই খেলার বিধানাবলী যেমন সরল

ছিল, এখন তেমনই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চদশ-শতাব্দীতে ফ্রান্সদেশে এই খেলাটি বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা হইতে সামান্য প্রজাপর্য্যন্ত এই খেলা খেলিতে ভাল বাসিতেন ও বাসিত।

এই খেলার আদিম নাম কিন্তু Tenez ছিল না—ছিল,—হাত-খেলা, কারণ তখন বলটিকে পাণিদ্বারা প্রহার করা হইত। পরে হাতে দস্তানা পরিয়া বলে আঘাত করা হইত। শেষে ছোট হাতলওয়ালা র‍্যাকেট ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়।

চৈনিকবিচার-বুদ্ধি

চারজন চীনা দোকানদারে মিলিয়া এক তুলার দোকান খুলিয়াছিল। পাছে ইঁদুরে তুলা কাটিয়া নষ্ট করে, তাই তাহারা একটী বিড়াল পুষিয়াছিল। বিড়ালের এক-একটি পা এক-এক-জন অংশীদারের। একদিন বিড়ালটা তাহার সাম্নের বাঁ-পা কাটিয়া ফেলিল। সেই পা যে অংশীদারের, সে তাহাতে তুলা তেলে ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিল। বিড়াল আগুনের খুব কাছে যাওয়াতে তাহার ঐ পায়ে আগুন ধরিয়া গেল। সে ভয়ে দোকানময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাতে দোকানের সমস্ত তুলায় আগুন লাগিয়া তুলা ছাই হইয়া গেল।

যে তিনজন অংশীদারের বিড়ালের পা ভাল ছিল, তাহারা চতুর্থ অংশীদারের নামে নালিশ রুজু করিল! বিচারপতি এই রায় দিলেন,—"যে পাটা খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল, সে পায়ের চলচ্ছক্তি অবশ্যই ছিল না, সুতরাং বিড়ালের ভাল পা-তিনটিই প্রথমে আগুনের কাছে, পরে দোকানময় ছুটাছুটি করিয়াছে, অতএব যে তিনজন অংশীদারের বিড়ালের পা ভাল ছিল, সেই তিনজন অংশীদারকেই বরং চতুর্থ অংশীদারের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে!

মে-মাসের প্রতিযোগিতার ফল।

এইবার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাদ্বয় প্রথম স্থান-অধিকার করিয়াছে।—"বালক"-সম্পাদক।

গরমীর ছুটী।

গ্রীষ্মের ছুটীতে রাম ও হরিতে
কাল্কা* বেড়াতে যায়।
দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাম্রার
উভয়ে কিনিয়া লয়॥
সত্বর করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া
শার্সি খুলিয়া বসিল।
এক ফেরিওলা কাঁধে করি ঝোলা
"বালক" ব'লে হাঁকিল॥
ইহা শুনি' হরি তাড়াতাড়ি করি'
ফেরিওলা বলে' ডাকে।
লইয়ে পুস্তক "বালক"-নামক
সুধাইল দাম তা'কে॥
হেন কালে গাড়ী ভোঁস ভোঁস করি'
ষ্টেশনহইতে ছাড়ে।
বিক্রেতা তখন ছোটে প্রাণপণ
দাম লইবার তরে॥
হুঁছোট খাইয়ে পড়িল গড়ায়ে
প্লাটফরমের শেষে।
হাত-পা ভাঙ্গিল, মাথাটী ফাটিল,
রামহরি দে'খে হাসে॥

শ্রীরামবংশ মাহিন্দার,
২২৮ নং রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া;
বয়স দ্বাদশ বৎসর,
হাওড়া জেলা স্কুল, ৫ম শ্রেণী।

"বালকে"র মোহিনী শক্তি।

হাওড়া-ষ্টেশন সুন্দর-দর্শন,
অনেক লোকের ভীড়।
কেহ বা চেঁচায়, কেহ বা বেড়ায়,
মুটে (রা) হাঁকিছে গভীর॥
ষ্টেশন কাঁপায়ে আসিল ধাইয়ে
বৃহৎ কলের গাড়ী।
হাতেতে "বালক" আসে বুড়া এক
তথা অতি ধীরি ধীরি॥
গ্রীষ্মের ছুটীতে যায় বালকেতে
নিজ নিজ দেশ-পানে।
"বালক" বেচিতে হাঁকিতে হাঁকিতে
আসে বুড়া সেইখানে॥
কোন ছেলে (তা) দে'খে গাড়ীহ'তে ঝুঁকে'
কিনিতে হাত বাড়া'ল।
লইয়া হাতেতে পড়িতে পড়িতে
তন্ময় হ'য়ে পড়িল॥
গাড়ী দিল ছেড়ে', বুড়া যায় দৌড়ে,
লাগিল দাম চাহিতে।
ছবি সে দেখিয়া বেহুঁস হইয়া
দিলা একটাকা (তা'র) হাতে॥

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ঘোষ।
(বয়স ১৫ বৎসর)
স্কটিশ চার্চেস্ কলিজিয়েট্ স্কুল।
দ্বিতীয় শ্রেণী, "ক"-বিভাগ।

* একটী স্থানের নাম।
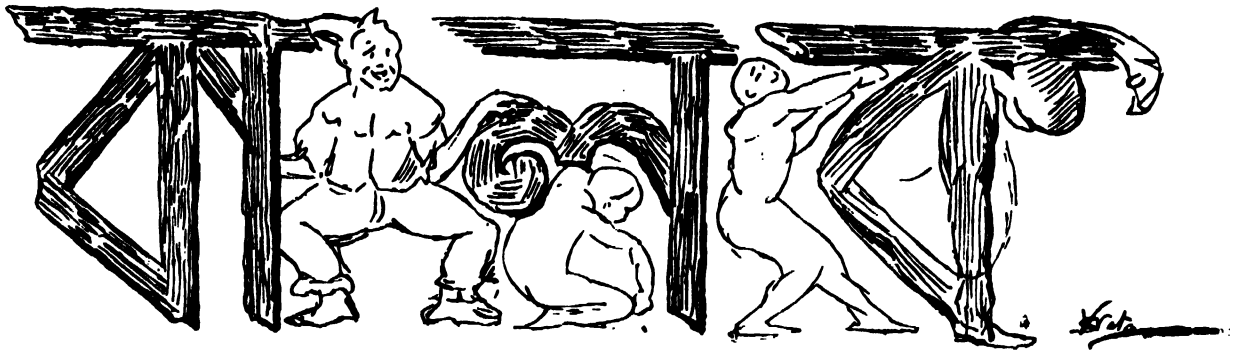
৩য় বর্ষ।] সেপ্টেম্বর, ১৯১৪। [৯ম সংখ্যা

জেনেরল গর্ডন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়।

চৈনিক গর্ডন।

আর্ম্মেণিয়াহইতে ফিরিবার একবৎসর পরে গর্ডন পরিখার ভারপ্রাপ্ত থাকিয়া নিজে যাহা শিখিয়াছিলেন, চ্যাথামে ভাবী পূর্ত্তবিদ্যাবিদ্‌দিগকে তাহাই শিখাইতে প্রবৃত্ত ছিলেন।

তাঁহার চ্যাথামে থাকিবার সময়ে কয়েকবৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডে ও চীনে যে সমর চলিতেছিল, তাহা গুরুতর ভাব-ধারণ করিল।

গর্ডন নিজ ইচ্ছাক্রমে তথায় কার্য্য করিতে চলিলেন; কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনদেশে পঁহুছিয়া দেখিলেন, যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাই তিনি বাড়ীতে চিঠী লিখিলেন,—"আমি দেরীতে আসিয়া পঁহুছিয়াছি, খেলা-শেষ হয় হয় হইয়াছে, ইহা শুনিয়া মা খুসীই হইবেন।" তিনি কিন্তু দেখিলেন, অনেক ইংরাজকে চীনারা পেকিনে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই কারাবদ্ধ ইংরাজ-দিগের মধ্যে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুও আছেন। ইংরাজ এবং তাঁহাদিগের সহিত যাঁহারা একযোগে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই পেকিনাভিমুখে যুদ্ধাভিযানপূর্ব্বক চীনাদিগের নিকটহইতে ইংরাজ-দিগের অবিলম্বে কারামুক্তির দাবী করিয়া বসিলেন।

চীনারা ইংরাজ-সেনা ও তাঁহাদের বড় বড় কামান দেখিয়া ভয়ে নগরদ্বার খুলিয়া দিল; কিন্তু কারারুদ্ধ ইংরাজদিগের অনেকেই বড় বিলম্বে সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চীনারা তাঁহাদের উপরে বড়ই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, অনেকেই যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

অগত্যা সহযোগী সেনাগণ চীনাদিগকে তাহাদের সেই ভয়ানক নিষ্ঠুরতার নিমিত্ত দণ্ড দেওয়া-ছাড়া আর বড় কিছু করিতে পারিলেন না। তাঁহারা চৈনিক সম্রাটকে বিশেষ করিয়া দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিলেন, কারণ তিনি তাঁহার চোকের উপর তাঁহার ক্রূরহৃদয় প্রজাবর্গকে ঐ নৃশংস আচরণ করিতে দিয়া-ছিলেন।

সম্রাট্ "আরব্য উপন্যাসে" বর্ণিত চৈনিক-সম্রাটের প্রাসাদের তুল্য এক মনোজ্ঞ ও সমৃদ্ধশালী প্রাসাদে বাস করিতেন। ইংরাজ সেনানী নিজ সৈনিকদিগকে সেই প্রাসাদটি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিতে আদেশ দিলেন।

চৈনিক সম্রাটের গ্রীষ্মাবাস-উৎসাদের পর গর্ডন বড়ই ব্যস্ত রহিলেন; তিনি তখন ইংরাজসৈনিকদিগের নিমিত্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে, যুদ্ধে যে সমস্ত চীনারা নির্য্যাতন-ভোগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে অর্থ-বিতরণ করিতে, তাহা-ছাড়া জরিপ ও আবিষ্কর-ণের কার্য্য করিতে থাকিলেন। ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি ও তাঁহার এক সঙ্গী, পূর্ব্বে ইউরোপীয়েরা যে সমস্ত স্থানে কখন যান নাই, সেই সমস্ত স্থান-আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহারা অনেক আপদ্-বিপদের মুখে পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু উহার অপেক্ষা বড় কাজ করিয়াই গর্ডন "চৈনিক গর্ডন" এই উপাধি-লাভ করেন। গর্ডন যখন বছর-দশেকের ছোট ছেলে, তখন হুং-সু-চুয়েন বলিয়া এক নীচজাতীয় গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক চীনদেশের লোকদিগকে বলে যে, ঈশ্বর তাহাকে [বলিয়াছেন

সে তৎকালীন সৈনিক সম্রাট্ ও শাসনকর্ত্তাদিগকে পরাভূত করিয়া চীনাদের শাসক ও রক্ষক হইবে।

শীঘ্রই সে তাহার দল পুষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার অধীন লোকেরা কেবল যে, তাহাকে রাজা বলিয়া মানিত, তাহা নহে, তাহারা তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজাও করিত। সে আপনাকে একজন "ওয়াং" অর্থাৎ রাজা বলিয়া পরিচিত করিত, তাহার দলভুক্ত লোকেরা তাহাকে "স্বর্গীয় নৃপতি" বলিত। সে তাহার দলস্থ কয়েক সহস্র লোককে শাসনকর্ত্তা করিয়াছিল, তাহারা সকলেও রাজোপাধি-গ্রহণ করিয়াছিল; এই লোকদের অধিকাংশই দলপতির আত্মীয় ছিল। তাহাদের আবার নিজেদের বিশেষ বিশেষ উপাধি ছিল; কাহারও উপাধি ছিল—"হরিদ্রা-ব্যাঘ্র," কাহারও উপাধি ছিল—"একচক্ষু কুক্কুর," কাহারও উপাধি ছিল— "কুক্কুট-নেত্র।" দলপতির গোষ্ঠীভুক্ত বিশহাজার চাষাভূষা লোক তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার দলে যোগ দিয়াছিল। তাহাছাড়া দেশে যত বোম্বেটে, ডাকাত, গুপ্ত সমিতির হিংস্রস্বভাব সভ্য, ও সেই দেশের যে সমস্ত লোকের রাজবিরুদ্ধে কাল্পনিক বা প্রকৃত কারণে কোন বৈরীভাব ছিল, তাহারা সকলেই হুং-স্যু চুয়েনের দলে যোগ দিয়াছিল।

শীঘ্রই ঐ বিদ্রোহীর দলে লক্ষাধিক লোক হইয়া উঠিল।

এই ভীষণাকৃতি বিদ্রোহিদলকে দেখিলে চীনের শান্তস্বভাব প্রজারা ভয়ে পলায়ন করিত।

ইহাদের নাম হইল টাএ-পিঙ্। ইহারা নিরীহ প্রজাকুলের গৃহ ও ধান্যক্ষেত্র ভস্মীভূত করিয়া তাহাদিগকে হত্যাপূর্ব্বক তাহাদিগের ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত, এবং জীয়ন্তে লোকদিগের গাত্রচর্ম্ম ছাড়াইয়া লইতে বা তাহাদের টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। ইহারা যথায়ই যাইত, তথাই তাবৎ বস্তু উৎসন্ন করিয়া ফেলিত। যাহারা ইহাদের হস্তহইতে পলাইয়া প্রাণ-রক্ষা করিত, তাহারাও পরে অনশনে পঞ্চত্ব পাইত। কোন কোন স্থানে এমনই খাদ্যাভাব ঘটিত যে, লোকে উদরের জ্বালায় শেষে নরভুক্ হইয়া পড়িত।

ইহারা একটি নগর ধ্বংসিত করে, সেই নগরের বিশহাজার অধিবাসীর মধ্যে একশত জনও রক্ষা পায় নাই।

এই বিদ্রোহীরা একসময়ে এইপ্রকার গর্ব্ব করিয়াছিল যে, "আমরা তাহাদের কাহাকেও ছাড়ি নাই, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে পর্য্যন্ত বধ করিয়াছিলাম; ঝাড়ে বংশে ধ্বংস করিয়াছিলাম; মৃতদিগের দেহ আমরা ইয়াংসীতে ফেলিয়া দিয়াছিলাম।"

৩৫০ ক্রোশ যুদ্ধাভিযান করিবার পর এই হত্যা ও লুণ্ঠনকারী প্রকাণ্ড দস্যুদল নানকিঙ্-নামে এক নগরে উপস্থিত হইল; এই নগরটী অধিকারপূর্ব্বক ওয়াঙেরা তাহাদের রাজধানী করিয়াছিল। ভয়ত্রস্ত কৃষকেরা সমুদ্রে[illegible] পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা তত্রত্য নগরসমূহে গিয়া আশ্রয় লয়। এই পলাতক প্রজাবর্গের অনেকেই সাংহাই-বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল; দস্যুদল সাংহাই-বন্দরটি ঘেরিয়া ফেলে। তাহারা তখন আরও অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলী-বারুদ চাহিতেছিল, এবং তাহারা জানিত যে, সাংহাই-বন্দরে তাহাদের সেই অভাবের প্রচুর পূরণ হইতে পারিবে। সাংহাই-বন্দরটি অধিকৃত করা তাহাদের পক্ষে এতই সম্ভবপর বোধ হইল যে, চীন-গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে-মাসে যে সমস্ত ইংরাজকর্ম্মচারী চীনাদের সাহায্য করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে গর্ডনও ছিলেন। বিদ্রোহীরা ভয়ানকভাবে যুদ্ধ করিতেছিল। ইংরাজ ও ফরাসীরা তাহাদের সাংহাইহইতে ১৫ক্রোশ দূরে তাড়াইয়া দিলেন। সরকারী পত্রে গর্ডনের উদ্ধতন কর্ম্মচারী বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন, "কাপ্তেন গর্ডন আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনে লাগিয়াছেন।" কিন্তু সেই পত্রে তিনি এই কথাও লিখিয়া পাঠান যে, "গর্ডন অতিসাহসিকতা-প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আমাকে বড় উদ্বিগ্ন হইতে হইতেছে, কারণ তিনি কোন বিষয়ের সন্ধান জানিবার নিমিত্ত শত্রুসৈন্যব্যূহের বড়ই নিকটে গিয়া পড়িতেছেন।" একবার তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে নৌকায় করিয়া যে নগরটি তাঁহারা আক্রমণ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। নগরের নিকটে পঁহুছিয়া গর্ডন সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটহইতে স্থলে নামিয়া স্থানটি ভাল করিয়া পরিদর্শন করিবার অনুমতি-প্রার্থনা করিলেন। স্থলে নামিয়া গর্ডন ক্রমশঃ নগরের নিকটহইতে নিকটতর হইতে লাগিলেন, তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া যাইতে লাগিল। গর্ডন কিন্তু এক গোপন-স্থলহইতে আর এক গোপনস্থলে ছুটিয়া ছুটিয়া গিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক "পাগোডার" পশ্চাতে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন, এবং সেখানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া নক্সা আঁকিতে ও মন্তব্য লিখিতে লাগিলেন। দেওয়ালহইতে বিদ্রোহীরা তাঁহাকে গুলী করিতে থাকিল, তাহাদের একদল লোক লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। তখন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া ডাকিয়া স্বরভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু গর্ডন প্রশান্তভাবে নক্সা-আঁকা-শেষ করিয়া ঠিক সময়ে নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

টাএ-পিঙেরা যাহাদের মারিয়া ফেলিত, তাহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাহাদের দলের সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইত। ইংরাজ ও টাএ-পিঙ্‌দের সহিত লড়াই হইবার পর বিস্তর এইরকম ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পথে কুড়াইয়া পাওয়া যাইত। গর্ডন লিখিয়া গিয়াছেন—"পলাইতে গিয়া একটি ছোট ছেলে খানায় পড়িয়া গিয়াছিল, আমি তাহাকে খানাহইতে তুলিয়া বাঁচাইয়াছিলাম, সে তাহার কর্দ্দমাক্ত হাত-পা-দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমার জামাটি খারাব করিয়া দিয়া পুরস্কৃত করে!"

• ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর-মাসে গর্ডন চীনদেশে ভাল করিয়া কার্য্য করার নিমিত্ত "মেজরের" পদে উন্নীত হন।

ঐ ঘটনার অত্যল্প কাল পরেই চৈনিক গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট টাএ-পিঙ্-বিদ্রোহীদিগকে দমন ও পরাভূত করিবার নিমিত্ত একজন ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারীকে ঋণস্বরূপে চান।

ইতোমধ্যেই চৈনিক সৈনিকেরা ইংরাজসেনানীদিগের দ্বারায় পরিচালিত হইতেছিল। সেই সেনানীদিগের একজনের নাম ছিল বারগেভিন, সে একজন দুর্ঘটনাপ্রিয় মার্কিণদেশীয় লোক, অর্থ ও সামর্থ্যলাভের নিমিত্ত সে সকলই করিতে প্রস্তুত ছিল। তাহার দলে সকল দেশের দুর্বৃত্ত লোকেরা আসিয়া যোগ দিয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহীদিগের ধনরত্নলুণ্ঠনপূর্ব্বক ধনী হইবার প্রত্যাশায় তাহার অনুচর হইয়াছিল।

অনতিবিলম্বেই চৈনিক শাসনকর্ত্তা লি হাং চাং বুঝিতে পারিলেন যে, বারগেভিনের উপর বিশ্বাস করা বিহিত নহে, তাই তিনি তাহাকে পদচ্যুত করিলেন।

এই সময়েই চৈনিক গবর্ণমেণ্ট একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে ঋণস্বরূপে দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের কাছে অনুরোধ করিয়া পাঠান। চৈনিকদিগের তখন যে সৈন্যদল ছিল, তাহারা আদৌ শিক্ষিত ছিল না; তথাপি তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার নিমিত্ত সেই সৈন্যদলের নাম দেওয়া হইয়াছিল, "চিরবিজয়িনী সেনা (চুণচেনচুন)।"

কিন্তু সেই সৈন্যদলের নাম "প্রায় পরাজিতা সেনা" দিলেই ঠিক হইত, বিজয়ী টাএ-পিঙেরা চৈনিক-সেনার ঐ নাম শুনিয়া হাসিত।

এই সৈন্যদের সেনাপতি হইবার কে উপযুক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে চীনে যে ইংরাজসেনাপতি কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

তিনি মেজর চার্লস গর্ডনের নাম করিয়া পাঠাইলেন, এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে গর্ডন ঐ সৈন্যদলের সেনাপতি হন। চীনারা তাঁহাকে "মান্দারিণ" এই উপাধিপ্রদান করেন।

গর্ডন জানিতেন, তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া-ছাড়া আর কাহারও দাসত্ব করিলে তাঁহার পিতা দুঃখিত হইবেন। তাই তিনি তাঁহার মাতাপিতাকে এইজন্য বিরক্ত না হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন; তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, এই কার্য্যটি করিবার পূর্ব্বে আমি গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছি।

তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই পদগ্রহণ করিয়া আমি চীনের হতভাগ্য প্রজাদের কষ্টের ও দুঃখের লাঘব করিতে পারিব। আমি যদি এই কার্য্য-ভার-গ্রহণ না করি, তাহা হইলে বিদ্রোহীরা বহুবৎসর ধরিয়া এই দেশময় অত্যাচার করিয়া বেড়াইতে পারে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গর্ডনের তাঁহার জননীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। তিনি এই সময়ে মাতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "তোমার ছবি আমি আমার চোকের সামনে রাখিয়াছি; আমি বাবাকে আর তোমাকে নিশ্চয় করিয়া লিখিতেছি যে, আমি

কোন বিষয়ে 'গোঁয়ার' হইব না। এই বিদ্রোহ-দমন করিয়া আমি যে, একটী ভাল কাজ করিতেছি, ইহাই আমার হৃদয়ের বিশ্বাস।"

তিনি এই সময়ে তাঁহার এক সৈনিক-বন্ধুকে এক পত্রে লেখেন,—"আমি আশা করি না যে, তুমি মনে করিতেছ, আমি এক চমৎকার সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছি; এই সৈন্যদলের মত ইতরলোকের জনতা তুমি কখন দেখ নাই। যদিও ইহাদের আমি অনেকটা ভাল করিয়াছি, তবুও এখনও অনেক বিষয়ে ইহাদের শোচনীয় ত্রুটি আছে। এখন সাধারণ সৈনিক ও সামরিক কর্ম্মচারীরা যদিও পরুষভাবাপন্ন এবং হয়ত একটু অভদ্রদর্শন, তথাপি আমি তাহাদিগকে চমৎকারভাবে শৃঙ্খলাধীন ও সংস্বভাব করিয়াছি।"

গর্ডন এই সৈন্যদলের ভার লইবার পূর্ব্বে, ইহারা কোন নির্দ্ধারিত বেতন পাইত না। যে সমস্ত নগর তাহারা অধিকার করিত, সেই সহরগুলিতে তাহাদিগকে লুট করিতে দেওয়া হইত, তাহাছাড়া প্রত্যেক নগরাধিকারের নিমিত্ত তাহারা কিছু কিছু পারিশ্রমিকও পাইত।

গর্ডন এই সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত হইবামাত্রই বিশৃঙ্খল সৈন্যদলকে সুশৃঙ্খল করিতে ব্যাপৃত হইলেন।

তিনি, সৈন্যেরা যাহাতে নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট বেতন পায়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন; এবং নিয়ম করিলেন, কোন স্থানাধিকার করিলে, তাহারা আর কোন অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাইবে না। অধিকৃত সহরে কাহাকেও লুট করিতে দেখিলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে। সামরিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেক দুর্বৃত্ত, মদ্যপ ও দুর্ঘটনাপ্রিয় বিদেশী লোক ছিল, তিনি তাহাদের ছাড়াইয়া দিয়া ইংরাজ সরকারহইতে অনেক সামরিক কর্ম্মচারীকে ঋণ-গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে ভাল করিয়া কুচ-কাওয়াজ শিখাইলেন। দুর্গবেষ্টিত স্থান কি করিয়া অধিকার করিতে হয়, তাহাও তিনি তাহাদিগকে শিখাইলেন। আর তিনি ছোট ছোট ষ্টীমার ও কামানপূর্ণ পোতের সমবায়ে একটী বহরও গঠিত করিলেন। ঐ ষ্টীমারগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পোত ছিল—"হাইসন।" কোন নদীর খাড়ীতে জল অল্প থাকিলে, সেখানেও এই ষ্টীমারটি উহার চাকার সাহায্যে চলিতে পারিত।

সৈন্যদিগকে উর্দ্দিও দেওয়া হইল; তাহাতে কেবল বিদ্রোহীরা নহে, চৈনিকেরা-পর্য্যন্ত সেই সৈন্যদলকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তাহারা তাহাদের "নকল বিদেশী সয়তান" এই নাম দিয়াছিল।

কিন্তু গর্ডনের এই নবগঠিত সৈন্যদল এত চমৎকাররূপে "চির-বিজয়িনী সেনা" এই উপাধির সার্থকতা-সাধন করিয়াছিল যে, তাহাদের উর্দ্দি দেখিলেই, বিদ্রোহীরা ভীত হইত।

একমাসের মধ্যে গর্ডনের সৈন্যদল আর 'ইতর লোকের জনতা' রহিল না, রীতিমত একটী সুগঠিত সৈন্যসম্প্রদায় হইয়া উঠিল।

টেট্সান বলিয়া একটী স্থানে গর্ডন তাঁহার তিনহাজার সৈন্য লইয়া দশহাজার বিদ্রোহীকে আক্রমণ করেন, তুমুল যুদ্ধান্তে বিদ্রোহীরা বিতাড়িত হয়।

টেট্সানহইতে বিজয়ী সৈন্যদল কুইন্সানে গমন করে; কুইন্সান একটী সুবৃহৎ দুর্গরক্ষিত নগর, উহা ঐ প্রদেশের রাজধানী সুচাওএর সহিত একটী সেতুদ্বারা সংযুক্ত। কুইন্সানের চতুস্পার্শ্বস্থ জনপদে খাল ও খাড়ী কাটা; কিন্তু গর্ডন সেই সমতল স্থলের তাবৎ খাল ও খাড়ী চিনিতেন। তিনি দেশী বা বিদেশী তাবৎ লোকের অপেক্ষা কোথায় জলা আছে, কোথায় সেতু আছে, কোন্খানটা শৈবালে আচ্ছন্ন, কোন্ খাল দিয়া সহজে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া যায়, তাহা জানিতেন। তিনি সুচাওস্থিত বিদ্রোহীদিগের সহিত কুইন্সানস্থিত বিদ্রোহীদিগের তাবৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

মে-মাসের একদা এক প্রত্যূষে কুইন্সানের বিদ্রোহীরা দেখিল, আশীটি নৌকা সামুদ্রিক পক্ষী যেমন ডানা মেলিয়া উড়িয়া যায়, তেমনই পাইল খাটাইয়া এবং বিবিধবর্ণের পতাকা উড়াইয়া খালগুলিদিয়া সহরের দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। সেই নৌবহরের মধ্যে হাইসন-ষ্টীমার অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে গর্ডন রহিয়াছেন।

দ্বিপ্রহরে তাঁহারা এক খাড়ীর এমন স্থানে পঁহুছিলেন, যে স্থানটি গোঁজদিয়া রক্ষিত। গোঁজগুলি তুলিয়া ফেলিয়া নৌকাগুলি তীরে গিয়া ভিড়িল, তাহার পর গর্ডন তাঁহার সৈন্যদলকে বিদ্রোহীদিগের খুঁটীর বেড়ার দ্বারা ঘেরা স্থানের নিকটে নামাইলেন। মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত টাএ-পিঙেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রাণ-ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। সেই খাড়ীতে অনেক নৌকা ছিল, বিদ্রোহীরা ভয়ে সেইগুলিহইতে লাফাইয়া লাফাইয়া পলাইয়া গিয়াছিল, নৌকাগুলি পাইল-তোলা অবস্থায় আপন মনে ভাসিয়া চলিয়াছিল, সুতরাং সেই নৌকাগুলিকে এড়াইয়া পথ করিয়া যাওয়া হাইসনের পক্ষে আদৌ সুকর হয় নাই। তথাপি সেই ক্ষুদ্র তরণীখানি আস্তে আস্তে সুচাওএর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। খালগুলির তীর দিয়া বিদ্রোহীরা নিরাপদ্ স্থানে পলাইতেছিল। হাইসন তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অগ্নিবৃষ্টি করিতে এবং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধুঁয়া উড়াইতে উড়াইতে ও তাহাদিগকে গুলী-গোলায়-জর্জ্জরিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মেষপালসহ যে কুকুর থাকে, তাহা যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া মেষদলকে তাড়াইয়া লইয়া চলে, হাইসন তেমনই বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। অনেক বিদ্রোহী খাল ও খাড়ীর তটে মরিয়া

পড়িয়া রহিল, অনেকে জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। দেড়শতজন বিদ্রোহীকে হাইসন বন্দী করিল।

যখন হাইসন সুচাওহইতে আধক্রোশেরও কম দূরে, তখন রাত্রি হইয়া পড়িল, তাই গর্ডন ফিরিয়া তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যদের সহিত মিলিত হইতে মনস্থ করিলেন। কতকগুলি বিদ্রোহী, হাইসন আর ফিরিবে না মনে করিয়া, ফের তাহাদের নৌকায় ফিরিয়া স্ফূর্ত্তিপূর্ব্বক নৌকাগুলি বাহিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে তাহারা হাইসনের লাল ও সবুজ আলো দেখিতে ও শিটি শুনিতে পাইল।

তখন পরাভব-স্বীকার করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইতেছিল, এমন সময়ে হাইসন অন্ধকারে শিটি দিতে দিতে আসিল। গর্ডনের সৈন্যদল কর্ণবিদারকারী চীৎকারসহ তাহার অভ্যর্থনা করিল, তাহাতে বিদ্রোহীরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলাইয়া গেল। হাইসন খাড়ী দিয়া কুইন্‌সানের দিকে অগ্রসর হইল, তখন গর্ডন দেখিলেন, একটা উচ্চ সেতুর কাছে অনেক লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখন এত অন্ধকার যে, কিছুই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না, তথাপি হাইসন শিটি দিল। তাহাতে তখনই সেই ভড়ংড় লোকগুলির কণ্ঠহইতে ভয়ব্যঞ্জক চীৎকার-ধ্বনি নিঃসৃত হইল। উহা কুইন্‌সানের

হাইসনের ঐ বাতি দেখিয়া ও শিটি শুনিয়াই, বিদ্রোহীরা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। অন্ধকারে পলাতক বিদ্রোহীরা দেখিল, অন্য বিদ্রোহীরা তাহাদের দলবৃদ্ধি করিতে আসিতেছে। তখন যে গোলমাল আরম্ভ হইল, তাহাতে হাইসন তাহাদিগকে গুলী-গোলাদ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে লাগিল। রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে হাইসনের আরোহীরা শুনিল, কুইন্‌সানের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামহইতে ভয়ানক চীৎকার ও জয়ধ্বনি হইতেছে। কুইন্‌সানে পঁহুছিয়া বিদ্রোহীরা থামিয়াছে, গর্ডনের কামান-পোতগুলি পাথরের দুর্গটির উপর অগ্নিবর্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে তাহা-হইতে কড়-কড়-শব্দ ও অগ্নি নিঃসৃত হইল, বিদ্রোহীরা তাহাতে ভয়ানক বীভৎসভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল। কামান-পোতগুলি

বিদ্রোহী সৈন্যদল, উহারা সংখ্যায় ৭।৮ হাজার ছিল, সুচাওএ পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ভয়ে তাহারা ছোড়ভঙ্গ হইয়া চারি-দিকে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল—৮০০০ লোক ৩০ জন লোকের ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল। হাইসন তাহাদের প্রতি অতি অল্পবারই গুলী গোলা ছুড়িয়াছিল, তথাপি সে রাত্রিতে বিদ্রোহীদের ৩।৪ হাজার লোক হত, জলে নিমজ্জিত বা কারারুদ্ধ হয়। তাহাছাড়া তাহারা তাহাদের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও অনেকগুলি নৌকা খোয়ায়।

পরদিন উষাকালে গর্ডন ও তাঁহার সৈন্যদল কুইন্‌সান দখল করেন। তাঁহারা প্রায় এক প্রত্যুষহইতে আর এক প্রত্যুষপর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। গর্ডন চিঠীতে লেখেন, "বিদ্রোহীরা পূর্ব্বে কখন এত প্রহারিত হয় নাই।"

এই যুদ্ধ-ফল দেখিয়া "চিরবিজয়িনী সেনা" আত্মপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের নায়কের কথা ভাবিয়া অতিশয় গর্ব্বানুভব করিতে লাগিল ; কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, তাহারা যে সমস্ত জিনিস লুট করিতে পারিয়াছিল, তৎসমুদয় বিক্রয় করিবার জন্য তাহাদের মনোমত কোন একটি সহরে তাহারা যাইতে পাইবে না, তাহাদিগকে কুইন্‌সানেই থাকিতে হইবে, তখন তাহারা গর্ডনের উপর চটিয়া উঠিল।

তাহারা এক ঘোষণা-পত্র জাহির করিল যে, সেনাপতি যদি তাহারা যে সহরে যাইতে চায়, সেখানে তাহাদের না যাইতে দেন, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে কামানের গোলা-দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিবে। গর্ডনের এরূপ নিশ্চিত ধারণা হইল যে, নিম্নপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীরা এই অনিষ্ট-চেষ্টার মূলে আছে। তিনি সেই সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার সম্মুখে সারিদিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করিলেন, তাহার পর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যদি কে ঐ ঘোষণাপত্র-রচনা করিয়াছে, তাহা তাহারা তাঁহাকে না বলিয়া দেয়, তবে তিনি তাহাদের প্রত্যেক পাঁচজনের মধ্যে একজনকে গুলী করিয়া মারিবেন। তাহাতে তাহারা গর্ডনকে কি নৃশংস লোক ভাবিয়াছে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল। একজন হাবিলদার অন্য সমস্ত কর্ম্মচারীর অপেক্ষা বেশী জোরে জোরে গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল। গর্ডন অগ্নি-বর্ষী নয়নে তাহার দিকে তাকাইলেন। এই ব্যক্তিই যে কথিত বদমায়েসীর সর্দ্দার, এ বিষয়ে তিনি এতই নিশ্চিত হইলেন যে, তাহাকে তিনি নিজের হাতে দলের মধ্যহইতে টানিয়া আনিলেন।

অতঃপর তিনি তাহার দুইজন দেহরক্ষককে কহিলেন, "এই লোকটাকে গুলী করিয়া মার।" সৈনিকেরা তাহাকে তাগ্‌ করিয়া গুলী করাতে হাবিলদারটা মরিয়া পড়িয়া গেল।

অন্য অন্য নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে তিনি একঘণ্টার নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কহিলেন,—"একঘণ্টার পরও যদি তোমরা নিজ নিজ উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশানুবর্ত্তী না হও, এবং যে সেই ঘোষণাপত্রটি লিখিয়াছে, তাহার নাম না বলিয়া দাও, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যহইতে প্রত্যেক পঞ্চম ব্যক্তিকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিব।"

একঘণ্টার পর প্রত্যেক নিম্নতন কর্ম্মচারী বশ্যতা-স্বীকার করিল, তাহাছাড়া যে লোকটি ঘোষণাপত্রখানা লিখিয়াছিল, তাহার নামও বলিয়া দিল। সেই লোকটা ইতঃপূর্ব্বে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিল ; যে লোকটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চেঁচাইয়া গোঁ গোঁ করিয়াছিল, সে-ই সেই ঘোষণাপত্রখানা লিখিয়াছিল।

গর্ডনের সেনামধ্যে বিদ্রোহাচরণের ইহাই একমাত্র নিদর্শন নহে। তাঁহার কর্ম্মচারীরা একাধিকবার বিদ্রোহাচরণ করিয়া তাঁহাকে মনঃপীড়া দিয়াছিল। সেনাপতি চিঙ্‌-নামে একজন চৈনিক-সেনানী তাঁহাকে হিংসা করিত। চিঙ্‌ একদিন গর্ডনের দেড়শত সৈনিকের উপর গুলী করিবার আদেশ দেয়, গর্ডন ক্রুদ্ধ হইলে, চিঙ্‌ তাহা রহস্য বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে গর্ডন তাঁহার সৈনিকদিগের নিকটে প্রতিশ্রুত হন যে, তাহারা নিয়মিতরূপে বেতন পাইবে, আক্রান্ত নগর-লুণ্ঠন করিতে পাইবে না ; তাঁহার নিজবেতন ও তদতিরিক্ত অর্থ সৈনিকদিগকে বেতন দিতে ও দরিদ্রদিগকে দান করিতে ব্যয়িত হইয়া যায়। পরে লি হাঙ্‌ চাঙ্‌ বলেন যে, তিনি সৈন্যদিগকে বেতন দিতে পারিবেন না এবং চিঙ্‌ যখন বন্দীদিগের জীবন-নাশ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার পর প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করে, তখন গর্ডন-ছাড়া আর কেহই বড় ভ্রূক্ষেপ করে নাই।

যাহাদের হইয়া গর্ডন লড়িতেছেন, তাহাদের মধ্যে এইপ্রকার অসত্যবাদিতা ও আত্মসম্মানের অভাব দেখিয়া গর্ডন চৈনিক-সেনার অধিনায়কতা ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন।

এই সময়ে কিন্তু সেই দুর্ঘটনাপ্রিয় বারগেভিন আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিল। সে তাহারই মত কতকগুলি গোঁয়ার লোককে তাহার দলভুক্ত করিয়া লইয়া বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিল। বিদ্রোহীরা তাহাকে একজন ওয়াঙ্‌ বা রাজা করিল, তখন সে তাহার তাঁবে যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের এত বেশী বেতন দিবার লোভ দেখাইতে লাগিল যে, গর্ডনের অসন্তুষ্ট সৈনিকেরা তাঁহার অধীনতা-ত্যাগ করিয়া বারগেভিনের দলভুক্ত হইতে লাগিল।

বারগেভিন ও তাহার অনুচরদিগের সাহায্য পাইয়া বিদ্রোহীদল সবিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিল, তখন ব্যাপারটি বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল!

বিদ্রোহীরা যে, অবাধে নিরীহ প্রজাব্রজের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়াইবে, ইহা গর্ডন সহ্য করিতে পারিলেন না ; তাই তিনি সেনাবিভাগের অধিনায়কতা না ছাড়িয়া "চিরবিজয়িনী সেনা-" সহ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়া পুনরায় জয়যুক্ত হইয়া ফিরিলেন।

(ক্রমশঃ।)

দু'টি পারসিক গল্প

ইস্পাহানের চোর।

শিরাজবাসী একটি লোক ইস্পাহানের চোরদের কুখ্যাতির কথা শুনিয়া, তাহারা কেমন চতুর চোর, তাহা পরীক্ষা করিতে ইস্পাহানে আসিল। কতকগুলি চক্রাকৃতি নীল-রঙের সানকী-ভাঙা যোগাড় করিয়া একটি থলিয়ায় পূরিয়া জামার বুকপকেটে রাখিয়া সে বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঐ সান্‌কী-ভাঙাগুলি পারসিক মুদ্রার মত ভারি ও এক ডৌলের ছিল।

রোজ রাতে সে থলিয়াহইতে ঐ কৃত্রিম মুদ্রাগুলি বাহির করিয়া গণিয়া দেখিত, যতগুলি ছিল, ঠিক ততগুলিই আছে। অবশেষে যে দিন সে ইস্পাহান ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, সে দিন এক বাজারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার অশ্বতরটির পীঠে মাল-বোঝাই করাইতেছিল। তখন তাহার সেই কৃত্রিম মুদ্রার থলিয়ার কথা মনে পড়িল। তাই সে সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল,— "আমি শুনেছিলেম, ইস্পাহানের লোকেরা চুরীবিদ্যায় পটু, কিন্তু আজ দশদিন আমি একশো টোমানস্ (পারসিক-মুদ্রা) পকেটে করিয়া ঘুরিতেছি, কেউ তো তা' নিতে পা'র্‌লে না।"

খালি পা, ছেঁড়া-কাপড়পরা এক ছোক্‌রা বলিয়া উঠিল,— "মিঞা-সায়েব! তোমার ও সান্‌কীভাঙাগুলো মুলুকে গিয়ে খরচ ক'র। আমি দশবার তোমার পকেটথেকে থ'লেটা তুলে' নিয়েছি, দশবার ফের রেখে দিয়েছি!"

শুনিয়া ত মিঞাসাহেবের চক্ষুস্থির, একটা ছোট ছোক্‌রা যদি এমন চোর হয়, তবে এখানকার জোয়ান মানুষগুলো না জানি কেমন হ'বে!

২

"কাটাঘায়ে নুণের ছিটে!"

একজন অন্যমনস্ক লোক একটা গাধার মুখে লাগাম লাগাইয়া এক বাজারের ভিতর দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। বাজারে লোক ভরা, লোকটি অন্যমনস্কভাবে সাগ্রহে বাজারের বেচা-কেনা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে—গাধাটি তাহার পাছু পাছু যাইতেছে।

দুই চোর গাধাটিকে সরাইবার মতলব করিল। একজন গিয়া গাধাটিকে রজ্জুমুক্ত করিয়া পশ্চাদ্দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। আর একজন সেই লাগাম ধরিয়া লোকটির পিছু পিছু চলিল, মাঝে মাঝে সে, গাধা যেমন হেঁচ্‌কা দিতেছিল, তেমনি লাগামে একটু একটু হেঁচকা দিতে লাগিল।

খানিক দূর গিয়া অন্যমনস্ক লোকটি ফিরিয়া দেখে, গাধা নাই, তাহার বদলে একটা মানুষ লাগাম ধরিয়া তাহার পিছনে পিছনে আসিতেছে—দেখিয়া সে হতভম্ব! কিন্তু লোকটি কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই চোরটা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "মিঞা-সাহেব, আর কতদূর এমন ক'রে যেতে হ'বে? হয় দাম দাও, দিয়ে লাগাম নাও, আর না হয় আমায় রেহাই দাও।"

লোকটি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া লোকদের বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, সেই লাগামে তাহার গাধা বাঁধা ছিল, চুরী গিয়াছে, লাগাম তাহারই, কিন্তু তাহা শুনিয়া পথের যত লোক কেবল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কেহ তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না। চোর পথের লোকদের বুঝাইল যে, লোকটি লাগাম কিনিতে চাহিয়াছিল, দর ঠিক হয় নাই, তাই সে লাগাম হাত-ছাড়া করে নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া, তাহার লাগাম যাহাতে সে-ই পায়, তাহার ব্যবস্থা করুন।

অন্যমনস্ক লোকটি তখন নিরুপায় হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাগাম চোরকে ছাড়িয়া দিল। চোরেরা গাধা ও লাগাম দুই-ই হাতাইল!

কূর্ম্ম-শিকার।

ফ্লোরিডা-প্রায়োদ্বীপের সহিত সংযুক্ত প্রবাল-শৈলের মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড বাদায় আমরা নৌবিহার করিতেছিলাম; যে লোকটি নৌকাটিকে লগী-দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল, সে একপ্রকার ইসারা করিয়া নৌকাটি থামাইল। তখন যে সমস্ত ছোক্‌রারা জলে হাঁটিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, তাহারা আস্তে আস্তে নৌকায় আসিয়া উঠিল। সাম্‌নে, সম্ভবতঃ ৫০ ফুট দূরে, জলতলে একটা কৃষ্ণ চিহ্ন দেখা যাইতেছিল, তাহা আর কিছু নয় একটা কচ্ছপ ঘুমাইতেছিল।

লগাদিয়া আস্তে আস্তে ঠেলিয়া নৌকাখানিকে ঘুমন্ত কচ্ছপটির কাছে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার জাগিয়া উঠিবার ভয় ছিল, কারণ কয়েক মুহূর্ত্তের অন্তরে সে নিশ্বাস লইবার নিমিত্ত জলোপরি ভাসিয়া উঠিতে বাধ্য; তাহার পর আবার সে জলতলে গিয়া ঘুমায়। নৌকাখানি যখন কচ্ছপটির আর ১৫ ফুট মাত্র দূরে, তখন একজন ছোক্‌রা আস্তে আস্তে নৌকাহইতে নামিয়া জলে ডুব দিয়া কচ্ছপের দিকে ছুটিয়া গেল এবং সেই অচেতন জীবের পীঠের খোলার যেখানটা মাথার পিছনে বাহির হইয়া আছে, সেইখানটা আঁকড়িয়া ধরিল।

কচ্ছপটা সবুজরঙের, খুব বড়, গায়ে খুব বল। ছোক্‌রার

স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া সে তাহার সামনের পাখ্‌না চাকার মত ঘুরাইয়া জলের উপরে উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া সে তাড়াতাড়ি একটা নিশ্বাস লইয়া ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটিয়া আবার জলে ডুবিয়া গেল।

প্রায় এক মিনিটটাক কূর্ম্মপ্রবর বালককে জলে ডুবাইয়া রাখিল, তাহার পীঠের উপর বসিয়া রহিল, এবং কখন এ-হাত কখন বা ও-হাত দিয়া তাহার পীঠের খোলা আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে লাগিল, কিছুতেই তাহাকে ছাড়িল না।

কচ্ছপটা ছোক্‌রাকে ৩।৪ বার জলে ডুবাইল, তাহার পর যখন সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন ছোক্‌রা কচ্ছপের পিচ্ছল পীঠে হাঁটু

কিন্তু বালক নাছোড়বন্দা, তাহাকে ছাড়িল না। তাহার পর কচ্ছপ আবার জলোপরি ছুটিয়া আসিল, তখন কচ্ছপের ফোঁশ্-ফোঁশ্-শব্দের সহিত বালকের হাঁফানীর শব্দ মিশ্রিত হইতেছিল। শঙ্কিত কূর্ম্ম আবার ত্বরিৎ বেগে জলে ডুবিয়া গেল, বালক তখনও রাখিয়া উঠিয়া বসিল, তাহাতে কচ্ছপটা বশীভূত হইয়া পড়িল। নৌকা নিকটস্থ হইলে, সে কয়েকবার বিবিধদিকে বৃথা লম্ফ-ঝম্ফ দিল, কিন্তু তাহাকে শীঘ্রই নৌকায় তুলিয়া ফেলা হইল।

রাসভের রস-কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঐ ঘটনার কয়েকদিন পরে পরের গ্রামে একটা মেলা বসিল। আমার মনিবের নাতিনাতিনীদের তাহাদের মাতাপিতারা মেলা দেখাইতে লইয়া যাইবেন। সবসুদ্ধ ১৫টি ছেলেপিলে হইল। আমার পীঠে পোনা চড়িয়া মেলা দেখিতে চলিল। অন্য সকল ছেলেমেয়েরা হাঁটিয়া বা গরুর গাড়ী চড়িয়া চলিল।

মেলায় পঁহুছিয়া শুনিলাম, সেখানে আমার একজন জ্ঞাতি চমৎকার খেলা দেখাইতেছে।

পোনা বলিল,—"বাবা, আমাকে গাধার খেলা দেখাও।"

পোনার বাবা বলিলেন,—"আচ্ছা চল, কিন্তু সে গাধাটা আমাদের "গাধু"র মত চালাক হ'বে কি ?"

এই ভদ্রলোকটির মুখে আমার সুখ্যাতি শুনিয়া আমি বড় খুশি হইলাম। ছেলেদের সঙ্গে আমিও আমার স্বজাতির 'কেরামতি' দেখিতে চলিলাম।

ছেলেদের বেঞ্চে বসান হইল, আমি তখন বেঞ্চের একধারে চোরের মত দাঁড়াইয়াছিলাম। বাজীকর একটা গাধাকে লইয়া খেলা দেখাইতে বেঞ্চগুলির সম্মুখে আসিল। গাধাটা যেন মড়া-খেকো, সে খেলা দেখাইবে কি ? তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, অনেকদিন অনাহারে আছে !

পোনা বলিয়া উঠিল,—"ওমা এই গাধা ? এ আবার কি বাজী দেখা'বে ? এর চেয়ে আমাদের 'গাধু' চালাক।"

আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম, তাই পোনাকে আমার প্রশংসা করিতে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, যদি আমি আমার বুদ্ধি ঐ ঘীয়ে ভাজা গাধাটার চেয়ে যে, ঢের বেশী, তাহা না দেখাইতে পারি, তবে আর আমি আমার বুদ্ধির জাঁক করিব না। যেখানে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখানহইতে গিয়া বেঞ্চগুলির সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

বাজীকর বক্তৃতা যুড়িয়া দিল,—"বাবুসব ! আমার এ খেলারামকে দেখে আপনাদের পচন্দই হ'বে না যে, এর সিকিভরিও আক্কেল আছে, কিন্তু, বাবুসব, আপনাদের দোয়ায় আর ওস্তাদের ওস্তাদিতে আপনাদের গোলাম দেখা'বে যে, খেলারাম সামান্যি গাধা নয়, এর বহুত আক্কেল। এর মত আক্কেলবন্দ গাধা দুনিয়ায় আর একটিও নেই। চলা আও, মেরা বেটা খেলারাম, সালাম, সালাম, বাবুন্দের সালাম কর।"

গাধাটা দুই-এক-পা আগাইয়া গিয়া বিরসমুখে হাঁটু গাড়িয়া বাবুদের সেলাম করিল। দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল, আরে এ হাঁদা গাধাটাকে খেলোয়াড়ী তো দড়ি-দিয়া টানিয়া টানিয়া সব কাজ করাইতেছে, এর আবার আক্কেল কোথায় ? আমি মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিলাম যে, খেলা-শেষ হইবার আগেই এই জুয়াচোর খেলোয়াড়ীকে উচিতমত শিক্ষা দিয়া ছাড়িব।

"হয়েছে, হয়েছে, খেলারাম, তুই তবে আদব-কায়দা জানিস আচ্ছা, এইবার রুমালখানা নিয়ে এই মেলার মধ্যে সব্‌সে খাবসুরত যে বিবি আছে, তা'কে দে।"

গাধাটা খেলোয়াড়ীর হাতহইতে একখানা লাল রুমাল মুখে করিয়া লইয়া এক কোণে এক বুড়া "কেলে কিষ্টে" মাগী বসিয়াছিল, তাহার কোলে গিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার হাতে এক ডেলা গুড় ছিল! সে সেই খেলোয়াড়ীর বিবি! দেখিয়া আর আমি সহিতে না পারিয়া বুড়ীর কোলহইতে রুমালখানা তুলিয়া লইয়া একটি বেশ টানা টানা চোক ফুটফুটে মেয়ে বসিয়াছিল, তাহার কোলে গিয়া রাখিয়া দিলাম। দর্শকেরা উল্লাসে হাততালি দিতে লাগিল। সকলেই তখন আমার রুচি ও বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া, আমি কাহার গাধা, তাহা খোঁজ করিতে লাগিল। তাহাতে খেলারামের মুনিব অবশ্য প্রসন্ন হইল না ; কিন্তু খেলারামের সে সব দিকে লক্ষ্য নাই, আমি তখন ভাবিতে লাগিলাম, এ গাধাটা কি বোকা, এটা গাধাধম !

দর্শকেরা চুপ করিলে, খেলোয়াড়ী চীৎকার করিয়া বলিল,—"খেলারাম, যে সবচেয়ে খাবসুরত বিবি তাঁনারে তুমি বাবুদ্দের পয়চান করিয়ে দিয়োচো, এবার কে সবচেয়ে হাঁদারাম, তা' বাবুদ্দের বাংলে দেও।" এই বলিয়া সে তাহার মুখে একটা রঙ-বিরঙের কাগজের তৈয়ারী "বোকার টুপী" ধরাইয়া দিল।

খেলারাম তাহা লইয়া এক ভোঁদা, শূয়োরমুখো ছেলে বসিয়াছিল, তাহার মাথায় পরাইয়া দিল। আমি দেখিয়াই বুঝিলাম; ছেলেটা খেলোয়াড়ীরই, কারণ দু'জনকার মুখের ভাব একই রকমের! ভাবিলাম, রহ, এইবার তোমায় ঠিক করিতেছি। এই ভাবিয়া কেহ আমাকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই আমি টুপীটা মুখে করিয়া লইয়া খোদ খেলোয়াড়ীরই পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া তাহাকে চারিদিকে ঘুরাইতে লাগিলাম। দর্শকেরা হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ খেলোয়াড়ী পা পিছলিয়া হাঁটুর উপর ভর দিয়া পড়িয়া গেল, আমি সেই সুযোগে তাহার মাথায় টুপীটা পরাইয়া দিয়া পা-দিয়া বেশ করিয়া থাবড়াইয়া দিলাম, তাহাতে তাহার চিবুকপর্য্যন্ত সেই টুপীতে ঢাকিয়া গেল।

খেলোয়াড়ী তখন রাগিয়া গালিগালাজ করিতে লাগিল, টুপীটা মুখহইতে খুলিয়া ফেলিবার জন্য এদিকে ওদিকে লাফ-ঝাঁপ দিতে লাগিল, আমি তাহার পিছনে থাকিয়া দুই পা তুলিয়া তাহার অঙ্গ-ভঙ্গীর ঠিক নকল করিতে থাকিলাম। লোকেরা তখন হাসিতে হাসিতে পেটে খিল্ ধরাইয়া ফেলিল। বলিতে লাগিল,—"বাহোবা, বাহোবা, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক, তুমিই, বাবা, আসল খেলারাম!"

ইহার পর আর খেলোয়াড়ীর খেলা দেখান চলিল না। সমস্ত লোক আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া আমার পীঠ চাপ্‌ড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার পীঠ বাঁচান দায় হইল। আমাদের গ্রামের লোকদের মনে ভারি অহংকার হইল। তাহারা দর্শকদের কাছে আমার প্রশংসাসূচক এত সব মিথ্যা ও আজগুবী গল্প বলিতে লাগিল যে, শুনিয়া আমি মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। শেষে চারিপাশে এত লোক জমা হইল যে, আমার নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট হইতে লাগিল। তখন আমি অগত্যা তাহাদের তাড়াইবার নিমিত্ত কামড়াইবার ও চাট মারিবার ভাণ করিতে লাগিলাম। লোকেরা ভয়ে সরিয়া গেল, তখন আমি ফাঁক পাইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। পোনা-টোনা আগেই চলিয়া গিয়াছিল, আধক্রোশ-পথ ছুটিয়া গিয়া আমি তাহাদের নাগাল ধরিলাম। তখন পোনা আবার আমার পীঠের উপর সওয়ার হইল। সেদিন বাড়ীতে আমার আদর দেখে কে?

কিন্তু সমস্ত হাঙ্গাম চুকিয়া গেলে, আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, খেলোয়াড়ীর উপর চালাকী খেলিয়া আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি, বেচারার অন্ন মারিয়াছি। (ক্রমশঃ।)

টেলিফোন

আমরা কথা কহিলেই, হাওয়া কাঁপিয়া উঠে,—ভিন্ন ভিন্ন কথায়, হাওয়া ভিন্ন ভিন্ন-রকমে কাঁপে। হাওয়ার এই কাঁপুনি-গুলিকে আমরা হাওয়ার ঢেউ বলি। কিন্তু বিদ্যুতের ঢেউ কোন আওয়াজকে যতদূরে ও যত তাড়াতাড়ি বহিয়া লইয়া যাইতে পারে, হাওয়ার ঢেউ তত দূরে বা তত তাড়াতাড়ি বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না, তাই আমরা হাওয়ার ঢেউকে বিদ্যুতের ঢেউএ বদলিয়া লইবার জন্য টেলিফোন-যন্ত্র-ব্যবহার করি। জিবহইতে কাণে আওয়াজ পঁহুছিতে যত সময় লাগে, তাহার অপেক্ষা অল্প সময়ে ঐ বিদ্যুতের ঢেউগুলি টেলিফোনের তার দিয়া আওয়াজকে কাণে পঁহুছাইয়া দেয়। টেলিফোন-যন্ত্রের বার্ত্তাপ্রেরকে (Transmitter) মুখ লাগাইয়া যখন আমরা কথা কহি, তখন টাকার-আকার একটি লোহার চাকৃতি হাওয়ার ঢেউকে বিদ্যুতের ঢেউএ বদলিয়া দেয়, সেই বিদ্যুতের ঢেউটি তারদিয়া অন্য টেলিফোন-যন্ত্রটির লোহার চাকৃতিতে গিয়া লাগে। সেই চাকৃতিতে লাগিয়া বিদ্যুতের ঢেউটি আবার হাওয়ার ঢেউ হইয়া পড়ে, এবং যে আওয়াজটিতে ঐ ঢেউটি হইয়াছিল, ঠিক সেইরকম একটী আওয়াজ বাহির করে। আমাদের মুখদিয়া যে কথাটি বাহির হইয়াছিল, ঐ আওয়াজটিতে সেই কথাটিই শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের মুখের কথায় একটি চাকতিতে ঘা পড়ে, তাহাতে বিদ্যুতের ঢেউ হয়, সেই বিদ্যুতের ঢেউটি আবার অন্য চাকতিতে গিয়া ঠেকিলে, হাওয়ার ঢেউ হইয়া কথাটিকে ফুটাইয়া তুলে; দুই চাকৃতিতেই এক সুর বাঁধা আছে, তাই ঢেউএর ঘায়ে দুই চাকৃতিহইতে একইরকম শব্দ বাহির হয়।

যে সমস্ত লোক ব্যোমযানে চড়িয়াছেন, তাঁহারা আমাদের বলেন, যতই তাঁহারা ক্রমশঃ আকাশে উঠিতে থাকেন, ততই মানুষের গলার আওয়াজ কম শুনিতে পান, তখন তাঁহারা কেবল কুকুরের ঘেউ-ঘেউ-শব্দই শুনিতে পান; তাহার পর, যখন তাঁহারা আর কুকুরের ঘেউ-ঘেউও শুনিতে পান না, তখন রেলগাড়ীর এঞ্জিনের শিটির আওয়াজ শুনিতে পান। এই শিটির আওয়াজ যে, সবচেয়ে দূরে যায়, এটি একটী বড় আশ্চর্য্য কথা; কিন্তু টেলি-ফোন-যন্ত্রটি বাষ্পীয় যানের অপেক্ষাও আশ্চর্য্য জিনিস, কারণ টেলিফোন কেবল যে কোন আওয়াজকে অনেক দূরে বহিয়া লইয়া যায়, তাহা নহে, মানুষের গলার আওয়াজ, তাহার কথা, তাহার হাসিপর্য্যন্ত অনেক ক্রোশ দূরে বহিয়া লইয়া যায়!

একটি তারে তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছে, আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? যদি তুমি কেবল একটা ফুস্ ফুস্ বা বিড়-বিড়-আওয়াজ শুনিতে পাইতে, তাহা হইলে ব্যাপারটা তত তাজ্জব ঠেকিত না, কিন্তু তার তোমার সঙ্গে এমন সকল কথা কয়, যাহা তুমি বেশ বুঝিতে পার, সেই কথাগুলির বেশ মানে আছে, সেই কথাগুলি শোনা তোমার দরকার। সুধু কি তাই? যে লোক হয়ত সাত-ক্রোশ তফাৎহইতে, তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছে, তাহার গলার আওয়াজটিপর্য্যন্ত তার ঠিক হুবহু বহিয়া আনিতেছে। সেই আওয়াজ শুনিয়া তাহা তোমার বাবার কি মার কি খুড়ার কি ভাইএর গলা, তাহাও তুমি চিনিতে পার।

বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার, এখন এস চেষ্টা করিয়া দেখা যা'ক, এটি কেমন করিয়া হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি কি না।

তুমি যদি তোমার মুখে হাত দিয়া কথা কও, তাহা হইলে তুমি অনুভব করিতে পারিবে, গরম হাওয়া তোমার হাতে আসিয়া লাগিতেছে। তোমার জিব ও ঠোঁট-দু'টি নাড়ার ফলে হাওয়া নড়িয়া উঠে, এই নড়নকে হাওয়ার ঢেউ বলে, কারণ হাওয়া

নড়িয়া সমুদ্রের ঢেউএর মত গড়াইয়া যাইতে থাকে। এই আওয়াজের ঢেউগুলি আসিয়া আমাদের কাণের ভিতরকার পাতলা চামড়ায় লাগে বলিয়া আমরা আওয়াজ শুনিতে পাই। টেলিফোন-যন্ত্র আমাদের মুখহইতে এই শব্দের ঢেউগুলিকে আপনার মধ্যে লয়, তাহার পর তার দিয়া সেই ঢেউগুলিকে বহিয়া লইয়া গিয়া যেমন যেমন আওয়াজ হইয়াছিল, ঠিক তেমনই তেমনই আওয়াজ টেলিফোনের অপরদিকে যিনি আছেন, তাঁহার কাণে পঁহুছাইয়া দেয়! আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আওয়াজগুলি ঐ যন্ত্রটি যেমন পায়, তেমনই ফিরাইয়া দেয়। কোন একটি যন্ত্রদ্বারা মানুষেরা দিবে, কারণ বাতাসের ঢেউয়ের চেয়ে বিদ্যুতের ঢেউ ঢের বেশী তাড়াতাড়ি চলে। তবেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ, টেলিফোনের তার কথা বহিয়া লইয়া যায় না; উহা "কেমন আছ?", "ভাল আছি"—এইরকম সব কথা বহিয়া লইয়া যায় না। তুমি যদি দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে দেখিতে, কোন বইএর পাতা ভাল করিয়া কাটিতে না পারিলে যেমন খর্‌খরে হয়, ঐ ঢেউগুলি তেমনই খর্‌খরে ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। টেলিফোনের তার, কথা নয়, ঢেউ বহিয়া লইয়া যায়; কিন্তু টেলিফোনের অন্য দিকে যিনি থাকেন, তিনি ফুস্‌ফুস্‌-আওয়াজ নয়, বেশ স্পষ্ট শোনেন, "কেমন

কলিকাতা টেলিফোন কার্য্যালয়ের সুইচ্‌-কক্ষ।

আছ" ইত্যাদি। এর মানে কি?
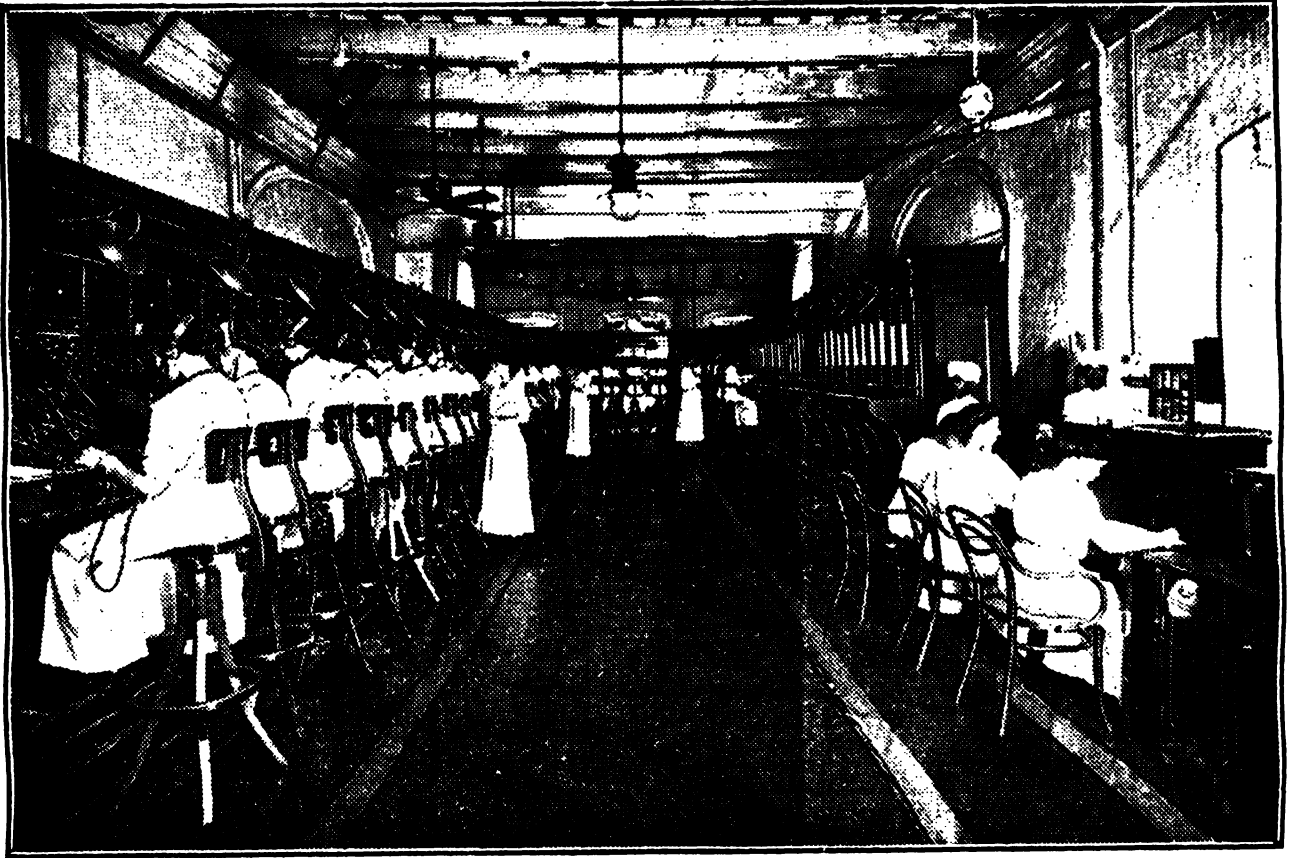
যে এই কাজ করাইয়া লইতে পারে, ইহার কারণ এই যে, শব্দ করিলে, বাতাসে যেরকম ঢেউ খেলে, তাহারা সেইরকম ঢেউ বিদ্যুতে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। মানুষে এরকম বিদ্যুতের ঢেউগুলিকে উৎপন্ন করিতে পারে, কেননা বৈদ্যুতিক তারে যে খবর বহিয়া লইয়া যায় তাহা, শব্দ করিলে, বাতাসে যেরকম ঢেউ হয়, সেইরকমের বৈদ্যুতিক ঢেউ-ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু বিদ্যুতের ঢেউ খুব জোরে চলে, গলার আওয়াজের চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি শব্দ বহিয়া লইয়া যায়। ধর, কলিকাতার দক্ষিণস্থিত বজবজিয়াহইতে কলিকাতায় মানুষের গলার আওয়াজ পঁহুছিতে পারে। বৈদ্যুতিক ঢেউগুলি সেই আওয়াজ আরও অনেক শীঘ্র কলিকাতায় পঁহুছিয়া

সব কথা যে, বুঝাইয়া বলিতে পারিব, তা' বলিতে পারি না। তবে মোটের উপর এইটুকু বলিতে পারি, তার যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে একটা বৈদ্যুতিক চুম্বক আছে, তাহার সাহায্যে ঐ ঢেউগুলি পেটা লোহার একটা চাক্‌তিতে গিয়া লাগে, তাহাতে সেই চাক্‌তিটা কাঁপিয়া উঠে। তাহাতে বাতাসে যে কাঁপুনি হয়, তুমি কথা কহিবার সময়ে বাতাসে যে কাঁপুনি হইয়াছিল, সে কাঁপুনি তাহারই মত, কাজেই সেই লোহার চাক্‌তি তুমি যে কথাগুলি কহিয়াছিলে, সেই কথাগুলিই কহিতে থাকে।

উপরে যাহা লিখিলাম, তুমি যদি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ

তাহা হইলে দেখিবে, তাহাতে টেলিফোন-রহস্যের বিশেষ কিছু সমাধান করা হইল না ; কারণ কোন মানুষের গলার আওয়াজ— তাহার হাসি, কাসি কলিকাতার উত্তরপ্রান্তস্থিত চিৎপুরহইতে কলিকাতার দক্ষিণপ্রান্তস্থিত কালীঘাটে কি করিয়া পঁহুছে, তাহার কিছুই বুঝা গেল না।

কলিকাতায় যে টেলিফোন-যন্ত্রের কার্য্যালয় (Exchange) আছে, সেখানে খোকার হাতের পানিতুয়ার আকার অর্দ্ধসমাপ্ত শূন্যের মত এক কাঠের প্রাচীরের সম্মুখে তিরিশ-চল্লিশ-জন ইংরাজের মেয়ে বসিয়া আছে। ঐ প্রাচীরটীর ইংরাজী নাম— "সুইচ-বোর্ড।" আমরা বাংলায় উহার খদ্যোত চক্র নাম দিলাম। মৌচাকে যেমন ছেঁদা থাকে, ঐ খদ্যোত-চক্রে তেমনই ছোট ছোট ছেঁদা আছে। প্রত্যেক ছেঁদার এক-একটি সংখ্যা আছে, তাহার উপরে আবার জুতার বোতামের মত ছোট ছোট ঘষা-কাচের একএকটী হাতল আছে, সেগুলিরও একএকটী সংখ্যা আছে।

মেয়েদের কাণে বার্ত্তা-গ্রাহক লাগান আছে, উহাকে ইংরাজীতে "রিসিভার" বলে ; আর তাহাদের মুখের ঠিক নীচেই আর একটী যন্ত্র আছে, তাহাকে ইংরাজীতে "ট্রান্সমিটার" অর্থাৎ বার্ত্তা-প্রেরক বলে। যতক্ষণ মেয়েরা কাছে থাকে, ততক্ষণ টেলিফোন-যন্ত্রের ঐ দুইটি জিনিস তাহাদের বুকে ও মাথায় লাগান থাকে। বার্ত্তাগ্রাহকটি মেয়েদের মাথার উপরে বসান থাকে। বার্ত্তা-প্রেরকটি তাহাদের বুক-পীঠ বেড়িয়া একটি বন্ধ-দ্বারা বাঁধা থাকে।' কেননা তাহাদের দুই হাতই খালি থাকা চাই।

যেই কোথাও কোন লোকে তাহার বার্ত্তাপ্রেরক ও বার্ত্তা-গ্রাহক-যুক্ত টেলিফোন-যন্ত্রের অংশটি হাতে তুলিয়া লয়, অমনি খদ্যোতচক্রের ঘষাকাচের একটী হাতল জোনাকীর মত জ্বলিয়া উঠে। কাছে যে মেয়েটি থাকে, সে অমনি সেই আলো দেখে, তাহার নীচে যে সংখ্যা লেখা আছে, তাহা দেখিয়া তাহার নীচের সেই সংখ্যার ছেঁদায় একটী ছিপি (Plug) আঁটিয়া দেয়। তখন লোকটি সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা কহিতে পারে। মেয়েটি ছিপি আঁটিয়া দিলেই, লোকটীর সঙ্গে টেলিফোন-কার্য্যালয়ের যোগ হইয়া যায়। তখন লোকটি কোন্ সংখ্যার সহিত তাহার সংখ্যার যোগ চাহে, মেয়েটিকে তাহা বলিয়া দেয়। মেয়েটি অমনি পূর্ব্বের ছিপির সঙ্গে যোড়া আর একটি ছিপি তুলিয়া যে সংখ্যাটির সঙ্গে যোগ করিতে হইবে, সেই সংখ্যার ছেঁদার মধ্যে পুরিয়া দেয়। তখন সেই সংখ্যার আফিসে বা বাড়ীতে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং সেই বাড়ীর বা আফিসের লোক বার্ত্তাগ্রাহকটি কাণে লাগায়, তখন দুই জায়গার লোকে কথা-বার্ত্তা কহিতে থাকে। তাহাদের কথা কহা হইয়া গেলে, তাহারা বার্ত্তাগ্রাহক ও প্রেরক-যন্ত্র আবার যথা-স্থানে রাখিয়া দেয়, তখন টেলিফোন-কার্য্যালয়ের বাতিটি নিবিয়া যায়, মেয়েটি তাহা দেখিয়া ছিপি খুলিয়া লয়।

বাঁধান "বালক" রাখিবার তাক।

প্রত্যেক বছরের "বালক" বাঁধাইয়া রাখা চাই, নতুবা খুজরা সংখ্যাগুলি হারাইয়া যাইতে পারে। আবার বাঁধান "বালক"-গুলিও যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখা চাই, নতুবা পোকা কাটিয়া নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু রাখি কোথায়? বাবা বা দাদার কাচের আলমারীতে তাঁহারা রাখিতে দিবেন না, কোন তোরঙ্গে ভরিয়া রাখিলে, অনেকটা জায়গা জুড়িয়া থাকিবে,—সেই তোরঙ্গে আর বেশী কিছু রাখা যাইবে না। তবে উপায়? আমি উপায় বলিয়া দিতেছি। বাঁধান 'বালক' রাখিবার তুমি নিজেই একটা তাক করিয়া লও, কিন্তু এই কাজ করিতে হইলে, একটু আধটু ছুতার-মিস্ত্রির কাজ জানা চাই। তুমি তা' জান কি? না জান যদি, শিখিতে ক্ষতি কি? পুরুষমানুষের সকল কাজই শিখিয়া রাখা ভাল, কারণ কখন্ আমরা কি অবস্থায় পড়িব, তাহা কেহই বলিতে পারি না। হয় ত এমন জায়গায় গিয়া পড়িব, যেখানে ছুতার-মিস্ত্রি মিলিবে না ; সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকা বুদ্ধি-মানের কাজ।

এখন কি করিয়া তাক তৈয়ারী করিবে বলি, শোন। দাঁড় করাইয়া রাখা যায়, এইরকম একখানি তাক তৈয়ারী করিতে হইলে, দুইখানি পাশের তক্তা ও তিনখানি সাম্‌নের তক্তা দরকার হইবে। তাকে যেরকম করিয়া বই রাখা যায়, সেইরকম করিয়া "বালক" রাখিতে হইলে, পাশের তক্তা-দুইখানি $৮\frac{১}{২}$ ইঞ্চি চৌড়া ও $১\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পুরু হইলেই যথেষ্ট হইবে, এবং ঐ তাকে উপরেরটি লইয়া তিনটি থাক করিতে হইলে, ঐ তক্তা-দুইখানির খাড়াই আন্দাজ ৩ ফুট ১ ইঞ্চি হওয়া চাই। তক্তা-দুইখানি বেশ পরিষ্কার করিয়া রেঁদা দিয়া ফেল, রেঁদা দিবার সময় দুইখানি তক্তাই যাহাতে সমান পুরু থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিও। দেবদারু-কাঠ সস্তা অথচ চিম্‌ড়ে, অতএব দেবদারু-কাঠই কিনিও। আমি এই পাশের তক্তা-দুইখানি দেড়-ইঞ্চি পুরু কিনিতে বলিয়াছি। রেঁদা দিবার পর তক্তা-দুইখানি যেন ১ ইঞ্চির কম পাৎলা না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিও। তাহার পর সেই তক্তা-দুইখানিকে করাৎ ও বাটালি-দিয়া নিম্নচিত্রিত ভাবে কাট :—

এই তক্তা-দুইখানি কাটিবার সময় পেন্সিল বা খড়ী দিয়া দাগিয়া লইয়া দুইখানি তক্তাই মাপিয়া মাপিয়া সমান করিয়া কাটিতে হইবে, যেন দুইখানি তক্তাই খাড়াইএ এক থাকে, এবং কোন তক্তার গর্ত্তগুলি অন্য তক্তাখানির গর্ত্তগুলির অপেক্ষা নীচে বা উপরে কাটা না হয়। গর্ত্তগুলি কাটিবার সময়েও দুইপাশে মাপিয়া সমান সমান জায়গা ছাড়িয়া একমাপের গর্ত এক লাইনে কাটিতে হইবে।

৪ইঃ ৫ইঃ ১ইঃ ১ফুট ১ইঃ ১ফুট ১ইঃ ৫ইঃ ৪ইঃ

তক্তা-দুইটি এইরূপে কাটিলে, ভুল হইবে না :—
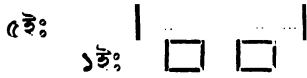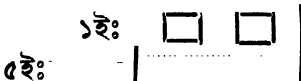
প্রত্যেক তক্তার খাড়াই আছে, ৩ ফুট ১ ইঞ্চি, তাহার মধ্যে মাঝের ও নীচের তাকের জন্য ১ ফুট করিয়া ২ ফুট জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইবে, কেননা বালকের খাড়াই ১১ ইঞ্চি, তাহা হইলে উপরে নীচে মিলাইয়া বাকী রহিল, ১ফুট ১ ইঞ্চি জায়গা, তাহার মধ্যহইতে আরও ৩ ইঞ্চি জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইবে, কারণ থাকের কাঠ অন্ততঃ ১ ইঞ্চি করিয়া পুরু হইবে, সুতরাং তাহারাই ৩ ইঞ্চি জায়গা লইবে। বাকী ১০ ইঞ্চি জায়গা, ৫ ইঞ্চি ৫ ইঞ্চি করিয়া, দুই পাশে রাখ। এইবার উপরে নীচে দুইপাশেই ৪ ইঞ্চি করিয়া জায়গা বাদে পেন্সিল বা খড়ীদিয়া একটি করিয়া কসি টান। তাহার পর, ছবিতে যেমন আঁকা আছে, তেমনই করিয়া দুইদিক্‌কার কাঠই কাট। এইবার দুইখানি তক্তারই উপরে ৫ ইঞ্চি ও নীচে ৫ ইঞ্চি ছাড়িয়া, প্রথমে উপরে একটী কসি টানিয়া ১ ইঞ্চি মাপিয়া লইয়া আর একটী কসি টান ; তাহার পর ১২ ইঞ্চি বাদে আর একটী কসি টানিয়া ফের ১ ইঞ্চি বাদে আর একটী কসি টান, তাহার পর ফের ১২ ইঞ্চি বাদ দিয়া আর একটী কসি টান, শেষে ১ ইঞ্চি বাদে আরও একটী কসি টান। তক্তা-দুইখানি প্রস্থে কতখানি করিয়া আছে, তাহা তোমাদের মনে আছে তো ?—৮½ ইঞ্চি। প্রত্যেক তক্তার দুই ধারহইতে মাপিয়া ১ ইঞ্চি করিয়া জায়গা বাদে লম্বালম্বি কসি টান, তাহা হইলে মধ্যে রহিল ৬½ ইঞ্চি জায়গা, আবার ১ ইঞ্চি করিয়া জায়গা বাদে দুইপাশে লম্বালম্বি দুইটি কসি টান, তাহা হইলে মধ্যে ৪½ ইঞ্চি জায়গা রহিল। এইবার লম্বালম্বি দুই পাশে যে দ্বিতীয় কসি টানা হইয়াছে, তাহা ও তক্তাতে আড়াআড়ি দুইটি করিয়া ছয়টি যে কসি টানা আছে, তাহার মধ্যে দুই পাশে দুইটি করিয়া গর্ত্ত কর, তাহা হইলে এই ছয়টি গর্ত্ত ঠিক মাপ করিয়া কাটা হইবে (২য় চিত্র দেখ।)

এখন থাকের তক্তা কাটিতে হইবে, উহা নিম্নাঙ্কিতমতে কাট। বলা বাহুল্য, ঐ তক্তার ও পাশের তক্তার প্রস্থ একই, তবে দৈর্ঘ্য ইচ্ছানুরূপ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক থাকে যদি ১২-খানি করিয়া বাঁধান 'বালক' রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে ঐ থাকের তক্তা-তিনখানির দৈর্ঘ্য ১ ফুট ৪ ইঞ্চি করিয়া হইলেই যথেষ্ট হইবে।

থাকের তক্তাতিনটি কাটিতে হইলে, দুই ধারহইতে ১ ইঞ্চি করিয়া জায়গা বাদ দিয়া লম্বালম্বি কসি টান। আবার কাঠগুলির আড়াআড়ি উপরে ১½ ইঞ্চি ও নীচে ১½ ইঞ্চি কাঠ বাদ দিয়া কসি টান। এইবার তিনখানি কাঠের উপরে নীচে কোণে কোণে যে ছয়টী ঘর হইল, সেগুলি, মধ্যের ৬½ ইঞ্চি করিয়া কাঠ কাটিয়া বাদ দিলে, এইরূপে বাহির হইয়া পড়িবে—

এখন প্রত্যেক ঘরের যে দিক্‌টা ধারে পড়িবে, সেই দিকে ½ ইঞ্চি করিয়া মাপিয়া লইয়া এক-একটা চতুষ্ক আঁকিয়া ফারফোর করিয়া গর্ত্ত করিয়া ফেল, তাহা হইলেই থাকের কাঠ কাটা হইবে। তাহার পর একটী পাশের তক্তাকে শোওয়াইয়া তাহাতে তিনটি থাকের তক্তার আলগুলি গর্ত্তে গর্ত্তে ঢুকাইয়া দাও, তাহার পর দ্বিতীয় তক্তাটির গর্ত্তগুলি আড়ানী তক্তা-তিনটার নাচির মুখে মুখে বসাইয়া কাঠের হাতুড়ীদিয়া আস্তে আস্তে ঠুকিয়া দাও। এইবার তাকটিকে খাড়া কর, করিলে দেখা যাইবে দুইপাশে ছয়টি সছিদ্র কাঠ বাহির হইয়া আছে। ঐ ছিদ্রগুলিতে ৮ এইরূপ আকারের ছয়টি
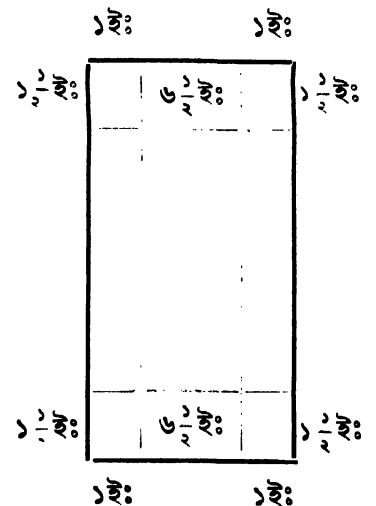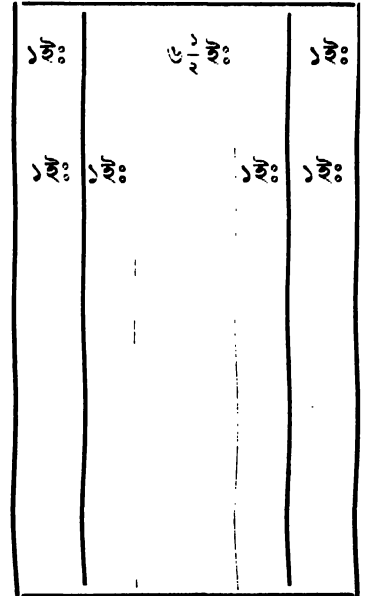
গোঁজ বাটালি-দিয়া কাটিয়া সরুদিক্ নিম্নে রাখিয়া ঢুকাইয়া দাও (৩য় ও ৪র্থ চিত্র দেখ।)

তাকের পীঠের দিক্‌টা খালি রহিল। ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, তবে তোমরা কেহ যদি ইহা পছন্দ না কর, তবে পিছনে পাৎলা কাঠ লাগাইতে পার। তা'-ছাড়া তাকটিকে যদি একটু পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন দেখিতে চাও, তাহা হইলে উহাতে প্রথমে শিরীষকাগজ ঘষিবে, তাহার পর একবোতল ফ্রেঞ্চ-পালিস কিনিয়া লাগাইয়া দিবে, তাহা হইলে উহা দেখিতে চক্‌চকে হইয়া যাইবে।
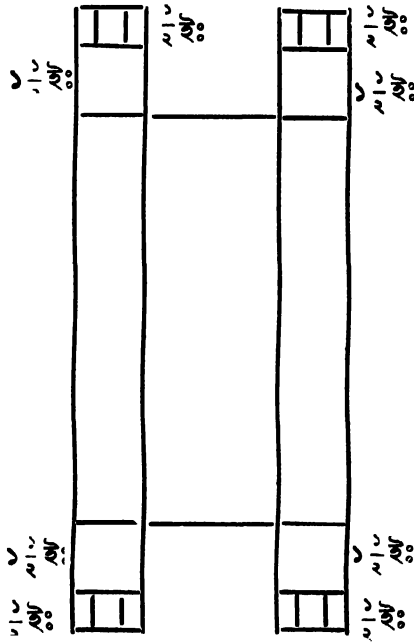
$\frac{1}{2}$ ইঃ $1\frac{1}{2}$ ইঃ $1\frac{1}{2}$ ইঃ $\frac{1}{2}$ ইঃ

কাড়াকাড়ি।

" 'বালক' এসেছে," " 'বালক' এসেছে"—
হঠাৎ উঠিল রোল।
'বালক' এসেছে, তাই করিতেছে
বালকেরা এত গোল।
'আমি আগে পড়ি', 'আমি আগে পড়ি'
বলি'ছে সকল শিশু।
"সরে' যাও সবে— আমি পড়ি এবে",
বলিল 'বড়দা' আশু।
'মেজদা' যাদব, 'সেজদা' মাধব,
তবুও ছাড়ে না তারা,
আশু বলে রেগে, 'আমি পড়ি আগে,
তোরা এ কেমন ধারা?'
'আমি আগে পড়ি, দাও মোকে ছাড়ি'—
"ঠাকুর্দ্দা" বলি'ছে ধরি'।
'বালক' আসাতে, ছেলেতে বুড়াতে
লাগিয়াছে কাড়াকাড়ি!

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস।

জুন-মাসের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ফল।

নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধটি প্রথম স্থানাধিকার করিয়াছে। "বালক"-সম্পাদক।

ঘুড়ী।

সাধারণতঃ ঘুড়ী দুইপ্রকার, মেচুয়াল এবং দেশী। তাহারা আবার আকারভেদে বিভিন্ন নাম-প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা, মেচুয়াল—একতে, দেড়্‌তে, দোতে; দেশী—সিকিতে, আদ্‌তে একতে। আর একপ্রকার ঘুড়ী আছে, তাহাকে "ঢাউস্" অথবা "মানুষ"-ঘুড়ী কহে। ইহা কচিৎ দৃষ্ট হয়।

ঘুড়ী প্রস্তত করিতে হইলে, প্রথমে ময়দার আঠা করিতে হয়। তা'র পর বাঁশকে চাঁচিয়া চিকের কাঠির ন্যায় কাঠি প্রস্তত করিতে হয়। বাজারহইতে পাতলা কাগজ কিনিয়া আনিয়া তাহাকে চতুষ্কোণ-ভাবে কাটিতে হয়। তার পর তাহার একটী "কোণ" অপর একটী, অর্থাৎ বিপরীত দিকের কোণের উপর ফেলিয়া ভাঁজ করিয়া লইতে হইবে। যে দাগ পড়িবে, সেইখানে সরুভাবে আঠা-দিয়া কাঠি জুড়িয়া দিতে হয়। এই কাঠিটিকে "পেট"-কাঠি কহে। আর একটী কাঠি খিলানের ন্যায় দিতে হয়। এটী দিবার সময় সমস্ত কাঠিতে আঠা দিবার প্রয়োজন হয় না, কেবল শেষের দুইদিকের কাগজে সামান্য আঠা-দিয়া মুড়িয়া দিতে হয়। এই কাঠিকে "কাঁপ" বলে। তা'র পর তলার দিকে "লেজ" করিয়া দিতে হয়। দেশী ঘুড়ীর ধারে সূতা থাকে না, কিন্তু মেচুয়াল ঘুড়ীর চারিধার মিহি সূতা-দিয়া সরুভাবে মোড়া থাকে। রঙ্গীন কাগজের ব্যবহারে নানাপ্রকার সুদৃশ্য রঙ্গীন ঘুড়ী প্রস্তত হয়, যথা সতরঞ্চী, মুখপোড়া, বাম্‌না ইত্যাদি। দেশী ঘুড়ীর নীচে ডিম্বাকার অথবা ত্রিকোণ একটু কাগজ লাগাইয়া "লেজ" করা হয়, মেচুয়ালের কাঠির যোগে একটী বড় লেজ থাকে।

তার পর "কল" বাঁধিতে হয়। "কল" বাঁধিতে হইলে, "পেট" ও কাঁপ-কাঠি যেখানে সংলগ্ন হয়, সেইখানের কাগজ ছিদ্র করিয়া, দেড়হাতপরিমিত সূতা লইয়া তাহার এক মুখ একদিকে বাঁধিতে হয়। তা'র পর নীচের লেজহইতে আট বা দশ আঙ্গুল-পরিমিত কাগজ ছাড়িয়া, ছিদ্র করিয়া, সেই সূতার অন্য মুখ-দিয়া পুনরায় বাঁধিতে হয়। অতঃপর প্রথম ও দ্বিতীয় ছিদ্রের মধ্যে সমান ব্যবধান রাখিয়া "গিরা" দিতে হয়। ঘুড়ী উড়াইতে হইলে, লাটাই-ভরা সূতার প্রয়োজন। সূতার মুখ কলের মুখে বাঁধিতে হয়।

যে নূতন উড়াইতে শিখে, সে আর একজনকে "ধরাই" দিতে বলে, নতুবা হাওয়ার প্রভাবে নিজেই উড়ায়। জোরে হাওয়া বহিলে, ঘুড়ী "ফাঁসিয়া" অথবা "উপ্‌ড়াইয়া" যায়। হাওয়া না থাকিলে, হেঁৎকাইয়া উড়াইতে হয়। মাঝামাঝি হাওয়া থাকিলে,

উড়াইবার সুবিধা হয়। "কল" ঠিক বাঁধা না থাকিলে, ঘুড়ী মাথার উপরে ঘুরিতে, অথবা ঘুড়ীর "ফেটি" ঝুলিতে থাকে। তখন উপরে বা নীচে "ডব্‌কল্" দিয়া ঘুড়ী ঠিক করিয়া লইতে হয়। কল ঠিক করা সত্ত্বেও যদি ঘুড়ী ঘুরিতে থাকে, তাহা হইলে ঘুড়ীর "কাঁপের" দোষ আছে জানিতে হইবে। তখন যেদিকে ঘোরে, তাহার বিপরীত দিকে "কেন্নি" অর্থাৎ সামান্য পরিমাণে কাগজ অথবা ন্যাকড়া দিয়া "কাঁপের" সহিত বাঁধিয়া লইতে হয়।

প্যাঁচ-খেলা দুইরকম, "লাটাইয়া" অর্থাৎ সুতা ছাড়িয়া এবং "টানিয়া" অর্থাৎ সুতা গুটাইয়া। প্যাঁচ-খেলার পূর্ব্বে এই কয়েকটী বিষয়ের উপর নজর রাখিতে হয় (১) ঘুড়ীখানা যেন ভাল হয়, (২) সুতায় যেন বেশ "মাঞ্জা" থাকে (অর্থাৎ কোনরূপ মাড়ের সহিত কাঁচচূর্ণ বেশ লাগান থাকে) (৩) সুতা যেন বেশ মজবুত হয়, (৪) সুতায় যেন বেশী গিরা না থাকে (৫) লাটাই-ভরা যেন সুতা থাকে (৬) ঘুড়ী যেন বেহাওয়ায় না থাকে এবং (৭) ফেটি যেন না ঝোলে।

বিপক্ষের সহিত প্যাঁচ খেলিতে হইলে, সে যদি সম্মুখে থাকে, তাহা হইলে তাহার ঘুড়ী "টেনে" কাটাই সুবিধা। এক পাশ ঘেঁসিয়া, ঘুড়ী "গোৎ" মারিয়া, দু-চারপাক সুতা ছাড়িয়া হাওয়ার মুখে সজোরে টানিয়া লইতে হয়। বিপক্ষ যদি বুদ্ধিমান হয়, তাহা হইলে টানিয়া লইবার আগেই, সে সুতার উপর সুতা চাপাইয়া "লাঠালাঠি" খেলিবে। পিছনের লোকটীও তখন ঘুড়ী ঘুরাইয়া "দোপাল্‌টা" করিয়া লয়। তখন "বুঁদাবুঁদি" প্যাঁচ চলে। অনেক সুতা ছাড়ার দরুণ ফেটি নামিয়া পড়িলে, "টুন্‌কি" দিতে হয়। অনেক সময় এই "টুন্‌কির" জোরে ঘুড়ী কাটিয়া দেওয়া যায়। বিপক্ষের ঘুড়ী কাটিয়া যাইলেই, নিজ ঘুড়ী টানিয়া লইতে নাই। কিছুক্ষণ সুতা ছাড়িতে হয়। বিপক্ষের "ফেটির" অর্থাৎ কাটিয়া যাইবার পরে যে সুতা পড়ে, তাহার ঘর্ষণে (কারণ সেই "ফেটি" নিজ সুতার উপর কিয়ৎক্ষণ থাকে) অনেক সময় ঘুড়ী কাটিয়া যায়। ঘুড়ী কাটিয়া যাইলেই, "ভক্কা" মারিতে অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র গুটাইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে পড়ন্ত সুতা অন্য কেহ ধরিয়া ছিঁড়িতে পারিবে না।

প্যাঁচ খেলিবার সময় মাঝে মাঝে ঘুড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন "থামা" মারিতে অর্থাৎ সুতা হঠাৎ আল্গা করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে ঘুড়ী আবার উপরে 'দিক্-দিক্' করিতে করিতে উঠে। সেই সময় যদি "ফেটি" ঝুলিতে থাকে, তাহা হইলে "টুন্‌কি" মারিবার পক্ষে বড় সুবিধা হয়।

মাঝে মাঝে ঘুড়ী ঘুরিয়া প্যাঁচ খুলিয়া যায়। কখন কখনও বা সুতায় সুতায় খুব "জড়াজড়ি" হইয়া যায়; তখন সুতা ছাড়িলে বিপক্ষের সুতার মধ্য দিয়া আর যায় না। তখন তাড়াতাড়ি নামাইয়া লইতে হয়, ইহাকে 'টানামানি' কহে। ঘুড়ীর প্যাঁচ খুলিয়া গেছে কি না, দেখিতে হইলে, নিজ সুতা কাণের কাছে আনিয়া ধরিতে হয়। যদি "খরখর"-শব্দ হয়, তাহা হইলে তখনও প্যাঁচ আছে জানিতে হইবে, তাহা না হইলে প্যাঁচ নাই জানিতে হয়।

শ্রীশিবপ্রসাদ দেব।

বয়স ১৩৷৷৹ বৎসর, প্রথম শ্রেণী, সম্বলপুর জিলা-স্কুল।

জুলাই-মাসের প্রতিযোগিতার ফল।

এইবার নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধদ্বয় প্রধান-স্থান-অধিকার করিয়াছে। — "বালক"-সম্পাদক।

যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।

আরবদেশের নাম, বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। সুপ্রসিদ্ধ, স্বনামখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা-নগরী আরবের রাজধানী। সেই মক্কানগরীর নিকটে বেরুল-নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। বেরুলে সব সুবিধা, কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিক্ গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত। ঐ গ্রামে বনের ধারে একটী সুন্দর বৃহৎ মস্‌জিদ আছে। ঐ মস্‌জিদের রক্ষকের নাম সৈয়দ; সৈয়দ প্রত্যহ দুইবার করিয়া নামাজ পড়ে, পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন থাকে, মুখে ঘন ঘন আল্লার নাম-উচ্চারণ করে, লোককে ধর্ম্ম-শিক্ষা দেয়, আর তাহা দেখিয়া সকলেই মনে করে যে, সৈয়দ পরম ধার্ম্মিক, গুণবান্ ব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ ভাল লোক ছিল না, সে অতিশয় গর্ব্বিত, নীচাশয় ও পরপীড়ক ছিল। এ কথা তাহার একমাত্র ক্রীতদাস সেলিম-ভিন্ন আর কেহই জানিত না। সৈয়দ সেলিমকে অতিশয় কষ্ট দিত, আর তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে হাসিত; ভাবিত কতই ভাল কাজ করিতেছি। সৈয়দ পবিত্র মসজিদের রক্ষক হইয়াও ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিত না; কিন্তু তাহার অশিক্ষিত ক্রীতদাস সেলিম সামান্য লোক হইয়াও ধর্ম্মেরমাহাত্ম্য বুঝিত। সৈয়দ তাহাকে কত কঠিন শাস্তি দিয়াছে, বিনা দোষে প্রহার করিয়াছে, কতবার অনাহারে রাখিয়াছে, তথাপি প্রভুভক্ত সেলিম একদিনের জন্যও নিজ অদৃষ্টকে ভিন্ন আর কাহাকেও দোষ দেয় নাই। সে জানিত ভগবান যখন আছেন, তখন জগতে নিশ্চয়ই সুবিচার হইতেছে। সেলিম আল্লার উপর নির্ভর করিয়া নিজ জীবন চালাইতেছিল, সেইজন্য তাহার হৃদয়ে একাধারে শান্তি ও সুখ বিরাজ করিত।

মস্‌জিদের নিকটে একটা পুরাতন অথচ সেকেলে মজবুত বাড়ীতে তাহারা দুইজনে থাকিত। বেরুলে অত্যন্ত বাঘের ভয় ছিল।

এক দিবস কথায় কথায় সৈয়দ সেলিমের উপর অত্যন্ত চটিয়া উঠিল এবং এমন ক্রুদ্ধ হইল যে, সে সেলিমকে সেই গভীর রাত্রে গৃহহইতে শার্দ্দূল-সমাকুল মাঠে বাহির করিয়া দিল। সেলিম অম্লান বদনে প্রভুর আদেশে বাহিরে গেল এবং মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। তাহার কোন ভয় হইল না। সৈয়দ সেলিমকে ভয়যুক্ত না দেখিয়া আরও রাগিয়া গেল এবং বাহিরে আসিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। সেলিম বলিল, "প্রভো, আমায় মারিবেন না, আমি বাহিরে বেশ শাস্তিরত্ন-সংগ্রহ করিতেছি।" রত্নের কথা শ্রবণে ক্রোধান্ধ সৈয়দ ভাবিল, "সেইজন্যই বুঝি বেটা বেশ আনন্দে বাহিরে বসিয়াছিল।" তাই সে তাহাকে বলিল, "যা, বেটা, শীঘ্র ঘরে ঢোক্, নতুবা আবার মার খাইবি। আমি রত্ন লইব না, তুই লইবি? ঢোক্, বেটা, ঢোক্।" এই বলিয়া মারিতে মারিতে সেলিমকে ঘরে ঢুকাইয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল; উদ্দেশ্য সে যেন রত্ন কুড়াইবার জন্য বাহির না হইতে পারে। সেলিম ঘরে যেমন আবদ্ধ হইয়াছে, অমনি সাক্ষাৎ শমন-সদৃশ এক ব্যাঘ্র সৈয়দের সম্মুখে আসিল। সে কি করিবে, বুঝিতে পারিল না, সেলিমকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু সেলিম যে ঘরে আছে, তাহাতে তো চাবি লাগান হইয়াছে। তথাপি প্রভুভক্ত সেলিম প্রভুকে বাঁচাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যাঘ্র সৈয়দের উপর লাফাইয়া পড়িল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

শ্রীদেবানীকুমার বসু,
বয়ক্রম ১৫ বৎসর।
১১১ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পাপের পরিণাম।

১

আমেদ্-আলিকে জানে না, এমন লোক সে গ্রামে অতি অল্পই ছিল। তাহাকে যে একবার দেখিয়াছে, সে জীবনে আর ভুলিবে না। তাহার চেপ্টা মস্তকটী সংসারের সকল বিষয় লইয়াই ব্যস্ত থাকে। এমন কাজ নাই, যাহা আমেদ্-আলি পারে না, কিন্তু পারিলে কি হইবে? তাহার ন্যায় কূটবুদ্ধি সংসারে নাই বলিলেও হয়। বাল্যকালহইতে সে দুষ্টামিতেই মাথা খাটাইয়াছে। তাহার অসাধারণ উপস্থিত-বুদ্ধি দেখিয়া লোকে দুঃখ করিয়া বলিত, "এই মাথা ভাল কাজে খাটাইলে, আমেদ্ একটা মস্ত লোক হইত।" তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবার সময় আমেদের থাকিত না, সে ততক্ষণ মনে মনে অভিসন্ধি আঁটিত,—কাহার গাছহইতে চুরি করিয়া লিচু পাড়িবে; কাহার পুকুরহইতে মাছ ধরিবে। তাহার নিকট সকলেই মানে মানে হার মানিয়া লইত, কারণ, যে কোন বিষয়েই হউক, আমেদ্ হারিবার পাত্র নয়। পিতার অগাধ সম্পত্তির মধ্যে আমেদ্ তাহার ভ্রাতা জহরকে একখণ্ড ভূমি-ভিন্ন আর কিছুই দেয় নাই। জহর তাহাতেই পরিতুষ্ট। আমেদ্ টাকার গদির উপর বসিয়া কেবল টাকার চিন্তা করিত। কেমন করিয়া গ্রামের সকলকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে, ইহাই তাহার প্রধান চিন্তা ছিল। আমেদ্ পিতার সম্পত্তি পাইয়াছিল—আর জহর পিতার দেবতুল্য চরিত্র পাইয়াছিল। তাই পিতার সম্পত্তি-হইতে বঞ্চিত হইয়াও ভ্রাতার প্রতি তাহার পূর্ব্বের শ্রদ্ধা ও স্নেহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

২

একদিন জহর মাঠে গরু চরাইতেছিল, এমন সময় একটী কাতর আর্ত্তনাদ তাহার কর্ণে পঁহুছিল। জহরের করুণ হৃদয় গলিয়া গেল, সে গরু ফেলিয়া দৌড়াইল। কিছু দূর যাইয়া দেখিল, একটী অষ্টমবর্ষীয় বালক পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একবার ডুবিতেছে, একবার উঠিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিতেছে। তীরের লোকগুলি অনেকক্ষণ ধরিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, কিন্তু কেহই জলে নামিতে সাহস করিতেছিল না। জহর একলম্ফে জলে পড়িল ও পরমুহূর্ত্তেই বালকটীকে লইয়া তীরে উঠিল। বালকটী সেই গ্রামের জমীদার-পুত্র। "জমীদার-পুত্র জলে ডুবিতেছিল, জহর-আলি-নামক কৃষক তাহাকে রক্ষা করিয়াছে"—এই সংবাদ গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল। জমীদার-মহাশয় জহরকে ডাকিয়া প্রচুর অর্থ ও বিস্তৃত ক্ষেত্র-দান করিলেন। জহর-আলি নাচিতে নাচিতে দাদার কাছে উপস্থিত হইয়া এই সুসংবাদ দিল। আমেদ্-আলি মনে মনে ভাবিল, "আমি থাকিতে তুমি টাকার তোড়া লইয়া জমীদারের মতন আমার উপর চা'ল্ চালিবে? তা' হইবে না, তোমার সর্ব্বনাশ করিব, তবে আমার নাম আমেদ্ আলি!" আমেদ-আলি হৃদয়ের হলাহল চাপিয়া মিষ্টমুখে বলিল "বেশ! শুনে সুখী হ'লাম।"

৩

গভীর নিশীথে আমেদ্-আলি ধীরে ধীরে শয্যা-ত্যাগ করিল। পরে তাহার বন্দুকটী লইয়া নিঃশব্দে রাজপথে বাহির হইল। পাঠক, এইবার যদি আমেদের মুখ দেখিতে তো আতঙ্কে তোমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিত। 'ওঃ ভীষণ আকৃতি!'—বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতে। আমেদ্ আপন মনে বলিতে লাগিল, "এক গুলীতেই শেষ হইবে। তাই তো! একি! কি বলিতেছি? জহরকে মারিব—প্রাণের ভাই জহরকে মারিব? না, তা' হ'বে না।" আবার কুমতি আসিয়া সুমতিকে পরাজিত করিল। "মারিব বই কি—নিশ্চয়ই মারিব—কিসের ভাই? টাকার জন্য সব করা যায়—আর বিলম্ব নয়, বিলম্বে কার্য্য-হানির সম্ভাবনা।" আবার অগাধ টাকার ভাবনা আমেদকে পিশাচের অধিক করিয়া তুলিল। "ঐ না, জহরের কুটীর?" আমেদ্ ধীরে ধীরে প্রান্তর-অতিক্রম করিয়া জহরের কুটীরের জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। উঁকি মারিয়া দেখিল, জহর ও তাহার স্ত্রী তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। "এই ঠিক সময়।" আমেদ্ বন্দুক তুলিল। তাই তো ও কি? দূরে ও দু'টী কিসের আলোক জ্বলিতেছে? বাব! বাঘ! বাঘের চোখ! ভয়ে আমেদের হস্তহইতে বন্দুকটা পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রটী ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইল। ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে জহরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে জানালায় আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরমুহূর্ত্তেই ব্যাঘ্রটী আমেদের স্কন্ধে লাফাইয়া পড়িল। জহর 'দাদা', 'দাদা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার নিকট প্রকৃত ব্যাপার অজ্ঞাত রহিল। দেখা গেল, ব্যাঘ্রটী আমেদকে লইয়া পলাইতেছে। পাপীর শাস্তিদাতা ভগবান্।

শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায়, বয়স দ্বাদশ।
(চতুর্থ শ্রেণী—স্কটিস্ চার্চ্চেস্ কলিজিয়েট স্কুল)।
১৩২।১এ, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বালক

৩য় বর্ষ। অক্টোবর, ১৯১৪ ১০ম সংখ্যা।

জাতীয় স্তোত্র

দয়ার আধার মোদের নৃপতি,
চিরায়ু হউন সেই মহামতি,
রক্ষ, পরমেশ, তাঁ'য়;
দাও তাঁ'রে জয়, সুখ, যশ আর,
সুদীর্ঘ হউক শাসন তাঁহার,
হে ঈশ, রক্ষ রাজায়।

২

উঠ, প্রভো, তাঁ'র অরাতি-নিকরে
দাও খেদাইয়া ছিন্নভিন্ন ক'রে,
যেন তা'রা লয় পায়;
তাহাদের নীতি করুন্ বিফল,
বিফল করুন্ চাতুরীসকল,
মোরা বাঁধি' আশা তোমাতে কেবল,
রক্ষ আমাসবাকায়।

৩

শ্রেষ্ঠ দান যাহা তোমার ভাণ্ডারে,
করহ বর্ষণ তাঁহার উপরে,
দীর্ঘকাল ব্যাপি' রাজত্ব তাঁহার,
থাকে যেন এ ধরায়;
করুন্ মোদের বিধান-রক্ষণ
নৃপতি; আমরা যেন অনুক্ষণ
পারি উচ্চকণ্ঠে গায়িতে উল্লাসে—
"হে ঈশ, রক্ষ রাজায়।"

জেনেরল গর্ডন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পাগোডাপূর্ণ সুচাও-নগর-অবরোধ করা হইল। যত সৈন্য নগরটী অবরুদ্ধ করিয়াছিল, নগরমধ্যে তাহার দ্বিগুণ সৈন্য ছিল, তাহাদের মধ্যে বারগেভিন ও তাহার অনুচরেরাও ছিল। সহরটির সম্মুখে বারগেভিন তাহার কামানগুলি সাজাইল, কিছুক্ষণ তোপ দাগা হইল, তাহাতে নগর-প্রাচীরগুলির সবিশেষ ক্ষতি হইল, গর্ডন তাঁহার সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। শত্রুপক্ষহইতে ভয়ানক অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল, তাহাতে গর্ডনের সৈন্যদল বিতাড়িত হইল। আবার তাই গর্ডনের কামানগুলি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল; তাহার পর কামানগুলি, যতদূর সম্ভব, আগাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। অনন্তর অবরোধকারিগণ পুনরায় ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারা যে সেতুসমূহ লইয়া গিয়াছিলেন, সেগুলির অপেক্ষা খাড়িগুলি ঢের বেশী চৌড়া, কিন্তু সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাহাতেও ব্যাহত না হইয়া নির্ভীকচিত্তে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে পার হইয়া গেলেন, তাঁহাদিগের সৈনিকেরা তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল, তখন টাএ-পিঙেরা পলাইয়া গেল, অতঃপর একটীর পর একটী বৃতিবেষ্টিত স্থান অধিকৃত হইতে থাকিল। গর্ডন স্বয়ং মুষ্টিমেয় লোক লইয়া তিনটী বৃতিবেষ্টিত স্থান ও একটী প্রস্তরময় দুর্গ অধিকৃত করিলেন।

এই অবরোধকালে এবং অন্যান্য অনেক যুদ্ধের সময় গর্ডনকে স্বয়ং সৈন্য-পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। যদি কোন সামরিক কর্ম্মচারী কোন বর্ব্বর শত্রুকে দেখিয়া ভয়ে পিছাইয়া যাইতেন, গর্ডন শান্তভাবে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে যেখানে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছে, সেইখানে লইয়া যাইতেন। তিনি স্বয়ং নিরস্ত্র অবস্থায় রণাঙ্গনে পদার্পণ করিতেন, যে বেত্রযষ্টি তিনি সর্ব্বদা হাতে করিয়া থাকিতেন, তদ্দ্বারাই পরিচালন করিয়া তিনি সৈন্যদিগকে অগ্রে গমন করাইতেন। যেখানে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইতেছে, সেইখানেই গর্ডনকে সর্ব্বদা দেখা যাইত, গুলীবর্ষণ দেখিয়া, লোকে জলবর্ষণ হইতে দেখিলে যতটা সাবধান হয়, তাহার বেশী গর্ডন সাবধান হইতেন না। চৈনিক সৈনিকেরা গর্ডনের বেত্র-যষ্টিকে যাদুকরের যাদু-দণ্ড-তুল্য মনে করিত। তাহারা ঐ যষ্টিকে গর্ডনের "জয়যুক্ত যাদু-দণ্ডই" বলিত।

অবরোধকালে গর্ডন দেখেন যে, তাঁহার সৈন্যদলের লোকেরা ঘুষ লইয়া শত্রুদিগকে আত্মপক্ষের সন্ধান বলিয়া দিতেছে। একজন যুবা সামরিক কর্ম্মচারী—তত অসদভিপ্রায়ে নহে, যত অসাবধানতা-প্রযুক্ত—কোন এক শত্রুকে চিঠী লিখিয়া সন্ধান বলিয়া দেয়।

গর্ডন তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বলেন, "যদি তুমি এবার ভাল করিয়া যুদ্ধ করিয়া রাজভক্তি দেখাও, তবে আমি তোমার এবারকার দোষ-ক্ষমা করিব।" দ্বিতীয় আক্রমণের সময় গর্ডন তাঁহার চুক্তির কথা ভুলিয়া গেলেও, সেই তরুণ সামরিক কর্ম্মচারী ভুলে নাই। সে-ই দ্বিতীয় আক্রমণের সময় অধিনায়কতা করে, একটা গুলী তাহার মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই সে গর্ডনের হাতে ঢলিয়া পড়িয়া পঞ্চত্ব পায়, গর্ডন তখন তাহার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিলেন।

পঞ্চাশটা খিলানযুক্ত একটী অদ্ভুত সেতু সুচাও-অবরোধের সময় ধ্বংসিত হয়, তাহাতে গর্ডনের মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল।

একদা সন্ধ্যাকালে গর্ডন সেই ভগ্ন সেতুটীর উপর বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে, তিনি যে সেতু-প্রস্তরের উপরেই বসিয়া ছিলেন, তাহাতে হঠাৎ তাঁহারই সৈনিকদিগের দুইটী গুলী আসিয়া লাগে। দ্বিতীয় বার গুলী করার পর গর্ডন সেতুহইতে নামিয়া তাঁহার নৌকায় চড়িয়া যে খাড়ির উপরে সেই সেতুটী ছিল, সেই খাড়ির পরপারে নৌকা বাহিয়া চলিলেন, উদ্দেশ্য যে সেই গুলী করিয়াছে, তাহাকে ধরিবেন। তিনি সেই ভগ্ন সেতুটি অতিক্রম করিয়া যাইতে না যাইতে, তাহার যে অংশে তিনি বসিয়াছিলেন, সেই অংশটী ভাঙিয়া জলে পড়িয়া গেল, তাহাতে তাঁহার নৌকাটি প্রায় চূর্ণিত হইল।

চৈনিকদিগের এই ধারণা ছিল যে, তাহাদের সেনাপতি যাদু-মন্ত্র জানিতেন, তাই তিনি এইরূপ সব বিপদের মুখে পড়িয়াও জীবিত থাকিতেন। এমন কি এক তুমুল যুদ্ধে যখন তিনি গুরুতর আঘাত-প্রাপ্ত হন, তখনও তাহাদের এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহার যাদুদণ্ডপ্রভাবেই তিনি সেবার মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই।

গর্ডন যদিও জানিতেন যে, বারগেভিন, সুবিধা পাইলেই, তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, তবুও তাহাকে ও তাহার হতভাগ্য অনুচরদিগকে বিদ্রোহীদিগের হস্তহইতে উদ্ধার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

একটীর পর একটি করিয়া বিদ্রোহীদিগের প্রত্যেক দুর্গ গর্ডন ও তাঁহার সৈন্যেরা অধিকৃত করিতে থাকিলেন। সুচাও-অধিকারের পূর্ব্বে অনেক ভীষণ যুদ্ধে তাঁহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

অবশেষে ওয়াংয়েরা পরাভব-স্বীকার করিল। গর্ডন যদি ছয়-জন প্রধান ওয়াংএর প্রাণনাশ না করেন, অন্য সমস্ত বিদ্রোহী-দিগের সহিত সদয় আচরণ করেন এবং সহরটী উৎসাদিত না করেন, তাহা হইলে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইল। এইসকল সর্ত্তপালনে গর্ডন, লি হাঙ্‌ চাঙ্‌ এবং সেনাপতি চিঙ্‌ সানন্দে সম্মত হইলেন, সেই রাত্রিতে সুচাও-নগরের একটী ফটক উন্মুক্ত হইল এবং গর্ডনের "চিরবিজয়িনী সেনা" সেই নগরটী অধিকৃত করিল।

এই বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপে এবং তাহারা লুণ্ঠন করিতে পাইবে না বলিয়া, গর্ডন তাঁহার সৈন্যদিগকে দুইমাসের করিয়া বেতন দিতে

লি হাঙ্ চাঙ্‌কে অনুরোধ করিলেন। লি হাঙ্ চাঙ্ তাহা দিতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু পরে একমাসের বেতন দিতে রাজি হইলেন, গর্ডন অগত্যা তাঁহার অসন্তুষ্ট সৈন্যদিগকে লইয়া কুইন্‌সানে ফিরিয়া চলিলেন, যেখানে লুণ্ঠনোপযোগী নানা বহুমূল্য দ্রব্য রহিয়াছে, সেখানে তিনি তাহাদিগকে আর রাখিতে সাহস করিলেন না।

গর্ডন নগরটী পরিহার করিয়া গেলেই, ওয়াংয়েরা নিরস্ত্র অবস্থায় হাসিতে হাসিতে, কথা কহিতে কহিতে তাঁহার সৈন্যশ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া অশ্বারোহণে লি হাঙ্ চাঙ্‌এর বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে চলিল।

তিনি অতঃপর তাহাদিগকে এই মনুষ্যলোকে আর দেখেন নাই।

কুইন্‌সানগামী ষ্টীমারের জন্য তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইতেছিল, সুতরাং যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যেরা বেশ নির্ব্বিঘ্নে যাত্রারম্ভ করিয়াছে, তখন তিনি অশ্বারোহণে নগর-প্রাচীর-প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলেন। এই সময়ে তিনি দেখিতে পান যে, লি হাঙ্ চাঙ্‌এর বাসভবনের সম্মুখে বড়ই লোকের ভীড় হইয়াছে; কিন্তু লি হাঙ্ চাঙ্ যে, তাঁহার শপথ-ভঙ্গ করিবেন না, এই বিষয়ে তিনি এতই নিশ্চিত ছিলেন যে, তাহা দেখিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল না, কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি চিঙ্‌এর সৈন্যেরা চীৎকার করিতে করিতে বন্দুক ছুড়িতে ছুড়িতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইরূপ আচরণ, গর্ডন ও চিঙ্ যেরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার এতই বিপরীত যে, গর্ডন চিঙ্‌এর সামরিক কর্ম্মচারীদিগের কাছে গিয়া তাহাদিগকে দুই-এক কথা বলিতে বাধ্য হইলেন।

সুবিখ্যাত চৈনিক প্রাচীর।

তিনি বলিলেন,—"তোমরা এরূপ করিলে, চলিবে না, নগরের মধ্যে এখনও অনেক বিদ্রোহী রহিয়াছে, যদি আমাদের সৈন্যেরা এইরূপ উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে বিদ্রোহীরাও উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, তখন ভয়ানক একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়া যাইবে।"

তিনি ঐ কথা বলিতেছেন, ঠিক এমন সময়ে সেনাপতি চিঙ্ দর্শন দিল। সে মনে করিয়াছিল, গর্ডন এতক্ষণ ষ্টীমারে চড়িয়া কুইন্‌সান-অভিমুখে চলিয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

এইরূপ হট্টগোল করিবার কারণ কি, এই প্রশ্নে সে এমন কতগুলি নির্ব্বোধের মত উত্তর-প্রদান করিল যে, সেগুলি যে মিথ্যা কথা, তাহা সহজেই বুঝা গেল। গর্ডন তৎক্ষণাৎ নার ওয়াংএর গৃহাভিমুখে অশ্ব ছুটাইলেন, এই ওয়াং সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ছিল, গর্ডন তাহার নিজ মুখহইতে তাবৎ বিবরণ অবগত হইতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি দেখিতে পাইলেন, উত্তেজিত বিদ্রোহীরা ভীড় করিয়া রহিয়াছে এবং চিঙ্-এর বহুসংখ্যক সৈনিক অনেক দ্রব্য-লুণ্ঠন করিয়াছে। পরে তিনি দেখিলেন, চিঙ্‌এর সৈন্যেরা নার ওয়াংএর বাসভবনটী সামগ্রীশূন্য করিয়াছে। নার ওয়াংএর একজন খুল্লতাত নারের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে তাহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিল; সে জানাইল, সেখানে গেলে, নারের আত্মীয়ারা নিরাপদ্ হইবে। গর্ডন তখন নিরস্ত্র ছিলেন, তথাপি তাহা করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা নার ওয়াংএর খুল্লতাতের গৃহে পঁহুছিলে, দেখিলেন, তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণ সহস্র সহস্র বিদ্রোহীতে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা তথায় পদার্পণ করিবামাত্র সেই গৃহের ফটক রুদ্ধ করা হইল, ফলে গর্ডন বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হইলেন। তখন বিদ্রোহীরা সকলেই বলিতে লাগিল যে, গর্ডন ও লি হাঙ্ চাঙ্ চালাকি করিয়া ওয়াংদিগকে বন্দী করিয়াছে, কিন্তু ওয়াংদিগের যে, কি হইয়াছে, তাহা কেহই ঠিক জানিত না। তাহাদের এই বিষয়ে অজ্ঞতা গর্ডনের পক্ষে হিতজনকই হইল; কেননা তাহা জানিতে পারিলে, চীনারা যে নানাপ্রকারে লোকদিগকে যন্ত্রণা দিতে জানে, তাহার কোন-না-কোন-প্রকারে গর্ডনকে যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলিত। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর গর্ডন তাঁহার দেহরক্ষকদিগকে ডাকিয়া এবং তাঁহারই সৈন্যের দ্বারা লি হাঙ্ চাঙ্‌কে বন্দী করিয়া আনিতে একজন দূত-প্রেরণ করিতে তাঁহার শত্রুদিগকে সম্মত করাইতে পারিলেন। তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন, যাবৎ না ওয়াংএরা নিরাপদে স্ব স্ব গৃহে ফিরিবে, তাবৎ লি হাঙ্ চাঙ্ তাহাদের হস্তে বন্দী থাকিবে।

পথে শত্রুদিগের সেই দূতের সহিত চিঙ্‌এর কতিপয় সৈনিকের সাক্ষাৎ হইল, তাহারা তাহাকে আহত করিয়া গর্ডনের প্রেরিত সংবাদ ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন বিদ্রোহীরা গর্ডনকেই স্বীয় সংবাদ-বাহকের কার্য্য করিতে অনুমতি দিল, কিন্তু পথে চিঙ্‌এর সৈনিকেরা তাঁহাকে ধরিয়া কয়েক ঘণ্টার নিমিত্ত বন্দী করিয়া রাখিল। তাহারা বলিল, গর্ডন বিপক্ষ-পক্ষে যোগ দিয়াছেন।

যাহা হউক, অবশেষে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া নিজ সৈনিকদিগের নিকটে পঁহুছিলেন, তখন তিনি নার ওয়াংএর খুল্লতাতের বাসভবন-রক্ষার জন্য তাঁহার একদল সৈন্য-প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে চিঙ্ তাঁহার কাছে আসিল। গর্ডন নগর-লুণ্ঠন ও দুর্ব্যবহার করার জন্য তাহার উপর অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া গেলেন, চিঙ্ নগরমধ্যে পলাইয়া গেল।

পরে সে, কি হইয়াছে, তাহা গর্ডনকে বুঝাইবার নিমিত্ত একজন ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারীকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিল, কিন্তু এই কর্ম্মচারী, ওয়াংএরা বাঁচিয়া আছে কি না, তাহা তাঁহাকে বলিতে পারিল না। সে বলিল, নার ওয়াংএর ছেলে তাহার নৌকায় রহিয়াছে, সে সেই খবর জানিতে পারে।

ছেলেটী আসিয়া বলিল,—"আমার বাবা খুন হইয়াছেন, তিনি খাড়ির অপর পারে পড়িয়া আছেন।"

গর্ডন একটী নৌকায় চড়িয়া খাড়িটী পার হইলেন। গিয়া দেখেন, ওয়াংদের বীভৎসভাবে মস্তকচ্যুত দেহগুলি তীরে পড়িয়া রহিয়াছে।

লি হাঙ্‌ চাঙ্‌ ও সেনানী চীঙ্‌ তাহাদের এবং গর্ডনেরও শপথ-ভঙ্গ করিয়াছে। লি হাঙ্‌ চাঙ্‌এর গৃহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছে।

চৈনিক শাসনকর্ত্তা অনেক অছিলা করিল, নির্লজ্জভাবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার বিস্তর হেতু দেখাইল।

কিন্তু গর্ডন তাহার হেতুপ্রদর্শনে কর্ণপাত করিলেন না। এইরূপ শুনা যায় যে, গর্ডন এই সময়ে ক্রোধান্ধ হইয়া পিস্তলহস্তে লি হাঙ্‌ চাঙ্‌কে তাড়া করিয়া যান, তিনি তখন তাহাকে কুক্কুরের মত গুলী করিয়া মারিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু সে তখন বুদ্ধিপ্রকাশপূর্ব্বক আত্মগোপন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, গর্ডন তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। তখন গর্ডন লিকে শাসনকর্ত্তার পদে ইস্তফা দিতে আদেশ করিয়া এক পত্র লিখেন; তিনি জানান, এই আদেশের অন্যথা করিলে, চৈনিকেরা বিদ্রোহীদিগের নিকটহইতে যে সমস্ত প্রদেশ-অধিকার করিয়াছে, তাহা তিনি পুনরধিকৃত করিয়া বিদ্রোহীদিগকে ফিরাইয়া দিবেন। তাঁহার তখন যেমন ক্রোধ হইয়াছিল, তেমনই লজ্জা হইয়াছিল।

লি হাঙ্‌ চাঙ্‌ তখন সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিল। সে তখন হালিডে মাকার্টনী-নামে একজন বিচক্ষণ ও বীর ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার ও গর্ডনের মধ্যে মনোমালিন্য মিটাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করে। এই সামরিক কর্ম্মচারী গর্ডনের বন্ধু ছিলেন, তিনি তখনই একটী দেশীয় নৌকায় চড়িয়া কুইন্‌সানে যাত্রা করিলেন এবং মধ্যরাত্রিতে কুইন্‌সানে পঁহুছিলেন; গর্ডন তখন নিদ্রিত ছিলেন। মাকার্টনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া গর্ডন অবিলম্বে তাঁহাকে তাঁহার শয়ন-গৃহে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। মাকার্টনী উপরে গিয়া দেখিলেন, গর্ডন স্বীয় মন্দালোকিত শয়ন-প্রকোষ্ঠে তাঁহার বিছানার উপর বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি ঝুঁকিয়া কি একটা বস্তু তাঁহার শয্যাতলহইতে বাহির করিলেন, তাহার পর তাহা মাকার্টনীর চোকের সাম্‌নে ধরিলেন।

পরে কহিলেন, "এটা কি বল তো?"

মাকার্টনী আতঙ্কে নিমেষশূন্য নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন, তাহা যে কি বস্তু, তাহা তিনি অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইলেন না।

গর্ডন বলিলেন,—"এটা অন্যায়ভাবে নিহত নার ওয়াংএর মাথা!" এই বলিয়া তিনি খুব ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

হালিডে ম্যাকার্টনী তখন বুঝিলেন যে, লির বিশ্বাসঘাতকতা গর্ডন সহজে ক্ষমা করিতে পারিবেন না। পরে গর্ডন দুইমাস যাবৎ নিজ আবাসে রহিলেন, তখন তাঁহার আদেশে ওয়াংদিগের হত্যাকাণ্ডসম্বন্ধে তদারক হইতেছিল।

এই সময়ে চৈনিক গবর্ণমেণ্ট গর্ডনের কার্য্যে যে, কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা জানাইবার নিমিত্ত তদ্দেশীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরের প্রাপ্য একটি স্বুবর্ণ পদক-প্রেরণ করেন। তদ্ভিন্ন চৈনিক সম্রাট্‌ স্বয়ং তাঁহাকে ১০,০০০ "টায়েল" অর্থাৎ ৪৫,০০০ টাকা-পুরস্কার ও অনেক মূল্যবান্‌ উপঢৌকন-প্রেরণ করেন। সেই সকল ধন-রত্ন মস্তকে লইয়া যখন বাহকেরা গর্ডনের আবাসে উপস্থিত হইল, তখন গর্ডন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ওয়াং-হত্যা-সম্বন্ধে নীরব থাকিবার নিমিত্তই চৈনিক গবর্ণমেণ্ট ও সম্রাট্‌প্রেরিত উৎকোচ-ব্যতীত উক্ত পদক পুরস্কার আর কিছুই নহে। তিনি তাই তাঁহার "যাদুদণ্ড"-হস্তে রত্নবাহকদিগকে তাড়া করিয়া গেলেন এবং বিস্মিত ও ভীত বাহকদিগকে যষ্টিপ্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

যদিও গবর্ণমেণ্ট গর্ডনকে পদক-প্রেরণ করিয়াছিলেন, তথাপি সুচাও-অধিকারের তাবৎ প্রশংসা লিঙ্‌ হা চাঙ্‌ আত্মসাৎ করিল।

সে, তাহার সৈনিকেরা কেমন করিয়া সুচাও-অধিকার করিয়াছে, তাহার বিবরণী প্রকাশিত করিল; কিন্তু গর্ডন যখন যুদ্ধস্থলে গুলী-গোলাবর্ষণের মধ্যে থাকিয়া আত্মপ্রাণ মুহুর্মুহুঃ বিপন্ন করিতেছিলেন, লি তখন সাংহাইএ নিরাপদে অবস্থান করিতেছিল, ঐ স্থানটি অবরুদ্ধ নগরহইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল!

গর্ডনের ক্রুদ্ধ হইবার বিশেষ কারণ ছিল। লিকে ক্ষমা না করিবার এবং চীনদেশকে বিদ্রোহীদের হস্তে ছাড়িয়া যাইবারও তাঁহার সবিশেষ হেতু ছিল।

কিন্তু গর্ডন "আমরা যেমন আপনাপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের অপরাধসকল ক্ষমা কর"—এই শাস্ত্রবাক্যের সম্যক্‌ মর্ম্মবোধ করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া চীনের প্রজাপুঞ্জের দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল। তাই, শাসকেরা যাহাই করুন না কেন, তিনি তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের পীড়নকারী টাএপিঙ্‌দিগের হস্তহইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি না দিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন না।

এইজন্য ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মাসে গর্ডন পুনরায় চৈনিক-সেনার অধিনায়কতা-গ্রহণ করিলেন। তদবধি ১১ই মেপর্য্যন্ত তিনি অনবরত যুদ্ধ করিয়া চৈনিক সম্রাটের সপক্ষে শক্তিসঞ্চয় করিতে থাকিলেন।

১০ই মে গর্ডন তাঁহার জননীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি

,যেমন দীনবেশে চীনে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তেমনই দীনবেশে এই দেশ-পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, কিন্তু আমার মনে এই এক সান্ত্বনা জন্মিয়াছে যে, আমার সাহায্যে এই দেশের আশীহাজার-হইতে একলক্ষ লোকের জীবন-রক্ষা হইয়াছে, ইহার অপেক্ষা সন্তোষের বিষয় আমার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।"

১১ই মে-তারিখে গর্ডন বিদ্রোহীদিগের শেষ-দুর্গ চাঙ্কু অধিকৃত করেন, তাহাতেই বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। "স্বর্গীয় রাজা" নান্‌কিন্‌-স্থিত প্রাসাদে প্রথমে তাহার স্ত্রীদিগকে বধ করিয়া পরে আত্মহত্যা করে। তখন অন্যান্য বিদ্রোহী-সর্দারেরা নিহত হয়।

চৈনিক-সেনার অধিনায়কতা ছাড়িবার পূর্ব্বে চৈনিক গবর্ণমেণ্ট গর্ডনকে পুনরায় অনেক টাকা দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু গর্ডন পুনরায় তাহা লইতে অস্বীকৃত হয়েন। কিন্তু টি-তূ অর্থাৎ সেনানী-শ্রেষ্ঠ হইবার মহাসম্মান-প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই, তাহাছাড়া "পীত-কুর্ত্তা"-পরিধানের মহামান্যও তিনি উপেক্ষা করিতে অক্ষম হন। উহা ইংরাজ সৈনিকের ভিক্টোরিয়া ক্রশ-লাভের তুল্য সম্মান। গর্ডন পীত-কুর্ত্তাটি, তাহাছাড়া মান্দারিণের পরিধেয় ছয়টি মূল্যবান্ পরিচ্ছদ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। মান্দারিণের পরিধেয় উষ্ণীষের এক-একটী বোতামের মূল্য ৪৫০হইতে ৬০০ টাকাপর্য্যন্ত ছিল। রাজমাতাও তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে একটী গুরুভার স্বর্ণপদক-উপহার দেন। এই শেষোক্ত বস্তুটি গর্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ছিল, তথাপি এই বস্তুটির গর্ডন পরে কি ব্যবহার করেন, তাহা আমরা জানাইব।

নিক বিদ্যালয়।

অনন্তর চৈনিক গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, গর্ডন তাঁহাদিগের নিকটহইতে কোন পুরস্কার লইতে অনিচ্ছুক, অতএব মহারাণী ভিক্টোরিয়া যেন তাঁহাকে যথোপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করেন। মহারাণী চৈনিক গবর্ণমেণ্টের সেই উপরোধ-রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর গর্ডন মেজরের পদহইতে লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেলের পদে উন্নীত হয়েন এবং "কম্প্যানিয়ন অব দি বাথ" এই উপাধি-লাভ করেন।

কেবল চীনে নয়, ইংলণ্ডেও গর্ডন বীরবৎ পূজিত হন। সেই সময়ের "টাইমস্"-পত্রিকায় এই কথা লেখা হইয়াছিল, "গর্ডন প্রথমতঃ তাঁহার বাহুবলে পরে তদপেক্ষা দ্রুতভাবে তাঁহার নামের সহিত সংজড়িত ভীতিপ্রভাবে চীনদেশকে বিজয়ী দস্যুদলের হস্তহইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"

এই সময়ে গর্ডন যাহা চাহেন, লি হাঙ্ চাঙ্ তাহাই করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাই গর্ডন তাঁহার সৈন্যদিগের নিকটহইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে, তাহারা যাহাতে প্রচুররূপে পুরস্কৃত হয়, তাহার ব্যবস্থা দেখিয়া গেলেন।

তাঁহার অধীন সৈনিকেরা যে, তাঁহাকে বড় ভাল বাসিত, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই; এমন কি, যে বিদ্রোহীরা তাঁহার নামে কাঁপিত, তাহারাপর্য্যন্ত তাঁহাকে ভালবাসিত।

ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলে, "চৈনিক গর্ডন"কে দেশের যাবৎ লোকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। দেশের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের তিনি নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে গর্ডন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি তখন বীরের সম্মানে ভূষিত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি আমার কর্ত্তব্য-পালন করিয়াছি মাত্র।" লোকে তাঁহার প্রশংসা ও সুখ্যাতি করিতে থাকিলে, তিনি লজ্জিত হইতেন। তিনি কোন নিমন্ত্রণ-গ্রহণ করিলেন না। দেশশুদ্ধ লোক দেখিল, গর্ডন যে কেবল কোন প্রশংসা-শ্রবণ করিতে অসম্মত, তাহা নহে, তিনি এখনও শিশুবৎ সরল ও লাজুক রহিয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

——:০:——

জীবন-জল।

(উপকথা।)

একসময়ে এক রাজার ভারি অসুখ করিয়াছিল, অসুখ এত বাড়িয়াছিল যে, তাঁহার প্রজারা মনে করিয়াছিল, তিনি মারা পড়িবেন। রাজ্যে যত কবিরাজ ছিল, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়াছিল, কিন্তু কেহই ভাল করিতে পারে নাই। রাজার তিন ছেলে ছিল, যখন তাহারা দেখিল যে, সব কবিরাজই জবাব দিয়া গেল, তখন তাহারা বাপের জন্য বড় কাঁদিতে লাগিল। তাহারা কাঁদিতেছে, এমন সময়ে এক বুড়া আসিয়া তাহাদের বলিল,—"কি গো রাজকুমারেরা! তোমরা সব কাঁদ্‌ছ কেন?"

রাজকুমারেরা বলিল,—"আমাদের বাবার বড় অসুখ হ'য়েছে, কিছুতেই ভাল হচ্ছেন না।

বুড়া বলিল,—"তাঁ'কে 'জীবন-জল' খাওয়াতে পার; সে জল খেলেই, তিনি ভাল হ'য়ে যাবেন; কিন্তু সে জল পাওয়া বড় মুস্কিল।"

বড় রাজকুমার বলিল,—"আমি চেষ্টা-চরিত্র ক'রে, যেখানথেকে পারি, সেই জল এনে বাবাকে খাওয়া'ব।" এই বলিয়া সে তাহার বাপের কাছে গিয়া সেই আশ্চর্য্য জল আনিতে যাইবার জন্য হুকুম চাহিল; কিন্তু তাহার বাবা ভাবিলেন, সেই জল আনিতে গেলে, তাঁহার ছেলে বড় বিপদে পড়িবে, তাই তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। বড় রাজকুমার কিন্তু বড়ই জিদ্ করিতে লাগিল, তাই রাজা শেষে তাহাকে যাইতে দিলেন।

পথে যাইতে যাইতে রাজকুমারের একজন বেঁটে লোকের সঙ্গে দেখা হইল, বামন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ও রাজকুমার, এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় চলেছ?"

রাজ-কুমার তাহাকে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিল,—"যেখানেই যাই না কেন, তোর কি?"

এই কথায় বামন রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

বড় রাজকুমার ঘোড়া ছুটাইয়া যাইতে যাইতে দুই পাহাড়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। কুমার সেই পথের আধাআধি গিয়াছে, এমন সময়ে তাহার পিছনে ও সাম্নে পাহাড় দু'টি যুড়িয়া গেল। রাজ-কুমার সেই পাহাড়-দু'টির মধ্যে কয়েদ হইয়া রহিল।

অনেকদিন গেল, তবু বড় রাজকুমার ফিরিতেছে না দেখিয়া মেজ রাজ-কুমারও রাজার কাছে কাকুতি-মিনতি করিয়া হুকুম লইয়া জীবন-জলের খোঁজে বাহির হইল।

পথে যাইতে যাইতে তাহারও বামনের সঙ্গে দেখা হইল। বামন তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথা যাচ্ছ, হে রাজকুমার?" মেজ রাজ-কুমারও চটিয়া লাল, বলিল,—"আরে ম'ল, মরকুটে মিন্সে, যেথাই যাই না কেন, তোর সে খবরে কাজ কি?"

বামন তাহার উপর চটিয়া যাদু করিয়া তাহাকেও দুই পাহাড়ের মাঝে আটক করিয়া রাখিল।

মেজ রাজ-কুমারও ফিরিল না দেখিয়া ছোট রাজকুমার তাঁহার বাপের কাছে জীবন-জল আনিতে যাইবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া হুকুম চাহিতে লাগিলেন। রাজা কিছুতেই কোলের ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে চান না—অনেকবার না, না করিয়া শেষে ছেলের জিদ্ দেখিয়া—কি করেন—হাঁ বলিলেন।

ছোট রাজকুমারেরও পথে বামনের সঙ্গে দেখা হইল। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বলি, ও রাজকুমার, এত তাড়াতাড়ি তড়্বড়্ ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় চলেছ?" রাজকুমার চু চু করিয়া ঘোড়া থামাইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"মশাই, জীবন-জলের খোঁজে চলেছি। আমার বাবার বড় অসুখ, সেই জল খেলে ভাল হ'বেন। সেই জল কোথায় পাওয়া যায়, জানেন?"

বেঁটে লোকটি বলিল,—"তুমি বেশ ধীর, তোমার দাদাদের মত খেঁকী-মেজাজের লোক নও, জীবন-জল কোথায় পাওয়া যায়, আমি জানি, তোমাকে বলে দিচ্ছি। একটা কেল্লার ভেতর সেই জীবন-জলের কূঁয়ো আছে; সেই কেল্লাটা কিন্তু যাদু করা আছে। আমি তোমাকে একটা লোহার দাণ্ডা আর তিনখানি অফুরাণ পাঁউরুটি দেব। কেল্লার নাচ-দরোজায় তুমি সেই লোহার দাণ্ডা দিয়ে তিনবার ঘা মেরো, তা'তে দরোজা খুলে যা'বে। কেল্লার ভেতর ঢুকে তুমি তিনটে সিংহী হাঁ ক'রে আছে, দে'খ্‌তে পা'বে। তা'দের তিনজনের দিকে রুটি-তিনটে ফেলে দিও। তা'র পরে কূঁয়োর দিকে ছুটে যেও। দুপুরের আগে কূঁয়োথেকে জল তুলে নিও, নইলে কেল্লার ফটক বন্ধ হ'য়ে যাবে, তুমি আর বা'র হ'তে পা'র্‌বে না।"

রাজকুমার বামনের খুব সুখ্যাতি করিয়া তাহার কাছহইতে লোহার দাণ্ডা আর রুটি-তিনখানি লইয়া আবার ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ছুট্ দিলেন। বামন যেমন যেমন বলিয়াছিল, ঠিক তেমনই তেমনই হইল। তিনবার লোহার দাণ্ডা-দিয়া ঘা দেওয়াতে, ঝপ্ করিয়া ফটক খুলিয়া গেল। এদিকে সিংহদের দিকে পাঁউরুটি ফেলিয়া দেওয়াতে, তাহারা সেই রুটী-তিনটি খাইতে লাগিল। রাজ-কুমার কেল্লার ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। এ-ঘর সে-ঘর দিয়া মস্ত একটা কামরায় গিয়া ঢুকিলেন। সেখানে কি দেখিলেন? দেখিলেন—

শুইয়া সোণার খাটে এক রূপে আলোকরা মেয়ে,
কোঁকড়া কোঁকড়া, এলো, কালো চুলে বিছানাটি ছেয়ে।
আঙুলে আঙটি তাঁ'র, হীরা তা'য় করে ঝল্‌মল্।
পাশে এক প'ড়ে খাঁড়া, দেখিলেই কাঁপে বক্ষঃস্থল!
আর আছে, একখানি থাল-যোড়া রুটী ভাজা;
থালাখানি ঝকমকে, যেন সে'টী এখনই মাজা।

দেখিয়া রাজকুমার মোহিত হইলেন। সেই মেয়েটির আঙুলের আঙ্‌টী লইয়া নিজে পরিলেন, আর তাঁহার নিজের আঙুলের আঙ্‌টী লইয়া তাঁহাকে পরাইতে গেলেন, তাহাতে মেয়েটীর ঘুম ভাঙিয়া গেল, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এসেছেন আপনি?" এই বলিয়া তিনি রাজকুমারকে রুটিখানি দিয়া বলিলেন,—"এই একখানি রুটি দিয়ে লাখ লাখ লোক-খাওয়ান যায়।" তাহার পর তাঁহার হাতে খাঁড়াটিও দিয়া বলিলেন,—"বীর আপনি, এ আপনারই উপযুক্ত হাতিয়ার। এটি যা'র সঙ্গে থাকে, সে যুদ্ধে অজেয় হয়।" তাহার পর কুমারী তাঁহাকে জীবন-জলের কূঁয়াও দেখাইয়া দিলেন। পরে বলিলেন,—"আপনার বয়স কম, আমারও এখন বয়স কম, আমা-

দের বিয়ের বয়স হ'লে, আপনি আবার আমার কাছে আ'স্‌বেন — আমি আপনারই।"

এইরকম অনেক কথা হইতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে রাজকুমার বেলা বারোটার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনিলেন, একটা ঘড়ীতে এগারটা বাজিতে এক কোয়ার্টার বাজিতেছে। তাড়াতাড়ি কুমারীর কাছহইতে বিদায় লইয়া রাজকুমার কুঁয়ার দিকে ছুটিয়া গেলেন, কুঁয়াহইতে জীবন-জল তুলিয়া লইয়া ঠিক বারটার সময় ফটকের ধারে পঁহুছিলেন।

পথে যাইতে যাইতে কুমার অনেক দেশে আকাল হইয়াছে, দেখিতে পাইলেন। সে সমস্ত দেশের লোককে তিনি তাঁহার রুটি খাওয়াইয়া বাঁচাইলেন। এক দেশে শুনিলেন, একটা লোক অন্যায় করিয়া এক রাজার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে। তিনি সেই রাজার হইয়া সেই খাঁড়া লইয়া যুদ্ধ করিয়া যাঁহার রাজ্য তাঁহাকে পাওয়াইয়া দিলেন।

শীঘ্রই তাঁহার আবার বামনের সঙ্গে দেখা হইল। রাজকুমার বামনকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনার দয়ায় আমি জীবন-জল পেয়েছি, আপনার এই উপকার আমি জীবন থা'ক্‌তে ভুল্‌'ব না। আর একটী উপকার আমি আপনার কাছে চাই—সেই উপকারটি ক'র্‌লে, আমি আপনার চিরদিনের কেনা-গোলাম হ'য়ে থা'ক্‌ব। আমার দাদারা কোথায়, ব'ল্‌তে পারেন? জানেন তো দয়া ক'রে বলে দিন।"

তখন বামন বড় ও মেজ রাজকুমারের কি হাল হইয়াছে, তাহা বলিয়া দিল। ছোট রাজকুমার তখন তাঁহার দাদাদের ছাড়িয়া দিবার জন্য বামনের কাছে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর বামন বড় ও মেজ রাজকুমারকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হইল। শেষে বলিল,—"কিন্তু দেখো, সাবধান থেকো, তোমার দাদা-হু'টি ভারি হিংসুটে।"

ছাড়া পাইয়া বড় ও মেজ রাজকুমার ছোট রাজকুমারকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিল। তাহারা তিন ভাইয়ে সমুদ্র দিয়া জাহাজে করিয়া দেশে ফিরিয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে ছোট রাজকুমার, কি করিয়া জীবন-জল আনিয়াছেন, তাহা তাঁহার দাদাদের বলিলেন।

এক রাত্রিতে ছোট রাজকুমার জাহাজের কামরায় ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময়ে বড় ও মেজ রাজকুমারে মিলিয়া তাঁহার জীবন-জলের বোতল-চুরী করিয়া তাহাহইতে জীবন-জল ঢালিয়া লইল এবং তাহাতে সমুদ্রের লোণা জল পুরিয়া বোতলটী আবার তাঁহার কাছে রাখিয়া আসিল। বাড়ী পঁহুছিয়া ছোট রাজকুমার তাড়াতাড়ি তাঁহার ব্যারামী বাপকে সেই জল খাওয়াইয়া দিলেন।

সেই জল খাইয়া রাজার অসুখ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি সেইজন্য অসন্তুষ্ট হইয়া বক্‌বক্‌ করিতেছেন, এমন সময়ে বড় ও মেজ রাজ-কুমার জীবন-জল আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিল। সেই জল খাইয়া রাজা অবশ্য ভাল হইয়া গেলেন।

রাজা তখন ছোট রাজকুমারের উপর ভারি চটিয়া গেলেন, ভাবিলেন, তাঁহার ছোট ছেলে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইতে চাহিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার বড় ছেলেদের ও আরও গুটিকতক লোকের সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ছোট রাজকুমারকে শিকার করিতে লইয়া যাওয়া হইবে, সেখানে তাঁহাকে তীর মারিয়া মারিয়া-ফেলা হইবে।

একজন শিকারীর সঙ্গে ছোট রাজকুমারকে শিকার করিতে পাঠান হইল। রাজকুমার দেখিলেন, শিকারী মুখ চূণ করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিকারী, অন্য দিন তুমি হাস-খোস আজ মুখে রা নেই কেন?"

তখন শিকারী সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া রাজকুমারের ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। যুদ্ধ করা এক কথা, কিন্তু জানিব না, শুনিব না, একজন লোক লুকাইয়া আমার প্রাণটী বাহির করিয়া দিবে, সে বড় ভয়ানক কথা। তখন শিকারী বলিল,—"রাজকুমার, ভয় ক'র্‌বেন না, আমি আপনাকে মা'র্‌তে চাই না। আপনি আমার পোষাক প'রে এই বনেই কিছুদিন লুকিয়ে থাকুন।"

কিন্তু জীবন-জল লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার সময় রাজ-কুমার যে সমস্ত দেশের লোককে সেই রুটী খাওয়াইয়া বাঁচাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত দেশহইতে ভাল ভাল সোণা ছোট রাজকুমারের নামে রাজার কাছে আসিতে লাগিল। তখন রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ছোট ছেলেটী খুব ভাল লোক ছিলেন। তখন রাজা ছেলের জন্য হা হা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিকারী তাহা দেখিয়া রাজার কাছে আসিয়া বলিল, —

"আপনার ছেলেটীর যায় নি জীবন,
আলো করি' কুমারজী আছেন কানন।"

রাজা তাহা শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া রাজ্যময় এই ঢেঁটরা পিটাইয়া দিলেন যে, ছোট রাজকুমার যদি ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে রাজা আবার তাঁহাকে আগেকার মত ভালটাল বাসিবেন।

এদিকে ছোট রাজকুমার আর সেই কুমারী হু'জনেই বেশ বড় হইয়া উঠিলেন। কুমারী সেই দেশের রাণী ছিলেন। তিনি তাঁহার হবু স্বামীর আসার আশায় একটী সোণার রাস্তা তৈয়ারী করাইলেন। তাহার পর আপনার প্রজাদের বলিয়া দিলেন, "দেখ, যিনি এই রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে আ'স্‌বেন, কেবল তাঁ'কেই আমার রাজ্যে ঢু'ক্‌তে দেবে, অন্য কাউকে ঢু'ক্‌তে দেবে না।"

ছোট রাজকুমারের দুষ্ট দাদারা তাঁহার মুখে কুমারীর কথা শুনিয়াছিল, তাহারা হু'জনেই দুই দিক্‌ দিয়া কুমারীকে বিবাহ করিতে চলিল, কিন্তু সোণার রাস্তায় পহুঁছে, তাহারা হু'জনেই ভাবিল, "সোণার রাস্তায় ঘোড়া চালিয়ে গিয়া রাস্তাটা মাটী ক'র্‌ব,

তা'র চেয়ে অন্য পথ দিয়ে যাই।" এই ভাবিয়া তাহারা অন্য রাস্তা দিয়া কুমারীর রাজ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিল। প্রজারা তাহাদের দু'জনকেই নাস্তানাবুদ করিয়া গলা-ধাক্কা দিয়া বিদায় করিল!

ছোট রাজকুমারও বনহইতে কুমারীকে বিবাহ করিতে চলিলেন। তিনি কুমারীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে এত অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতেছিলেন যে, কখন যে সোণার পথ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া গেলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তাই প্রজারা তাঁহাকে খুব খাতির করিয়া রাজ্যের মধ্যে ঢুকিতে দিল।

কুমারী তাঁহাকে দেখিয়া খুব আহ্লাদিতা হইলেন। তিনি

সিমলা-শৈলে সম্রাটের জন্মদিন-উপলক্ষে সৈন্য-প্রদর্শনী।
এই চিত্রে গবর্ণর ও বর্ত্তমান জঙ্গীলাট-মহোদয় আছেন।

তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, আর তাঁহার রাজ্য তাঁহার স্বামীকে দিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার ভাসুরেরা তাঁহার

স্বামীকে বড় কষ্ট দিয়াছেন, তখন তিনি শ্বশুরের কাছে গিয়া সত্য কথা বলিয়া দিলেন। পীঠটান দিয়াছিল। জাহাজটা সমুদ্রে খোয়া যায়, তাহাতে দুই রাজকুমারই জলে ডুবিয়া মারা পড়ে।
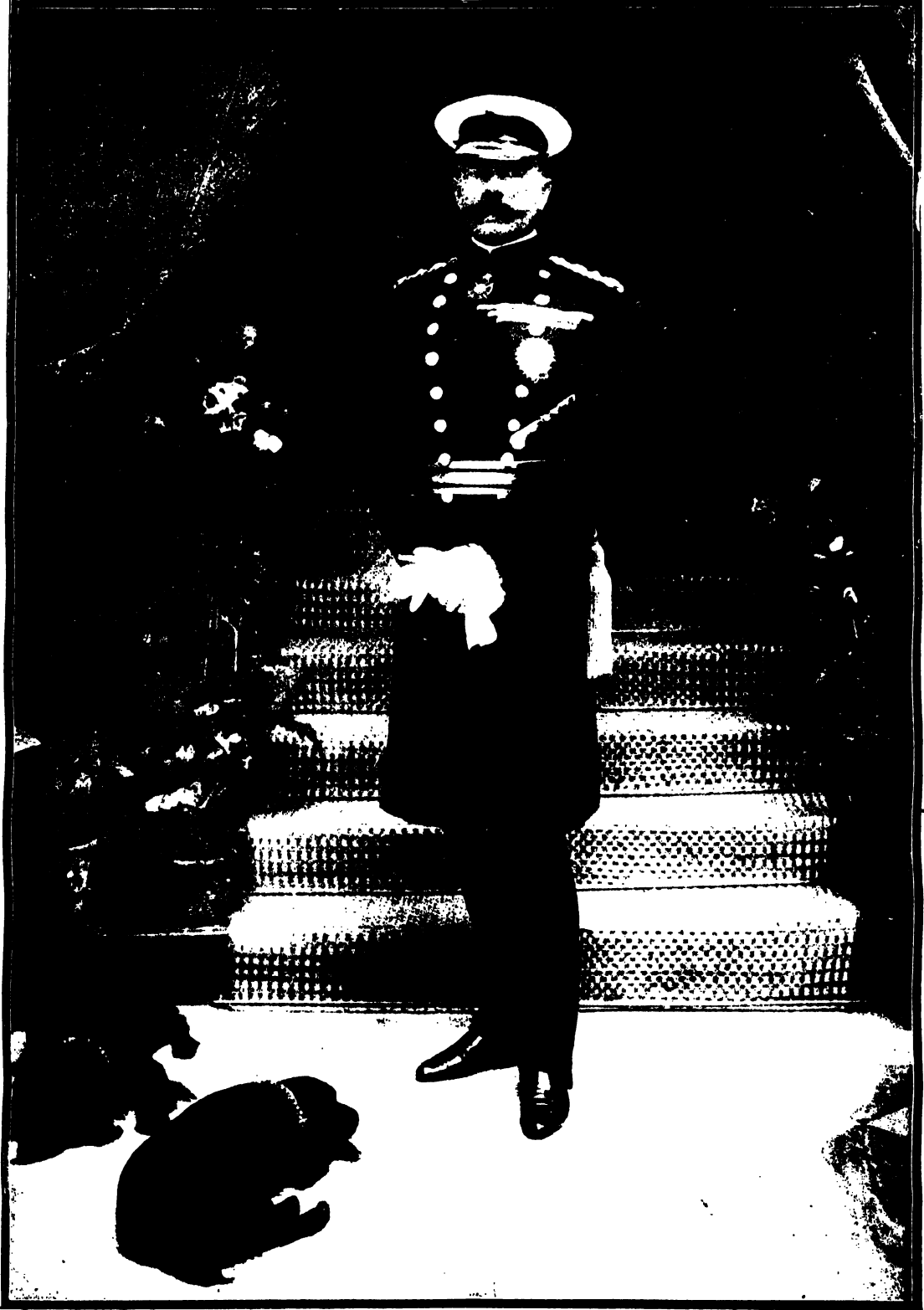
Photo by বর্ত্তমান সমর-সচীব আর্ল কিচেনার। Messrs. Bo & Shepherd, Calcutta.

রাজা শুনিয়া রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বড় ছেলেদের শাসন করিতে হুকুম দিলেন; কিন্তু তাহারা তাহার আগেই জাহাজে করিয়া

আমার কথাটি ফুরা'ল,
নটে-গা'ছটি মুড়া'ল।—ইত্যাদি।

রাসভের রস-কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নন্দদুলাল বলিয়া ছেলেটাকে দেখিলেই, কেন জানি না, আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিত। সে যেমন ভীরু, তেমনই কাপুরুষ। সে যে আমার বন্ধু, বেচারা ভূতিকে, মারিয়া ফেলিয়াছিল, ইহা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলাম না। তাই একদিন সে যখন আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া আমার উপর চড়িবার জন্য জিদাজিদি করিতে লাগিল, তখন আমি ভাবিলাম, এইবার আমি বানরটাকে যোএ পাইয়াছি, এইবার আমি বাছাধনকে আচ্ছা করিয়া নাকাল করিয়া ছাড়িব।

আমাদের গৃহসংলগ্ন বাগানের পাশেই একটা বন ছিল। বনের পাশেই একটা গভীর, কানায় কানায় কাদা-ভরা পগার ছিল। নন্দ গুমোর করিতেছিল যে, সে খুব ভাল সওয়ার, যে পগারটার কথা বলিয়াছি, সেই পগারটা নাকি সে আমার উপর চড়িয়া এক-লাফে পার হইয়া যাইতে পারে। কাহারও সে কথায় বিশ্বাস হইল না, তবুও তাহারা নন্দ কেমন পগার-পার হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমাকে লইয়া সেই বনের ভিতরে চলিল।

নন্দ আমার পীঠের উপর ভাল করিয়া চড়িয়া বসিতে না বসিতেই, আমি পথ ছাড়িয়া ঝোপ-ঝোড়ের ভিতর দিয়া চোঁচা দৌড় দিলাম। নন্দ আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা, এই পথেই চল, তুমি পগারপর্য্যন্ত পৌছলেই, আমি এক লাফে সেটা পার হ'য়ে যা'ব!"

আমি মনে মনে বলিলাম, "বটে?" খানিকটা আমি বেশ শান্ত-শিষ্টের মত ছুটিলাম, তাহার পর হঠাৎ একটা কাঁটা-বনের মধ্যে ঢুকিয়া ছুটিতে সুরু করিলাম। আমার গায়ের চামড়া শক্ত, কাঁটায় আমার কি করিবে? নন্দর কিন্তু মুখ, হাত, পা বেড়ে কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তাহার কাপড়ে হরেকরকমের কাঁটা লাগিয়া গেল, পগারপর্য্যন্ত পঁহুছিতে না পঁহুছিতে তাহার যে, কি চমৎকার চেহারা হইল, তাহা আর কি বলিব; তখন তাহার পগার ডিঙাই-বার খেয়াল একেবারে লোপ পাইয়াছে, আমাকে থামাইবার ও আমার পীঠহইতে নামিয়া পড়িবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে!

আমি মনে মনে বলিলাম,—"সে হচ্ছে না, যাদু, আমি এখন তোমাকে কিছুতেই পীঠ:থেকে না'ব্‌তে দিচ্ছি নে, তোমাকে সায়েস্তা ক'র্‌বার এমন সুযোগ আর পা'ব না—বড় অহঙ্কার তোমার!" এই বলিয়া আমি উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পগারের কিনারা-পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া এক ঝাঁকড়া মারিয়া নন্দকে পগারের পাঁকের মধ্যে পপাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলাম। শোঁক নন্দ, পাঁকের সুগন্ধ! ঠিক সেই সময়ে অন্য ছেলেরাও পথ দিয়া সেখানে আসিয়া পহুঁছিল। আমি পগারের দিকে তাকাইয়া আছি, আর নন্দ নাই, দেখিয়া ছেলেরা অবাক্ হইয়া গেল।

তাহারা চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"নন্দ, নন্দ, কোথায় রে তুই।"

নন্দ। এই যে, পগারে প'ড়ে গেছি, দুর্গন্ধে মরে গেলুম, কেউ আমাকে তোল্ রে!

ছেলেরা পগারের দিকে নজর করিল। নন্দ তখন দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু পাঁকের ভিতর গলাপর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছে। "ওরে আমাকে কেউ তোল্‌রে, নইলে ডুবে যা'ব—ম'রে যা'ব।"

নন্দর চীৎকার শুনিয়া দুইজন চাষা, কি হইয়াছে, তাহা দেখিতে ছুটিয়া আসিল। নন্দকে পগারে নাকানিচুবানি খাইতে দেখিয়া, কাছেই একটা বাঁশ পড়িয়াছিল, তাহারা তাহার এক মুখ নন্দর দিকে বাড়াইয়া দিল, নন্দ তাহা দুই-হাত-দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া রহিল, চাষারা বাঁশের আর এক মুখ জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে অতি কষ্টে ডাঙায় তুলিল। তখন তাহার সমস্ত গায়ে পাঁকের পলস্তারা জড়াইয়া গেছে। পাঁকের ঠাণ্ডা লাগিয়া আর ভয়ে সে তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। আমার মনে তখন একটু একটু আপশোষ হইতে লাগিল। ছেলেদের পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম, তাহারা তখন তাড়াতাড়ি নন্দকে বাড়ী লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পরদিন আমি শুনিলাম, নন্দর ভারি অসুখ করিয়াছে। সে এখন শয্যাশায়ী, ডাক্তার ভয় করিতেছেন, তাহার জ্বর হইবে এবং সে মাসেকখানিক শয্যাশায়ী হইয়া থাকিবে। গৃহিণী তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। নন্দ তাঁহাকে বলে, "ছেলেদের আর গাধাটার পীঠে চ'ড়্‌তে দেবেন না; আমি ভাল হই, তা'র পর সব কথা ব'ল্‌ব।"

শুনিয়া আমার একটু ভয় হইতে লাগল। "মনের অগোচর তো পাপ নাই?" নন্দ ভাল হইলে, সকল কথা বলিয়া দিল, তখন সকলেই আমার উপরে অসন্তুষ্ট হইল।

পরদিন সকালে রাখাল আসিয়া আমার দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইতে লাগিল।

খানিক বাদে পোনাও আসিল, বলিল,—"গাধু, দেখ দেখি, তুমি কি ক'রেছ, ঠাকুর-মা আর আমাকে তোমার পীঠে চ'ড়্‌তে দেবে না। কোন দিন আমাকেও হয়তো তুমি উলটিয়ে ফেলে দেবে। তুমি এমন দুষ্টুমি ক'র্‌লে কেন?"

আমার তখন বলিবার ইচ্ছা হইল, নন্দ বদ্‌মায়েস্, তাই তাহাকে

ফেলিয়া দিয়াছি, তোমাদের ফেলিব কেন? কিন্তু মানুষের ভাষা আমি জানি না, তাই খালি মাথা নীচু করিয়া আমার নাকটা পোনার কাঁধে ঠেকাইলাম।

রাখাল বলিল,—"খোকাবাবু, সাবধান! গাধাটা কা'ম্‌ড়ে দিতে পারে, তফাতে থাক।"

পোনা আমার কাছহইতে একটু সরিয়া গেল। রাখাল আমায় গালি দিতে লাগিল। তাহাতে পোনার মনে বড় দুঃখ হইল, সে বলিল,—"আহা, বেচারা গাধু! কেউ তোমায় ভাল না বাসে, আমি বা'স্‌ব। তবে আমি আর তোমার পীঠে চ'ড়্‌ব না। তুমি আবার লক্ষী হ'বে—হ'বে তো?"

শুনিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল। পোনা চলিয়া গেলে, আমি মনের দুঃখে মাঠে গিয়া বসিলাম, আর আমি কি কি কুকাজ করিয়াছি, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময়ে শুনিলাম, দূরে কে তিনজন লোক কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। ভাল করিয়া দেখিয়া তাহাদের আমি চিনিতে পারিলাম। তাহারা সেই বাজীকর, তাহার স্ত্রী ও ছেলে। আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তাহাদের কথাবার্ত্তাহইতে বুঝিতে পারিলাম যে, যে দিনকার কথা আগে বলিয়াছি, সেই দিন তাহাদের খেলারাম খোঁড়া হইয়াছে, তাহাকে লইয়া আর বাজী দেখান চলে না; তাই তাহারা তাহাকে একজায়গায় ভাল হইবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এখন তাহাদের রোজগারের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে, কয়দিন তাহাদের আহারপর্য্যন্ত হয় নাই। শুনিয়া আমার মনে বড় দুঃখ হইল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে লাগিলাম। এক সরাইএ পঁহুছিয়া তাহার জোন খাটিয়া চারিটি খাইতে চাহিল। সরাইএর মালিক বলিল,—"আমার জোন-মজুরের দরকার নাই, পথ দেখ।"

বাজীকরেরা তাহা শুনিয়া চলিয়া যাইতেছিল, আমি তখন পিছনকার দুই পায়ে ভরদিয়া দাঁড়াইয়া নাচিতে সুরু করিলাম! এমন সব মজা দেখাইতে লাগিলাম যে, তাহা দেখিতে বিস্তর লোক জড় হইল, তখন আমি বাজীকরের মাথাহইতে তাহার ময়লা টুপীটা খপ্‌ করিয়া মুখ দিয়া তুলিয়া লইয়া লোকদের সাম্‌নে ধরিতে লাগিলাম। এইরকম করিয়া আনা-তিনেক পাওয়া গেল। তাহা আমি বাজীকরের স্ত্রীর কোলে ঢালিয়া দিলাম। তাহা খরচ করিয়া তাহারা সরাইএ খাইল, আমাকেও ঘাসজল খাইতে দিল। পরদিনও আমি তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া আর একজায়গায়—এক হাটে বাজী দেখাইলাম। সেদিন তাহারা টাকাটাক পাইল। আমি তখন ভাবিলাম, ইহাদের যা' আমি লোকসান করিয়াছিলাম, তা' আজ পূরাইয়া দিলাম, আর ইহাদের সঙ্গে থাকিব না, বাড়ী ফিরিয়া যাই। তাই না বলা, না কওয়া একেবারে চোঁ-দৌড় দিলাম, তাহারা আমাকে ধরিতে পারিল না!

বাড়ীর কাছ বরাবর পঁহুছিয়া দেখি, কে একজন লোক আমাদের বাগানের প্রাচীরে চড়িতেছে। নিশ্চয় চোর, ফল-চুরী করিতে চাহে! আমি দৌড়িয়া গিয়া তাহার পা কামড়াইয়া ধরিয়া, তাহাকে মাটীতে পাড়িয়া ফেলিলাম। আর একটা লোক কোথাহইতে আসিয়া তাহাকে তুলিতে গেল, সেও চোর, সন্দেহ নাই, আমি তাহাকেও লাথির চোটে চিৎপটাং করিয়া ফেলিয়া দিলাম। লাথি খাইয়া সে এমন চীৎকার করিয়া উঠিল যে, আমাদের বাড়ীহইতে তিন-চার-জন লোক ছুটিয়া আসিল। তখন চোর-দুইটা ধরা পড়িল। কেন তাহারা সেখানে আসিয়াছিল, তাহার কোন ঠিক জবাব দিতে পারিল না; ফলে তাহারা পুলিস-সোপরদ্দ হইল।

সেই-অবধি বাড়ীর সব লোকে আমাকে আবার ভাল বাসিতে লাগিল। নন্দ একদিন আসিয়া বলিল,—"গাধু নিশ্চয় আমাকে ইচ্ছে ক'রে ফেলে দেয় নি; কোন কিছু দেখে ভয়ে পেয়ে ভ'ড়্‌কে গিয়েছিল।"

শুনিয়া আমি লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিলাম। নন্দ গুমরে বটে, কিন্তু প্রতিশোধপ্রিয় নয়। তাহার মন ভাল।

এখন আমি বেশ সুখে আছি। কোনরকম দুষ্টামি করি না। বাড়ীর সকলেই আমাকে খুব ভাল বাসে। ক্রমশঃ বুড়া হইতেছি, কবে মরিয়া যাইব। গৃহিণী বলেন, আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তিনি আমাকে পালন করিবেন।

সম্পূর্ণ।

শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-চিহ্ন।

একসময়ে এক যুবক মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কি করিলে মৃত বন্ধুর সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে স্মৃতি-চর্চ্চা করা যায়?"

মহম্মদ বলিয়াছিলেন,—"তাঁহার নামে একটি কূপ-খনন করিয়া দিও।"

মহম্মদের এই উত্তর বাস্তবিকই বড় বুদ্ধিমানের মত দেওয়া হইয়াছিল। যে স্থানে আসিয়া শ্রান্ত ব্যক্তি বিশ্রাম করে, পিপাসিত ব্যক্তি তৃষ্ণা-নিবারণ করিতে পারে, পথিক আসিয়া নব বললাভ করে, মর্ম্মর-প্রস্তরের স্মৃতি-স্তম্ভ, তাজমহল বা কলিকাতার মনুমেণ্ট তাহার মত স্থান নহে।

ধাঁধা।

বই ভারি ভার মোরা দু'টি ভাই,
এর, ওর, তা'র পায়ে পায়ে যাই।

দিবাভাগে বেশ থাকে পেটভরা,
রাত্রিবেলা কিন্তু, হায় রে, হা-করা!

লর্ড হার্ডিঙ্‌।

লেডি হার্ডিঙ্‌।

লেডি হার্ডিঞ্জের প্রতি।

মা, এত শীঘ্র যে, তোমার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া যাইবে, তাহা আমরা কখন ভাবি নাই। অভাগ্য ভারতের প্রজাপুঞ্জকে তুমি হৃদয় দিয়া স্নেহ করিয়াছিলে—তাহাদের প্রতি মমতা ও করুণা-প্রকাশ করিয়াছিলে বলিয়াই কি ঈশ্বর তোমাকে মমতা ও করুণার উৎস-স্থলে—স্বর্গে তুলিয়া লইলেন?

তোমাকে যে, আমরা মধুর মা-নামে সম্বোধন করিতেছি, ইহা তুমি আমাদের মৌখিক ভক্তি-প্রকাশ মনে করিও না। তুমি প্রকৃতই আমাদের প্রতি মায়ের মত স্নেহ-প্রকাশ করিয়াছিলে, তাই আমরাও তোমার প্রতি অকপট মাতৃভক্তি-প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মার স্নেহ কি স্বর্গীয় বস্তু! মা ব্যথা পান, তবু ব্যথা দেন না। মা সন্তানদিগকে মুহুর্মুহুঃ ক্ষমা করিয়া থাকেন। মা দুর্ব্বৃত্ত পুত্রেরও কল্যাণ-কামনা করেন। তুমি তো, মা, আমাদের প্রতি এমনই ব্যবহার করিয়া গিয়াছ। আমরা ব্যথা দিয়াছি, তুমি কিন্তু ব্যথা দাও নাই; আমরা দোষ করিয়াছি, তুমি শুধু ক্ষমা করিয়াই ক্ষান্ত হও নাই, অকপট অন্তঃকরণে আমাদের কল্যাণ-কামনা করিয়াছ।

ছায়া যেমন আলোকের চিরানুবর্ত্তিনী, তুমি তেমনই তোমার ঐ সৌম্যমূর্ত্তি ও উদার-হৃদয় স্বামীর চিরানুগামিনী ছিলে। তোমার স্বামীর সকল কার্য্যে তোমার সহানুভূতি ছিল। তুমি তোমার স্বামীর কামিনীমাত্র ছিলে না, প্রকৃতই উঁহার সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী ছিলে। উঁহার সুখে তুমি সুখিনী এবং উঁহার দুঃখে তুমি দুঃখিনী হইতে। তাই তুমি কেবল আজিকালিকার লক্ষ্যভ্রষ্টা মায়েদের নহে, স্ত্রীদেরও আদর্শস্থানীয়া হইয়া উঠিয়াছ।

যে সন্তানেরা তোমার মত স্নেহ-মমতা-করুণারূপিণী মাকে হারাইয়াছে, অন্য বিষয়ে যতই সৌভাগ্যবন্ত হউক না কেন, তাহারা বাস্তবিকই অভাগ্য, তাহাদের দুঃখ কেবল অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। আর যিনি তোমার মত পতিগতপ্রাণা পত্নীকে হারাইয়া—প্রকাশে না হউক—অন্তরের অন্তস্তলে হাহাকার করিতেছেন, হউন না তিনি অদ্ধভূমণ্ডলপতির প্রতিনিধি, তাঁহার তুল্য মন্দভাগ্য জগতে আর কে আছে?

তবে, মাগো, আমাদের এই এক সান্ত্বনা—প্রেম নিত্য, প্রেম চিরঞ্জীব, প্রেম জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান থাকিতে দেয় না। তুমি স্বর্গে, আমরা এই মর্ত্তে, তাহাতে ক্ষতি কি? প্রেম তাহার পথের সকল অন্তরায় অন্তরিত করিতেছে! জানি না, তুমি এখন নির্ম্মল, নীল, নৈশ আকাশের কোন্ শুচিশুভ্রা তারকাটিতে পরিণত হইয়া তোমার প্রিয়তম পতির উপর তোমার পূত প্রেমের এবং তোমার এই সন্তানদের উপর তোমার স্নিগ্ধ স্নেহের কিরণ শ্যামিকাশূন্যা রৌপ্যধারার ন্যায় বর্ষণ করিতেছ!

মা, ফুল ঝরিয়া পড়িলেও, বসন্ত-বাতাসে তাহার সুবাস বহুক্ষণ হিল্লোলিত হইতে থাকে; ভানু অস্তমিত হইলেও, প্রতীচীর বুকে তাহার আভা অনেকক্ষণ অভ্রশুভ্র মেঘগুলিকে মনোলোভা শোভা দিতে থাকে; আর গান থামিয়া গেলেও, তাহার রেশ যেন শেষ হইতে চায় না, তেমনই মানুষ যায়, স্মৃতি থাকে; মানুষ মরে, কীর্ত্তি রহে; কে বলে তুমি আর নাই? তুমি আমাদের স্মৃতি-সৌধে ভক্তির আসনে বিরাজ করিতেছ। এ জগতে কেহ কাহারই মত নহে, তোমার তুলনা তুমি। তাই, মাগো, তুমি কাহার মত আমাদের হৃদয়ের নিভৃত-নিলয়ে এক্ষণে অধিষ্ঠান করিতেছ, তাহা বুঝাইতে পারিলাম না।

নমস্তে মাতঃ ক্ষেম-হেমাভরণ-ভূষিতে!

অবনী-কাহিনী

অবতরণিকা।

আমাদের আবাস-স্থল, এই পৃথিবী, এত বড় যে, আমরা ইহার সমস্তটা এককালে দেখিতে পাই না। এখন আমরা ইহাকে যে অবস্থায় দেখিতে পাই, লক্ষ লক্ষ বৎসরে ইহা সেই অবস্থা-প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু মহাবিশ্বে সুধু পৃথিবী নয়, আরও কত গ্রহ-নক্ষত্র রহিয়াছে, তাহারা মহাশূন্যে গোলার আকারে ঘুরিতেছে। চন্দ্র পৃথিবীহইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীরই একাংশ ছিল। আমরা এই সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র-সম্বন্ধে কি জানি? ইহারা কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছে? প্রত্যেক নক্ষত্রই কি আমাদের সূর্য্যের মত একএকটা সূর্য্য? নক্ষত্রগুলিকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবীর মত আকারবিশিষ্ট যে সমস্ত গোলা ঘুরিতেছে, সেই গোলাগুলিকে লইয়া ছেলের কি কোথাও 'বল্' খেলিতেছে? চন্দ্র কি করিয়া পৃথিবীহইতে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে? সূর্য্য কি করিয়া আমাদের জীবন ও জ্যোতিঃ দেয়? এই যে বিশ্বে আমরা বাস করি, ইহার সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেই, আপনাদের মনে এইরকম নানা প্রশ্নের উদয় হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ঐরকম কএকটি প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

সমুদ্রের তলায় এমন অনেক জীব আছে, যাহারা আলোক কাহাকে বলে জানে না, সর্ব্বদাই অন্ধকারে বাস করে। তাহাদের চোকও নাই, কাণও নাই, তাহারা কেবল অনুভব করিতে পারে। এই জীবেরা জগৎকে দুইরকমে জানে, তাহারা অনুভব করে যে, খানিকটা তাহারা বেশ খাইতে পারে, আর খানিকটা খাইতে পারে না। তাহাদের দিনও হয় না রাতও হয় না। তাহারা কোন ঋতু-পরিবর্ত্ত-অনুভব করে না। তাহারা চন্দ্র, সূর্য্য, তারা প্রভৃতি কিছুই দেখে না, কোন শব্দ শোনে না, কোন শোভা-সৌন্দর্য্যও প্রত্যক্ষ করে না। এমন কি, তাহারা তাহাদেরই মত আরও যে, অনেক জীব আছে, তাহাপর্য্যন্ত অবগত নয়।

তাহারা যেন এমন একজন শিশুর মত বাস করিতেছে, যে ঘোর অন্ধকারে তাহার সমস্ত জীবন কেবল শুইয়া কাটাইতেছে। তাহার জীবনে কেবল একপ্রকার ঘটনা-পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে, সে কখন কিছু খাইতে পাইতেছে, কখন পাইতেছে না। এরকম জীবন-যাপন করিতে আমরা কেহই চাহি না, অনেকের জীবন কিন্তু ঐ শিশুর জীবনের অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট নয়।

আমাদের জীবনে ও পূর্ব্বোক্ত জলচর জীবের জীবনে কত প্রভেদ! আমাদের কয়েকটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কয়েকটি আমাদের তত বেশী আবশ্যক নয়। চাখিবার, ছুঁইবার গরম-ঠাণ্ডা-অনুভব করিবার শক্তিগুলি জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের খুব বেশী কাজে লাগে না; কিন্তু আমাদের শুনিবার শক্তিটুকু আশ্চর্য্য শক্তি। এই শক্তিটুকুর সাহায্যেই আমরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করি, অনেক শ্রুতিসুখকর শব্দ—যেমন পাখীর গান, সমুদ্রের কল্লোল, বন্ধুদিগের কণ্ঠস্বর ও নানাপ্রকার সঙ্গীত শুনিতে পাই; কিন্তু জ্ঞানদ্বারস্বরূপে দর্শনশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা অশেষ বিচিত্র বস্তু প্রত্যক্ষ করি। ইহারই সাহায্যে আমরা আমাদের পদতলস্থিতা ভূমি, ঊর্দ্ধস্থ গগনমণ্ডল, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমালা, গতিশীলা তারকামালা, বিদ্যুৎ, সূর্য্যাস্ত, আমাদের নিজের ও আমাদের বন্ধুদের দেহ এবং অনেকপ্রকারের জীবজন্তুকে দেখিতে পাই। দৃষ্টিশক্তির সহিত শৈত্য ও তাপের অনুভূতি মিলিতা হইয়া আমাদিগকে দিবা ও রাত্রি অনুভূত ও প্রত্যক্ষ করায়।

যদি আমরা একটু ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, এই দিবারাত্র হওয়া একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। খুব সাধারণ একটা জিনিসও যদি সুধু আমরা চর্ম্ম-চক্ষু-দিয়া না দেখিয়া মানস চক্ষুর্দ্বারাও দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, তাহাও একটি খুব আশ্চর্য্য জিনিস। দিবারাত্রের মত দ্রুতভাবে ঘটে না এমন অনেক নৈসর্গিক ব্যাপারও চক্ষু আমাদিগকে অনুভূত করায়। এই ব্যাপারগুলি, নিত্য না ঘটিলেও, নিরূপিতকালে নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। আবার তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব উভয়ই নিশ্চিত।

মাসদুই শীত থাকিবার পর ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হয়। তখন দিনগুলি দীর্ঘ হইয়া উঠে, তরুলতিকায় মুকুল ও ফুল মুঞ্জরিত ও প্রস্ফুটিত হয়, পাখীরা ললিতকণ্ঠে গান গাহিতে আরম্ভ করে, বায়ু নাতিশীতোষ্ণ হইয়া উঠে, সূর্য্যেরও উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। অনন্তর আমরা গ্রীষ্মের সঞ্চার-অনুভব করিতে থাকি। গ্রীষ্মও চিরস্থায়ী হয় না। দেখিতে দেখিতে ধারাপাত আরম্ভ হয়, তখন ধরণীধারা-জলে স্নান করিতে থাকে, নদনদী উছলিয়া উঠে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বীজ-বপনের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। একালও স্থায়ী হয় না। বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়া যায়, তখন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে শরতের স্বর্ণবর্ণ ধান্যগুলি সমীরহিল্লোলে হেলিতে দুলিতে থাকে। শেষে হিমপাত আরম্ভ হয়, লতাপল্লব নিশার নীহার-শোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে।

অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা এতগুলি নৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। এই পৃথিবী আমাদের বাসস্থান বলিয়া, ইহা ছাড়িয়া আমরা জীবিত থাকিতে পারি না বলিয়া, ইহার সহিত আমাদের জীবনের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলিয়া, ইহা আমাদের একটী অতীব আগ্রহোদ্দীপক বস্তু। তথাপি আমরা যখন ইহাহইতে অন্য অনেক গ্রহনক্ষত্রকে নিরীক্ষণ করিতে থাকি, তখন বুঝিতে পারি, সেগুলিতেও আমাদের সবিশেষ

প্রয়োজন আছে। সেইগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আমাদের সূর্য্য, ঐ মহাজ্যোতিষ্কেরই নিকটহইতে আমরা আলোক ও উত্তাপ পাই। সূর্য্য না থাকিলে, পৃথিবীতে কিছুই জীবিত থাকিতে পারিত না, এমন কি, যে সামুদ্রিক জীবেরা উহাকে কখন দেখিতে পায় না, তাহারাও জীবিত থাকিত না। যাহা হউক, এ কথা সত্য যে, আমরা যদি কখন আকাশের দিকে না চাহিয়া দেখিতাম, তথাপি এই পৃথিবীতে এত জিনিস দেখিতে পাইতাম যে, তাহার ক্ষুদ্রতম অংশেরও সংখ্যা-নির্ণয় করা পৃথিবীর সর্ব্বযুগের লোকের সমষ্টির পক্ষে একান্ত অসম্ভাবিত হইত। এইসমস্ত দ্রব্য দেখিয়া আমাদের মনে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় হয়, তৎসমুদয়ের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তথাপি আমরা সে প্রশ্নগুলি যথোচিতভাবে করি (সেগুলির উত্তর না পাইলেও) এবং প্রাপ্ত উত্তরগুলি আমাদের জীবনের পক্ষে অতীব মূল্যবান্। মানুষেরা যাহা কিছু আবিষ্কৃত করিতেছে ও করিয়াছে, সকলই মনুষ্যের পক্ষে মূল্যবান্। আবিষ্কৃত বস্তু বা বিষয়গুলি মনুষ্যকে সুখময় ও বর্ব্বর জাতিহইতে বিভিন্ন জীবন-যাপনে সাহায্য করিতেছে। আমরা যত বেশী জানি, তত বেশী বুঝি।

এই প্রবন্ধ-প্রারম্ভে একটি কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে। সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিতে বা সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা সকলে পারি না। আবার কোন প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, সবিশেষ শ্রম করা আবশ্যক। একের শ্রমফলে সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। সকলকেই জীবনের খানিকটা করিয়া সময় এই মহাকার্য্যে লাগাইতে হইবে। এই বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা এবং তোমরা ছোট ছোট ছেলেরাপর্য্যন্ত অলস থাকিতে পাইবে না। অনেকের মুখে এই কথাগুলি শুনা যায়,—"আমরা জানি না, আমরা জানিতে চাহিও না; এ সকল বিষয় না জানিলেও, আমাদের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, সুতরাং এ সকল বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের ইচ্ছা নাই।"

অনেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালকবালিকার মুখেই এইরূপ নানা কথা শুনা যায়; কিন্তু তাহারা যে প্রকৃতভাবে জীবিত আছে, তাহা বলা যায় না। যাহারা ঐপ্রকার কথা বলে, তাহারা পূর্ব্বকথিত সমুদ্রগর্ভস্থিত জীবাবলীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতেছে। এইরূপ শ্রেণীর লোক জগতে নূতন জ্ঞানের বৃদ্ধিবিষয়ে অলস থাকিয়া পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদন করে। অতএব এইরূপ কথা "বালকে"র কোন পাঠকের মুখহইতে, আশা করি, নির্গত হইবে না। (ক্রমশঃ।)

ছাত্রদ্বয়।

এক বড় সহরে একজন প্রবীণ দার্শনিক থাকিতেন, তাঁহার দুই-জন প্রিয় ছাত্র ছিল। পড়া-শুনা-শেষ হইলে, ছাত্র-দুইটি দেশ-ভ্রমণ করিতে যাইবার ইচ্ছা-প্রকাশ করিল। ছাত্র-দুইজনের মধ্যে কে তাঁহার কাছে অধিকতর শিক্ষা-লাভ করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য গুরু দুইজন ছাত্রকেই কিছু কিছু টাকা দিয়া বলিলেন,—"যাও, এই টাকা-দিয়া এমন জিনিস কিনিয়া আন, যাহাতে একটী ঘর ভরিয়া যায়।

একটি ছাত্র গিয়া অনেক খড় কিনিয়া আনিল। সেই খড়-দিয়া সে নিজের ঘরটি প্রায় ভরাইয়া ফেলিল। তাহার পরদিন সে গুরুকে ঘরটি দেখাইল। দেখিয়া গুরু বলিলেন,—"মন্দ কর নাই।" তাহার পর তিনি দ্বিতীয় ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি কিনিয়াছ?"

সে একটি প্রদীপ ও তৈল দেখাইয়া বলিল,—"গুরো, ইচ্ছা করিলে, এই তেল-দিয়া প্রদীপ জালিয়া আমি আমার ঘরটি আলোকে পূর্ণ করিয়া পাঠে মন দিতে পারিব।"

গুরু অবশ্য দ্বিতীয় শিষ্যকেই অধিকতর বুদ্ধিমান মনে করিলেন।

নূতন প্রতিযোগিতা।

কোন কলেজের অধ্যাপক-মহাশয় রেলের দৈনিক যাত্রী। প্রাতে নয়টার ট্রেণ না ধরিতে পারিলে, তাঁহার আর বেলা চারিটার পূর্ব্বে সে দিন কলিকাতায় আসা হইবে না। ট্রেণ ছাড় ছাড় হইয়াছে, তাই হৃষ্টপুষ্টকায় ও চোগাচাপকানধারী অধ্যাপক-মহাশয় প্লাট্‌ফরম দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ট্রেণ ধরিতে যাইতেছেন, এইরূপ একটি কালী-কলমে আঁকা ছবি ৩১সে অক্টোবরের মধ্যে আমার হস্তগত হওয়া চাই; ছবিটি উৎকৃষ্ট না হইলে, বালকে প্রকাশিত বা পুরস্কৃত হইবে না। ঐ চিত্রে ছায়াপাতের প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক চিত্রের নিম্নে চিত্রকরের নাম, ধাম ও বয়স লিখিয়া দিতে যেন ভুল না হয়।

বালক-সম্পাদক,
২৩নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

"দীপাঙ্গনা।"

যুদ্ধের সময়ে অবলারা গিয়া আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, একথা কি কাহারও সহজে বিশ্বাস হয়? সত্যই কোন সময়ে এক রমণী নির্ভীকভাবে ও উদারহৃদয়ে এইরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্য যে শ্রেণীর লোকেরা চাকর-চাকরাণীর কাজ করিয়া থাকে, সেই শ্রেণীর লোকেরাই করিত। যত দিন না ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল রুগ্ন ও আহত সৈনিক-দিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের শুশ্রূষা-কার্য্যে জীবনোৎসর্গ এবং মানব-ইতিহাসে সম্মানের স্থান-লাভ করেন, ততদিন শুশ্রূষা-কার্য্যও যে শিখিতে হয়, ঐ কার্য্যেও যে, বুদ্ধি, ইচ্ছুকতা, যোগ্যতা, উদারতা, স্নেহ ও প্রেমের প্রয়োজন হয়, তাহা লোকে বুঝিত না। ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল একসময়ে বলিয়াছিলেন,—"স্ত্রীলোকমাত্রেই যে, উত্তম শুশ্রূষাকারিণী হইতে পারে, এইকথা অনেকবার পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি; কিন্তু আমার বরং বিশ্বাস শুশ্রূষা করার সম্বন্ধে সমস্ত নিয়মই অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।"

কিন্তু ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের মত সম্ভ্রান্ত মহিলা শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্যে কি করিয়া ব্যাপৃতা হইয়াছিলেন? কেবল প্রেম ও কর্ত্তব্যের প্রেরণায় ও প্ররোচনায় তাঁহাকে সেই ক্লান্তিজনক ও অপ্রীতিকর কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি অতিশয় সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন, তাঁহার প্রচুর অর্থও ছিল। তাঁহার পারিবারিক জীবনে তিনি সুখিনী ছিলেন, পরিবারমধ্যে সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, অনেকেই প্রশংসমাননেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন। যে সমস্ত পদার্থ থাকিলে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সুখভোগের সম্ভাবনা থাকে, তাঁহার সে সমস্তই ছিল। তবু তিনি সে সকল সুখ-সম্ভোগের বাসনা-বর্জ্জন করিয়া যে পথে গেলে দুঃখ ও ক্লেশ অনিবার্য্য, সেই পথে বিচরণ করিতে গেলেন। তাঁহার মত অবলাদের প্রতি তাঁহার চিরকালই আগ্রহপূর্ণ অনুরাগ ছিল। তিনি ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র এককোণে হ্যাম্পশায়ারের অন্তর্গত এম্‌ব্লে বলিয়া একটী স্থানে বিদ্যালয়ে পড়াইতেন, গরীবদুঃখীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদের তত্ত্ব লইতেন, তাহারা অসুখে পড়িলে, তিনি তাহাদিগকে খাওয়াইতেন, তাহাদের শুশ্রূষা করিতেন।

কিন্তু যে সৎকার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, সে যেমন প্রকাশ্যে তেমনই গোপনেও তাহা করিতে পারে।

তখন হাস্যকৌতুক ও রঙ্গরহস্যের জগৎ তাঁহার নয়ন-সমক্ষে প্রসারিত। নাগরিক-রমণীরা যেপ্রকার আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস ব্যসনে দিনাতিপাত করে, তিনিও তেমনই ভাবে জীবন-যাপন করিলে কে তাঁহাকে কি বলিত? কিন্তু তাঁহার করুণার্দ্র-হৃদয় তাঁহাকে অন্যদিকে টানিয়া লইয়া চলিল। যাহারা কষ্ট পাইতেছে, যাহারা পতিত, যাহারা পরপদদলিত, তিনি তাহাদেরই প্রতি অনুরাগ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি চিকিৎসালয়, কারাগার ও সংশোধনী আশ্রমগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যখন অন্যে সুইট্‌জারল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড বা সমুদ্র-সৈকতে গিয়া অবসর-কাল আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিতেছিল, তখন তিনি জর্ম্মাণীতে গিয়া শুশ্রূষাকারিণীদিগের শিক্ষালয়ে ও চিকিৎসালয়ে দিনযাপন করিতেছিলেন। শুশ্রূষাকারিণীদের কার্য্য শিখিতে গিয়া তিনি ইতরবৃত্তিহইতেই শিক্ষারম্ভ করেন। তিনি তথায় প্রথমে কাপড় কাচিতেন, বুরুষ ও জলদিয়া গৃহতল ধুইতেন, জিনিসপত্র ঝাড়িতেন, ক্রমে ক্রমে তিনি শুশ্রূষাকারিণীর অন্য সমস্ত কার্য্য শিখিতে লাগিলেন। তিনমাস অনবরত অহোরাত্র তিনি রোগীদিগের রোগশয্যার সন্নিকটে যাপন করেন। এইপ্রকারে তিনি, হাঁসপাতালের "ওয়ার্ডে" যে সমস্ত কর্ত্তব্য-পালন ও কার্য্য করিতে হয়, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-লাভ করেন।

ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল শ্রম করিতে থাকিলেন। "গবর্ণনেস" অর্থাৎ পারিবারিক কার্য্যে গৃহিণীদিগকে সাহায্যকারিণীরা অসুস্থ হইয়া পড়িলে, যে হাঁসপাতালে গিয়া থাকিত, উপযুক্তভাবে পরিদর্শনের অভাবে সেই হাঁসপাতালটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল তাহার ভার-গ্রহণ করিলেন। স্বগৃহের স্নেহপ্রীতি ও পল্লীগ্রামের মুক্ত-বায়ু-উপভোগের সুখ-ত্যাগ করিয়া হার্লি ষ্ট্রীটের আনন্দশূন্য চিকিৎসালয়ে তিনি দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সেইখানে তাঁহার রুগ্না ভগিনীদিগকে তিনি সাহায্য ও শুশ্রূষা করিতে থাকিলেন। ইহাতে চিকিৎসালয়টি মৃত্যুমুখহইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু গুরুভার পীড়িত হইয়া ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের আত্মস্বাস্থ্য-হানি হইল, এইজন্য তিনি কিছুদিনের নিমিত্ত হাম্পশায়ারের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু আবার একজায়গায় আর্ত্তনাদ উঠিল। তখন ক্রিমিয়ান সমর চলিতেছিল। সেই সমরের আহত সৈনিকেরা বস্‌ফোরসের চিকিৎসালয়গুলিতে প্রায় অবহেলিত হইতেছিল। করুণারূপিনী ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁহার করুণার্দ্র-হৃদয়ের আবেগে অবিলম্বে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ছুটিলেন। স্কুটারি-যাত্রী এক বাষ্পীয় পোতে চড়িয়া তিনি রণস্থলে যাত্রা করিলেন। এই কার্য্যে বিঘ্নের অবধি ছিল না, ইহাতে যেমন ক্লেশ, তেমনই বিপদ, প্রাণহানির পর্য্যন্ত সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু কর্ত্তব্য যখন কোন নির্ভীকচিত্ত ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিতে থাকে, তখন তিনি কি আর আপদাশঙ্কায় আকুল হন? ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলকে যাহা করিতে বলা হইয়াছিল, তিনি রণক্ষেত্রে তাহাই করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি আর্ত্ত পুরুষদিগের মধ্যে গিয়া আহত সৈনিক ও নাবিকদিগের সেবা করিতে লাগিলেন, তত্রত্য শুশ্রূষাকার্য্যে শৃঙ্খলাস্থাপনপূর্ব্বক সমগ্র শুশ্রূষাবিভাগটির ভার-গ্রহণ করিলেন।

এই ইংরাজমহিলার সহিষ্ণুতাসহকারে রোগীদিগকে দেখা ও যত্ন করা দেখিয়া আহত ব্যক্তিরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ঐ সৈনিকেরা নিশাকালে তাহাদের উপাধানের উপর তাঁহার দেহচ্ছায়া পড়িতে দেখিলেই, তাঁহার কল্যাণ-কামনা করিত। তাহারা তাঁহার নাম জানিত না, তাই তাহারা তাঁহার নাম দিয়াছিল—"দীপাঙ্গনা"।*

"সুষুপ্ত সৈনিক; আহা, কে তাহারে হেরি' সুখসুপ্ত
হন নত তা'র 'পরে?
শত্রুরা তো নাই—নাহি বান্ধবও কেহ তাহার সে
আনন্দবিহীন ঘরে।
একি কোন দেববালা বিতরিতে প্রসাদ তাহায়
অবতীর্ণা অবনিতে?
না, না, নহে অপার্থিব অঙ্গযষ্টি তাঁ'র, সুধু দিব্য
আভা ভায় মুখটিতে!"

সৈনিকেরা এই অনূঢ়া মহিলাকে পূজা করিত। তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার অশিষ্ট ভাষা-প্রয়োগ করিত না। কাহারও কোন অঙ্গে অস্ত্র-প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইলে, সে অম্লানবদনে যাতনা সহ্য করিত। তাহারা তাঁহার উপদেশ ও উদাহরণমতে কার্য্য করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। এদিকে ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল সাধারণ সৈনিকদিগকেপর্য্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি কেবল যে, তাহাদের শারীরিক স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখিতেন, তাহা নহে, ইংলণ্ডে, স্কট্‌লণ্ডে ও আয়র্লণ্ডে তাহাদের আত্মীয়-বন্ধুদিগকে চিঠী লিখিতেন। তিনি তাহাদের টাকা পুঁজি করিতেন। প্রত্যেক সপ্তাহে একটী করিয়া বৈকাল তিনি তাহাদের পুঁজি টাকা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পাঠাইবার জন্য ক্ষেপণ করিতেন। এইজন্য সৈনিকেরা তাঁহার কাছে কতই না কৃতজ্ঞ হইত! তিনিও তাহাদের সম্বন্ধে কেমন ভাবিতেন, তাহাদের প্রতি কি যত্ন করিতেন!

ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের এই সদৃষ্টান্তের ফলেই এক্ষণে আহত ও রুগ্ন সৈনিকদিগের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং অনেক সুশিক্ষিতা মহিলা এই কার্য্যে ব্রতিনী হইয়াছেন।

* কারণ নিশাকালে তিনি সর্ব্বদা একটী প্রদীপ হস্তে লইয়া তাহাদের শুশ্রূষা করিতে যাইতেন।

বালক

৩য় বর্ষ। নবেম্বর, ১৯১৮। ১১শ সংখ্যা।

জেনেরল গর্ডন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রেভসেণ্ড, ও সুদানে প্রথমবার।

ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া রাজকীয় এঞ্জিনীয়ারদিগের কর্ত্তা হইয়া গর্ডন গ্রেভসেণ্ডে গমন করিলেন। এই সময়ে তিনি কোন সামরিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে পান নাই, তাই তাঁহার বড় অস্বস্তি-বোধ হইয়াছিল।

গর্ডন যদিও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়চেতা সৈনিক ছিলেন, তথাপি তাঁহাতে নারীসুলভ কোমলতা ও করুণাও প্রকাশ পাইত। যাহার যে কোনপ্রকার যাতনা হউক না কেন, দেখিলেই, তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত, কিন্তু অবলা রমণী ও নিরুপায় শিশুদিগের কষ্ট হইতে দেখিলে, তিনি তাহাদের সেই কষ্টের লাঘব না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। এই পৃথিবী-প্রসিদ্ধ জননায়ক, তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, করুণার প্রেরণায় কখন কোন সামগ্রীশূন্য ও অপরিস্কার বাসাবাটীতে গিয়া, কোন জরাবিকল শীতার্ত্ত হতভাগ্যের শীতক্লেশ-নিবারণের জন্য হাঁটু গাড়িয়া আগুন জ্বালিতেছেন, তাহার পর ঘরটি একটু উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হইলে, পাকদ্রব্যসংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বহস্তে কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া হাস্যপ্রফুল্লমুখে ও সান্ত্বনাসূচক বাক্যে সেই হতভাগ্যকে খাইতে অনুরোধ করিতেছেন, গ্রেভসেণ্ডে অবস্থান-কালে তাঁহার জীবনে এইরূপ যুগপৎ হাস্য-অশ্রুময় দৃশ্য লোকে প্রায়ই দেখিতে পাইত।

এই সময়ে কখন বা লোকে তাঁহার জীবনে আর একপ্রকার দৃশ্যও দেখিত। তাহারা দেখিত, তিনি অন্ধকার ও আবর্জ্জনাময় গলির মধ্যদিয়া চলিয়াছেন, যাইতে যাইতে যখনই কোন ছিন্নবাস দরিদ্র বালককে দেখিতেছেন, অমনই তাহাকে দুই-একটি আমোদজনক বাক্য বলিতেছেন, যখনই কোন দরিদ্রা রমণীকে দেখিতেছেন, অমনই সদয়ভাবে একটু হাসিতেছেন। তাহার পর তিনি একটী ছোট কুঠরীতে প্রবেশ করিতেছেন। সে কুঠরীটী তাঁহারই ভাড়া করা। সেখানে অনেক বালক তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, তাঁহাকে দেখিয়াই, তাহাদের অধরে আন্তরিক আনন্দের চিহ্নস্বরূপ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

যে কণ্ঠস্বর রণস্থলে আদেশ-ঘোষণা করিত, সেই কণ্ঠস্বর বালকদিগকে দেখিয়া স্নেহকোমল হইয়া উঠিত। যে হস্ত অব্যর্থলক্ষ্যে তরবারি-চালনা করিত, সেই হস্তই তাহাদের অঙ্গে কোমলভাবে স্থাপিত হইত।

স্নেহপূর্ণ সহিষ্ণুতার সহিত তিনি ঐ বালকদিগকে পড়িতে, লিখিতে এবং সহজ সহজ আঁক কষিতে শিখাইতেন, তাহাদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতেন, আহার ও আশ্রয় দিতেন, জলে ও স্থলে ভাল ভাল কাজ জুটাইয়া দিতেন।

যাহারা জাহাজে কাজ করিতে যাইত, তাহাদিগকে তিনি "রাজা" বলিতেন। তাঁহার ঘরে একটী বড় মানচিত্র টাঙান ছিল, তাহাতে ঐ 'রাজা'দিগের পোতগুলি যে যে বন্দরে বা নৌ-ষ্টেশনে গিয়াছে, সেই সেই পোতাশ্রয়ে পিন্ মারিয়া রাখিতেন।

ছয় বৎসর-যাবৎ গ্রেভসেণ্ডে থাকিয়া তিনি তত্রত্য দরিদ্রদিগের এইপ্রকারে সেবা করিয়াছিলেন। কেহ কষ্টে পড়িয়া তাঁহার কাছে আসিয়া জানাইলেই, তিনি তাহার প্রতি প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিতেন। আর তিনি সৎকার্য্যগুলি এমন অনাড়ম্বরে ও সুকৌশলে সম্পন্ন করিতেন যে, যাহাকে তিনি নানারকম গৃহস্থালী জিনিস-দিয়া সাহায্য করিতেন, সেও তাহাতে আপনাকে অবমানিত মনে করিত না, বরং তাঁহার

প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয় ভরিয়া থাকিত; তাই গর্ডন যখন গ্রেভসেণ্ড হইতে বিদায় লন, তখন এই লোকেরা মনে করিয়াছিল, আমরা আমাদের, কেবল অন্নদাতাকে নয়, বন্ধুকেও হারাইয়াছি!

গর্ডন বড় প্রমোদপ্রিয় ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত লোকও ছিলেন। তিনি যখন কাহারও দুঃখ দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হইতেন, তখন সেই লোকের আর বিমর্ষ থাকিবার জো থাকিত না। কোন রোগীর গৃহে তিনি প্রবেশ করিলে, রোগীর বোধ হইত, আমার গৃহে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়াছে। তিনি তত মোটা-সোটা ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার শরীর পেশীযুক্ত ও সবল ছিল। সক্রিয় চিত্তযুক্ত ব্যক্তির চলাফেরায় যেমন তাহার বুদ্ধিমত্তা ও উদ্যমশীলতা প্রকাশ পায়, তাঁহারও চলাফেরায় তাহা পাইত। তাঁহার মুখাকৃতি দেখিলেই, বুঝা যাইত যে, তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা আছে এবং তিনি স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হন না। তাঁহার নীলনেত্রতারের দৃষ্টি তাবৎ ব্যক্তি ও বস্তুর অন্তর্ভেদ করিত।

গ্রেভসেণ্ডে তিনি যে কার্য্য করিতেন, সেই কার্য্য তাঁহার মত স্বভাবের লোকের তত প্রীতিকর হইতে পারে না, তাই তিনি তত্রত্য দীনদুঃখীদের সেবা করিয়া আপনাকে ও তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে তিনি কৃষ্ণসাগরের কমিশনারের পদ পাইয়া গ্রেভসেণ্ড-ত্যাগ করিয়া গেলেন।

কিন্তু একটি কথা না বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গটি ছাড়িতে পারি না। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি, গর্ডন চৈনিক রাজ-মহিষীর নিকটহইতে একখানি গুরুভার সুবর্ণপদক পাইয়া-ছিলেন। সেই পদকটির তিনি উত্তরকালে কি ব্যবহার করেন, তাহা বলিব বলিয়া আমরা প্রতিশ্রুত আছি। একবার ম্যান্‌-চেষ্টারে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গর্ডন সেই অকালবার্ত্তা পাইয়া তাঁহার সেই প্রিয় সুবর্ণপদকটির উৎকীর্ণ লিপি চাঁচিয়া ফেলিয়া তাহা দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে প্রেরণ করেন। পদকটি হস্তান্তরিত করিতে তাঁহার যে বড় ক্লেশ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার সৈনিকদিগের মধ্যে কাহাকেও তাহার কোন প্রিয়বস্তুর মায়া-ত্যাগ করাইতে চাহিলে, তিনি বলিতেন, "তোমার সোনার মেডেলের মায়া ছাড়।"

যাহা হউক, গ্রেভসেণ্ডহইতে যাত্রা করিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানের সন্নিকট হইয়াই তিনি সামরিক অবস্থানগুলির নক্সা আঁকিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে তিনি ইস্তাম্বুলে পঁহুছিলেন। এই স্থানে তাঁহার নিউবার পাশার সঙ্গে দেখা হয়, তিনি গর্ডনের গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সুদানের একাংশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

গর্ডন জননায়ক ও শাসনকর্ত্তা হইবার উপযুক্ত লোকই ছিলেন। চঞ্চলচিত্ত ও অসন্তুষ্ট সুদানবাসীদিগকে শাসন ও পালন করার কর্ত্তব্যটি তিনি প্রীতিজনকই মনে করিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে তিনি প্রথমবার খার্টুমে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার দলবল ও তল্পীতাল্পা পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া 'বারবার' ও 'সুয়া-কিমের' ভিতরদিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি অনেক বিশৃঙ্খলা ও অপব্যয়-দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার নিশ্চিত প্রতীতি হইল যে, এইপ্রকার ব্যাপার বহুদিন চলিতে পারে না।

তাই তিনি বলিলেন,—"ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, কি করিয়া তাহা এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না, আমি এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার প্রতীকার করিব।" তিনি যে এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সফল-কাম হইয়াছিলেন, তাহা এই আখ্যায়িকাটির আর খানিকটা পড়ি-লেই, অবগত হওয়া যাইবে।

তখন নীল-নদ নৌচালনোপযোগিনী অবস্থায় ছিল, তাই গর্ডন সরাসর গণ্ডোকোরায় অর্থাৎ তাঁহার সদর কার্য্যস্থলে চলি-লেন। তাঁহার তরণীখানি ধীরে ধীরে চলিয়াছে, এমন সময়ে, তাঁহার মনে হইল, কতকগুলি অসভ্য লোক রূঢ়ভাবে যেন হাসিয়া উঠিল; কিন্তু তাহা কোন অসভ্যলোকের হাসি নহে, কতকগুলি বকজাতীয় পক্ষী এক ঘন গুল্মবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ঐ শব্দ করিয়াছিল।

অল্প সময় পরে যখন তিনি দেখিলেন যে, গণ্ডকোরা জনশূন্য স্থান, এবং প্রজাপুঞ্জের সন্নিহিত হওয়া নিরর্থক, তখন তিনি এই মন্তব্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন, "গণ্ডকোরায় আসিয়া কোন কাজ করা অসম্ভব, তাই বকেরা হাসিয়া উঠিয়াছিল।"

তিনি এই সময়ে পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"এই দেশের গভীর দুঃখ-দৈন্যের কেহই ধারণা করিয়া উঠিতে পারিবে না—হেথায় সারাবৎসর ধরিয়া সমস্ত দিনরাত মশকের অত্যাচার হয় এবং দারুণ গ্রীষ্ম থাকে।"

তখন ঐ দেশের অবস্থা প্রকৃতই অতি শোচনীয় ছিল। মশকের জ্বালায় একে তো গর্ডন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার উপর তাঁহার কোথাও একাকী যাইবার জো ছিল না। সৈনিকদিগের অত্যাচারে প্রজারা ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, কাজেই কাহাকেও একা পাইলে, তাহারা তাহাকে খুন করিয়া, তাহার কাছে যাহা থাকিত, সব কাড়িয়া লইত। তাই গর্ডন হতাশ হইয়া তাঁহার সঙ্গীদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবার নিমিত্ত ফিরিয়া চলিলেন।

মে-মাসের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পদে স্থির হইয়া বসিতে পারি-লেন না, তখন তিনি কয়েকটি ফাঁড়ীর সৃষ্টি করিলেন, মিশ্রীয় সৈনিকদিগকে পল্লীবাসী প্রজাদিগের ধনরত্ন-লুণ্ঠন করিতে না দিয়া তিনি চাষ করিতে শিখাইলেন। তাহাছাড়া তিনি দাস-ব্যবসায়ী-দিগের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন।

যখন তিনি প্রজাদিগের দারুণ দুঃখদৈন্যের কথা পূর্ণভাবে অবগত হইলেন, তখন তিনি তাহাদের অস্থিরতা ও অসন্তোষের যে,

সবিশেষ কারণ আছে, ইহা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

এই লোকদিগকে মিসরের খেদিভ শাসন করিতেন। তিনি এই হতভাগ্য প্রজাদিগকে তাহাদের কষ্টলব্ধ ফসল তাঁহার অপব্যয়ের নিমিত্ত সমর্পণ করিতে বাধ্য করিতেন, কাজেই তাহারা অর্দ্ধাশনে থাকিতে বাধ্য হইত, ফলে খেদিভের প্রতি তাহাদের একান্ত অভক্তি জন্মিয়া গিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে তখন বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল।

গর্ডনের সহানুভূতিপ্রবণ হৃদয় আর্ত্ত প্রজাদের দুঃখে গলিয়া গেল। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা তাঁহাকে প্রজাদেরই দলে টানিয়া লইয়া গেল। তথাপি তাঁহার এই আশা হইল যে, রক্তপাত করিতে না দিয়াও তাহাদের তৎকালীন দুঃখ-দৈন্য ঘুচাইবার একটী উপায় তিনি তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

এই সময়ে তিনি তাঁহার দিনলিপিতে লিখিলেন,—"অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকার অপেক্ষা এইরূপ ক্লেশভোগ যদি একান্ত অনিবার্য্যই হয়, তবে তাহা ভোগ করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।" এই দুঃখ যে কিপ্রকারের ছিল, তাহা আমরা তাঁহার নিজমুখহইতেই অবগত হই।

"মাসখানিক হইল, আমি এক অস্থিচর্ম্মসার ব্যক্তিকে আমার শিবিরে আনিয়া আহারাদি দিতেছিলাম, কিন্তু গতকল্য ঈশ্বর তাহাকে তুলিয়া লইয়াছেন, এখন সে তাবৎ বিষয়ই অবগত হইয়াছে।"

আবার একস্থানে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "এক দুর্ভাগিনী ভগিনী পথদিয়া অতিকষ্টে হাঁটিয়া চলিয়াছিল, সে এত দুর্ব্বল ছিল যে, বাতাসের ধাক্কায় তাহার হুমড়ী খাইয়া পড়িয়া যাইবার ভয় ছিল, তাই সে পড়িয়া যাইবার অপেক্ষা দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিল। আমি তাহার কাছে খানিকটা ধুরা (শস্যবিশেষ) পাঠাইয়াছি, হইতে তাহার কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক, কঙ্কাল-সার দেহে আনন্দ-স্ফুলিঙ্গ ফুটিবে।" কিন্তু তাহাকে সঞ্জীবিত করিবার শত-চেষ্টা করা সত্ত্বেও অভাগিনী রমণী দুই দিনে মরিয়া যায়।

এই দেশের লোকেরা এত দরিদ্র ছিল যে, বিক্রয় করিবার মত কোন দ্রব্য তাহাদের কাছে ছিল না। সুতরাং যাহারা দুর্ব্বল ছিল, তাহারা অনাহারে অল্পে অল্পে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, আর যাহারা সবল ছিল, তাহারা মিস্রীয় শাসনকর্ত্তার অধীনতা-পাশহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রাণপণ করিত।

গর্ডন যদিও তথায় খেদিভের প্রতিনিধি-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথাপি তিনি সত্যের অবমাননা করিতে পারেন নাই। তিনি এই আশা করিতেছিলেন যে, গণ্ডকোরার পর-প্রবাহিত নীলনদে জলযাত্রার পথ উন্মুক্ত করিয়া এবং মরুভূমির মধ্য দিয়া একটী পথ প্রস্তুত করাইয়া সুদানবাসী তাবৎ জাতিকে মিসরের অধীনে শান্তিপ্রিয় একজাতিতে পরিণত করিবেন। তিনি ইহাও আশা করিতেছিলেন যে, তাহাদের পোষণার্থে যে যে পন্থা পাওয়া যায়, সেই সেই পন্থার সবিশেষ অবলম্বন করিয়া তিনি তাহাদিকে আত্মপোষকও করিয়া তুলিবেন।

কিন্তু সংকল্পিত পন্থাবলম্বনের ফলে প্রজারা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়া একান্ত আশঙ্কিত হইয়া উঠিল, তাহাতে তাঁহাকে সাফল্যলাভের আশায় প্রায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। তাঁহার কার্য্যে সন্দেহ করিয়া দেশীয় দলপতিরা তাঁহাকে নানাপ্রকারে বিফলমনোরথ করিতে লাগিল, তাহারা তাঁহার প্রতিকার্য্যে বাধাবিঘ্ন জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে অগত্যা তিনি তাহাদের প্রতি তাঁহার অপ্রীতিকর আচরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

তিনি স্থির করিলেন, হ্রদসমূহপর্য্যন্ত জলযাত্রার পন্থা পরিমুক্ত হইলেই, খেদিভ যদি তাঁহাকে সমগ্র প্রদেশটির ভার-দিয়া অধিকতর স্বচ্ছন্দতা-প্রদান না করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ বিরক্তিকর কার্য্যহইতে অবসর লইবেন।

তাঁহার এই ধারণা হইল যে, প্রজাব্রজের উপর তিনি যদি সদয় ব্যবহার ও সহানুভূতি-প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদের হৃদয়-হরণ করিতে পারিবেন। তাহাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ এবং স্বীয় সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতার উদাহরণ-প্রদর্শন করিলে, তিনি তাহাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য-লাভও করিতে পারিবেন। খেদিভ ইস্মাইলের নিজের গর্ডনের প্রতি বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তাঁহার পরামর্শদাতৃগণের প্রতিকূলাচরণ করিলে, তাঁহার স্বার্থহানি হইবে, এই ভয়ে তিনি গর্ডনের মতে মত দিতে পারিলেন না। কাজেই গর্ডন যেই দেখিলেন, আলবার্ট নিয়াঞ্জা ও ভিক্টোরিয়া হ্রদদ্বয়ে গমন করিবার জলপথ মুক্ত হইয়াছে, অমনই সুদানপরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সুদানের প্রধান শাসনকর্ত্তা।

যাহা হউক, তিনি অধিক দিন স্বদেশে থাকিতে পারিলেন না। খেদিভ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, যে ইংরাজ-বীরকে তিনি বিদায়

করিয়া দিয়াছেন, তিনি ব্যতীত আর কেহই সুদানের দুর্দ্দশার প্রতীকার প্রচেষ্টায় সফলকাম হইবেন না, তখন তিনি গর্ডনকে অবিলম্বে সুদানে ফিরিয়া আসিবার জন্য এক জরুরী খবর পাঠাইলেন।

গর্ডন খেদিভের অনুরোধ-রক্ষা করিলেন; কিন্তু কাইরো-পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সমগ্র সুদান-প্রদেশের প্রধান শাসন-কর্ত্তার পদপ্রাপ্ত হইলেন। প্রধান শাসনকর্ত্তারূপে তিনি পুনরায় খার্টুমে যাত্রা করিলেন, তিনি তখন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহার পদনিহিতা শক্তি তিনি প্রজাপুঞ্জের প্রতি যে, অন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে, তাহারই প্রতিকারার্থে, তাহা-দিগকে সাধুতা কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইতে ও সদাচরণে বাধ্য করিতে এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয়বিধ প্রজাকেই দেশ-প্রচলিত বিধি-বিধানের সমভাবে অধীন করিতে প্রয়োগ করিবেন।

এই সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি এই কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছি, যদি আবশ্যক হয়, এই কার্য্যের জন্য আমি প্রাণ দিব। আমার মনে হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যেন আমার কোন সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর স্বয়ং এই কার্য্যটি হাতে লইয়াছেন, আমি এই সময়ের নিমিত্ত তাঁহার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছি।"

কিন্তু যখন তাঁহার দ্রুতগামী উষ্ট্র তাঁহাকে মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়া ছুটিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাঁহার কার্য্যের গুরুত্ব ও কঠিনতা তাঁহার বিশেষভাবে উপলব্ধ হইল, তথাপি তাঁহার বিশ্বাস তাহাতে আরও সবল হইল, তিনি আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর হয়, তবে তিনি এই কার্য্য সফল করিবেনই করিবেন।

কেবল একজন বেদুইন-সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া তিনি এক ফাঁড়ী-হইতে আর এক ফাঁড়ী ত্বরিৎগমনে পরিদর্শন করিতে করিতে চলিলেন,—সর্ব্বত্রই তিনি নানা আদেশ দিতে দিতে, নানাপ্রকার পরিকল্পনা ও বিচার করিতে করিতে চলিলেন। তখন তিনি রৌদ্র বা ঝড়, দিবা বা রাত্রি কিছুই মানিতেছিলেন না। তাঁহার দলবলকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া, কেবল তাঁহার প্রিয় পথপ্রদর্শকটিকে লইয়া তিনি এত দ্রুতভাবে পর্য্যটন করিতেছিলেন যে, বোধ হইতেছিল, যেন তিনি সর্ব্বত্র একই সময়ে উপস্থিত হইতেছেন।

সুদানীয় কর্ম্মচারীরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে, তাহাদিগকে এখন একজন দৃঢ়সংকল্প ও দুষ্টদিগের বিষয়ে নির্ম্মম বিচারক ব্যক্তির সহিত কার্য্য করিতে হইবে। সেই ব্যক্তি এমন লোক যে, তাঁহার অভ্যর্থনায়, তাঁহাকে সেলাম করিবার বা উৎকোচ দিবার প্রয়োজন হয় না। তাঁহার ইস্পাতের ন্যায় ধূসরবর্ণ চক্ষুর দৃষ্টি দরিদ্র, জরা-গ্রস্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের উপরে করুণায় কোমলভাবে পতিত হয়। তাঁহার আদেশ-প্রদানকালীন কঠোর স্বর দীন-দুঃখীদের দৈন্যদশার অবসান হইবে, এই আশাপূর্ণ আশ্বাস দিবার সময়ে, তাহাদের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতিবশতঃ, কামিনীকণ্ঠের ন্যায় কোমল হইয়া উঠে।

প্রজাদের কেবল যে দাসব্যবসায়ীদিগকে ঠেকাইতে হইত, তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধও চলিতেছিল। আক্রমণ ও প্রত্যাক্র-মণে দেশের উর্ব্বর অঞ্চলগুলি উৎসাদিত হইতেছিল, তাহার জন্য প্রজারা নির্ভয়ে কোথাও যাইতে-আসিতে পারিত না, যে প্রদেশের লোকেরা শান্তিতে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা করিত, তাহারা ঐ কারণে ভগ্নাশ হইয়া পড়িতেছিল।

ইহা দেখিয়া গর্ডন বলিয়াছিলেন, "এই লোকদের যাতনা ঘুচাইবার জন্য আমি শপথ করিতেছি, যদি প্রয়োজন হয়, প্রাণ-বিসর্জ্জন করিব।"

ডারফোরহইতে কর্দ্দোফানে, এক বিপ্লব-স্থলহইতে আর এক বিপ্লবস্থলে—দুঃসহ উত্তাপহেতু যখন ভ্রমণ একান্ত অসম্ভাবিত হইত, কেবল তখনই একটু বিশ্রাম করিয়া—এই উদার-হৃদয় বীর দ্রুত-ভাবে গমন করিয়া কখন এ সর্দ্দারকে কখন বা ও সর্দ্দারকে প্রশান্ত করিতেন, কখন কোন দাসব্যবসায়ীকে ধরিয়া বন্দীদিগকে তাহার কবলহইতে মুক্ত করিতেন; কিন্তু তিনি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল অবলা স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের দুঃখ দূরীকরণার্থেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়াস-স্বীকার করিতেন।

একবার তিনি দেড়দিনে সাড়েবিয়াল্লিশ-ক্রোশ পথাতিক্রম করেন এবং তাহার পর প্রত্যূষে উঠিয়াই একদল বাণী বাজুক, দস্যু ও গুণ্ডাকে সঙ্গে করিয়া কয়েকজন পরাক্রান্ত দাসব্যবসায়ী রাজার তাম্বুতে সাহসের সহিত অভিযান করেন। দস্যু ও গুণ্ডারা তাঁহার সাহস ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া

কিন্তু তাঁহার এই অক্লান্তভাবে পথ-পর্য্যটন, অবিশ্রান্ত তর্ক ও অক্ষুণ্ণ প্রযত্ন বৃথা হইয়াছিল। ফিচেল দাসব্যবসায়ীরা যে মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞা করিত, তাহার পরমুহূর্ত্তেই সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া দাস ধরিতে ছুটিত।

গর্ডনের মত কোমলহৃদয় মনুষ্যের পক্ষে ইহা এক হৃদয়বিদারক ব্যাপার। তবু এই কার্য্যের যে একটু সুফল পাওয়া যাইতেছিল, গর্ডনব্যতীত আর কাহারও দ্বারায় সেই সুফলটুকুও পাইবার সম্ভাবনা হইত না। গর্ডনের এক-একসময়ে মনে হইত, দেশটা বুঝি অভিশপ্ত, নতুবা একস্থানের তিমির-হরণ করিতে গিয়া, অন্য স্থানে ঘোরান্ধকার পুঞ্জীভূত হইতে দেখা যায় কেন?

যখন তিনি ঐপ্রকার নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তখন একদিন কাইরোহইতে খেদিভের এই আদেশ আসিল, গর্ডনকে ঐ দেশের আর্থিক-অবস্থাসম্বন্ধে পরামর্শ দিতে যাইতে হইবে। ইস্-মাইল বড়ই অপব্যয়ী লোক ছিলেন। তাঁহার কুবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি বিস্তর টাকা ভয়ানক অধিক সুদে ধার লইয়া-ছিলেন।

ঐ টাকার সুদ দেওয়ার সম্বন্ধে কষ্টে পড়ায় খেদিভ তাঁহার দেশের মধ্যে যে লোকটীকে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাকেই ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু সৎপরামর্শ পাওয়া সত্তেও, যাহাদের স্বার্থ ছিল, এমন সমস্ত লোকের পরামর্শে খেদিভ প্রকৃত বন্ধুর পরামর্শ-উপেক্ষা করিলেন। গর্ডন বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া সুদানে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার তখন এই নিশ্চিত প্রতীতি হইল যে, এই দেনার দায়ে খেদিভের অধঃপতন হইবে। খেদিভকে গর্ডন অকপট প্রেম করিতেন।

উপযুক্তভাবে শাসন করিবার জন্য খার্টুমে তিনি আর একবার সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কার্য্য-সাধনার্থে ইতঃপূর্ব্বে তিনি একটুও বিশ্রাম করিতে পাইতেন না, এখন তিনি প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দীর্ঘ পথ-ভ্রমণ ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের গ্লানিচিহ্ন তাঁহার শরীরে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার বিন্দুমাত্র মৃত্যু-ভয় ছিল না বলিয়া, তিনি সেসম্বন্ধে বড় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উদ্বেগ এই কারণে হইত যে, তিনি ইংলণ্ডের কোন লোকের দৃষ্টি এই আর্ত্ত সুদানবাসীদের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারেন নাই, তাহাছাড়া খেদিভের কার্য্য-কলাপের নির্ব্বুদ্ধিতার কথাও তিনি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন নাই।

তাঁহার কাছে কোন বন্ধু এবং বাইবেল আর একখানি পুস্তক-ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকও ছিল না। অসুস্থ গর্ডন বিদেশে একাকী নিঃসঙ্গ ও ক্লেশকর জীবন-যাপন করিতেছিলেন। তথাপি তিনি এই বিশ্বাসে স্থির ছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহার অভীপ্সিত সময়ে সুদানের প্রজাব্রজের দুঃখ দূর করিবেন, তাই তিনি কার্য্য করিতেই থাকিলেন।

বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ হইতে লাগিলেন, কোন কোন বিদ্রোহ দাসব্যবসায়ীদিগের অত্যাচারের ফল, কোন কোন বিদ্রোহ মিস্রীয় গবর্ণমেণ্টের কুশাসনের ফল। এই সকল বিদ্রোহ-দমন করিবার জন্য গর্ডন বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণতম ঋতুতে জোর করিয়া যুদ্ধাভিযান করিতে বাধ্য হইতেন। সময়ে সময়ে কোন ওয়েসিসে পহুঁছিয়া দেখিতেন, তাঁহার সঙ্গে আছে ৪০টি উট, কিন্তু জল পাওয়া যাইতেছে, কেবল দুইটি উটের মত!

তখন তিনি দেড়দিনের পথস্থিত আর একটী ওয়েসিসে পহুঁছিবার জন্য রাত্রিবেলাতেই চলিতে আরম্ভ করিতেন।

এইপ্রকারে পথ-পর্য্যটন বড়ই নীরস কার্য্য, গর্ডন পথে মতলব আঁটিতে আঁটিতে যাইতেন। তাঁহার সৈনিকদিগের বড়ই বস্ত্রাভাব হইয়াছিল, তাহাদের স্ত্রীপরিবারদিগের অবস্থাও ঐপ্রকার হইয়াছিল, কারণ তাহারা দুইবৎসর বেতন পায় নাই। গর্ডন এই অর্থক্লিষ্ট সৈনিকদিগের কষ্ট দূর করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজ ও মিস্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটহইতে ঋণ-গ্রহণ করিয়াও কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

দেশে টাকার একান্ত অনাটন হইয়াছিল, তাই দাসব্যবসায়ী-দিগের বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। সবল ও সুস্থ পুরুষ ও নারীরাই দেশের পণ্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের বিক্রয় করিলে, প্রচুর অর্থ পাওয়া যাইত। সেইজন্য, অনিচ্ছাসত্তেও, দেশীয় দলপতিরা ঐপ্রকার পুরুষ ও স্ত্রীকে ধরিয়া সদা নরক্রয়ে-প্রস্তুত দাসব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় করিত।

খেদিভ তাঁহার দেনার হাঙ্গামা মিটাইবার জন্য আর একবার গর্ডনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গর্ডন যদিও বুঝিলেন যে, খেদিভকে পরামর্শ দিতে যাওয়া বৃথা, তথাপি গেলেন।

পথে যাইতে যাইতে তিনি বিস্তর নরকঙ্কাল পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। দাসব্যবসায়ীরা কোন স্থানে তাড়াতাড়ি পহুঁছিবার জন্য পথশ্রমে মৃত দাসদিগকে কবর দিবারও অবকাশ পায় নাই, তাহাদিগকে যেথা সেথা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সকল কঙ্কাল সেই পথিমৃত দাসদিগেরই।

কোন লোক এই বীভৎস দৃশ্য দেখিলে, অসুখী হইবে, এই বিবেচনা করিয়া গর্ডন নরকঙ্কালগুলিকে কবর দিবার আদেশ করিলেন।

কিন্তু তিনি কাইরোতে পহুঁছিবার পূর্ব্বেই ইস্মাইল সিংহাসন-চ্যুত হইলেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে এক নূতন খেদিভ রাজত্ব করিতে লাগিলেন। নূতন খেদিভ, টিউফিক্, গর্ডনের সদুদ্দেশ্যের কথা জানিতেন বলিয়া তাঁহাকে একটী কাজ দিয়া আবিসিনিয়ার রাজার কাছে প্রেরণ করিলেন। তিনি মিস্রীয় রাজ্যের অন্তর্গত কয়েকটি দ্বীপ দাবী করিতেছিলেন।

পথে বহু কষ্ট পাইয়া গর্ডন আবিসিনিয়ার রাজার রাজ্যে পহুঁছিলেন। রাজা কিন্তু গর্ডনের শান্তিপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। গর্ডন তাই রাজার অসম্মতিজ্ঞাপক একখানি পত্রমাত্র লইয়া প্রত্যাগত হইলেন।

রাজপ্রাসাদ ছাড়িবার পরই একদল আবিসিনিয়ান তাঁহাকে দলবলসহ ধরিয়া কাসালার পথদিয়া না যাইতে দিয়া মাসোওয়ার পথদিয়া দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

এই কার্য্যে গর্ডন পদে পদে বিফল-মনোরথ হন। কাইরোতে ফিরিলে, খেদিভ তাঁহার প্রতি উপেক্ষাপ্রকাশ করিলেন। তিনি ঐ দেশের হিতার্থে যে সমস্ত সদুপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এমন বিকৃত করিয়া বিলাতের সংবাদ-পত্রসমূহে পাঠান হইল যে, তাহাতে ইংরাজ-সমাজ তাঁহার উপর চটিয়া উঠিল।

গর্ডন শরীরে ও মনে ক্লান্ত এবং মানুষের প্রতি মানুষের নির্দ্দয়তায় মর্ম্মাহত হইয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে দীর্ঘ ও অত্যাবশ্যক বিশ্রামলাভ করিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

(ক্রমশঃ।)

-:০:-

কুসুম-কাহিনী

এক বিজন কুসুমকাননে একটি কুসুমিকা ফুটিয়াছিল, আজ ঝরিয়া পড়িয়া গেল। আহা! কেন ঝরিল? 'আহা' কেন? দুঃখ কেন? করতালি দাও! প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে একবার তাহার ধূলিধূসরিত অঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। যাহার যেমন জীবন, তাহার তেমন মরণ। দেখ না, সূর্য্য যখন উদিত হয়, তখন কুঙ্কুমাভ, আবার যখন অস্ত যায়, তখনও কুঙ্কুমাভ!

ফুলের জীবন যে, আত্মবিতরণের জীবন। ফুল তখনও কলিকা, হাওয়া আসিয়া বলিতেছে, "ও কলি, কবে ফুটিবে? আমি যে তোমার পরাগ মাখিয়া দেশদেশান্তরে ছুটিয়া যাইতে চাই!" মধুমক্ষিকা আসিয়া বলিতেছে, "ও ফুলের কুঁড়ি! ফোট, ফোট! এ গরীবকে একচুমুক মধু দাও, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে।" হাওয়া কেবলই আসিয়া তাহাকে দুলায়, আর ঐ কথা বলে। মৌমাছি কেবলই আসিয়া গুণ্‌গুণ্‌ করে, আর ঐ ভিক্ষা করে। কলিকা তাহাদের কথা শুনিয়া করুণায় ফুটি ফুটি করিতে করিতে অবশেষে ফুটিয়া উঠিল। তখন হাওয়া বেচারাকে অবশ ও শিথিল করিয়া তাহার রেণু গায়ে মাখিয়া মানুষের কাছে আসিয়া সুখ্যাতি লইতে লাগিল! আর মধুকর তাহার শরীরের শোণিত—তাহার বুকে যতটুকু সুবাসিত মধু ছিল, সব নিঃশেষে পান করিয়া মধুচক্রে উড়িয়া গেল। ফুলের পরাগ গেল, মধু গেল, তবু সুবাস গেল না, সে তাহাই পরকে বিলাইতে লাগিল। এমন সময়ে এক পাখী আসিয়া তাহার কোমল দলগুলি ক্ষুদ্র চঞ্চুপুটদিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে লাগিল, ফুল তাহাতে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, তবু কিছু বলিল না। শেষ ছিল, তাহাতে একটু মিষ্ট, রঙ্গীন রস, সূর্য্যের সেটুকু দরকার হইল, সে তাহা শুষিয়া লইল। তখন তাহার মাতৃভূমি তাহাকে কামনা করিতে লাগিল, "আয়, মা, আমি তোকে চাই, আবার তোর মত আর একটি ফুল ফুটাইব।" তাই ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, সে এখন মাটীতে মিশিয়া গিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করিবে! তাই বলি, আহা বলিও না, দুঃখ করিও না, দেখ কি সুন্দর ফুলের জীবন, তাহার দিকে প্রশংসমান নয়নে চাও, করতালি দাও। তোমার চোকের সাম্‌নে সে ফুটিয়া টুটিয়া পড়িয়া তোমাকেও সে কিছু দান করিয়া গেল। সে তোমাকে এই শিক্ষা-দান করিয়া গেল, "ওগো মানুষ! তোমার প্রাণ-প্রসূনও একদিন আমারই মত ঝরিয়া পড়িবে; তাই এই অনুরোধ, আমি যেমন পরের জন্য ফুটিয়াছিলাম, পরেরই জন্য মরিয়াছি, তুমিও তেমনই পরের জন্য জীবন-প্রদীপ জালিয়া রাখ, আর জীবনে যখন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না, তখন 'যদি' অবকাশ পাও, পরেরই জন্য প্রাণ-প্রদীপ নিবাইয়া দিও!"

সুপ্তি-তত্ত্ব

প্রাণিমাত্রেই ঘুমায় কেন? এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর-প্রদান এ-পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই। তবে আমাদের মনে হয়, প্রকৃত কারণ এই যে, আমাদের শরীরের মধ্যে এমন কোন একটি পদার্থ সঞ্জাত হয়, যাহা রক্তদ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া আমাদের ঘুম পাড়াইয়া দেয় এবং সেই পদার্থটি যে নিদ্রা-জনক কোন ঔষধের মত পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, নিদ্রাজনক যে ঔষধটি শরীরমধ্যে জাত উক্ত পদার্থটির মত, সেই ঔষধটিই নিদ্রার উত্তম ঔষধ। আমরা ঘুমাই কেন, এ প্রশ্নের ইহার অপেক্ষা বিশদতর উত্তর আর দেওয়া গেল না, কিন্তু এই উত্তরে ঐ প্রশ্নটির, আশা করি, অনেকটাই উত্তর করা হইল।

ঘুমাইয়া আমাদের কি উপকার হয়? বিশ্রামলাভ করা হয়। যখন আমরা ঘুমাই, তখন আমাদের সমস্ত শরীর, মস্তিষ্ক, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌, মাংসপেশীসমূহ, উদর, আমাদের তাবৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বিশ্রাম করিতে থাকে। শিশুদিগকে বৃদ্ধি পাইতে হয়, তাই তাহাদের বুড়া লোকেদের অপেক্ষা বেশী ঘুমাইবার প্রয়োজন হয়, নিদ্রিত অবস্থাতেই শিশুরা বেশী বৃদ্ধিলাভ করে, এইজন্য না ঘুমাইলে, তাহারা ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না। না ঘুমাইলে, যদিও কাহারই চলে না, তবু ঐ কারণে শিশুদেরই বেশী ঘুমান আবশ্যক। যে সমস্ত লোকে তেমন বাড়ে নাই, কিম্বা দুর্ব্বল, কিম্বা মনোবলশূন্য, তাহারা শৈশবে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই।

এমন এক সময় ছিল, যখন বয়স্ক লোকেরা শিশুদের নিদ্রা-সম্বন্ধে তত মনোযোগী ছিল না, কিন্তু এখন শিশুপালন-সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুখের বিষয় এই যে, মাতা বা ধাত্রীরা তাহাদের সুপ্তিসম্বন্ধে সবিশেষ মনোযোগিনী।

ভোরেই আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় কেন? এই কথার উত্তর দিতে হইলে, প্রথমে আমাদের বলিতে হইবে, সমস্ত রাত আমরা সমান গাঢ়ভাবে ঘুমাই না। "ভাতঘুমটা" আমাদের খুব গাঢ় হয়। গাঢ় নিদ্রা খুব ভাল; ইহাতে আমাদের চেহারা ভাল হয়, এইজন্য প্রথম ঘুমের ইংরাজী নাম—"সৌন্দর্য্য-সুপ্তি"। তাহার পর কিন্তু ক্রমশঃ আমাদের ঘুম খুব পাৎলা হইতে থাকে। প্রথম ঘুম ঘুমাইতেছে, এমন লোকের একডাকে সাড়া পাওয়া যায় না, তাহাকে বার বার ডাকিতে হয়, পরে কিন্তু অনেককে একবার

ডাকিলেই, সাড়া পাওয়া যায়। শেষে মানুষের ঘুম এমন 'সজাগ' হইয়া উঠে যে, একটু শব্দেই, সে জাগিয়া উঠে।

এই কারণে ভোরে মানুষের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। যত রাত বেশী হইতে থাকে, তত মানুষের ঘুম কমিয়া যাইতে থাকে; ভোরের বেলা তাহার ঘুমের 'নেশা' একটুও থাকে না, কাজেই সে জাগিয়া উঠিয়া পড়ে।

অবনী-কাহিনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে আমরা পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়াছি—ঊর্দ্ধে নীলাকাশে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছি, নিম্নে সমুদ্রের তলদেশপর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন আমাদিগকে অবনী-কাহিনীর সূচনাহইতে আরম্ভ করিতে হইবে, অবনী কিরূপে বর্ত্তমান আকার-প্রাপ্ত হইয়াছে, সে কথা ক্রমে ক্রমে গুছাইয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে। অন্য কোনপ্রকার কাহিনী বলা এক কথা, আর অবনী-কাহিনী বলা অন্য কথা; যে ঘটনা কেহ নিজে প্রত্যক্ষ করে, সে ঘটনার বর্ণনা করা তাহার পক্ষে সহজ হয়, কিন্তু অবনীর পূর্ব্বাবস্থা আমরা নিজেরা প্রত্যক্ষ করি নাই, পরে তাহাতে আসিয়া চতুর্দ্দিকস্থ বস্তুব্যূহ দেখিয়া তৎ-সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, তাহাই অবনীবিষয়ে আমাদের জ্ঞানের সম্বল। চতুর গুপ্তচর যেমন, কোন ঘরে চুরী হইলে, সেই ঘরের জিনিসপত্র দেখিয়া ও লোকদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া চোরকে ধরিয়া ফেলে, আমরাও তেমনিই চতুর্দ্দিকস্থ নানা ব্যাপার মনো-যোগপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ করিয়া ও সে সমস্ত ব্যাপারের বিষয়ে চিন্তা করিয়া পৃথিবীসম্বন্ধে অনেক সম-স্যার সমাধান করিতে পারি; কিন্তু গুপ্তচরকে অনেক মাথা ঘামাইতে হয়, তবে সে কোন মোকদ্দমার কিনারা করিতে পারে।

পৃথিবীসম্বন্ধে রহস্যগুলি আরও জটিল, আরও বিস্ময়জনক, আরও গৌরবমণ্ডিত। পৃথিবীরহস্যের সমাধান করিতে পদে পদে ঠকিতে হয়, পদে পদে ধাঁধা লাগে, পদে পদে ভুল হয়। অনেক ব্যাপার দেখিয়া বোধ হয়, এ তো খুব সোজা, পরে কিন্তু দেখা যায়, ব্যাপারটি মোটেই সোজা নয়, তাহার ভিতরে নানা জটিল বিষয় জড়িত রহিয়াছে। আবার প্রাথমিক-সমস্যাটীর সমাধান না করিতে পারিলে, আর একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। ধর, দ্বিতলে তুমি শুইবার ঘরে যাইতে চাও, দ্বিতলের সোপান বাহিয়া উপরে না উঠিয়া যদি তুমি নীচে পাকশালার দিকে যাও, কখনও গন্তব্য স্থানে পহুঁছিতে পারিবে না, তেমনই পৃথিবীর সম্বন্ধে কোন সমস্যার সমাধান করিবার সময়ে যদি তুমি গোড়াতেই ভুল কর, তবে তাহার সম্বন্ধে জটিলতর রহস্যের সমাধান কি করিয়া করিবে?

প্রথমে পৃথিবীর কয়েকজন জ্ঞানী লোক এইরকম গোড়ায় গলদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাস্তবিকই জ্ঞানী লোক ছিলেন, তবু পৃথিবী তাহাদিগকে এমন ঠকাইয়াছিল যে, ভুল পথটাই তাঁহাদের ঠিক পথ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আর যত তাঁহারা সেই পথ ধরিয়া চলিতেছিলেন, তত সমস্যার জাল জটিলতর হইয়া উঠিতেছিল।

তাঁহাদের একটা ভুল-ধার-ণার কথা শুন। তাঁহারা ভাবিয়া-ছিলেন, পৃথিবীতে পাহাড়-টাহাড় থাকিলেও, ইহা গোল নহে, মাঠের মত সমতল জায়গা, আর পাহাড়গুলা আবুড়া-খাবুড়া জায়-গায় যেমন মাটী উঁচু নীচু থাকে, তেমনই উঁচু মাটী। তাঁহারা এই-রকম তর্ক করিতেন যে, পৃথিবী গোল নয়, কারণ পৃথিবীর উপর দিয়া যত দূরই হাঁটিয়া যাও না কেন, কখনও মাথা দিয়া হাঁটিতে হয় না! আবার পৃথিবীর কিনারায় আসিয়া কখনও পড়িয়াও যাইতে হয় না।

সার্কাসে বাজীকর যেমন বলের উপর দিয়া হাঁটে, আমাদের তেমন

করিয়া পৃথিবীর উপর দিয়া হাঁটিতে হইতেছে না। অতএব পৃথিবী একটা সমতল ক্ষেত্র, তাহার উপরে আকাশ আর নীচে পাতাল। আকাশে উড়িয়া যাইতে হয়, আর পাতালে মাটী খুঁড়িয়া ঢুকিতে হয়।

চিত্র [illegible] হইতে [illegible] যাইতেছে।

পাতালের সম্বন্ধে ঐ জ্ঞানী লোকদের এই ধারণা ছিল যে, পাতালটা বড় গরম জায়গা; কারণ তাঁহারা দেখিতেন, কোন কোন পাহাড়ের মাথায় গর্ত্ত আছে, (এখন ঐ গর্ত্তকে আগ্নেয়গিরি-মুখ এবং ঐ পাহাড়কে আগ্নেয়গিরি বলা হয়), সেই গর্ত্ত দিয়া মাটীর ভিতরহইতে গরম গরম কত কি বাহির হইতে থাকে। তাই:তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবীর ভিতরে আগুন জ্বলিতেছে।
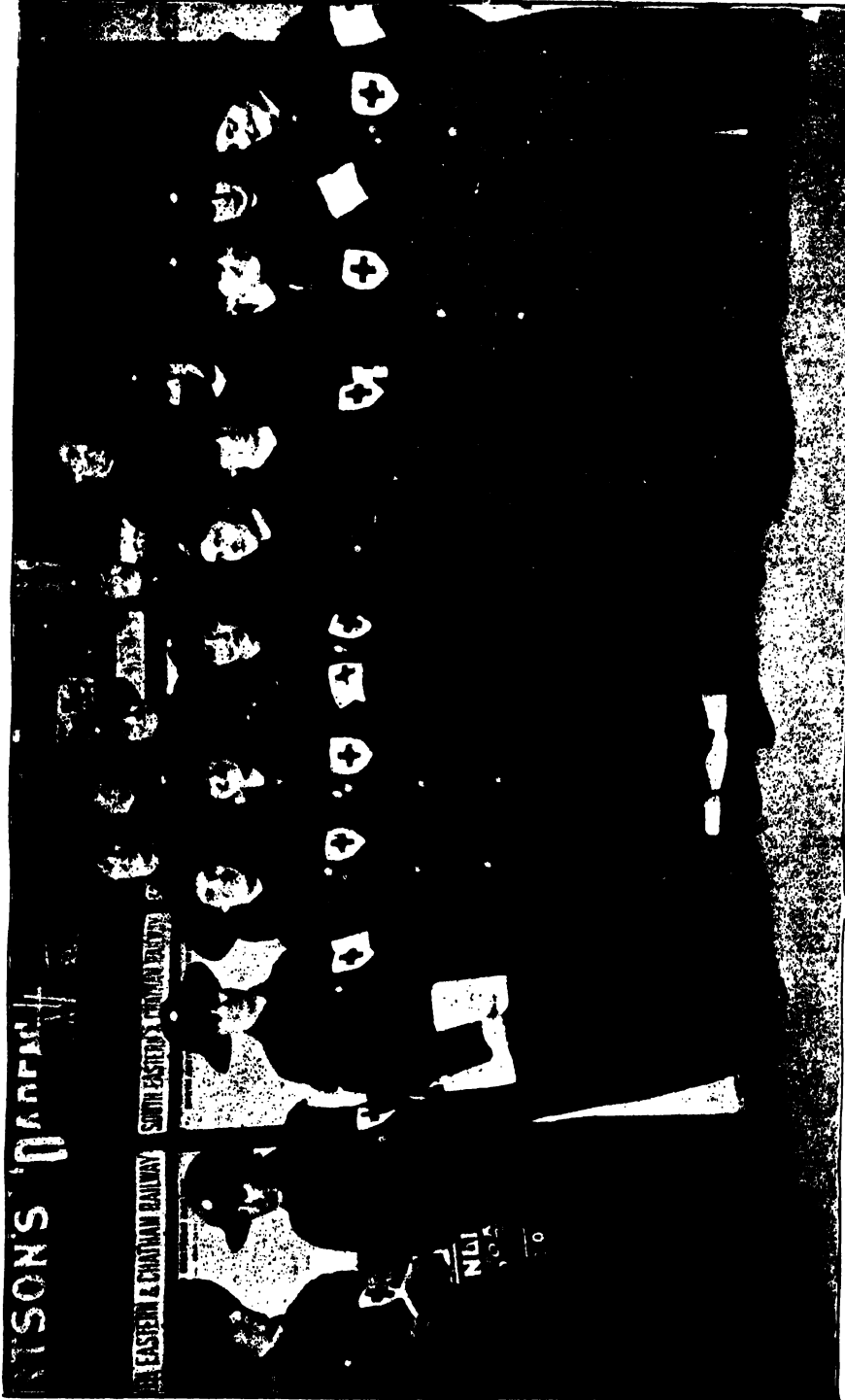
কিন্তু উক্ত সমস্ত সিদ্ধান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ। আবার তাঁহাদের এই ভুল-ধারণাও ছিল যে, পৃথিবী স্থির হইয়া আছে। সূর্য্য ও চন্দ্র ও তারাগুলি সব প্রত্যহ ঠিক একদিক্‌হইতে উঠে, আর একদিকে অস্ত যায়। পৃথিবী যদি সত্যই ঘুরিত, তাহা হইলে এমনটি কখন হইত না।

তাঁহারা বলিতেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে না, সূর্য্য ঘুরিতেছে, কেন-না দেখা যায়, সূর্য্য প্রত্যহ পূর্ব্বদিকে উঠে, চলিতে চলিতে সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের জলে ডুবিয়া নিবিয়া যায়; তাহার পর, কি জানি কেমন করিয়া, পৃথিবীর ভিতরদিয়া গিয়া সকালবেলা আবার জ্বলিয়া উঠে! তখন বরং পৃথিবী ঘুরিতেছে, একথা বলিলে, লোকে হাসিয়া উঠিত।

শেষে একজন পণ্ডিত একদিন বলিয়া ফেলিলেন, পৃথিবী সমতল-ভূমি নয়, গোলাকার। ইহা শুনিয়া তখনকার লোকেরা বলিল, পৃথিবী যদি গোল হইত, তবে আমরা, যেস্থানহইতেই যাত্রা করি না কেন, আবার সেই স্থানে ফিরিয়া আসিব; কিন্তু তখন তাহারা পৃথিবী বলিতে, পৃথিবীর সামান্তে একটু অংশকেই বুঝিত, সুতরাং তাহারা কোন একস্থান-হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসা সত্যই যে যায়, তাহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইত না।

ইহাছাড়া তখনকার লোকেরা এই তর্কও করিত যে, পৃথিবী গোল নয় এই কারণে যে, পৃথিবীর নিম্নার্দ্ধে কোন লোক থাকিলে,

সে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে ; এমন কি পৃথিবীর উচ্চার্দ্ধের লোকেরাও, পৃথিবী যদি গোল হইত, তাহা হইলে খানিকদূর গিয়াই পড়িয়া যাইত।

তবুও পৃথিবীর গোলত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, পৃথিবী গোল, কারণ তাঁহারা দেখিতেন, সমুদ্রে প্রথমে জাহাজখানিকে ধূঁয়ার মত দেখাইতেছে, শেষে তাহা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, বরং আমরা দেখি যে, জাহাজখানি যেন নীচেহইতে উপরে উঠিতেছে, প্রথমে তাহার মাস্তুল, তাহার পর তাহার উপরিতল, শেষে তাহার খোল দেখা যাইতেছে।

ভারত-সম্রাট ।

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট।

রুষিয়ার জার।

জর্ম্মানীর কৈসর।

সার্ভিয়ার রাজা।
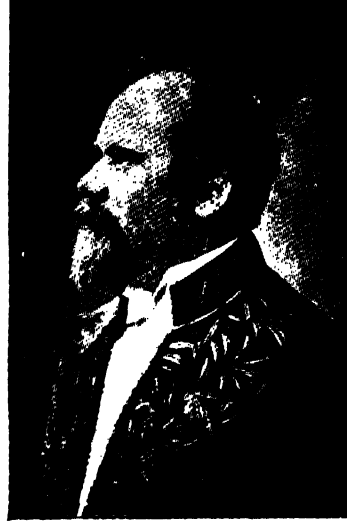
অষ্ট্রিয়ার রাজা।

যে জাহাজ চলে, তাহা খানিকদূর গেলেই, প্রথমে তাহার খোল, তাহার পর তাহার উপরিভাগ, শেষে মাস্তুলটি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যায়। পৃথিবী যদি সমতল ক্ষেত্র হইত, তাহা হইলে জাহাজখানি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়া শেষে অদৃশ্য হইত। আবার সেই জাহাজখানিই যখন ফিরিয়া আসে, তখন আমরা এমন দেখি না যে,

শেষে একদল খুব সাহসী নাবিক একদিন এই কথা বলিল, "আচ্ছা, পৃথিবী যদি সত্যই গোল হয়, আর পৃথিবীর চারপাশে যদি জাহাজ চালাইবার মত জল থাকে, তবে আমরা বড় ও ভাল একখানি জাহাজে অনেক দিনের খাবার লইয়া পৃথিবীর চারপাশে ঘুরিয়া আসি—অবশ্য ইতিমধ্যে খাবার যদি না ফুরাইয়া

যায়। তাহারা বড় একখানি জাহাজে অনেকদিনের খাবার লইয়া স্পেনহইতে যাত্রা করিল। তাহারা যখন বিদায় লয়, তখন তাহাদের আত্মীয়েরা, তাহারা আর ফিরিয়া আসিবে না ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহারা সোজা জাহাজ চালাইয়া চলিল; কিন্তু তাহারা পৃথিবীর সমস্তটা না ঘুরিয়া ভুলিয়া খানিকটা ঘুরিয়া একজায়গায় ডাঙা দেখিতে পাইয়া জাহাজ ভিড়াইল। শেষে কিন্তু আরও অনেক সাহসী নাবিক পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রা করিল এবং কোন কোন দল নানা নূতন দেশ-আবিষ্কার করিয়া ঘরে ফিরিল। অবশেষে সত্য সত্যই একদল নাবিক অনেকদিনের পর পৃথিবী ঘুরিয়া আসিল; তখন পৃথিবী যে সত্যই গোলাকার, সে বিষয়ে আর কাহারই সন্দেহ রহিল না।

সাহসিক শিখ

তখন ভারতে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। একদল ইংরাজ ও শিখসৈন্য এক নগরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। এই নগরটি তখন সিপাহীদিগের অধিকারে রহিয়াছে। ইংরাজেরা সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও নগরটি অধিকৃত করিতে পারেন নাই।

বিকানিরের মহারাজ; ইনি ইংরাজের পক্ষে বর্ত্তমান সমরে যোগ দিয়াছেন।

ইংরাজ-সৈন্যেরা প্রাচীরবেষ্টিত এই নগরের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া নগরমধ্যস্থ সূর্য্যালোকিত মন্দিরের চূড়া ও জনপূর্ণ গৃহছাদগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক প্রকাণ্ড লৌহ-ফটক খোলা হইতেছে, ঐ লৌহ-ফটকটি এমনই মজবুত ছিল যে, কামানের গোলায়ও উহার কিছু ক্ষতি হয় নাই। ফটকটি উন্মুক্ত হইতে দেখিয়া ইংরাজেরা সহসা গোপনে নগরমধ্যে প্রবেশ করিবার সংকল্প করিলেন। এক মাল-গাড়ী-বোঝাই রসদ বিদ্রোহীদিগের নিমিত্ত নগরমধ্যে প্রবেশ করান হইতেছিল। ফটকটি উন্মুক্ত হইতে দেখিয়া ইংরাজ ও শিখ-সৈনিকেরা সহসা চীৎকার করিয়া উঠিয়া ফটকের দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

রসদ-বোঝাই গাড়ীর চালক তাহা দেখিয়া অশ্বগুলিকে ভয়ানক চাবুক মারিতে লাগিল। ইংরাজ ও শিখ-সৈনিকেরা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন। ফটক পুনরায় রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা যদি ফটকের কাছে পহুঁছিতে না পারেন, তাহা হইলে নগরমধ্যে প্রবেশের আশা থাকে না। ইংরাজ ও শিখ-সৈনিকমাত্রেই ইহা বুঝিয়া প্রত্যেকেই সর্ব্বাগ্রে সেই লৌহ-দ্বারে পহুঁছিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন।

তিনজন সৈনিক - দুইজন ইংরাজ ও একজন শিখ—অপর সৈনিকদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইলেন। এই তিনজন সৈনিকের মধ্যে আবার সর্ব্বাগ্রে নগরদ্বারে পহুঁছিবার সম্মানলাভার্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল।

রসদ-বোঝাই গাড়ীখানা নগরদ্বারে পহুঁছিয়া ঘড়্‌ঘড়্‌-শব্দে নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তাহার অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তেই ফটকটা বন্ধ হইতে আরম্ভ হইল।

বীর-সৈনিকত্রয় হুহু-শব্দে ছুটিয়া চলিলেন। পিছনের সৈনিকেরা হাঁকিতেছেন--"ফটক বন্ধ হ'ল, ফটক বন্ধ হ'ল, শীগ্‌গির, শীগ্‌গির!"

শিখ-সৈনিকটি তাহা শুনিয়া ইংরাজ-সৈনিকদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ফটকটি বন্ধ হয় হয় হইয়াছে, এমন সময়ে তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় অপ্রতিরোধনীয় বিক্রমে ফটকের সন্নিহিত হইলেন, তাহার পর তিনি যেন তাঁহার কোন শত্রুকে মুষ্টি-প্রহার করিতেছেন, এইরূপভাবে ফটকের দুই দ্বারের মধ্যে তাঁহার এক হাত ঢুকাইয়া দিলেন।

লৌহদ্বারের পেষণে তাঁহার হাতখানি চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু চূর্ণ হাতখানি মধ্যে রহিল, সুতরাং ফটক বন্ধ করা গেল না।

বীর-হৃদয় শিখ-সৈনিক অম্লানবদনে চূর্ণ হস্তের বেদনা সহ্য করিয়া রহিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁহার চূর্ণ হস্তখানি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল। শিখবীর নিঃশব্দে সেই যাতনা সহ্য করিতে লাগিলেন, তাহার পর যখন তিনি দেখিলেন, সেই হস্তখানি সম্পূর্ণ কর্ত্তিত হইয়া গেল, তখন তিনি মৃদু হাসিয়া দ্বিতীয় হস্তখানিও ফাঁকের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন!

দ্বিতীয় হস্তখানিও সম্পূর্ণরূপে ছেদিত হইবার একটু পূর্ব্বে ইংরাজ ও শিখ সৈনিকেরা নগরদ্বারে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা ঘোর নিনাদ করিয়া ফটকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সেই ভয়ানক ঠেলায় প্রকাণ্ড লৌহদ্বার কাঁপিয়া উঠিল।

সেনানী হাঁকিলেন,—"মার ঠেলা ভাইসব—জোরসে পীঠ লাগাও, পীঠ লাগাও!"

সেই ঘর্ম্মাক্তকলেবর, কলরবকারী ও লৌহদ্বারে আঘাতে নিযুক্ত সৈন্যদিগের মধ্যে সেই শিখবীর লুনহস্তে ও হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন!

উল্লাস-ধ্বনি করিয়া সৈনিকেরা লৌহদ্বার খুলিয়া ফেলিল।

এক তরুণবয়স্ক সামরিক কর্ম্মচারী ছিন্নভুজ শিখের প্রতি প্রশংসমাননেত্রে ও সহাস্যমুখে চাহিয়া বলিলেন,—"দৌড়ে তোমারই জিত হয়েছে!" এই সামরিক কর্ম্মচারীর নাম—ফ্রেডারিক রবার্টস্; ইনি এক্ষণে আর্ল রবার্টস্ ভি, সি।

ব্যায়াম

মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোনের এই মত ছিল যে, যে সময়টুকু শরীরের উৎকর্ষ-সাধনে ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যরক্ষণে ব্যয়িত হয়, সেই সময়টুকুই উৎকৃষ্টরূপে ব্যয়িত হয়।

অনেকে লোককে চমৎকৃত করিবার অভিপ্রায়ে ব্যায়াম-শিক্ষা করিতে চায়; কিন্তু ব্যায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা নহে। লোকরঞ্জন বা 'বাহবা'-লাভ ব্যায়ামের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা বাহাদুরী দেখাইবার অভিপ্রায়ে ব্যায়াম-শিক্ষা করে, তাহারা স্বাস্থ্যলাভ করা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে স্বাস্থ্য নষ্টই করিয়া ফেলে। ঈশ্বর সকলকে সমরূপ স্বাস্থ্য দেন নাই, সেইজন্য সকলেরই শরীর যে, একই প্রকার শ্রমসাধ্য ব্যায়ামের উপযোগী, তাহা নহে। ইংরাজী 'জিমন্যাষ্টিক' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে শরীরের কোন কোন অঙ্গের অস্বাভাবিক-পরিণতি হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত স্বাস্থ্য-লাভ করা যায় না। ব্যায়ামের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিলেও স্বাস্থ্যহানি হয়। হকি, ফুটবল্‌, ক্রিকেট প্রভৃতি নানাপ্রকারের বহিরঙ্গন ক্রীড়া, এবং দৌড়ান, দাঁড়টানা, সন্তরণ প্রভৃতি ব্যায়ামের ফলে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। ফলতঃ এমন সমস্ত ব্যায়ামে ব্যাপৃত হওয়া উচিত, যাহাতে শরীরের সর্ব্বাঙ্গেরই তুল্যপরিমাণে পরিচালনা হয়। যাহাতে সহজে অঙ্গচালনা হয়, প্রথম প্রথম সেই

সমস্ত ব্যায়ামেরই অভ্যাস করা উচিত। যে ব্যায়ামে শরীরের সমস্ত শক্তিটুকুরই প্রয়োগ করিতে হয়, সে ব্যায়ামে ব্যাপৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ব্যায়ামার্থে স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ থাকা উচিত। ব্যায়ামকালে সেই পরিচ্ছদ-পরিধানপূর্ব্বক ব্যায়ামানুশীলন করিয়া ব্যায়ামান্তে তাহা ছাড়িয়া ফেলিয়া অন্য পরিচ্ছদ পরা উচিত। প্রতিদিন ৪৫ মিনিটের কম সময় এবং একঘণ্টার অধিককাল ব্যায়ামাভ্যাস করা উচিত নহে। তবে সকলের স্বাস্থ্য সমান নহে, সেইজন্য ক্লান্তিবোধ হইলেই, ব্যায়াম-পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ব্যায়ামকালে শরীরের সকল অঙ্গেরই পরিচালনার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মুখরোচক, দুষ্পাচ্য খাদ্য-ভোজন স্বাস্থ্য-হানিকর। সচরাচর, যতদূর সম্ভব, অল্পমসলাযুক্ত সাধাসিধা খাদ্যই খাওয়া উচিত। অল্প বা অতিরিক্ত ভোজন উভয়ই নিষিদ্ধ। যে সমস্ত খাদ্যের সহজে পরিপাক হয়, অথচ শরীরে অধিকপরিমাণে নবশোণিতের সঞ্চার হয়, সেই সমস্ত খাদ্যই সুস্থ শরীরের খাদ্য। কেহ কেহ বড় তাড়াতাড়ি আহার করে, আবার কেহ কেহ এত ধীরে ধীরে খায় যে, খাদ্যদ্রব্যাদি শীতল ও দুষ্পাচ্য হইয়া উঠে; বলা বাহুল্য, উভয়ই দোষাবহ, সর্ব্ববিষয়ে মধ্যপথাবলম্বনই বিবেচকের কার্য্য। আহার করিবার অব্যবহিত পরেই, গুরু পরিশ্রম করা বা নিদ্রা যাওয়া দুই-ই অনুচিত। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ-বাক্য আছে—

"After dinner rest a while,
After supper walk a mile."

—মধ্যাহ্ন-ভোজের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, নিশাভোজের পর আধক্রোশ বেড়াইয়া এস। এ বড় মন্দ কথা নহে। ঐ প্রবাদ-বাক্যহইতে লঘু ও গুরু আহারান্তে কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, তাহা জানিতে পারা যায়।

কেবল ব্যায়ামেই স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। আমাদের শরীর-রক্ষার্থে ঈশ্বর যে কয়েকটি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, সেই নিয়মগুলি সর্ব্ব-প্রযত্নে পালন করা উচিত। আহারের কথা বলিয়াছি, নিদ্রার সম্বন্ধে ১৯১২ সালের ডিসেম্বরমাসের "বালকে" কয়েকটি কথা বলা গিয়াছে। এক্ষণে আর একটী বিষয়ের কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

মনের সহিত শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মন ভাল থাকিলে, শরীরও ভাল থাকে। যাহার মনে কোন কুচিন্তা স্থান পায় না, সে যেমন স্ফূর্ত্তিযুক্ত, এমন আর কেহ নহে। ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষ্যা, বিরক্তি প্রভৃতি কুভাবগুলি যত মনের মধ্যে আসিয়া বাসা বাঁধিতে থাকে, তত লোকের স্বাভাবিক-প্রফুল্লতা লুপ্ত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরও নানা রোগের আধার হইয়া উঠে। মন যখন সুস্থ, তখন শরীরের ক্রিয়াগুলিও স্বাভাবিকভাবে চলিতে থাকে। মন বিকৃত থাকিলে, শরীরের কার্য্যগুলিও বিকৃত হইয়া যায়। স্বাস্থ্যের তিনটি ফল,—প্রফুল্লতা, বলবত্তা ও সৌন্দর্য্য। নানা কুচিন্তায় যাহার মন নরক হইয়া আছে, তাহার স্ফূর্ত্তি নাই, শক্তি নাই, সৌন্দর্য্যও নাই। তাহার নয়ন ও মুখের জ্যোতিঃ সতত নিষ্প্রভ। সে তাহার মুখ বিকৃত করিয়াই থাকে। তাহার কপালে শত কুচিন্তার কুঞ্চন-রেখা। সে জীবনে কোন কার্য্যেই তেমন উৎসাহিত হয় না। অতএব, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যত দূর সম্ভব, নিষ্পাপ জীবন-যাপন করিলে, অনেকটা ব্যায়ামানু-শীলনের ফললাভ করা যায়।

দুইটি অভিপ্রায়ে ব্যায়ামানুশীলন করা উচিত। (১) সর্ব্বাঙ্গের চালনার্থে (২) স্ফূর্ত্তিলাভার্থে। সর্ব্বাঙ্গ-চালনার ফলে পাকযন্ত্রের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহাতে ফুস্ফুস্হইতে শরীরের সর্ব্বাঙ্গে শীঘ্র শীঘ্র সদ্যঃ শোণিতের সঞ্চালন হয়। তাহার পর, মন শরীরের পরিচালক, মনে স্ফূর্ত্তি থাকিলে, শরীরও, কেমন করিয়া জানি না, স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও সুশ্রী হইয়া উঠে। এইজন্যই বহিরঙ্গন ক্রীড়াকৌতুকে যেমন ব্যায়ামাভিপ্রায় সাধিত হয়, এমন আর কিছু-তেই হয় না। অঙ্গ-চালনাসহ আমোদলাভ করিতে পারিলেই, উৎকৃষ্ট ব্যায়ামানুশীলন করা হয়। এইজন্য আমরা "বালকের" তরুণ-মতি পাঠক-পাঠিকাগণকে ঐরূপ কোন ব্যায়ামেই ব্যাপৃত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী কথা বলিয়াই আমরা বর্ত্তমান নিবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই বাল্যে ও যৌবনে পদার্পণ করিয়া কিছুকালপর্য্যন্ত অর্থাৎ কর্ম্ম বা পরিণীত জীবনে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বকালাবধি ব্যায়ামানুরক্ত থাকে, তাহার পর সহসা ব্যায়াম-পরিত্যাগ করে। ইহা ভাল নহে, সদভ্যাস কখনই পরিত্যাগ করিতে নাই। ইংরাজের বৃদ্ধকেও টেনিস খেলিতে দেখা যায়, বাঙ্গালীর সংসারী যুবকও ব্যায়াম-বিমুখ। যৌবনের-ব্যায়াম প্রৌঢ় বয়সে অনুশীলন করা যায় না, তাই ইংরাজের যুবার একপ্রকার ব্যায়াম, প্রৌঢ়ের আর একপ্রকার; তবু ব্যায়াম তাঁহারা ছাড়েন না।

সন্ন্যাসীর দান।

রঙ্গ-গাথা

সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ মিলিত,
(দুঃখের বিষয় তাঁ'রা এবে আছেন অন্তর্হিত!)
ছিল সে সময়ে এক নগর পরম বিচিত্র।
করিত সেই নগরে বসতি দুইজন মিত্র॥

নামটী তাঁ'দের ডুবে গেছে বিস্মৃতির জলে।
আমাদের যে জানা আছে, তা' গর্দ্দভেই বলে॥
(যদি বলেন, তা'রা যে ছিল, কি করে তা জা'নব?
কেন— আদালতে উকিল-দিয়ে প্রমাণ ক'র্‌ব॥)

কেহই ছিলেন নাকো বটে একেবারে নিগুর্ণ।
জ্বলিত প্রথমের হৃদয়ে লালসার আগুন॥
জন্মাবধি ধনাহরণই ছিল তাঁহার ব্রত।
সকালথেকে তিনি কেবল ঐ চিন্তাতেই রত॥

পয়সা-দান করা তাঁ'র কোষ্ঠিতে নাহি লেখা।
ব'লতেন তিনি পয়সাদাতৃগণই বোকা॥
এক লাঠি দিয়াছিল তাঁ'কে (তাঁ'র) মাতামহী বুড়া।
(আর) সুখের বিষয়, ছিল তাঁ'র 'পেরকাণ্ড' ভুঁড়া॥

দ্বিতীয় ব্যক্তি—আহা ছিল তাঁ'র পদ্মলোচন।
তবে কিনা পিলে ফাটিত তাঁ'র দেখে চলন॥
ছিল না তাঁ'র বেশী দোষ, কেবল এই গুণ।
অপরের সম্পদ্ দেখে হ'তেন তিনি খুন॥

যাহা কিছু দেখেন আর যা' কভু দেখেন নি,
সবগুলি পাইতে তাঁ'র বড্ডই ইচ্ছা হ'ত।
লোকের টাকা-কড়ি দে'খ্‌লে কভু পারেন নি
নিবারণ করিতে তিনি তাঁ'র অশ্রু উত্তপ্ত॥

দুই মহাপ্রভুতে একদিন হইলেন বাহির।
কোথায় যাইতে তা' আমি নারিলাম করিতে স্থির॥
যাহা হউক, দু'জনে একসাথে চলিতে লাগিল।
অকস্মাৎ পথে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ মিলিল।

কিয়ৎকাল তাহাদের সহিত করিয়া ভ্রমণ।
কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন, তা'দের গুণ অগণন॥
পরম দয়াবান্ সেই অজ্ঞাত সন্ন্যাসী-ঠাকুর।
স্মিতমুখে এই ব'লে তা'দের করিলেন বিদুর॥

"শোন, ওহে বাপুসব, আমাদের এই সোজা পথ
গিয়াছে দু'দিকে, দক্ষিণে যাওয়াই আমার মত॥
নহি দাতা,—তবু কাহারও ধার নাহি ফেলে রাখি,
তদ্ধেতু তোমাদের গোষ্ঠীসুখ শুধি' হইব সুখী।

সম্মুখের ঐ মন্দির-দ্বারে হইয়া উপস্থিত।
কর যদি প্রার্থনা তোমাদের যাহা আকাঙ্ক্ষিত॥

মনোবাঞ্ছা আমি তোমাদের করিবই পূরণ।
করিতে হ'বে না মোর কাছে কারণ-প্রদর্শন॥

সাবধানে, বাপু, কি চাহিবে তাহা নির্ণয় করিবে।
চাহিবার পর, ফিরাইতে তাহা কভু না পারিবে॥
প্রথম যে ব্যক্তি, বিষয়-বিভব, যাহাই চাইবে।
দ্বিতীয় যে জন, অবশ্য তাহার দ্বিগুণ পাইবে॥

এতেক বলিয়া ঠাকুর সত্বর গেলেন চলিয়া।
হর্ষোৎফুল্ললোচনে দু'জনে রহিল দাঁড়াইয়া॥
এমনটা যে কভু হ'তে পারে, তা' তা'রা ভাবে নাই।
(এবং) কার মুখ দেখে বেরিয়েছিল, তা' মনে পড়ে নাই।

বড় ফ্যাসাদেই পড়া গেল, তর্ক উঠিল—কে আগে চাইবে?
কারণ শেষে যে জন চা'বে প্রথমের সে ডবল পাইবে॥
ঝগড়ার চোটে কাণ গেল ফেটে, তুলো বুঝি বা গেল সব।
ওঃ সে কি বিষম ঝগড়া—শুধু তুমি যাও, তুমি যাও-রব॥

অলোভী (!) সেই প্রথম ব্যক্তি অন্যেরে কয়, "যদি না যা'বি।
আমার কাছথেকে, দে'খ্‌ছি, তুই ভীমের ঘুসিই খা'বি॥"
অতি শীর্ণকায় আমাদের মিঃ পরমহিংসুক ভাবেন,
"শেষকালে কি মারের চোটে আমার প্লীহা ফাটি' যাবেন!!

তা'র চেয়ে সুশীল বালকের মত করা যা'ক্ প্রস্থান।
কি জানি কি ঘটে' যা'বে, এখানে আর করিলে অবস্থান॥"
এই ভেবে মিঃ পরমহিংসুক চলিলেন গট্‌মট্ করি'।
উষ্মান্বিত হ'য়ে ভা'ব'ছেন, 'কি ক'রে বেটাকে জব্দ করি?'

ভাবেন তিনি ঈর্ষ্যাগ্নিতে হ'য়ে দগ্ধ, কোন্ বস্তুটি চাই?
ভেবেতো না পাই, কি চাহিলে ওর আশায় পড়ে ছাই॥
অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে তিনি এই ক'র্‌লেন প্রার্থন—
হে ঠাকুর, লও মোর একটী চক্ষু ক'রে উৎপাটন॥

যেমন বলা, অমনি মিঃ পরমহিংসুক হইলেন কাণা।
মিঃ লোভী যে হ'য়ে যা'বেন দ্বিচক্ষুহীন, সে [illegible] জানা॥
শেষে দরিদ্র হ'য়ে তাঁহারা বাধ্য হ'য়ে করিতেন ভিক্ষা।
ভাই হে, লোভী আর দ্বেষীর দৃষ্টান্ত দেখে করহ শিক্ষা॥

শ্রীঅনিলপ্রকাশ ঘোষ।

বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল।

(বালকের রচনা।)

একজন সৈনিক তাহার উপার্জ্জিত ধনহইতে অনেক টাকা জমাইয়াছিল। তাহার দুইজন বন্ধু ছিল। তাহারা যদিও মুখে বেশ বন্ধুতা দেখাইত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড়ই দুষ্টলোক ছিল এবং সর্ব্বদাই তাহার টাকাগুলি চুরি করিবার জন্য চেষ্টা করিত। একদিন তাহারা বলিল, "বন্ধু, চল দেশ-ভ্রমণ করিতে যাই, অনেক টাকা-উপার্জ্জন করিতে পারিব।" সৈনিক ইহাতে সম্মত হইল।

কিছুদূর যাইবার পর তাহারা বামদিকে একটী পথ দেখিতে পাইল। বন্ধু-দুইজন বলিল,—"চল, এইপথ দিয়া যাই।" সৈনিক বলিল, "না, এ পথ বনের ভিতর গিয়াছে, এ পথ দিয়া যাইব না।" বন্ধু-দুইজন বলিল "হাঁ, এই পথ দিয়াই যাইব।" সৈনিক বলিল, "না, যাইব না।" এইরূপে তাহাদের মধ্যে বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বন্ধু-দুইজন তাহার উপর পড়িয়া, তাহাকে প্রহার করিয়া একটী গাছের সহিত হাত-পা বাঁধিয়া রাখিয়া গেল এবং তাহার নিকটহইতে সমস্ত টাকা-কড়ি লইয়া পলায়ন করিল।

এদিকে সৈনিকটি বদ্ধাবস্থায় কিছুক্ষণ সেই বৃক্ষের তলে থাকিবার পর, একটা "সোঁ-সোঁ"-শব্দ শুনিতে পাইল; মাথা তুলিয়া দেখিল, দুইটি কাক আসিয়া, সে যে গাছে বাঁধা ছিল, সেই গাছের ডালে বসিল। প্রথম কাকটী বলিল, "ভাই, তোমার খবর কি?" দ্বিতীয়টি উত্তর করিল, "ভাই, এদেশের রাজকুমারীর অসুখ হইয়াছে; এই গাছের একটু ছাল বাটিয়া না খাইলে, সে অসুখ কিছুতেই সারিবে না। আর রাজা এই প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে, যে রাজকন্যাকে আরাম করিতে পারিবে, তাহার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিবেন। এখন তোমার কি খবর বল, শুনি।"

প্রথম বলিল, "ভাই, রাজধানীতে বড় জলকষ্ট হইয়াছে। বাজারের অমুক জায়গার একখানা বড় পাথর সরাইয়া, সেইখানে কূপ খুঁড়িলে, এত জল পাওয়া যাইবে যে, রাজ্যের লোক খাইয়াও ফুরাইতে পারিবে না।"

এই বলিয়া কাক-দুইটি উড়িয়া গেল।

সৈনিক সমস্তই শ্রবণ করিল। সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং সেই গাছহইতে একটু ছাল কাটিয়া লইয়া রাজধানী-অভিমুখে চলিল।

রাজসভায় গিয়া রাজাকে ছালটুকু দিয়া সে বলিল, "আমি রাজকন্যাকে আরোগ্য-দান করিবারজন্য আসিয়াছি। এই ছালটুকু বাটিয়া খাইলেই, রাজকন্যা আরোগ্যলাভ করিবেন।" তখন রাজকুমারীকে ছাল বাটিয়া খাইতে দিবামাত্র তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু রাজা সৈনিকের ছেঁড়া কাপড়, জামা দেখিয়া, তাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না এবং বলিলেন, "এই নগরে জলকষ্ট হইয়াছে, যদি তুমি, নগরের সকল লোকে খাইতে পারে, এরূপ একটি কূপ খুঁড়িয়া দিতে পার, তবে রাজকন্যার সহিত বিবাহ দিব।" এই কথা বলিবামাত্র সৈনিক সেই নগরের বাজারের নিকট কাকের কথামত বড় পাথর সরাইয়া লোকদিগকে সেই স্থানে কূপ খুঁড়িতে বলিল। সেই কূপহইতে এত সুন্দর জল বাহির হইল যে, রাজা তখন রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন।

বিবাহের পর একদিন যখন সৈনিক নগরের পথে বেড়াইতেছিল, তখন তাহার পূর্ব্ববন্ধুদ্বয়কে দেখিতে পাইল। সে তাহাদিগকে নিকটে ডাকিল। তাহারা তাহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। সৈনিকের মন খুব ভাল ছিল, সে তাহাদের ক্ষমা করিয়া বলিল, "তোমরা যে আমাকে প্রহার করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহাহইতেই আজ আমি এত বড়লোক।" এই বলিয়া তাহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিল। তখন তাহার বন্ধুদ্বয় পরস্পর পরামর্শ করিল যে, তাহারাও একরাত্রি সেই গাছের তলায় গিয়া, কাকদুইটি কি বলে শুনিয়া আসিবে।

পরদিন রাত্রিতে তাহারা সেই গাছের তলায় গিয়া বসিলে, একটা "সোঁ-সোঁ"-শব্দ শুনিতে পাইল এবং দুইটা কাককে সেই গাছের ডালে আসিয়া বসিতে দেখিল। একটি কাক বলিল, "ভাই, আমাদের মধ্যে সেদিন যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা কোন লোকে শুনিয়া গিয়া থাকিবে; কারণ রাজকুমারী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, আর কূপও খোঁড়া হইয়াছে। অতএব আইস, কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে দেখিয়া লই, এখানে কেহ আছে কি না।" এই বলিয়া একটু খুঁজিবামাত্র সেই দুইজন লোককে দেখিতে পাইল এবং রাগে ঠোক্‌রাইতে ঠোক্‌রাইতে তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিল।

শ্রীহরিদাস ঘোষ।

কাচের ঘড়ী।

ব্যাভেরিয়ার একজন কাচ-পালিশ-কারক ছয়বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া একটি ঘড়ী-নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহার নির্ম্মাণকার্য্যে কাচব্যতীত আর কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই। উহার বাহিরের খোপ কাচের, থামগুলি কাচের, স্ক্রু কাচের, কাঁটা কাচের, শঙ্কু কাচের, চাকা, স্প্রাং ইত্যাদি সকলই কাচের। এই ঘটিকা-নির্ম্মাণকার্য্যে ঐ কারুর অশেষ অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হইয়াছে, কোন কোন অংশের ৩০।৪০ বার চেষ্টার পর নির্ম্মাণ করা গিয়াছে। এই ঘড়ীটি খেলার জিনিস নহে, ঠিক চলেও।

বিড়ালীর কীর্ত্তি।

উপকথা।

এক কলুর তিনটি ছেলে ছিল; সে মরিবার সময় তাহার বড় ছেলেকে ঘানীটা, মেজ ছেলেকে বলদটা আর ছোট ছেলেকে তাহার মেনী বিড়ালটা দিয়া গেল।

ছোট ছেলেটি তাহার পৈতৃক সম্পত্তিস্বরূপে বিড়ালীটা পাইয়া বড়ই মনমরা হইয়া পড়িল; তাহা দেখিয়া বিড়ালী তাহাকে বলিল, —"মুনিব-মশাই, আমাকে পেয়েছেন বলে আপ্‌নি দুঃখু কর্‌ছেন, কিন্তু আপনি যদি আমাকে একজোড়া নাগরা-জুতো আর একটা থ'লে কিনে দেন, তা' হ'লে আমি দেখা'ব যে, ঘানী কিম্বা বলদের চেয়ে আমি কত কাজের জিনিস।"

ছোটছেলে বিড়ালীর কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে তাহার যে ২৷৩টি টাকা ছিল, তাহা খরচ করিয়া চমৎকার একজোড়া নাগরা-জুতা ও একটা থলিয়া কিনিয়া দিল।

বিড়ালী নাগরা-জুতাজোড়া পরিল, আর থলিয়াটা কাঁধে ফেলিয়া এক খরগোশের গর্ত্তের কাছে গেল। সেখানে সে থলিয়ার মুখ খুলিয়া তাহার মধ্যে খানিকটা ভুষি রাখিয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল। ভুষির গন্ধ পাইয়া একটা খরগোশ থলিয়ার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বিড়ালী তখন তাহাকে মারিয়া রাজার কাছে লইয়া গিয়া বলিল,—"মহারাজ! রাজকোটের রাণা শত্রুজিৎ সিং আপনাকে এই খরগোশটি উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। আদা-লঙ্কার ফোড়ণ দিয়ে আপনি যদি এটিকে মাখমমারা ঘীয়ে ভেজে খান তো জীবনে ভু'ল্‌তে পা'র্‌বেন না।"

"রাণা কি বল্লে?"

"আজ্ঞে, রাণা শত্রুজিৎ সিং।"

"কোথাকার রাণা বল্লে?"

"আজ্ঞে, রাজকোটের।"

"কি পাঠিয়েছেন বল্লে?"

"বেড়ে একটি মোটাসোটা খরগোশ!"

"খরগোশ? তোফা, তোফা! আমি খরগোশ খেতে বড়ই ভালবাসি, কিন্তু আমার রাঁধুনি আমাকে কখন একটা খরগোশের ঠ্যাংও রেঁধে দেয় না—ভারি অকেজো সেটা! রাণা শত্রুজিৎ সিংকে তুমি আমার নমস্কার জানিয়ে ব'ল যে, তাঁ'র কাছথেকে এই উপঢৌকন পেয়ে আমি বড়ই খুশী হয়েছি।"

তাহার পরদিন বিড়ালী দুইটা পায়রা মারিয়া রাজার কাছে লইয়া গিয়া বলিল, "মহারাজ, আজ আবার রাণা শত্রুজিৎ সিং আপনাকে এই দু'টো কবুতর-উপঢৌকন পাঠিয়েছেন।" তাহাতে রাজা আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাঁহার পাত্রমিত্রদের ডাকিয়া বলিলেন, "আমার এই অচেনা বন্ধু, রাণা শত্রুজিৎ সিং লোকটী, বড়ই চমৎকার লোক, দে'খ্‌ছি; চল, আমরা গিয়ে এঁর সঙ্গে আলাপ-টালাপ করে আসি।" এই বলিয়া রাজা রাজকুমারীকে আর কয়েকজন আমীর-ওমরাহকে সঙ্গে লইয়া সত্যসত্যই রাণা শত্রুজিৎ সিংএর সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। বিড়ালী তাহা দেখিয়া ছুটিয়া ছোটছেলের কাছে আসিয়া বলিল, "মুনিব-মশাই, নদীতে একটা বড় চমৎকার জায়গা দেখে এলুম, সেখানকার জল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি পরিষ্কার, চান ক'র্‌বার তো বেলা হ'য়েছে, আজ সেইখেনে চান ক'র্‌বেন চলুন।"

যেখানদিয়া রাজা হাতী চড়িয়া যাইবেন, সেইখানে পহুঁছিয়া বিড়ালী ছোটছেলেকে বলিল, "আপনি এইখেনে কাপড় খুলে পাথরের তলায় লুকিয়ে রাখুন, আর নদীতে নেবে জলে গলাপর্য্যন্ত ডুবিয়ে থাকুন।"

ছোটছেলে বলিল,—"কেন রে, তা' ক'রে কি হ'বে?"

বিড়ালী। এখন যা' বলি, তা' করুন তো, এর পরে সব কথা বুঝিয়ে ব'লুব; কিন্তু শীগ্‌গির, শীগ্‌গির!

ছোটছেলে যেই নদীতে লাফাইয়া পড়িয়া গলাপর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়াছে, অমনি রাজার হাতীর গলার রূপার ঘণ্টার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল।

বিড়ালী অমনি মেও মেও করিয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল,—"রক্ষে কর, রক্ষে কর!"

রাজা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'য়েছে?"

বিড়ালী বলিল,—"মহারাজ, চোরেরা রাণা শত্রুজিৎ সিংএর কাপড়-চুরী ক'রে পালিয়েছে, উনি ঐ গলা-জলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, লজ্জায় ডাঙ্গায় উ'ঠ্‌তে পা'র্‌ছেন না, কিন্তু উনি যদি আর বেশীক্ষণ জলে থাকেন, তা' হ'লে হাতে পায়ে খিল্ ধ'রে যা'বে।"

রাজা তখনই একজন লোককে তাঁহার সবচেয়ে ভাল পোষাকটি রাজবাড়ীথেকে আনিতে পাঠাইলেন। ঐ পোষাকটি পরিয়া রাজা বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন। পোষাকটি আসিল। কলুর ছোট ছেলে তাহা পরিলে, তাহাকে রাজকুমারের মত সুন্দর দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী তখন তাহার দিকে দুই-একবার লুকাইয়া না তাকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। রাজা তাহাকে তাঁহার হাতীতে আদর করিয়া তুলিয়া লইলেন। রাজাও তাহার রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন। তিনি তখন তাঁহার মেয়ের কাণে কাণে বলিলেন,—"কুড়িবছর আগে আমি যখন তোমার গর্ভধারিণীকে বিয়ে ক'র্‌তে যাই, তখন আমাকেও এম্‌নি দেখাচ্ছিল।

তাহার মৎলব বেশ খাটিল দেখিয়া বিড়ালী খুব খুশী হইল। সে রাজার হাতীর আগে আগে ছুটিয়া গিয়া এক ক্ষেতের চাষাদের বলিল,—"দেখ্, রাজা আ'স্‌ছেন; তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন, এ ক্ষেত কা'র? তোরা বলিস্, রাণা শত্রুজিৎ সিংএর, বুঝ্‌লি? নইলে, আমি ব'ল্‌ছি, তোদের সকলকার গর্দ্দান যা'বে।"

তাহারা ভয়ে ভয়ে বলিল,—"এঁজ্ঞে!"

রাজা সেই ক্ষেতের ধার দিয়া যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ক্ষেত কা'র রে—মালিক কে?"

চাষারা হাত জোড় করিয়া বলিল,—"এঁজ্ঞে, মহারাজ, রাণা শত্রুজিৎ সিংএর।" রাজা তখন ছোটছেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনার জমী-জায়গাগুলি বেশ ভাল তো!"

তাহাতে ছোটছেলে কেমন একরকম বোকা বনিয়া গিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল। রাজা রাজকুমারীর কাণে কাণে বলিল,—"আমি যখন বিয়ে ক'র্‌তে যাই, তখন আমিও ঐরকম বোকার মত হেসেছিলুম।"

বিড়ালী তখনও রাজার হাতীর আগে আগে ছুটিতেছে। এক বনের ভিতর দিয়া গিয়া সে এক চমৎকার বালাখানা-বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইল। ঐ বাড়ীতে একটা খোক্কশ থাকিত, আগে যে ক্ষেতের কথা বলা হইয়াছে, সেই ক্ষেত তাহারই। বিড়ালী গিয়া তাহাকে প্রথমে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পরে পিছনের পা-দু'টিতে ভরদিয়া সাম্‌নের পাদু'টি জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খোক্কশকে কেহ কখন নমস্কার করে না, সে তাই ভারি খুশী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কিঁ রেঁ, কিঁ চাঁস তুই?"

বিড়ালী তখন ন্যাকামী করিয়া বলিল,—"খোক্কশ-মশাই, একটা কথা শুনেছি, পিত্যয় হয় না; তাই আপনাকে সুধোতে এসেছি - আপ্‌নি নাকি একলহমার মধ্যে যা' খুশী তা'ই হ'তে পারেন?"

"পারিঁ।"

"আমার তো পিত্যয় হয় না, একবার অনুগ্‌গর ক'রে একটা কিছু হ'ন তো দেখি।"

খোক্কশ তখনই সিংহ হইল।

বিড়ালী হাসিয়া কুটিকুটি, বলিল,—"ও খোক্কশ-মশাই, এই আপনার যা' খুশী, তা'ই হওয়া? সিংহী তো রাক্ষসেরাও হ'তে পারে, তবে আর আপনার বাহাদুরী কি? নেংটি-ইঁদুর হ'তে পারেন, তবে বুঝি। গা ফুলিয়ে ভোঁদা হওয়া তো সোজা, ছোট্টটি হওয়াই ঠক্‌ঠকী।"

খোক্কশ বলিল,—"দূঁর্ বেঁটি, ওঁ তোঁ আঁরঁও সোঁজাঁ রেঁ!" . .

এই বলিয়া যেই সে ইঁদুর হইয়াছে, অমনই বিড়ালী তাহাকে থাবা মারিয়া ধরিয়া কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলিল। তাহার পর রাজার হাতীর গলার রূপার ঘণ্টার আওয়াজ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল,—"আসুন, আস্‌তে আজ্ঞে হোক, মহারাজ, এই আমার মুনিব রাণা শত্রুজিৎ সিংএর প্রাসাদ।" রাজা ছোটছেলের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"বা! আপনার প্রাসাদটি তো বড় চমৎকার, অনুগ্রহ ক'রে কুমারীকে হাতীথেকে নাবিয়ে নিন।" ছোটছেলে ভারি লাজুকভাবে কুমারীকে হাতীহইতে নামাইয়া লইল। রাজা তখন কুমারীর কাণে কাণে বলিল,—"আমি যেদিন বিয়ে ক'র্‌তে যাই, সেদিন আমিও এমনি লজ্জা করেছিলুম।"

ইহার মধ্যে বিড়ালী বাড়ীর চাকর-বাকরদের উপর তম্বীতম্বা করিয়া চমৎকার ভোজের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, রাজাটি একটু "খাউকুড়ে" লোক।

ভোজন করিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়া
বলেন,—"তোমার মত পরি' হেন সজ্জা,
ওহে রাণা, তোমারই মত করি' লজ্জা
গিয়াছিনু করিবারে মহিষীরে বিয়া।
সুপুরুষ বট তুমি, আছে ধন-জন,
তোমারই করে করি কন্যা-সমর্পণ।
আঁখি দেখি' টের পাই, দোঁহে দোঁহাপ্রতি
করিয়াছ অরপণ নিজ নিজ মতি।
মিলনে সাধিতে বাদ নাহি ইচ্ছা মোর;
দোঁহে দোঁহারই হ'য়ে রহ আয়ুভোর।"

এই বলিয়া রাজা ছোটছেলের হাত ধরিয়া কুমারীর হাতের সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন। দু'জনেই তখন লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল।

বিয়ের দিন বিড়ালীর সাজ দেখে কে? সে সেদিনও নাগরা-জুতা পরিয়াছিল, কিন্তু সে জরীর নাগরা জুতা, তাহাতে আবার হীরা-মুক্তা-চুনি-পান্না ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিতেছে!

প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে কয়েকটি কথা

১। প্রত্যেক প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার সর্ত্তগুলি মনোযোগ-পূর্ব্বক পড়িয়া দেখিবে; প্রবন্ধ চাহিলে, কবিতা পাঠাইবে না; কবিতা চাহিলে, প্রবন্ধ পাঠাইবে না; প্রত্যেকেই স্ব স্ব রচনা কাগজের একপীঠে লিখিয়া পাঠাইবে।

২। "ঘুড়ীর"-সম্বন্ধে (অর্থাৎ কি করিয়া ঘুড়ী তৈয়ার করিতে, উড়াইতে ও প্যাঁচ খেলিতে হয় তদ্বিষয়ে) প্রবন্ধ-রচনা করিতে নীতি-উপদেশ দিবে না। এমন কি, গল্পেও মুখ্যভাবে নীতি-উপদেশ দেওয়া চলে না। ছবি আঁকিতে যেমন কলাকৌশলের ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন, গল্প-রচনা করিতেও তেমনই নিপুণ কলাবিৎ হওয়া চাই। কোন ছবি যেমন-তেমন করিয়া আঁকিয়া তাহার নীচে কতকগুলি উপদেশ (সাইন বোর্ডের মত) লিখিয়া দিলে, যেমন দর্শকেরা হাসিবে, তেমনই কোন গল্পের গল্পাংশ অক্ষমভাবে রচনা করিয়া ও গল্পোক্ত চরিত্রগুলি যেমন-তেমনভাবে ফুটাইয়া, কেহ যদি কেবল নীতি-উপদেশ দিয়া গল্পটীর কলেবর বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পাঠকেরা বিরক্তির সহিত সে গল্পপাঠ-ত্যাগ করিবে। চিত্রকর উপদেশ দেন—মৌনভাবে। গল্প-লেখককেও অন্তর্নিহিতভাবে উপদেশ দিতে হয়, উপদেশকের আসন-গ্রহণ করিয়া মুখ ফুটিয়া কোন উপদেশ দিবার তাঁহার যো নাই। তাহা করিলে, গল্পের রসভঙ্গ হয় ও রচনা-নৈপুণ্য নষ্ট হইয়া যায়।

৩। প্রতিযোগিমাত্রেই তাহার রচনা শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ভাষায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবে। ভাষার দোষে অনেক সুচিন্তিত রচনা পুরস্কারযোগ্য হয় না। দন্ত্য "ন"এ মাত্রা আছে, মূর্দ্ধন্য "ণ"এ মাত্রা নাই, একথা যেন সকলেরই স্মরণে থাকে। বানান-ভুল করা রচনার একটি মহাদোষ।

৪। অনেকের ধারণা এই, কারণে বা অকারণে যথা-তথা ঈশ্বরের নাম করিলে, সম্পাদক প্রবন্ধবিশেষের প্রতি সানুকূল-দৃষ্টিপাত করিবেন। যে অকারণে ও লঘুভাবে ঈশ্বরের নাম লয়, সে কুকর্ম্মই করে।

৫। ঘুড়ীসম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ মন্দ হয় নাই, কিন্তু নীতি-উপদেশের জ্বালায় ও অযত্নরচনার দোষে সেগুলিকে পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

৬। সেপ্টেম্বর-মাসে প্রকাশিত "যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল"-শীর্ষক গল্পটীতে একটি দোষ না থাকিলে, উহা একটি চমৎকার গল্প হইত, উহাতে বৃদ্ধের পার্শ্বস্থিত বন্দুকের কথার আদৌ উল্লেখ নাই; এইজন্যই "পাপের পরিণাম"-শীর্ষক গল্পটি উহার সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে।

"বালক"-সম্পাদক।

৩য় বর্ষ ডিসেম্বর, ১৯১৮। ১২শ সংখ্যা।

জেনেরল্ গর্ডন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চীন, প্যালেষ্টাইন ও কেপ-কলোনী।

গর্ডনের সুইট্জারল্যাণ্ডে যাইবার বড় ইচ্ছা ছিল, তাই তিনি মনস্থ করিলেন যে, অবকাশকালটা সেই দেশেই তিনি কাটাইবেন, কিন্তু আবার তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মিল। বিদ্রোহ-দমনে গর্ডনের সবিশেষ যোগ্যতা আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্বদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে কেপ-কলোনীর ঔপনিবেশিক সৈন্যগণের সেনাপতির পদ-প্রদানে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু গর্ডন সবিশেষ বিচার-বিবেচনার পর ঐ পদটী গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন।

উহার অল্পদিন পরেই তাঁহাকে ভারতের তৎকালীন নবনিযুক্ত রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপনের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ-প্রদান করা হইল। ঐ পদে কার্য্য করিতে তিনি বড় শীঘ্র সম্মত হন, কিন্তু জাহাজে চড়িয়া যখন তিনি ভারতাভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ভারতের বহুসংখ্যক প্রজার প্রকৃত তত্ত্বাবধান তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, তাই তিনি বোম্বাই-সহরে পদার্পণ করিয়া ঐ পদে ইস্তফা দিলেন।

ইহাতে তাঁহার দেশস্থ লোকেরা ভাবিলেন যে, গর্ডনের এই সমস্ত "পাগলামী" তাঁহার উন্নতি-পথের চির-অন্তরায় হইয়া থাকিবে; কিন্তু গর্ডনের মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় মত ছিল, আপনার জাগতিক-উন্নতির জন্য সেই মতগুলিকে তিনি বলি দিতে কোন দিনই সম্মত হইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে চীনের সহিত রুষিয়ার যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। চীন এই সময়ে প্রবৃত্ত হইতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না, তবে সে ক্ষেত্রে সেই দেশের কর্ত্তব্য কি ছিল?

কোন লোক পরামর্শ দিল, গর্ডনকে ডাকিয়া পাঠাও, সকলেই সেই পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইল। গর্ডন তখনও ভারতে, এমন সময়ে তাঁহার কাছে চীনদেশহইতে পত্র আসিল। গর্ডন চীনদেশে যাইবার জন্য ছয়মাস বিনাবেতনে ছুটী-প্রার্থনা করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সেই ছুটী দিতে অসম্মত হইলেন। অগত্যা গর্ডন ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগের সহিত সকল সম্পর্ক রহিত করিয়া চীনে যাত্রা করিলেন।

চীনে পঁহুছিয়া লি হাঙ্ চ্যাঙের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। লি শান্তিপ্রস্তাবে সম্মত ছিল। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে গর্ডন সমরেচ্ছু দলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, রুষিয়ার সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ-ঘোষণা করিলে, চীনের সবিশেষ স্বার্থহানি ঘটিবে। অনন্তর তিনি অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগ তাঁহার পদত্যাগ-মঞ্জুর করেন নাই বটে, কিন্তু যে সমস্ত লোকের তাঁহার প্রতি বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল, সেই সমস্ত লোকের তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস দেখিয়া গর্ডন বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার দেশস্থ সরকারী বা বেসরকারী লোকেরা তাঁহাকে যে স্বার্থের দাস মনে করিয়াছে, ইহাতে তিনি ক্লেশানুভব না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় তাঁহারও কোন কোন দোষ ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি স্বার্থান্বেষী ছিলেন না।

সংকল্প ও অভিপ্রায়ের সাধুতা ও নির্ম্মলতা তাঁহাকে তাবৎ সংকল্প ও উদ্দেশ্যসাধনে প্ররোচিত করিত, এইবার যে লোকে তাঁহার সেই সংকল্পের সাধুতাতেই অবিশ্বাস করিল, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এইজন্য তিনি তাঁহার জীবনে এই প্রথমবার কি উদ্দেশ্যে তিনি চীনে গিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইয়া সংবাদ-পত্রে একখানি পত্র লিখিলেন।

এই সময়ে আয়র্লণ্ডে জমীজায়গা লইয়া গোলযোগ হইতেছিল। দেশময় একটা অশান্তির ভাব বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তখন সকলেই ভাবিতেছিল যে, এই গোলযোগের একটা প্রতীকার করা আবশ্যক।

দরিদ্রের কষ্ট হইলে, গর্ডন সেই কষ্টের কারণানুসন্ধান না করিয়া কখনই থাকিতে পারিতেন না; সুতরাং তিনি স্বয়ং গিয়া প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইবার বাসনা করিলেন। কোনপ্রকার অছিলা করিয়া তিনি সমস্ত দেশটিতে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, যে সকল জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ হইতেছিল, সেই সকল জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া তিনি তাঁহার প্রখরা দর্শনশক্তির সাহায্যে সেই সমস্ত ক্লেশের কারণ-নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার সক্রিয় মস্তিষ্ক একটি প্রতীকার-পন্থাও নির্ণয় করিল।

কিন্তু সচরাচর লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া যাহা বলিত, এবারও তাহাই বলিল। তাহারা বলিত, গর্ডনের হৃদয় যত কোমল, বুদ্ধি তত প্রখরা নহে। তাহারা বলিত, গর্ডনের পরামর্শানুসারে কাজ করা যায় না; কিন্তু অল্প দিন পরেই এই সমস্ত লোকেরা বুঝিয়াছিল যে, গর্ডনের পরামর্শগুলি কেবল কার্য্যোপযোগী নহে, সেই সমস্ত পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলে, সকলের প্রকৃত কল্যাণও হয়।

যদিও তখন মহাব্রিটনের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, যে সমস্ত লোকের যোগ্যতা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদিগকে কোন-না-কোন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে, দেশের মহদুপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল, তথাপি গর্ডনকে ইংলণ্ডে বেকার বসাইয়া রাখা হইল।

অবশেষে গর্ডন নিজেই নিজের একটা কর্ম্ম খুঁজিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার এক সহকর্ম্মচারীর কার্য্যটি বিনাবেতনে করিবার জন্য মরিসসে গমন করিলেন। মরিসসে গিয়াও কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু সুখী হইলেন না, কারণ সেখানে কাজ কিছু ছিল না। অবশেষে ঔপনিবেশিক সৈন্যগণের সেনাপতির পদ পুনরায় তাঁহাকে প্রদান করা হয়। প্রথমবার এই কার্য্যটি করিতে অসম্মত হওয়ার পর, তিনি স্বয়ং এই পদপ্রার্থী হয়েন; এক্ষণে কাজেই তিনি সানন্দে এই পদে কার্য্য করিতে চলিলেন।

ঐ পদের কার্য্যটি বুঝিয়া লইয়া গর্ডন একটি কার্য্য-পদ্ধতির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাহাতে যাহাদের স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা হইল, তাহারা তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল।

তাহা সত্ত্বেও গর্ডন চারিজন বিদ্রোহী সর্দ্দারের মধ্যে তিনজনকে নিজ মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইলেন। চতুর্থ বিদ্রোহী সর্দ্দারের সহিত তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে স্বমতে আনিবার প্রত্যাশা করিলেন।

যত দিন না তিনি ফিরিয়া আসেন, তত দিন কেপ-গবর্ণমেণ্ট সেই সর্দ্দারের প্রতি শত্রুতাচরণ করিবে না, এইপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া গর্ডন সর্দ্দার মুস্তাকার কাছে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি তাহার সহিত মিটমাটের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন, একদল সৈন্য তাঁহারই বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছে, এবং তাহারা দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতেছে!

বড়ই বিরক্ত হইয়া গর্ডন তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, সেখানে পঁহুছিয়া তিনি আবার কিছুকাল নিষ্কর্ম্মার বিরক্তিকর জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

বেলজিয়মের রাজা গর্ডনের দৌত্যকার্য্যে দক্ষতার সবিশেষ সুখ্যাতি করিতেন; তিনি পূর্ব্বে তাঁহাকে একটি দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহাকে সেই কার্য্যটি দিতে চাহিলেন। একজন বিদেশী নৃপতি তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে চান, ইহাতে গর্ডনের হৃদয় যদিও বিশিষ্টরূপে স্পৃষ্ট হইল, তবুও তিনি এই কার্য্যটি করিবেন কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার জন্য যথেষ্ট সময়-প্রার্থনা করিলেন।

যাহা হউক, তাঁহার স্বদেশী লোকেরা তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছে, ইতোমধ্যে এই চিন্তাটি বুঝি ভুলিবার অভিপ্রায়েই তিনি প্যালেষ্টাইনে বেড়াইতে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। প্যালেষ্টাইনে বেড়াইয়া তাঁহার এই লাভ হইল যে, সেখানে যিনি মানবজাতির দুঃখ দূরীকরণের জন্য আত্মপ্রাণ-বলিদান করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই স্বর্গীয় প্রেমের ও ত্যাগস্বীকারের কথা সেই দেশভ্রমণ-সম্পর্কে বার বার স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার সহ-মনুষ্যদিগকে আরও অধিক ভালবাসিতে ও তাহাদের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে শিখিলেন।

বিশ্বাস ও প্রেমই তাঁহার ধর্ম্মমতের এবং সাধুতা, ন্যায়পরতা ও অকাপট্য তাঁহার জীবনের মূলসূত্র ছিল। যে সকল লোক ঐ সকলই তাহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের মূলসূত্র করে, তাহারা যদি ভাল লোক হয়, তাহা হইলে গর্ডনও ভাল লোক ছিলেন।

যাহা হউক, মিসরে যে সমস্ত উৎপাতের তিনি পূর্ব্বাবধি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এই সময়ে তথায় সেই সমস্ত উৎপাত হইতে লাগিল। সুদানে মহম্মদ আহ্মৎ বলিয়া একজন লোক মধ্য-নীল-নদের

জাতিসমূহকে একত্র করিয়া মিস্রীয়দিগকে সেই প্রদেশহইতে তাড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিল।

এই উন্মত্ত দেশহিতৈষীরা হিক্‌স পাশার অধিনায়কতায় পরিচালিত বৃহৎ একদল মিস্রীয় সৈন্যকে হারাইয়া দিল। এই সৈন্যদলে দশজন ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন, ইঁহারা স্বেচ্ছায় খেদিভের অধীনে কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন।

এই দুর্ঘটনা ঘটাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশটি ছাড়িয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। শীঘ্রই কাইরোতে এই খবর গেল, কিন্তু রাজকর্ম্মচারীদিগকে সম্মত করাইতে বিস্তর সময় নষ্ট হইল। গর্ডনকে ঐ প্রদেশে যাইবার আদেশ করা হইয়াছিল, তিনি যখন সুদানে পঁহুছিলেন, তখন মাহ্‌দী (মহম্মদ আহমৎ) তাহার অবস্থা খুবই ভাল করিয়া তুলিয়াছে।

গর্ডন এই সময়ে ব্রসেল্‌সে থাকিয়া রাজা লিওপোল্ডের সঙ্গে কঙ্গোতে যাইবার কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন এবং ঐ কার্য্য করিতে যাইবেন বলিয়া আবার ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগের কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছিলেন, লর্ড উল্‌সিলি তাঁহাকে লণ্ডনে আসিবার জন্য তারযোগে সংবাদ পাঠাইলেন।

লণ্ডনে উপস্থিত হইলে, ইংলণ্ডের মন্ত্রিদল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি, সুদানে যে সৈন্যদল আছে, তাহা ঐ প্রদেশহইতে বাহির করিয়া আনিবার চেষ্টায় তথায় যাইতে চাহেন কি?" গর্ডন তৎক্ষণাৎ উহা করিতে সম্মত হইলেন, সুতরাং তিনি অবিলম্বে মিসরে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে লর্ড উল্‌সিলি টের পাইলেন যে, গর্ডন লণ্ডনে আসিবার জন্য বেলজিয়মের রাজার কাছহইতে যে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার আর দুই-এক-পাউণ্ডমাত্র তাঁহার হাতে আছে।

উহাছাড়া তাঁহার কাছে আর কিছুই ছিল না। তখন সকল ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এদিকে গর্ডনের যাইবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে। উল্‌সিলি দুইজন লোকের নিকটহইতে কিছু কিছু টাকা ধার করিয়া, ট্রেন যখন ছাড় ছাড় হইয়াছে, তখন গর্ডনকে খুচরা ২০০ পাউণ্ড একটা থলিয়ায় ভরিয়া দিলেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী গর্ডন লণ্ডন-ত্যাগ করিলেন। তিনি যে কার্য্যে যাত্রা করিলেন, সে কার্য্যটি নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন করিয়া ফিরিতেন; কিন্তু কতকগুলি লোকের দোষে তাহা ঘটিতে পারিল না। তাহাছাড়া সুয়াকিমে একদল ইংরাজ সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে মাহ্‌দী, যাহা আমি ভয় করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিতে চলিল, ইহা মনে করিয়া অকাণ্ড কাণ্ড বাধাইয়া ফেলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আবার খার্টুমে।

খার্টুমে পঁহুছিয়া গর্ডন যে দুই গবর্ণমেণ্টের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সেই দুই গবর্ণমেণ্টের ন্যায় নিজেও ভুল করিয়া মাহ্‌দীর প্রতি তত লক্ষ্য রাখিলেন না। কি করিতে তিনি পুনরায় খার্টুমে আসিয়াছেন, তাহা তিনি প্রজাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি একাকী আসিয়াছেন, তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য—ন্যায়-বিচার। অতঃপর আর কাহারও নিকটহইতে অন্যায় করিয়া কর-আদায় করা হইবে না, এবং মিস্রীয়দের রাজত্ব গিয়াছে বলিয়া, আর যুদ্ধও হইবে না।

তিনি জানাইলেন যে, ঐ দেশবাসীদিগকে তিনি আত্মশাসন, আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণ করিতে শিক্ষা দিবেন। আর তাঁহার উদ্দেশ্য যে, মহৎ, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিবেন, এবং অনাদায় খাজনার কাগজ-পত্র পোড়াইয়া ফেলিবেন।

কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, মাহ্‌দী বড় প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জেবের রহমন বলিয়া একজন লোককে মাহ্‌দীর প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য খার্টুমে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া, তিনি অবিলম্বে কাইরোতে টেলিগ্রাম করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলস্থ সৈন্যশ্রেণী স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং এই ইচ্ছা-প্রকাশ করিলেন যে, কর্দ্দোফানে মাহ্‌দীর সঙ্গে স্বয়ং গিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।

কিন্তু তাঁহার অনুরোধ, প্রস্তাব প্রভৃতি সকলই উপেক্ষিত হইল। তিনি নির্ব্বিবাদে খার্টুম-ত্যাগ করিবার যে, আশা করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহাকে জলাঞ্জলী দিতে হইল। সুদানের চাবিস্বরূপ বার্বার-নামক স্থান তখনও অরক্ষিত ছিল বলিয়া তাহা মাহ্‌দীর হাতে পড়িল। সুয়াকিমে ইংরাজ সৈন্য ছিল বলিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ-মাসে টামাইয়ের যুদ্ধটি হইল। তাহার ফলে গর্ডনের আর কাহারও উপর কোন আধিপত্য রহিল না। আরবেরা আসিয়া খার্টুম-অবরোধ করিল, এবং খার্টুমের মধ্যেই বিস্তর বিশ্বাসঘাতক লোক রহিয়া গেল।

অতঃপর যে সমস্ত ঘটনা ঘটিল, তৎসমুদয়ের আর বিস্তারিত বিবরণ দিয়া কোনই লাভ নাই। গর্ডনের সঙ্গে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু ছিল, তাঁহাদিগকে তিনি "আব্বাস" বলিয়া একটি নৌকায় করিয়া সেই বৎসরের ৯ই সেপ্টেম্বরের রাত্রিতে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু "আব্বাস" ডন্‌গোলায় পঁহুছিতে পারিল না, পথে মাহ্‌দীর হাতে পড়িল, সে আরোহীদিগকে হত্যা করিয়া তাহাতে যে সমস্ত দলীল-পত্র ছিল, হস্তগত করিল।

গর্ডন তখন নির্ব্বন্ধু হইয়া একাকী প্রাসাদমধ্যে রহিলেন। তথাপি তিনি সাহসের সহিত সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন—বিচার-বিবেচনাপূর্ব্বক খাদ্যাদি বণ্টন করিতে লাগিলেন; দুর্ব্বল ও নিরুপায় লোকদিগকে আশাজনক কথা কহিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন; আহতদিগের শুশ্রূষা ও শত্রুর আক্রমণ-প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; মৃতদিগকে কবর দিতে ও যে কিছু অর্থসংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন, সকলেরই জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন

তাঁহার সৈন্যদিগের কাহারও কাহারও মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা

দেখিয়া তিনি হতাশ হইয়া একদা দুইজন দেশীয় সর্দ্দারকে হত্যা করিবার হুকুম দিলেন; তাহার ফল বিষময়ই হইল। এইজন্য গর্ডন পশ্চাত্তাপ করিতে বাধ্য হইলেন।

ছয়মাস অবরুদ্ধ থাকিবার পর, গর্ডন বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক-স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন। তাই "আব্বাস"-তরণী-খানি প্রেরিত হয়, ফল কি হইয়াছিল, বলিয়াছি।

যে দিন "আব্বাস" শত্রুহস্তগত হয়, সেই দিবস ইংলণ্ডহইতে গর্ডনকে উদ্ধার করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। সংক্ষেপে বলি, সেই সৈন্যদল আসিয়া গর্ডনকে উদ্ধার করিবার পূর্ব্বেই মাহ্‌দী মহাপ্রাণ গর্ডনকে বধ করিল।

কোথায় যে, তাঁহাকে বধ করা হইয়াছিল, তাহা কেহই জানে না। এক্ষণে মিসরে গর্ডনের স্মৃতি-রক্ষা করিবার জন্য একটী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডেও এই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হইয়াছে। গর্ডন যে, কি উদারহৃদয় লোক ছিলেন, এক্ষণে তাহাও লোকে বুঝিয়াছে। গর্ডনের নামে একটি সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে গর্ডনের নামে জগতের প্রতিলোকের মস্তক ভক্তিভরে অবনত হয়। গর্ডন যে কার্য্য-সাধনার্থে প্রাণ দেন, সে কার্য্যও সাধিত হইয়াছে,—মিসরের নিরীহ প্রজারা এক্ষণে শান্তিতে বাস করিতেছে।

সমাপ্ত।

রজ্জু-রথ।

অল্প কাল পূর্ব্বেও দূরদেশে যাইতে হইলে, লোকে হয় স্থল-পথে নয় জল-পথে যাইত; কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই মানুষে বিজ্ঞানের এমন উন্নতি করিয়াছে যে, শূন্যকেও আয়ত্তের ভিতর করিয়া ফেলিয়াছে। যে সমস্ত যানের সাহায্যে লোকে এখন শূন্যেও যাওয়া-আসা করিতেছে, তাহার একটি যানের কথা আজ আমরা এই প্রবন্ধটিতে লিখিব। এই যানটির নাম রজ্জু-রথ বা ঝোলা-গাড়ী।

রজ্জু-রথ নূতন জিনিস বটে, কিন্তু রজ্জু-পথ নূতন নহে। মানস-সরোবরে যাইতে হইলে, পথে "লছমণ-ঝোলা" পার হইতে হয়, ঐ লছমণ-ঝোলা রজ্জু-পথ অর্থাৎ দড়ির রাস্তাছাড়া আর কিছু নয়, উহা অনেকদিনকার পুরাণো রজ্জু-পথ। বহুদিনকার পুরাণো দলিলপত্র ও পুঁথি-টুথি পড়িয়া দেখা যায় যে, সেকালেও লোকে চিমড়া লতা পাকাইয়া দড়ির মত করিয়া সেই দড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া নদী-টদী পার হইত। সেই সময়ে লোকে চার-পাঁচখানি চিমড়া লতা পাকাইয়া দড়ি করিয়া ঐরকম দুইগাছা দড়িতে গাছের ডাল বাঁধিয়া সেতুর মত করিয়াও নদী, খড্ প্রভৃতি পার হইত।

এখন যে, দড়ির রাস্তা হয়, তাহা ঐ সেকেলে দড়ির রাস্তারই মত। তবে তখন লতা পাকাইয়া দড়ি করা হইত, এখন ৮।১০ গাছি কিম্বা তাহারও বেশী গাছি তার পাকাইয়া দড়ি করা হয়, আর যে পথটা অতিক্রম করিতে হইবে, তাহা যদি খুব চওড়া হয়, তাহা হইলে মাঝে মাঝে ইস্পাতের থাম বসাইয়া রজ্জুপথটিকে লম্বা আর মজবুত করা হয়। রজ্জু-রথ রজ্জুপথে ঝুলিয়া ঝুলিয়া যায়, তাই সোজা ভাষায় উহাকে ঝোলা গাড়ী বলিলে, ক্ষতি নাই। বর্ত্তমানে দুইরকমের দড়ির রাস্তা দেখা যায়, (১) "একানে" দড়ির রাস্তা, (২) জোড়া দড়ির রাস্তা।

একানে দড়ির রাস্তার দড়িগাছার যেন শেষ নাই,—একগাছা দড়িই উপরে উঠিয়া আবার নীচে ঘুরিয়া আসিয়াছে। এই দড়িতে গাড়ীটা আট্‌কান থাকে। এই পথের যেখানথেকে যাত্রা করিতে হইবে, সেখানটা প্রায় উচু জমীতেই থাকে, কাজেই গাড়ীখানা কি করিয়া চলে, তাহা আর, বোধ করি, কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না; ছবিতে একানে দড়ির আর জোড়া দড়ির রাস্তা এবং দড়ি কোথাহইতে কেমন করিয়া ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে, দেখ, তাহা হইলে কতকটা বুঝিতে পারিবে। মাধ্যা-কর্ষণের বলে গাড়ী উচু জায়গাহইতে নামিয়া দড়িটাকে অনবরত ঘুরাইতে ঘুরাইতে রজ্জুবর্ত্মের অপর প্রান্তপর্য্যন্ত গিয়া পঁহুছে; তথায় মালখালাস করিবার জন্য একটী আড্ডা থাকে।

মালখালাস হইয়া গেলে, রজ্জুপ্রান্তে বিশেষপ্রকারে নির্ম্মিত সচ্ছিদ্র চাকা আছে, গাড়ীখানা তাই ঘুরিয়া খালি ফিরিয়া আসিতে পারে।

এই রজ্জু-পথ না থাকিলে, অনেক জায়গায় যাওয়াই যাইত না। অনেক পাহাড়ের উপরে লৌহবর্ত্ম-নির্ম্মাণ করা যায় না, সেই সব পাহাড়ে রজ্জু-পথ দিয়া উঠিলে, সুবিধা হইতে পারে। রজ্জু-রথ প্রায় সমস্ত বাধাবিঘ্ন-অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া যায়। রজ্জু-পথে উপত্যকা, নদী, গিরিসঙ্কট এমন কি সমুদ্রপর্য্যন্ত সমান স্বচ্ছন্দে পার হওয়া যায়। এই পথ শূন্যে থাকে বলিয়া, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় ইহার তত ক্ষতি হয় না। তাহাছাড়া এই পথ বেশী জমী জুড়িয়া থাকে না, সরু একফালি জমী হইলেই, যথেষ্ট হয়; কাজেই এই পথের তদারক করা সহজ। এই পথ করিতে খরচও তত বেশী পড়ে না; আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি ঢালু জমীহইতে পথটি নামাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই পথে গাড়ী চালাই-বার খরচও বেশী নয়, গাড়ী আপনিই চলে।

জোড়া দড়ির রাস্তায় গাড়ী প্রায় একানে দড়ির রাস্তার নিয়মেই চলে। তবে এই পথে দড়িতে গাড়ীখানা আট্‌কান

থাকে না, "রোলার" দিয়া ঝুলান থাকে এবং আর একটা দড়ি দিয়া উহাকে টানিতে হয়। জোড়া দড়ির রাস্তায় সচরাচর "অন্তহীন" রজ্জু-ব্যবহার করা হয় না। একপ্রান্তে আসল দড়িটা গাড়া থাকে, আর একপ্রান্তে ঐ দড়িতে যাহাতে টান পড়ে, তাহার জন্ম ভার ঝোলান থাকে। জোড়া দড়ির রাস্তার অসুবিধা এই যে, উহা কম খরচে হয় না, তাহাছাড়া তদারক করিতে চাহিলে, এই রাস্তা একানে দড়ির রাস্তার মত সহজে তদারক করা যায় না। একানে দড়িগাছা সুবিধাজনক কোন একজায়গায় দাঁড়াইয়াই পরীক্ষা করা যায়, কিন্তু জোড়া দড়ির রাস্তা তদারক করিতে হইলে, তত্ত্বাবধায়ককে সমস্ত পথটাই ঘুরিয়া আসিতে হয়।

কয়েকমাসে এইপ্রকার আরও অনেক রজ্জুবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তর-আফ্রিকায় একটী বিস্ময়কর রজ্জুপথ উষাম্বর-পর্ব্বতমালায় উঠিয়া গিয়াছে, উহা ঐ পর্ব্বতমালাহইতে কাঠের গুঁড়ি বহিয়া সমুদ্রোপকূলে পহুঁছিয়া দিতেছে।

পেকিনহইতে সাড়েপঁয়ত্রিশক্রোশ দূরস্থিত এক পর্ব্বতমালা-হইতে পেকিনে কয়লা বহিয়া আনিবার জন্ম একটি ঐপ্রকার রজ্জুবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। যদিও এই সমস্ত পথ দিয়া সচরাচর মাল-চালান হয়, তথাপি কুলি-মজুর আর এঞ্জিনীয়ারদিগকে লইয়া যাইবার জন্ম ঐসমস্ত পথে যাত্রীগাড়ীও চালান যায়।
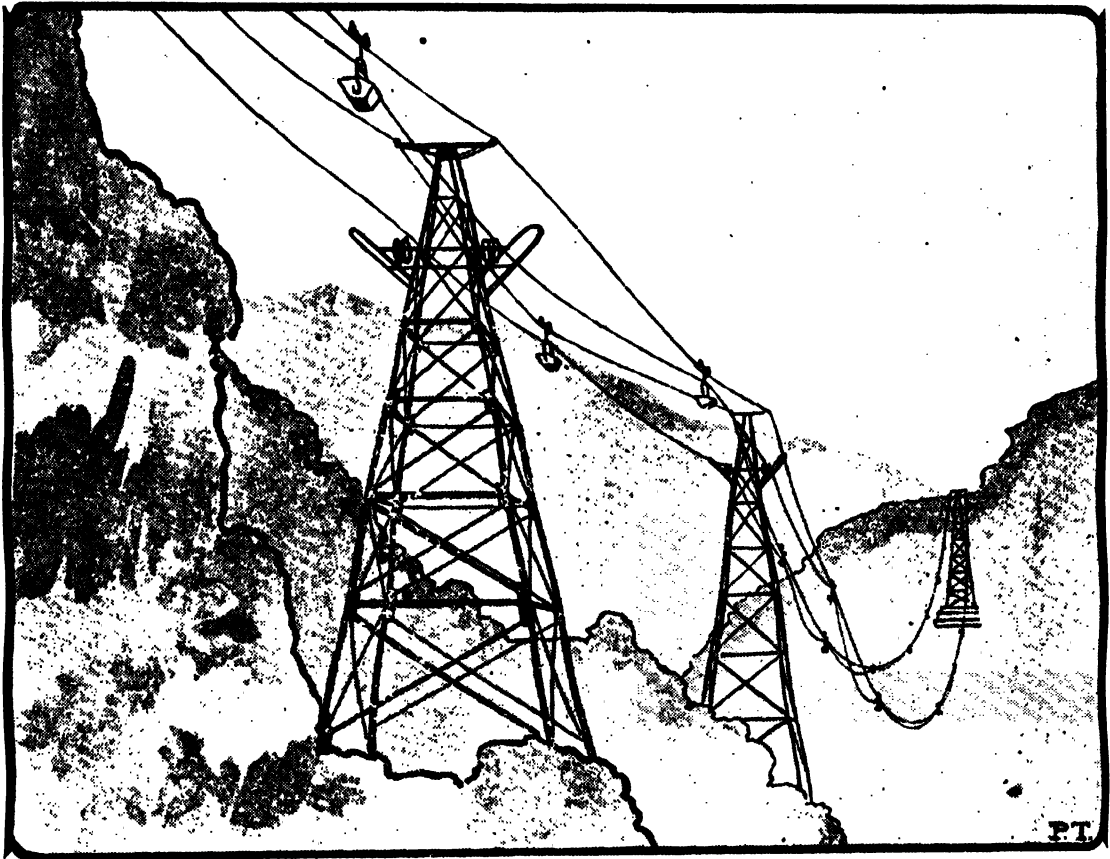
দিনের মধ্যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও সুমহান্ হিমালয়পর্ব্বত-

আগে দড়ির রাস্তা দিয়া কেবল মালই চালান দেওয়া হইত। পর্ব্বতের উপরে কোন খনি থাকিলে, তাহাহইতে খনিজ পদার্থ নীচে কোন নগরে চালান দেওয়া হইত, ঐ পথে লোকজন বড় যাওয়া-আসা করিত না, তবে খনির মজুরেরা অবশ্য ঐ গাড়ীতে চড়িয়াই পাহাড়ের উপরে উঠিত এবং তাহাহইতে নামিত। কিন্তু সম্প্রতি অতি অল্পদিনহইতে রজ্জুরথে মানুষেরাও আনাগোনা-আরম্ভ করিয়াছে। রজ্জুরথের দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক কার্য্যই চলিবে বলিয়া বোধ হয়। সম্প্রতি অষ্ট্রিয়ান টাইরলে ও সুইট্জার-ল্যাণ্ডে এইপ্রকার লোকবাহী রজ্জুরথ নির্ম্মিত হইয়াছে। গত

হইতে একটি রজ্জুবর্ত্ম নামাইবেন, এই পথটির নির্ম্মাণ-কার্য্য-সমাধা হইলে, উহা পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম রজ্জু-বর্ত্ম হইবে। ইহা দৈর্ঘ্যে সাড়ে সাঁইত্রিশ ক্রোশ এবং এতদ্দ্বারা শ্রীনগরের সহিত রাওলপিণ্ডির সংযোগ-সাধন করা হইবে। এখন কাশ্মীরে গাড়ী যাইবার যে রাস্তা আছে, মাটীর চাপড়া ধ্বসিয়া তাহা প্রায়ই বেমেরামত হইয়া পড়ে। এই রাস্তাটি সর্ব্বদা সংস্কৃত রাখা যে, কি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তাহা ইহাহইতে বুঝা যাইবে যে, এই রাস্তার প্রত্যেক মাইল সুসংস্কৃত রাখিতে কাশ্মীর-গবর্ণমেণ্টের বৎসরে ১৫০০ টাকা করিয়া ব্যয় পড়ে! কিন্তু রজ্জুপথটি নির্ম্মিত

হইলে, উহার এক-একটি অংশ ২০০০ ফুট করিয়া দীর্ঘ এবং উহার প্রত্যেক ইস্পাত-স্তম্ভ ১০০ ফুট করিয়া উচ্চ হইবে। পথটি পর্ব্বত-মালার মাথার উপর দিয়া যাইবে। ঐ পথে ১৫ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীনগরহইতে রাওয়লপিণ্ডিতে মাল চলিয়া আসিবে, এখন কিন্তু গরুর গাড়ী শ্রীনগরহইতে রাওয়লপিণ্ডি পহুঁছিতে ১৫ দিন লাগে।

অষ্ট্রিয়াতে যে রজ্জুবর্ত্মটি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। এই পথে যাত্রী-গাড়ী যায়। এই পথের রজ্জুর বেড় ১$\frac{3}{8}$ ইঞ্চি। এই রজ্জু ঢিলা নহে, খুব টানা। ইহাতে দুইটিমাত্র ষ্টেশন আছে, একটা পর্ব্বতের উপরে, আর একটা পর্ব্বতের পাদদেশে। ইহা কয়েকটি অংশে বিভক্ত। ইহার উপরের আট্‌কান আছে, আর নিম্নস্থিত প্রান্তে খুব ভার ঝুলাইয়া গভীর গহ্বরে পুতিয়া দেওয়া হইয়াছে। যত ভারী বোঝা ঐ রজ্জুতে এখন ঝুলান হইয়া থাকে, তাহার অপেক্ষা পাঁচগুণ ভারী বোঝা ঝুলাইয়া রজ্জুটাকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। উহার গাড়ীগুলি তাড়িতের দ্বারা চালিত হয়। নীচেহইতে উপরে উঠিতে ১৫ মিনিটমাত্র সময় লাগে। গাড়ীগুলি এমনভাবে ঝুলান থাকে যে, উঠিবার সময়ে সেগুলি যে কোণেই ঘুরুক না, তাহাদের মাথার দিক্ আর পায়ের দিক্ যেমন, তেমনই থাকে। গাড়ীগুলির চারদিকেই জানালা থাকায়, যাত্রীদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্য দেখিবার কোনই অসুবিধা হয় না।
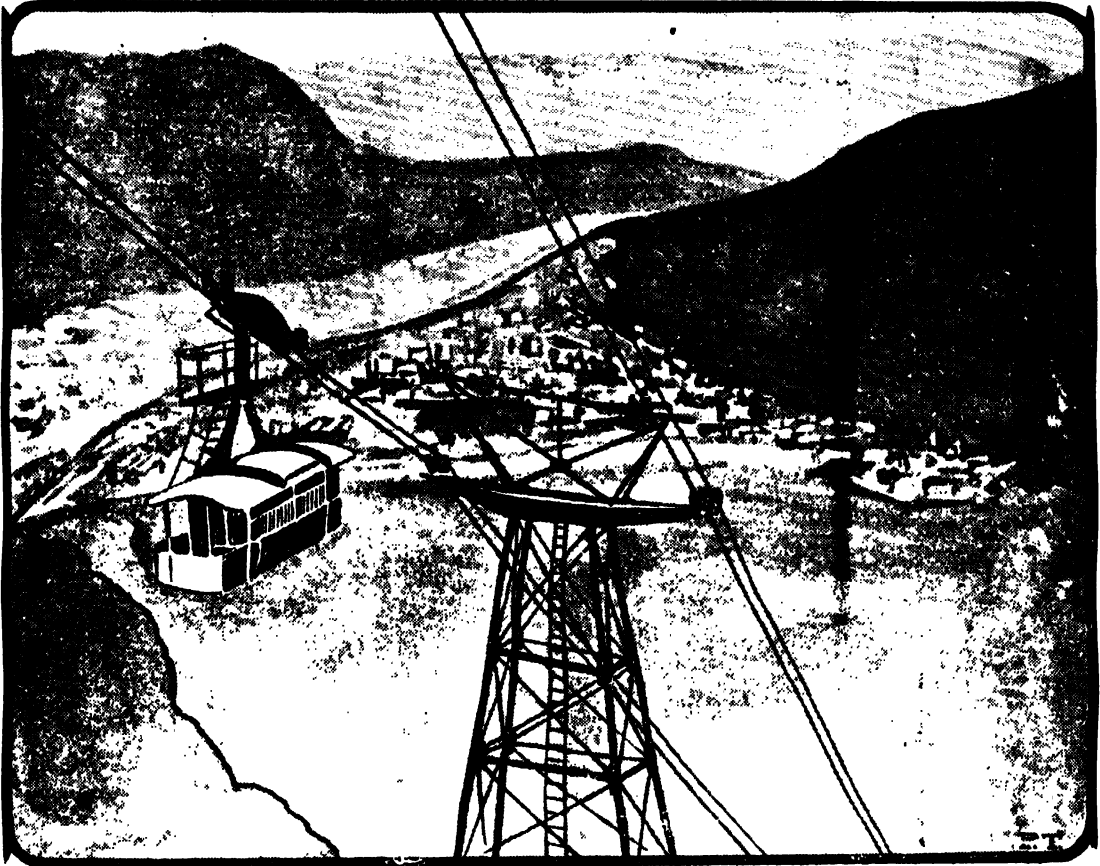
ষ্টেশনটি ৪০০০ ফুট উচ্চে; কিন্তু দুই ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানের দূরত্ব ৫২৩০ ফুট। ইহা ১২টি ইস্পাত-স্তম্ভের উপরে স্থাপিত, স্তম্ভের উচ্চতা ২৩ ফুটহইতে ১০০ ফুটপর্য্যন্ত, ইহাতে জোড়া লাইন আছে। একটা গাড়ী যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন আর একটা গাড়ী নীচে নামিতে থাকে, ফলে একটা গাড়ী অন্য গাড়ীটির তুল্যভারের কার্য্য করে।

এই পথ দিয়া পর্য্যাটকেরা গমনাগমন করিয়া থাকেন বলিয়াই, ইহার সর্ব্বত্র খুব মজবুত ও নিরাপদ্ করা হইয়াছে। এইজন্য এই রজ্জুপথের উচ্চস্থিত প্রান্ত পর্ব্বতের গায়ে পাকা গাঁথুনি করিয়া

যে সমস্ত এঞ্জিনীয়ারেরা এই রজ্জুবর্ত্ম-নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের যত অসুবিধা-ভোগ করিতে হয়, এত অসুবিধাভোগ আর কোন এঞ্জিনীয়ারদেরই করিতে হয় না। চীনদেশে যে রজ্জুবর্ত্মটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নির্ম্মাণ করিতে এঞ্জিনীয়ারদের বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। যে সমস্ত থামের উপর ঐ রজ্জুবর্ত্মটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত থামের টুক্‌রা টুক্‌রা অংশ খচ্চরের পীঠে করিয়া পাহাড়ের উপর তুলিতে হইয়াছিল। মাঝে মাঝে পথে নদীনালা পার হইতে হইত, সেগুলি পার হইবার সময়, মজুরদের আর খচ্চরদের একগলা ঠাণ্ডাজলে নামিতে

হইত। এই রজ্জু-পথ কয়েকটি গ্রামের উপর দিয়া গিয়াছে, এই সকল গ্রামের লোকেরা এই রজ্জুবর্ত্ম-নির্ম্মাণে বড়ই আপত্তি তুলিয়াছিল, কারণ চীনারা মেয়েছেলেদের আব্রু-রক্ষার বড়ই উদ্যোগী। গ্রামের মাথার উপর দিয়া রজ্জুবর্ত্ম গেলে, সকলে গ্রামের স্ত্রীলোকদের দেখিতে পাইবে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোকদের কেহ বিবাহ করিতে চাহিবে না, এই ভয়েই ঐ সকল গ্রামের পুরুষেরা ঐ রজ্জুপথ-নির্ম্মাণে অত আপত্তি করিয়াছিল। এঞ্জিনীয়ারেরা ঐ গ্রামবাসীদিগকে টাকা দিয়া বশীভূত করে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় উসাম্বরা-গিরির উপর দিয়া রজ্জুবর্ত্ম-নির্ম্মাণ করিতেও এঞ্জিনীয়ারদিগকে কম অসুবিধা-ভোগ করিতে হয় নাই।

রেডিয়ম।

আত্মপোষক অগ্নি।

বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বে কেহ কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, পৃথিবী কি করিয়া আপনাতে এত তাপরক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পৃথিবী অতি আশ্চর্য্য উপায়ে আপনার তাপ বরাবর রক্ষা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও, কতকাল তাহা কেহ বলিতে পারে না, স্বীয় তাপ উক্ত অতীব আশ্চর্য্য উপায়ে রক্ষা করিবে।

এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর তাপহ্রাস ঘটিতেছে; কিন্তু সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পৃথিবী সত্যসত্যই আপনিই আপনার তাপ উদ্ভূত করিতেছে। ইহা যে, কত আবশ্যক, তাহা তোমরা সকলেই বুঝিতে পার। কাহারও যদি আটটা টাকা থাকে, আর সে প্রতিদিন একটী করিয়া টাকা খরচ করিতে থাকে, তাহা হইলে আটদিন পরেই অবশ্যই তাহার সব টাকা খরচ হইয়া যাইবে; কিন্তু কেহ যদি প্রত্যহ একটী করিয়া টাকা-খরচ করে আর প্রত্যহ একটী করিয়া টাকা পায়, তাহা হইলে তাহার অবশ্য আটটি টাকা কিছুতেই ফুরাইবে না। পৃথিবীর তাপক্ষয় ও লাভসম্বন্ধে অনেকটা অমনই কিছু ঘটিতেছে। পৃথিবী প্রত্যহ তাপ হারাইতেছে, তাহার ফলেই ইহা জীবের বাসোপযোগিনী হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে সেই সঙ্গে নূতন তাপেরও সঞ্চার হইতেছে। এইরূপ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে যে, পৃথিবী প্রত্যেক দিন বা প্রত্যেক বৎসর অথবা প্রত্যেক লক্ষবৎসরে যতটা করিয়া তাপ হারাইতেছে, ঠিক অন্ততঃ ততটা করিয়াই তাপ আবার লাভও করিতেছে, সেইজন্য ইহা দিন দিন ক্রমশঃ শীতল হইয়া পড়িতেছে না। ফলে, যে বালক প্রত্যেক দিন একটী করিয়া টাকা খরচ করে, আবার একটী করিয়া টাকা পায়, সে যেমন কখন দরিদ্র হইয়া পড়ে না, তেমনই পৃথিবীও দিন দিন তাপশূন্যা হইতেছে না। যে পদার্থটী পৃথিবীকে এইপ্রকারে তাপলাভে সাহায্য করিতেছে, তাহারই নাম "রেডিয়ম"।

রেডিয়ম-সম্বন্ধে সব কথা বলিতে গেলে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পরিসরে স্থানসংকুলান হইবে না, কারণ প্রায়ই রেডিয়মসম্বন্ধে নানা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। তথাপি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঐ আশ্চর্য্য পদার্থসম্বন্ধে এমন কয়েকটি কথা বলা চাই, যাহাতে, পৃথিবী কি করিয়া প্রতিদিন তাপ-লাভ করিতেছে, তাহা কতকটা বুঝা যায়।

জড়বস্তুমাত্রেই কোন কোন মৌলিক পদার্থের সমষ্টিছাড়া আর কিছুই নহে। আগে ভারতের লোকেরা ভাবিত যে, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি মৌলিক পদার্থ পৃথিবীতে আছে, কিন্তু এখন সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, ঐ পাঁচটী পদার্থের একটিও মৌলিক বা রূঢ় পদার্থ নহে; কিন্তু এখন আমরা অনেক প্রকৃত মৌলিক পদার্থের কথা জানিতে পারিয়াছি, যথা হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, এবং বায়ুর একটী উপাদান অম্লযান-নামে একপ্রকার পদার্থ ইত্যাদি। রেডিয়মও ঐরূপ একটী মৌলিক পদার্থ। এই মৌলিক পদার্থটি সকলের শেষে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই রূঢ় পদার্থটি সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য, কারণ ইহা অতি অল্পই পাওয়া যায়; কিন্তু অন্য সমস্ত মৌলিক পদার্থের অপেক্ষা এই মৌলিক পদার্থটিই অধিকতর আশ্চর্য্য।

এই পদার্থটির সম্বন্ধে একটী বিস্ময়করী কথা এই যে, ইহা সর্ব্বক্ষণই আপনাহইতে আপনাতে তাপোদ্ভব করিতেছে। সীসা, রূপা বা অম্লযান ইহা করিতে পারে না। ঐ তিনটি জিনিস আপনা-আপনি গরম হয় না, হুকার ছিঁচ্‌কা আগুনে পোড়াইলে, গরম হয়, উহা তো বাহিরের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু রেডিয়ম বাহিরের কোন উত্তাপ না পাইলেও, আপনা-আপনি গরম হয়। যেখানেই ইহা পাওয়া যাউক না কেন, সর্ব্বত্রই ইহা ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী তাবৎ বস্তুর অপেক্ষা একটু বেশী উত্তপ্ত থাকে। এক অগ্নিছাড়া জগতের আর কোন পদার্থের এই গুণ নাই; কিন্তু অগ্নি রেডিয়মহইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, কারণ অগ্নির উত্তাপ সূর্য্যের উত্তাপছাড়া আর কিছুই নয়, সূর্য্যের উত্তাপ পৃথিবীর অনেক পদার্থে সুপ্ত থাকে, সে সমস্ত দাহ্য পদার্থহইতেই অগ্নি উদ্ভূত হয়।

কিন্তু রেডিয়মসম্বন্ধে আশ্চর্য্য কথা এই যে, ইহাতে তাপ-সঞ্চার করিবার নিমিত্ত ইহাকে পোড়াইবার প্রয়োজন নাই, ইহাতে

বহুকালহইতে সূর্য্যের উত্তাপ সুপ্তাবস্থায় সঞ্চিত নাই, ইহার উত্তাপ ইহাতেই যেন সদ্য সদ্য উদ্ভূত হইতেছে।

এখন, এই কথাটায় একটা ভারি ভুল-ধারণা আমাদের মনে জন্মিয়া যাইতে পারে। আমরা যদি মনে করি যে, রেডিয়ম কোথাহইতেই তাপ পাইতেছে না কিম্বা কিছু-না-হইতে ইহাতে তাপের সঞ্চার হইতেছে, তাহা হইলে আমরা বড় ভুল করিব। একথা নিশ্চিত যে, কিছু-না-হইতে কিছুর উৎপত্তি হয় না, কিছু-হইতেই কিছুর উৎপত্তি হয়। রেডিয়মে তাপ আছে, একথা যদি সত্য হয় এবং উহা কোন বহির্ব্বস্তুহইতে তাপ লইতেছে না, একথাও যদি সত্য হয়, (বলা বাহুল্য, উক্ত উভয় কথাই সত্য), তাহা হইলে রেডিয়মের মধ্যেই এমন কোন তাপজনক পদার্থ নিহিত আছে, যাহাহইতে উহাতে তাপ জন্মিতেছে। আমরা ইহাও জানিয়াছি যে, শেষোক্ত কথাই সত্য।

অতএব আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, পৃথিবীতে এমন একটা পদার্থ আছে, যাহাহইতে সে নিত্য নবতাপ পাইতেছে; তবে পৃথিবীর ঐ তাপলাভের উপায় যে, অনন্তকাল-স্থায়ী, তাহা আমরা বলিতেছি না, কেবল এই কথা বলা, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না যে, পৃথিবীর ঐ তাপলাভোপায় যে, কত দিনে অন্তর্হিত হইবে, তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না।

একটা কথা কিন্তু আমরা বলি নাই। পৃথিবীতে কতটা রেডিয়ম আছে? এপর্য্যন্ত যতটা রেডিয়ম পাওয়া গিয়াছে, সমস্তটা জড় করিলে, ছোট একটা "বলের" চেয়ে বড় হইবে না। তাহা-ছাড়া পৃথিবীর কেবল দুই-একটী জায়গায় ঐ দুর্লভ পদার্থটি পাওয়া গিয়াছে। যে জিনিসে রেডিয়ম পাওয়া যায়, তাহার কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রশ্মি কর্ণওয়ালে ও অষ্ট্রিয়ায় মর্ম্মর-প্রস্তরে ও প্লেটে পাওয়া গিয়াছে। অষ্ট্রিয়ায়ই বেশী পাওয়া গিয়াছে। তবুও যদবধি রেডিয়ম পাওয়া গিয়াছে, তদবধি উহা এত সংগৃহিত হয় নাই যে, একটা কুইনিনের বটিকার কৌটাও ভরিয়া যাইতে পারে।

সুধু ঐ টুকু রেডিয়মই যদি আমাদের ভরসা হইত, তাহা হইলে রেডিয়মের উত্তাপে পৃথিবী বহুকাল উত্তপ্তা থাকিবে, একথা বলা যাইত না। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, কর্ণওয়াল ও অষ্ট্রিয়াছাড়া অন্যান্য অনেক স্থলেও রেডিয়ম আছে। তবে সে সমস্ত স্থলে রেডিয়ম-সংগ্রহ করা যায় না, উহার অস্তিত্ব-অনুভব করা যায় মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রেডিয়ম দুষ্প্রাপ্য মৌলিক পদার্থ; বোধ হয়, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য মৌলিক পদার্থ।

রেডিয়ম যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে খুবই কম পাওয়া যায়, সত্য, তবু ইহা সর্ব্বত্রই একটু-না-একটু পাওয়া যায়। সম্প্রতি লোকে সকলরকমের জল, মাটী ও পাথর লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে, সবেতেই একটু-না-একটু রেডিয়ম আছে। অবশ্য সর্ব্বত্রই সেই একটু রেডিয়ম খুবই একটু পাওয়া গিয়াছে, নতুবা পৃথিবী এমনই গরম জায়গা হইত যে, ইহাতে জীবের বাস একান্ত অসম্ভাবিত হইত। এত কম রেডিয়ম সর্ব্বত্র আবিষ্কৃত হয় যে, তাহার অল্পতার কথা বলিলে, তোমাদের বিশ্বাস হইবে না; কিন্তু উহা এমন এক অদ্ভুত ও সক্রিয় পদার্থ যে, মুহুর্মুহুঃই কার্য্য করিতেছে এবং উহার কার্য্য এমন শক্তিসম্পন্ন যে, উহার অস্তিত্বানুভব করিতে কোনই ক্লেশ-ভোগ করিতে হয় না।

খুব ছোট একটী ছেলেও যদি কোন একটা বড় বাড়ীতে চেঁচাইতে থাকে, তাহা হইলে সকলেই তাহার গলার আওয়াজ পায়। রেডিয়মও তেমনই এমন একপ্রকার জিনিস যে, তাহার অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণে বৃহত্তর প্রস্তরে যদি একটু তিলপরিমাণ রেডিয়ম থাকে, তবুও তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। যে বৈজ্ঞানিকবর রেডিয়মের ঐ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক গুণটি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তিনি ইংরাজ। ইনি ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-সভ্য রয়েল সোসাইটীর একজন সভ্য, নাম মাননীয় আর, জে, ষ্ট্রাট্। ইঁহার পিতা, লর্ড র‍্যালে, উক্ত সোসাইটীর সভাপতি। মর্ম্মর-প্রস্তরে রেডিয়ম বাস্তবিকই প্রাগুক্ত অতি অল্পপরিমাণেই পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রস্তরে ও ধাতব পদার্থেও রেডিয়ম অতি অল্পই পাওয়া যায়।

এখন হয় তো তোমরা বলিবে যে, পৃথিবীতে তবে কতটুকুই বা রেডিয়ম আছে? লোকে অনুমান করে যে, পৃথিবীর ভিতরটা তপ্ত গলিত পদার্থে পূর্ণ, উহার উপরিস্থ ৪০ বা ৫০ মাইল গভীর স্থানের গলিত দ্রব্য জমিয়া কঠিন ও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর ঐ অতটা শৈত্যপ্রাপ্ত অংশ কি ঐটুকু রেডিয়মে, উহার নিত্য তাপ-ত্যাগ করা সত্ত্বেও, এতদিন গরম হইয়া রহিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও বহুদিন থাকিবে? হাঁ, থাকিবে! রেডিয়মসম্বন্ধে আশ্চর্য্য কথা এই যে, অতি অল্পপরিমিত রেডিয়মের তাপেই পৃথিবী বহুকাল তপ্তা আছে এবং ভবিষ্যতেও বহুকাল থাকিবে!

রেডিয়ম-সম্বন্ধে বিস্ময়ের অবধি নাই। ইহার সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা যত বাড়িয়া যাইতেছে, ততই আমরা ইহার সম্বন্ধে নানা তথ্যও অবগত হইতেছি। একথা যে সত্য, তাহা সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ; রেডিয়ম তাপোদ্ভব করিতে করিতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, ঐ পরিবর্ত্তনের ফলে উহা সর্ব্বদাই আর একটী মৌলিক পদার্থ-প্রসব করিতেছে; সেই পদার্থের নাম "হেলিয়ম"। সূর্য্যশব্দের গ্রীক প্রতিশব্দ "হেলিয়স"। হেলিয়মের ঐ নাম হইবার কারণ, লোকে প্রথমে উহাকে সূর্য্যেতেই আবিষ্কার করিয়াছিল। আমরা প্রতিদিন রেডিয়মের কার্য্যে দৃষ্টি রাখিতে পারি। আর উহা আপনাহইতে প্রতিদিন কতটা করিয়া হেলিয়ম উৎপন্ন করিতেছে, তাহারও আমরা পরিমাণ করিতে পারি; সুতরাং আমরা যাহা চাই, তাহা পাইতে পারি। কারণ ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, কোন একপ্রকার প্রস্তরে যদি এক নির্দ্দিষ্ট পরিমিত হেলিয়ম পাওয়া যায়, (হেলিয়ম রেডিয়মহইতেই হয়,

অন্ত কিছুহইতে হয় না) তাহা হইলে সেই পাথরটি যে, কত কালের, তাহা হিসাব করিয়া দেখা যায়।

কত হেলিয়ম, কতই বা রেডিয়ম আছে, তাহা ঐ বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিতেছেন। হেলিয়ম ও রেডিয়মের পরিমাণ-

ভারত-সম্রাট।

এখন ভূতত্ত্ববিদেরা তাহাই করিতেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরহইতে বিভিন্নপ্রকার প্রস্তর খুঁড়িয়া লইয়া সে সমস্ত প্রস্তরে

দ্বারা জানা যায়, কতদিন ঐ সমস্ত প্রস্তরে রেডিয়ম রহিয়াছে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রস্তর কত দিনের।

কালুয়া ও ভুলুয়া

(উপকথা।)

দুই ভাই ছিল; বড় ভাই কালুয়া, ছোট ভাই ভুলুয়া, দু'জনেই ভেড়াওয়ালা ছিল, তাহাদের প্রায় একশো ভেড়া-ভেড়ী ছিল, তাহাদের পশম বেচিয়া তাহারা সংসার চালাইত। তাহারা এমন সতর্কভাবে তাহাদের ভেড়া-ভেড়ীগুলিকে চরাইত ও পাহারা দিত যে, কখন একটা ভেড়ার বাচ্ছাও তাহারা হারায় নাই। কিন্তু ভাই হইলে কি হয়? দুই ভাইএর স্বভাব একেবারে উল্টা ছিল। কালুয়া যেমন লোভী, তেমনই নিষ্ঠুর ছিল; ভুলুয়ার শরীরে কিন্তু বড় দয়া-মায়া ছিল। কালুয়া বড়ই স্বার্থপর ছিল, যেমন করিয়াই হউক, দু'পয়সা ঘরে তুলিতে পারিলেই, সে খুশী হইত; ভুলুয়া কিন্তু একমুঠা চানা পাইলে, আধমুঠা কাহাকেও বিলাইয়া বাকী আধমুঠা নিজে খাইত। কালুয়া বড় ভাই, ভুলুয়া ছোট। কালুয়া লোভী, তাই তাহাদের বাপ মরিয়া গেলে, সে-ই বাড়ীর কর্ত্তা হইয়া উঠিল, ভুলুয়া-বেচারাকে সে চাকরের মত খাটাইত, লোকে চাকরের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে, কালুয়া ভুলুয়ার সঙ্গে সেইরকমই ব্যবহার করিত।

যতদিন না কালুয়ার অতিলোভের দরুণ তাহাদের অবস্থা বড় খারাব হইয়া পড়িল, ততদিন দুই ভাই বেশ শান্তিতে ছিল।

শেষে একদা এক গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি পশমক্রেতারা আসিয়া কালুর পশমের ভারি সুখ্যাতি করিয়া তাহার পশমের দাম সবচেয়ে বেশী দিয়া গেল। তাহাতে ভেড়াগুলার কপালে দুঃখ উপস্থিত হইল, কারণ সেই দিন-অবধি তাহাদের পশম যতই পেঁচাইয়া কাটা হউক না কেন, কালুয়া সন্তুষ্ট হইত না। পশম কাটিবার সময় কালুয়া যত তাহার ভেড়াদের গায়ের লোম ছোট করিয়া কাটিত, তত ছোট করিয়া আর কেহই কাটিত না। ভুলুয়া-বেচারা যাহাই বলুক না কেন, কালুয়া ভেড়াদের লোম এত খাট করিয়া কাটিত যে, তাহাদের দেখিলে বোধ হইত, কে যেন তাহাদের গা কামাইয়া দিয়াছে। ভুলুয়া ভেড়াদের লোম এত ছোট করিয়া কাটা পছন্দ করিত না, কিন্তু কালুয়া তাহাকে বুঝাইত যে, ভেড়াদের লোম ছোট করিয়া কাটিলে, তাহাদের ভালই হয়। এদিকে ভুলুয়া কিন্তু কালুয়াকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, কালুয়া যতটা পশম কাটিয়াছে, ততটা পশমই প্রচুর হইয়াছে। তবু কালুয়া আরও পশম কাটিয়া বিক্রয় করিত আর লভ্যাংশ জমা করিয়া রাখিত। এইরকমে কত গ্রীষ্মকাল কাটিয়া গেল। অন্য সমস্ত মেষপালকেরা কালুয়াকে খুব ধনী লোক ভাবিতে আরম্ভ করিল, কালুয়ার দেখা-দেখি অন্য ভেড়াওয়ালারাও হয় ত তাহাদের ভেড়াদের লোম তাহারই মত ছোট করিয়া কাটিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু ইতোমধ্যে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাতে তাহারা তাহা করিল না।

সেবার গ্রীষ্মকালে কালুয়ার ভেড়াদের গায়ে খুব লোম হইয়াছিল। কালুয়া তাহাদের গায়ের লোম দুইবার কাটিয়া লইয়া তৃতীয় বারও কাটিবার সংকল্প করিতেছিল, এমন সময়ে প্রথমে তাহার ভেড়ার বাচ্ছাগুলি, শেষে তাহার ভেড়ীগুলিও কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। দুইভাইএ মিলিয়া অনেক খোঁজাখুঁজি করিল, কিন্তু একটীও ভেড়া খুঁজিয়া পাইল না। প্রত্যেক দিন তাহাদের ভেড়ার সংখ্যা কমিয়া যাইতে লাগিল। শেষে দুইভাই এই দেখিল যে, যে ভেড়াগুলির লোম বেশী করিয়া কাটা হইয়াছিল, সেই ভেড়াগুলিই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

ভুলুয়া ভেড়াগুলিকে চৌকী দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আর কালুয়া যত তাহার ভেড়া হারাইতে লাগিল, ততই বিরক্ত হইতে লাগিল। অন্য যে সমস্ত ভেড়াওয়ালাদের কাছে কালুয়া তাহার বুদ্ধির গর্ব্ব করিত, তাহারা এখন তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে দেখিয়া একটুও দুঃখিত হইল না। তবুও একটার পর একটা করিয়া ভেড়া হারাইতেই থাকিল। বসন্তকাল আসিলে, তিনটী বুড়ী ভেড়ী-ভিন্ন দুই ভাইএর আর কিছুই রহিল না। একদা সন্ধ্যাকালে দুই ভাইএ ভেড়া-তিনটিকে দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে কালুয়া বলিয়া উঠিল, "এই ভেড়া-তিনটের গায়ে বেশ লোম আছে।"

ভুলুয়া বলিল, "সে কি, দাদা, এদের গায়ে তেমন লোম নেই তো। এখনও একটু একটু শীতের হাওয়া বয়। এদের গায়ের লোম কা'টলে, এরা শীতে মারাই যা'বে।"

সে কথা কে শোনে? কালুয়া ঘরের ভিতরহইতে কাঁচি আনিতে ছুটিল!

ভুলুয়া ভাইএর এই অতিলোভ দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইল। অন্য বিষয়ে তাহার মন নিবিষ্ট করিবার জন্য সে নিকটস্থ উচ্চ পর্ব্বত মালার দিকে তাকাইয়া রহিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সে দেখিল, ভেড়ার মত তিনটী জীব সেই পর্ব্বতমালার একটির উপর যেন ছুটিয়া ছুটিয়া উঠিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার পর সে তাহাদের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখে, তাহার দাদা কাঁচি ও থলিয়া লইয়া আসিতেছে, আর তাহাদের ভেড়া-তিনটি কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কালুয়া আসিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "ভেড়া-তিনটে কোথায় গেল?" ভুলুয়া তখন যাহা দেখিয়াছিল, বলিল। তাহার দাদা তাহাতে তাহার উপরে ভারি চটিয়া গিয়া তাহাকে বড়ই বকিল। শেষে বলিল, "আর তো আমাদের একটাও ভেড়া রইল না। এখানকার ভেড়াওয়ালারাও আমাদের কোন কাজ-কর্ম্ম দেবে না। চল্, আমরা ঐ পর্ব্বতমালার ওপারে যাই। আমি বাবার মুখে শুনেছি, ওখানে অনেক বড় বড় ভেড়াওয়ালা আছে। তা'দের কাছে গেলে, নিশ্চয়ই আমরা কোন কাজ পা'ব।"

তাহার পরদিন সকালে কালুয়া ও ভুলুয়া, যে যাহার জিনিস-পত্র লইয়া, পর্ব্বতমালার ওপারের দিকে যাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু যাহারা তাহাদের পর্ব্বতমালা পার হইতে দেখিল, তাহারাই ভাবিল, দুই ভাইই পাগল হইয়া গিয়াছে। কারণ একশতবৎসর-পর্য্যন্ত কেহ সেই গিরিশ্রেণীর পরপারে যায় নাই। দ্বিপ্রহরে দুই ভাই, যে পর্ব্বতচূড়ায় ভুলুয়া মেষী-তিনটিকে লাফাইয়া উঠিতে খানে চলিল এবং সূর্য্যাস্তের সময় তথায় পঁহুছিল। সেখানে পঁহুছিয়া তাহারা দেখে, একহাজার তুষারশুভ্র মেষ এক মাঠে চরিতেছে, আর একজন বুড়া-লোক বসিয়া বসিয়া তন্ময় হইয়া তাহার মুরলী বাজাইতেছে।

কালুয়া তো সেই মুরলীবাদককে দেখিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল। ভুলুয়া কিন্তু তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

দেখিয়াছিল, সেই পর্ব্বতচূড়ায় উঠিল। তখন দুইজনেই একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সেই পর্ব্বতচূড়ায় উঠিয়া দুই-ভাই-ই বসিয়া পড়িল। তাহারা বসিয়া আছে, এমন সময়ে শুনিল, যেন একশতজন মেষ-পালক একসঙ্গে তাহাদের মুরলী বাজাইতেছে। কালুয়া ও ভুলুয়া পূর্ব্বে কখন সেইরূপ শ্রুতিবিনোদন সঙ্গীত শুনে নাই। দুই-ভাই-ই, যেখানে ঐ সঙ্গীত শোনা যাইতেছিল, সেই-

"মশাই, এ কোন্ দেশ? আমরা দুই-ভাই-ই মেষ-পালক, এখানে কি আমরা কোন কাজ-কর্ম্ম পেতে পারি?" বুড়া বলিল,—"এ শৈলচারণ। আমি এখানকার প্রবীণ মেষ-পালক। আমার মেষপাল কখন যূথভ্রষ্ট হয় না, কিন্তু তোমাদের আমি কাজ দিতে পারি। তোমাদের মধ্যে কে ভাল ক'রে ভেড়ার লোম ছাঁ'টতে পারে?"

কালুয়ার তখন সাহস হইল, সে বলিল,—"মশাই, আমাদের দেশে আমিই সবচেয়ে ছোট ক'রে ভেড়ার লোম ছাঁ'ট্‌তে পারি। আমি যে ভেড়ার লোম ছাঁ'ট্‌ব, তা'তে আর এমন কি সুতো পাকাবার জন্যেও, যথেষ্ট লোম থা'ক্‌বে না।"

বুড়া। তবে তুমিই আমার কাজ পা'র্‌বে। চাঁদ উঠ্‌'লে, যে ভেড়াদের লোম ছাঁ'ট্‌তে হ'বে, তা'দের আমি ডাক দেব।

সূর্য্য অস্ত গেল। চন্দ্রোদয় হইল, তখন সমস্ত নীহার-শুভ্র মেঘ ঘুমাইয়া পড়িল এবং একদল বহুলোমবিশিষ্ট নেকড়িয়া-বাঘ দেখা দিল; তাহাদের গায়ে এত লোম হইয়াছে যে, তাহাদের চোকপর্য্যন্ত ঢাকা পড়িয়াছে। কালুয়া ভয়ে পলাইয়া যাইত কিন্তু নেকড়িয়া-বাঘগুলা স্থির হইয়া দাঁড়াইল, আর বুড়া তখন বলিল,—"এই আমার ভেড়ার দল, এদের গায়ে বেজায় লোম হ'য়েছে, তুমি ছেঁটে দাও দেখি।"

কালুয়া পূর্ব্বে বিস্তর ভেড়ার লোম ছাঁটিয়াছে, কিন্তু জীবনে কখন নেকড়িয়া-বাঘের লোম ছাঁটে নাই! তবুও সে সাহস করিয়া নেকড়িয়া-বাঘদের লোম ছাঁটিতে গেল। তাহাতে প্রথম নেকড়িয়া-বাঘটা এমন ভয়ানক দন্তবিকাশ করিল আর অন্য সমস্ত নেকড়িয়া-বাঘ সেই সঙ্গে এমন ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল যে, কালুয়া ভয়ে কাঁচি ফেলিয়া বুড়ার পিছনে আসিয়া লুকাইতে পথ পাইল না! তখন কালুয়া বলিল, "মশাই, আমি ভেড়ার লোম ছাঁ'ট্‌তে পারি, নেকড়েবাঘের লোম ছাঁ'ট্‌তে পা'র্‌ব না।"

বুড়া বলিল,—"এদের লোমই তোমাকে ছাঁ'ট্‌তে হ'বে। তা' যদি না পার, তুমি যেখানথেকে এসেছ, সেইখেনে ফিরে যেতে পার; কিন্তু তুমি যা'বে, আর তোমার পেছনে পেছনে এরাও তোমায় তাড়া ক'রে যা'বে। তবে তোমাদের মধ্যে যে এদের লোম ছাঁ'ট্‌তে পা'র্‌বে, সেই এই ভেড়ার পাল পা'বে।"

এই কথা শুনিয়া ভুলুয়া সাহসে ভর করিয়া, কালুয়া ভয়ে যে কাঁচি ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা উঠাইয়া লইল এবং নিকটতম নেকড়িয়া-বাঘের লোম কাটিতে গেল। তখন সেই নেকড়িয়া-বাঘটা শান্তভাবে তাহার কাছে দাঁড়াইয়া লোম ছাঁটাইতে লাগিল, দেখিয়া ভুলুয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল! ভুলুয়া বেশ সুষ্ঠুভাবে তাহার লোম ছাঁটিল, কিন্তু তত ছোট করিয়া ছাঁটিল না। একটার লোম-ছাঁটা হইলে, আর একটা নেকড়িয়া-বাঘ আপনিই তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এইরকম করিয়া সমস্ত নেকড়িয়া-বাঘই তাহার কাছে শান্তভাবে লোম ছাঁটাইল। তখন বুড়া বলিল,—"তুমি, দে'খ্‌ছি, বেশ লোম ছাঁ'ট্‌তে পার। তাই আমি তোমাকেই সমস্ত লোম আর এই ভেড়ার দল বক্‌শিশ দিলেম। তুমি এদের নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পার, আর তোমার ভাইটাকে এদের চাকর রেখো।"

ভুলুয়া নেকড়িয়া-বাঘের পাল পুষিতে তত ইচ্ছুক ছিল না। তাই সে তাহার অনিচ্ছা-প্রকাশের পূর্ব্বেই দেখিল, সমস্ত নেকড়িয়া-বাঘের পাল তাহাদের হারা মেষপাল হইয়া গেছে, আর সমস্ত নেকড়িয়া-বাঘের রোমরাশি সুকোমল ও শুভ্র মেষলোমে পরিণত হইয়াছে!

কালুয়া সমস্ত মেষরোম থলিয়ায় ভরিয়া তাহার ভাইএর সঙ্গে দেশে ফিরিয়া গেল। সেই-অবধি সে আর তত লোভী রহিল না। ভুলুয়া তাহাকে আর মেষলোম ছাঁটিতে দিত না, নিজেই ছাঁটিত।

অঙ্গুরীয় ও মুদ্রার ম্যাজিক

এই ম্যাজিক দেখাইতে যে সামান্য দুই-একটি সরঞ্জামের দরকার হয়, তাহা তোমরা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিবে।

এই ম্যাজিক দেখাইতে তিনটী জিনিস দরকার হয়—একটুকরা মসীশোষক কাগজ, দেড়-ইঞ্চি পরিধি-বিশিষ্ট একটা পর্দ্দার পিতলের আংটা আর একটী এমন বড় কুইনিনের বটিকার কৌটা, যাহার মধ্যে আংটাটা রাখিতে পারা যাইবে, অথচ তাহার ভিতরকার ব্যাস আংটাটার ব্যাসের চেয়ে বেশী বড় হইবে না, ২।১ চুল বড় হইলেই, হইবে। খেলা দেখাইবার সময়ে প্রথমে একটা কাঠের "ট্রে" অর্থাৎ বারকোশের উপর শোষক-কাগজখানি বিছান থাকিবে, তাহার উপর আংটাটা আর তাহার পাশে কৌটাটী থাকিবে (চিত্র দেখ)। আমরা প্রথমে এই ম্যাজিকের চমৎকারিত্বের কথা বলিব, তাহার পর কি করিয়া এই ম্যাজিকটী দেখান যাইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দিব।

প্রথমে বাজীকর কৌটাটী হাতে তুলিয়া লইয়া বলিবে যে, উহা আংঠাটার ঢাক্‌নীমাত্র, পরে কাহাকেও উহার মধ্যে কোন ছিদ্র আছে কি না, দেখিতে দিবে। যখন কেহ কৌটাটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে থাকিবে, তখন বাজীকর কাহারও নিকটহইতে একটা সিকি চাহিয়া লইবে এবং তাহা শোষকের উপর আংঠাটার পার্শ্বে রাখিবে।

অতঃপর কৌটাটা ফেরত পাইলে, বাজীকর বলিবে, "সকলে বেশ ক'রে দেখুন, আমি এই কৌটার ঢাক্‌নীটা আংঠার ওপরে রা'খ্‌ছি, তার পরে এই দুটো জিনিসই সিকির উপরে রা'খ্‌ছি।" এই বলিয়া বাজীকর ঢাক্‌নীটা-দিয়া আংঠাটা চাপিয়া ধরিবার জন্য উহার পার্শ্ব একটু টিপিবে, তাহার পর বলিবে,—"ভা'ল ক'রে দেখুন, সিকিটা কৌটার ভেতরই রইল কি না, আমি নয় আর একবার আপনাদের দেখাই।" এই বলিয়া বাজীকর আর একবার

সিকিটা দেখাইয়া দিবে। তাহা দেখাইবার সময়ে, সে কৌটার সহিত আংটাটাও তুলিয়া ফেলিবে। তাহার পর বলিবে,—“এখন আমি সিকিটী ছুঁয়ে যেই ব'লব,—‘উড়ে যা,' অমনি উড়ে যা'বে।” এই বলিয়া যেই বাজীকর আর ঢাকনীটার পার্শ্ব না টিপিয়া উহা তুলিয়া লইবে, অমনি সিকিটা উড়িয়া যাইবে! তাহার পর বাজীকর তাহার দুই হাত দেখাইবে, ঢাকনী দেখাইবে, তখন লোকে দেখিবে, তাহার হাতে কিছুই নাই, ঢাকনীতেও কিছুই নাই!

তাহার পর বাজীকর বিস্তর কথাবার্ত্তা কহিয়া, যে লোকের সিকি তাহাকে বলিবে,—“ম'শায়, আজকাল দিনকাল যেরকম খারাপ প'ড়েছে, আপনার সিকিটা গাপ ক'রলে, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন, কাজ কি, আপনার জিনিস আবার আপনাকেএই ফিরিয়ে দি।” বলিয়া সে আবার কৌটাটাদিয়া আংটাটা ঢাকিয়া দিবে। তাহার পর বলিবে, “চলে আয়, চলে আয়।” আর ঢাকনী-দিয়া ধরিয়া আংটা তুলিয়া লইবে। তখন আবার সিকিটা যে জায়গায় ছিল, সেই জায়গায় দেখা যাইবে।
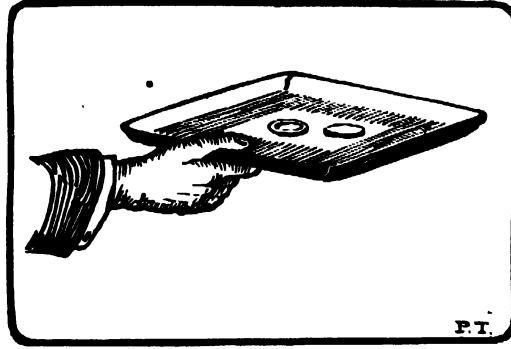
ইহা কি করিয়া হইতে পারে? আসল কৌশল আংটাটাতেই করা হয়। এই আংটার যেদিক্‌টা শোষক-কাগজের উপরে থাকে, সেই দিক্‌টায় একটুকরা শোষক-কাগজ (যেরকম শোষক-কাগজ ট্রের উপরে পাতা আছে, ঠিক সেইরকমই) আঠাদিয়া জোড়া থাকে, ফলে ঐ আংটাটা ঠিক আংটা থাকে না, উহা যেন একটা অসম্ভবরকম ক্ষুদ্র খঞ্জনী হয়।

তাই যখন কৌটার ঢাকনী-ঢাকা আংটাটা সিকির উপরে রাখা হয়, আর তাহার পরে কৌটার ঢাকনীটা তুলিয়া লওয়া হয়, তখন আংটার কাগজের নীচে সিকি চাপা পড়িয়া যায়।

এই ম্যাজিকটা লোকের এত আশ্চর্য্য-বোধ হইবে যে, তাহারা নিশ্চয়ই উহা আবার দেখাইতে বাজীকরকে অনুরোধ করিবে। বাজীকর তৎক্ষণাৎ সম্মত হইবে এবং একটু রকম-ফের করিয়া বাজীটা দেখাইবে। এইবার আংটা ও ঢাকনী দুই-ই সিকির উপরে না রাখিয়া আংটাটার ভিতরে সিকিটা রাখিবে, তাহার পর ঢাকনী দিয়া আংটাটা তুলিয়া লইবে, তাহাতে সিকিটা আবার অন্তর্দ্ধান করিবে। প্রথমবারে ঢাকনীটা ভাল করিয়া দেখান হইয়াছে বলিয়া এবার আর ঢাকনীটার উপর কাহারও নজর পড়িবে না, তবু বাজীকর দর্শকদের এ বিষয়ে বেশীক্ষণ ভাবিবার অবকাশ দিবে না। তাড়াতাড়ি আবার ঢাকনীটা ট্রের উপরে রাখিয়া দিয়া সুধু ঢাকনীটা তুলিয়া লইবে, তখন আবার সিকিটা প্রত্যক্ষ হইবে।

আংটাটাতে কিছু কল-কায়দা করা হইয়াছে, তাহা সহজে কেহ সন্দেহ করে না। সুধু একটা আংটা কি করিয়া সিকি লুকাইতে পারে? তবুও বাজীকর আর একটা ঠিক ঐরকম আকারের সাধাসিধা আংটা প্রথমে ট্রের উপরে রাখিয়া উহাও দর্শকদের পরীক্ষা করিতে দিতে পারে। ট্রেটা ছবিতে যেরকম করিয়া ধরা হইয়াছে, ঠিক ঐরকম করিয়া ধরিয়া বাজীকর ট্রেতে করিয়া আংটা ও কৌটা দর্শকদের কাছে পরীক্ষার জন্য আনিবে, তখন কাজের আংটাটা ট্রের নীচে তাহার অন্য আঙ্গুলগুলির উপরে থাকিবে। তাহার পর যখন সে আবার দর্শকদের দিকে পিছন ফিরিয়া ট্রে টেবিলের উপরে রাখিতে যাইবে, তখন একটু কায়দা করিয়া যদি আংটা-বদল না করিয়া লইতে পারে, তবে সে এই বাজী দেখাইবার চেষ্টা না করিলেই, ভাল হইবে!

স্বসা-স্নেহ।

দেখা যায়, ভাইরা তাহাদের ভগিনীদের সম্বন্ধে তত যেন ভাবে না। কিন্তু ভাই-বোনে যে সম্বন্ধ, তাহার মত পবিত্র সম্বন্ধ বুঝি জগতে আর নাই। ভাই বা বোন পরস্পরের আত্মীয়ও বটে, বন্ধুও বটে। ভাইরা কিন্তু তাহাদের বড় বোনদের তত ভক্তি করে না, ছোট বোনদের তো উপেক্ষাই করিয়া থাকে, এটি ভাল নয়। আজ আমি এক ভাইএর তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির কথা বলিব।

তোমরা অনেকেই হয়তো সেক্সপিয়ারের নাটকাবলীহইতে গল্প-সঙ্কলয়িতা ও সঙ্কলয়িত্রী চার্লস্ ও মেরী ল্যামের কথা শুনিয়াছ। ইঁহারা দুইজনে ভাই-বোন ছিলেন। মেরী বড় ও চার্লস্ ছোট ছিলেন। একদিন মেরী উন্মত্ততার উত্তেজনায় তাঁহার জননীর বুকে ছুরিকা বসাইসা দিলেন। যেদিন ঐ দুর্ঘটনা ঘটে, সেইদিন-অবধি চার্লস্ মেরীর যত্ন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়া তুলিলেন। পাছে পাগলিনী ভগিনীর অযত্ন হয়, এই-জন্য তিনি বিবাহই করিলেন না। পাগলের সঙ্গে বাস করা যে, কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী-ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। চার্লস্ তাঁহার ভগিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহবশতঃ চিরজীবন সেই কষ্ট সহিতে প্রস্তুত হইলেন। মেরী যখন একেবারে পাগল হইয়া

যাইতেন, তখন চার্লস্ তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাতুলাশ্রমে রাখিয়া আসিতেন। ভাল হইলে, আবার নিজের কাছেই করিতেন। তিনি বলিতেন,—"মেরীকে (ইংরাজে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর, নাম ধরে) ঈশ্বর ভাল বাসেন, আমরাও যেন কেহ কাহাকেও

চিত্র-প্রতিযোগিতার ফল।

শিবপ্রসাদ দেব- বৎসর পুর চিত্র- এই চিত্রে প্রথম স্থানাধি রে বাল
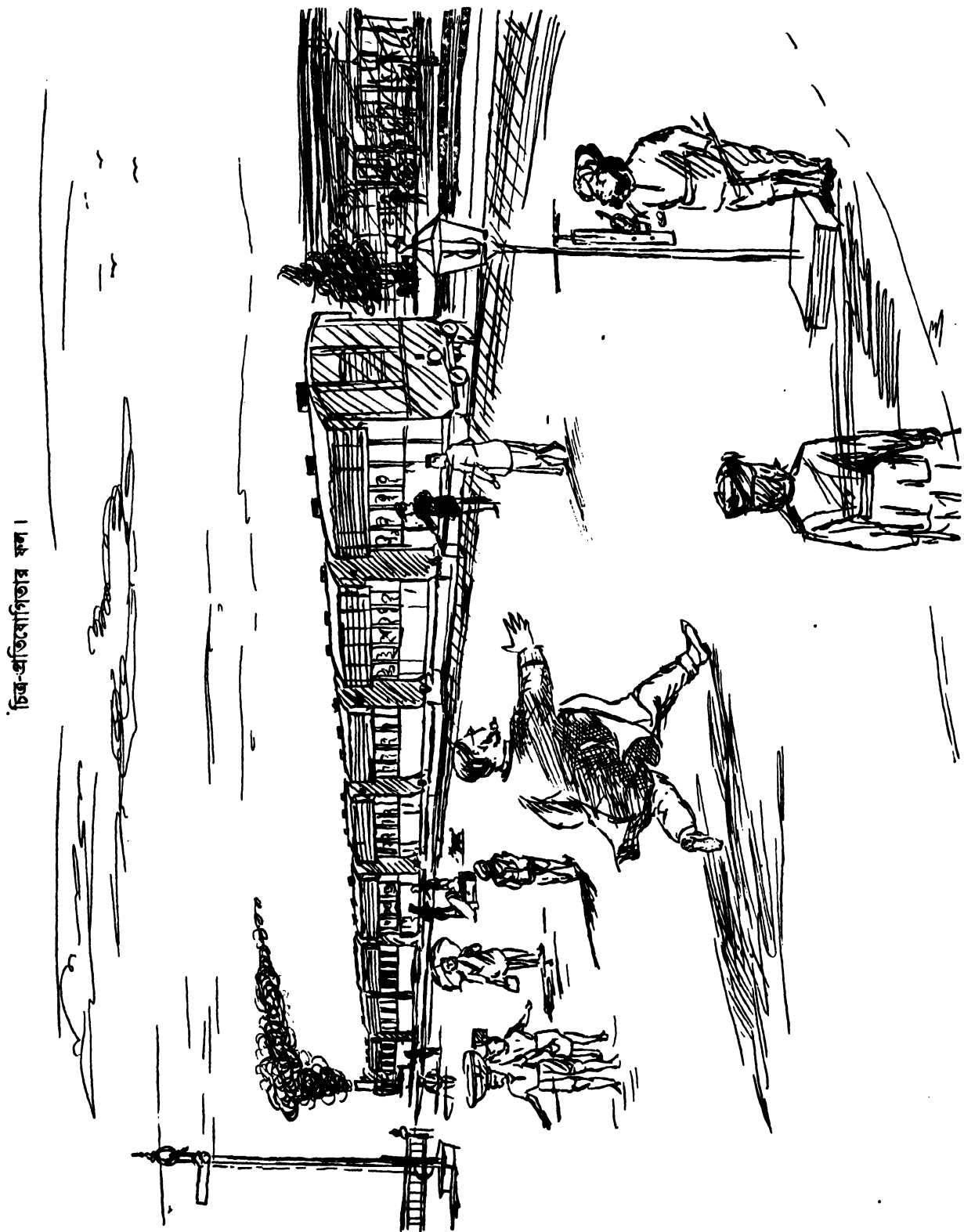
আনিয়া রাখিতেন। মেরী যখন ভাল থাকিতেন, তখনও মাঝে মাঝে তাঁহার উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইত। কিন্তু চার্লস্ তাঁহার সেই উন্মাদিনী ভগিনীর সহিত সর্ব্বদাই অতি মৃদুব্যবহার কম না ভালবাসি।" সুদীর্ঘ চল্লিশ-বৎসর-কাল চার্লস্ মেরীর প্রতি ঐ একইরূপ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও যত্নপ্রকাশ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কখনও তাঁহার প্রতি বিরূপ হন নাই। স্বসার প্রতি

এইরূপ স্নেহ সকল ভাইএরই প্রকাশ করা উচিত। উদার-হৃদয় চার্লস্ ল্যাম পৃথিবীর অনেক ভাইএরই আদর্শস্থানীয়। ভারতে ঐপ্রকার স্বগা-স্নেহ-প্রকাশের সবিশেষ আবশ্যকতা আছে, কেননা ভারতীয়া নারীরা বিশেষতঃ বিধবারা বহু পরিবারে বাস্তবিকই উপায়হীনা অবলা, বড়ই কষ্টে জীবন-যাপন করেন। তাঁহাদের ভাইরা যদি তাঁহাদের প্রতি মহাত্মা চার্লস্ ল্যামের মত স্নেহ, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি-প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দাবদগ্ধ হৃদয় শীতল হইবে, তাঁহারা জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা-লাভ করিবেন।

ক্রিকেট

খেলোয়াড়দের প্রতি সাধারণ সঙ্কেত।

"বালক"-পাঠকদিগের মধ্যে অনেকে, বোধ হয়, শীতকালে ক্রিকেট খেলিতেছে। তাহাদের সকলকার হয় ত এই ইচ্ছা আছে, যেন তাহারা নিজেরা ভাল খেলোয়াড় হয় এবং তাহাদের দল ম্যাচ্ খেলিয়া জিতিতে পারে। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া তাহাদিগকে এমন কএকটী সঙ্কেত বলিয়া দিতে চেষ্টা পাইব, যদ্দ্বারা তাহাদের ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। আমরা প্রথমতঃ তোমাদিগকে মনে করাইয়া দিতে চাহি যে, দল যাহাতে জিতিতে পারে, তজ্জন্য সকলের একমত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করা দরকার। দলের জয়-লাভ কেবল একজনের নয়—সকলেরই সমবেত চেষ্টার উপর নির্ভর করে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যেমন, ক্রিকেট-ক্ষেত্রে তেমনই দলের প্রত্যেক সদস্যের সমগ্র দলের প্রতি বিশ্বস্ত ও কাপ্তেনের আজ্ঞাবহ থাকা দরকার। আমরা অনেক সময়ে মনে করিতে পারি যে, কাপ্তেন আমাদের কৌশল ও যোগ্যতা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না, তাহা হইলেও বাধ্য ও বিশ্বস্ত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা যদি এইরূপে কাপ্তেনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তাহা হইলে আমাদের মনে অশান্তি ও অসন্তোষ-ভাব জন্মিবে না এবং সমগ্র দলের উন্নতি হইবে। বিশ্বস্ততাসম্বন্ধে আমার আর একটী কথা আছে; অনেক ক্রিকেট-দলের মধ্যে বড় শিথিল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমি যখন প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলাম, তখন কলেজ-ছাত্রদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার বেশ স্মরণে আছে যে, একটী ম্যাচ্ খেলিবার পর আমি সকল খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, "তুমি কালকে খেলিতে পারিবে কি?" সকলে "হাঁ" বলাতে আমি সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসি। পর দিন যখন আমি St. Xavier's কলেজে খেলা করিতে গেলাম, তখন দেখিলাম যে, উক্ত দশজন খেলোয়াড়দের মধ্যে কেবল দুই-চারিজন উপস্থিত ছিল! ফলতঃ অনেক খেলোয়াড় নিজেদের দায়িত্ব বুঝে না; তাহারা ঠিক সময়ে ক্রীড়া-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় না কিংবা আদৌ আসে না। ক্রিকেট-খেলা যাহাতে ভালরূপে চলে, তজ্জন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝা ও স্বীকার করা আবশ্যক। সকলে যদি নিজ নিজ দায়িত্ব-স্বীকারপূর্ব্বক প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের দলের চমৎকার উন্নতি হইবে, সন্দেহ নাই।

সবরকম খেলাতেই খেলোয়াড়ের কৃতকার্য্যতা তাহার স্বাভাবিক-বৃত্তি বা শক্তির উপর অনেকটা নির্ভর করে বটে, কিন্তু যত্নের সহিত অভ্যাস করিলে সাধারণ খেলোয়াড়ও প্রচুর উন্নতি-লাভ করিতে পারে। যাহারা ক্রিকেট শিখিতেছে, তাহাদের এমন একজন শিক্ষক থাকা চাই, যিনি তাহাদের দোষ সকল দেখাইয়া তাহাদিগকে সেই সমুদয়ের সংশোধন করিতে সাহায্য করিতে পারেন।

ব্যাট্ করিতে গেলে, ছেলেদের দুইটী বিষয়ে সাবধান থাকা আবশ্যক। ব্যাট্ করিবার সময়ে অনেকে উইকেটের সামনে এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, বলটী যদি তাহাদের পায়ে লাগে, তাহা হইলে তাহারা এল্ বি ডবলিউ হইয়া আউট হয়। এই কু-অভ্যাসটী বড় বিপজ্জনক বলিয়া, এতদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া অত্যাবশ্যক, নহিলে নিপুণ বোলার তোমাকে শীঘ্র আউট করিয়া দিতে পারিবে। পক্ষান্তরে এমন অনেক ছেলে আছে, যাহারা, বোলার বল দিতে উদ্যত হইলেই, আহত হইবার ভয়ে পা সরাইয়া দেয়। এই ত্রুটিও বড় বিপজ্জনক; তুমি যদি উত্তমরূপে ব্যাট্ করিতে চাও, তবে তোমাকে তোমার ডাইন-পা স্থির রাখিতে কিংবা আবশ্যকমত এদিকে বা ওদিকে সঞ্চালন করিতে হইবে।

উইকেট নিরাপদে রাখিয়া রাণ-স্কোর করা ব্যাট্স্ম্যানের কর্ত্তব্য, এবং তাহার উদ্দেশ্য যেন সফল হয়, তজ্জন্য তাহার সতর্ক ও বিবেচক হওয়া দরকার। কেহ কেহ আত্মরক্ষার প্রতি এতদূর দৃষ্টি রাখে যে, দর্শকদের বোধ হয়, যেন তাহারা রাণ-স্কোর করিতে চাহে না। অনেকে আবার স্কোর করিতে এমন ব্যতিব্যস্ত হয় যে, তাহারা আত্মরক্ষা করিতে ভুলিয়া যায়। ব্যাট্স্ম্যানের পক্ষে দুঃসাহস বিপজ্জনক বটে, কিন্তু অন্যদিকে আবার জোর করিয়া বলটীতে আঘাত করা আত্মরক্ষার একটী বড় প্রয়োজনীয় উপায়, আত্মরক্ষা করিবার সময়ে ব্যাট্স্ম্যানের একটু জোর করিয়া বলের উপর আঘাত করা উচিত; তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, রাণ-স্কোর করা তাহার অভিপ্রেত। এমন অনেক ক্রিকেট-দল

আছে, যাঁহারা না হারিলেই সন্তুষ্ট থাকে। এইপ্রকার দলের খেলা-পদ্ধতি সন্তোষজনক নহে, বরং যাহারা বিপক্ষ-দলকে পরাভব করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, এবং জিতিতে না পারিলে, পরাজয়-স্বীকার করিতে উদ্যত হয়, তাহাদেরই খেলা সন্তোষজনক।

ব্যাট্স্ম্যানকে আউট করিতে সচেষ্ট থাকা বোলারের কর্ত্তব্য। ব্যাট্স্ম্যান বেশি রাণ স্কোর করিতে না পারিলেই, অনেক বোলার যেন সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু ইহা বড় ভুল। বোলারকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহার দশজন সাহায্যকারী আছে; তাহারাও ব্যাট্স্ম্যানকে আউট করিতে প্রস্তুত ও উদ্যোগী। ব্যাট্স্ম্যানকে কোন-না-কোনপ্রকারে প্রবঞ্চনা করিতে সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য; তাহাকে এমনভাবে প্রলোভন দেখাইতে হইবে, যেন সে দুঃসাহসীর ন্যায় হিট্ করিয়া বিপদ্গ্রস্ত হয়। আমার স্মরণে আছে, একজন বোলার একসময়ে আমাকে উক্তপ্রকারে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন। আমি বলটী এমন জোর করিয়া মারিয়াছিলাম যে, তাহা উঁচু হইয়া বোলারের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া ক্রীড়া-ক্ষেত্রের সীমা-অতিক্রমপূর্ব্বক নিরাপদে একটী বাগানে পড়িয়াছিল। ফলে কি হইল? আমি জোর করিয়া হিট্ করিতে ভালবাসি বুঝিয়া বোলার আমাকে প্রলোভন দেখাইলেন। তিনি পর বলটীর জোর ও টিপের যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে ভুলাইলেন, কাজেই আমি বলটী মারিলে,তাহা এবার ক্ষেত্রের সীমা-অতিক্রম না করিয়া লং-অনের হাতে পড়িয়া গেল। ব্যাট্স্ম্যানের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে উক্তপ্রকারে প্রলোভন দেখাইলে, বোলার প্রচুররূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে। বোলার যখন দেখিতে পায় যে, ব্যাট্স্ম্যান অমুক দিকে বল ছুড়িতে ভাল বাসে, তখন সে ঐ দিকে একজন নিপুণ ফিল্ডারকে দাঁড় করাইয়া এমনভাবে বল দিবে, যাহাতে ব্যাট্স্ম্যান প্রলোভিত হইয়া ঐ ফিল্ডারের দিকে বল উঁচু করিয়া ছুড়িয়া দেয়। এইপ্রকার উপায়-অবলম্বন করিলে, ফিল্ডার সম্ভবতঃ ক্যাচ্ করিবার সুযোগ পাইবে। ব্যাট্স্ম্যান হয় ত প্রথমে কএকটী রাণ-স্কোর করিবে, কিন্তু শেষে সে ধরা পড়িবে। যতসাধ্য ফিল্ডারের নিকটহইতে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া বোলারের কর্ত্তব্য।

যাহাদের শারীরিক বল বেশি নহে, তাহারা মনে করিতে পারে যে, তাহাদের পক্ষে ক্রিকেট-খেলা করা অসম্ভব, কিন্তু এইরূপ মনে করা ভুল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বা ফুস্-ফুসের অবস্থা খারাব, তাহারা অবশ্য ক্রিকেট ভাল করিয়া খেলিতে পারিবে না; তাহাদের পক্ষে খেলিবার চেষ্টা করাও সম্ভবতঃ বিপজ্জনক হইবে, কিন্তু অন্য ছেলেরা ক্রিকেট বেশ শিখিতে পারে। এই খেলাতে শারীরিক বলের উপর তত নির্ভর করা যায় না, সুতরাং যে বালকের শরীর অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সেও বেশ খেলিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা তাহার যথেষ্ট উপকার হইবে, সন্দেহ নাই।

ভ্রম-সংশোধন।

নবেম্বর-মাসে প্রকাশিত "সন্ন্যাসীর দান" শীর্ষক রঙ্গ-গাথার লেখকের নাম অনিলপ্রকাশ ঘোষ নহে, অনিলপ্রকাশ সোম।

আগামী বর্ষের "বালক"।

আগামী বর্ষের বালকের প্রথম সংখ্যাতে একখানি সুবৃহৎ ও সুরঞ্জিত চিত্র থাকিবে। কিন্তু প্রচলিত মহাযুদ্ধপ্রযুক্ত ঐ চিত্রখানির অতি অল্প সংখ্যাই আমাদের হস্ত-গত হইয়াছে, সেইজন্য বালকের সমস্ত গ্রাহককে আমরা ঐ ছবিখানি দিতে পারিব না, কোন পুরাতন ছবি দিতে হইবে। অতএব যাঁহারা নূতন ছবি পাইতে চান, তাঁহারা মনি-অর্ডার করিয়া বালকের বার্ষিক মূল্য ॥৴০ এই সংখ্যাটি হস্তগত হইবামাত্র পাঠাইতে অন্যথা করিবেন না। আমরা গ্রাহকদের নিকটহইতে মূল্য প্রাপ্তির তারিখ-অনুযায়ী গ্রাহক-তালিকায় তাঁহাদের নাম লিখিয়া যাইব এবং নূতন ছবি প্রথম কয়েক সহস্র গ্রাহককে দিব।

আগামী বর্ষের "বালক" যাহাতে কি লেখায়, কি ছবিতে আরও ভাল হয়, তাহার জন্য আমরা যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করিব না। ১৯১৫ সালের "বালকে"

১। পাচিকার পুত্র

২। কালোয়াৎ

এই দুইটি আখ্যায়িকা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। তাহাছাড়া প্রত্যেক মাসেই ২।১ টি ছোট গল্পও প্রকাশিত হইবে। ইহাছাড়া আগামী বর্ষের বালক যাহাতে নানা চিত্তাকর্ষক সন্দর্ভে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, তাহারও জন্য এখনহইতে যত্ন করা হইতেছে। আগামী বর্ষে এই উপাদেয় প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি প্রকাশিত হইবে—

(১) তারকাসম্বন্ধিনী উপকথা।
(২) মানুষে কি করিয়া লিখিতে শিখিয়াছে?
(৩) নানা দেশের পুতুল।
(৪) বিপদ্-প্রতীকার।
(৫) কুসুম-রক্ষা।
(৬) লাঠি ও রুমালের খেলা।
(৭) মুদ্রা ও রুমালের ম্যাজিক।
(৮) মাকড়সা ও মাছি (গাথা)
(৯) একটুকরা রেশমের কাপড়।
(১০) মস্তিষ্ক-তত্ত্ব।
(১১) বালুকায় মানচিত্র-রচনা।
(১২) বংশী-নির্ম্মাণ।
(১৩) ফল কি করিয়া টাট্কা রাখা যায়?
(১৪) শ্রবণ-রহস্য।
(১৫) বালুকা-দুর্গ।
(১৬) ঘাসের কথা।
(১৭) আমরা অন্ধকারে দেখিতে পাই না কেন?
(১৮) হৃদয়-তত্ত্ব।
(১৯) দিয়াশলাইএর বাক্সের দেরাজ।
(২০) জিউ-জিৎসু।

ইত্যাদি ইত্যাদি। "বালক"—কার্য্যাধ্যক্ষ।

ধাঁধার উত্তর

১। জুলাই-মাসের ধাঁধার উত্তর—বালক।

২। অক্টোবর-মাসের ধাঁধার উত্তর- একজোড়া জুতা।